বঙ্গদর্শন

১২৭৯ সালে প্রথম মুদ্রিত

বঙ্গদর্শন
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সম্পাদিত
71930
THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA
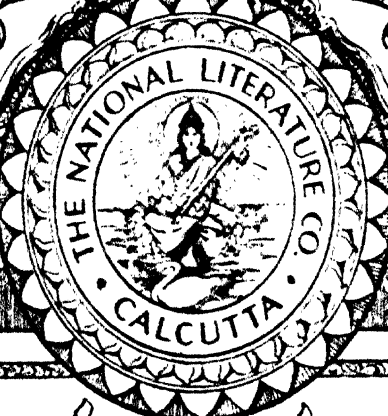
বিজ্ঞপ্তি

পুনর্মুদ্রিত 'বঙ্গদর্শনে'র বর্ত্তমান খণ্ডটি আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিতেছি। আশা করি আপনারাও ইহার রসাস্বাদনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবেন। ইহার সম্পাদন কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে মূল গ্রন্থের অনুসরণ করা হইয়াছে এবং মুদ্রাকর-প্রমাদ যথা সম্ভব দূরীকরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও যদি কোনও ভুল, ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। পরবর্ত্তী আট খণ্ডেও আমরা ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সুশীলা সুন্দরী দেবীর সহায়তা ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ-প্রচার কদাচ সম্ভব হইত না এবং তিনি আমাদিগকে 'বঙ্গদর্শনে'র মূল গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই খণ্ডের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

আমাদের প্রার্থনা এই, যেন আমরা উত্তরোত্তর আপনাদিগের এইরূপ আনন্দবর্দ্ধন করিতে কৃতকার্য্য হই। ইতি—

১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৬ দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিলেই বঙ্গবাসীগণের স্মৃতিপটে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রটিই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সর্ব্বাশ্রয়ী। তাঁহার প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই সোনা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কবি-প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কেবল রসসৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—যাহাতে বঙ্গসাহিত্য ভাব ও ভাষার সম্পদে বিশ্বসাহিত্যের আসরে একটি সম্মানের স্থান পাইতে পারে এই আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার অন্তরে বর্ত্তমান ছিল। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। 'বঙ্গদর্শনের' স্বল্প পরিসর জীবনে বঙ্গ সাহিত্যের এক অসীম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে কতবড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কেবল তাঁহার রচিত উপন্যাসের সহিত পরিচয় থাকিলে চলে না। বঙ্কিমের প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। ইহার ভিতরে বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার সহস্রদল বিকশিত। এখানে তিনি একাধারে কবি, সমাজ-সংস্কারক, ঔপন্যাসিক, ভাবুক, স্বদেশভক্ত, সমালোচক, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং দার্শনিক রূপে দর্শন দিয়াছেন।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১২৭৭ সাল হইতে এই বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অবশেষে ১২৭৮ সালের শেষভাগে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। সেই বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত লেখকগণের নাম ছিল :—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জগদীশনাথ রায়
,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
,, রামদাস সেন
,, অক্ষয় চন্দ্র সরকার।

প্রথম সংখ্যায় যে সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে চারিটি বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। কেবল প্রথম সংখ্যায় নহে 'বঙ্গদর্শনের' অন্যান্য বহু সংখ্যাতেই অধিকাংশ রচনাই বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত হইত। সুতরাং বঙ্কিমের কল্পনা

'বঙ্গদর্শনে' যেরূপ সহস্রধারে উৎসারিত হইয়াছে সেরূপ অন্য কোথাও হয় নাই। একা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' অধিকাংশ প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি কোন রচনায় লেখকের নাম দেন নাই।

'বঙ্গদর্শন' বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত মাসিকপত্র না হইলেও আদর্শ মাসিক-পত্র হিসাবে ইহা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার অভিনব অনন্যসরণীয় আদর্শই বঙ্গসাহিত্যে মাসিকপত্র সম্পাদনার একটি উন্নত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে কেন্দ্র করিয়া এক সাহিত্যিক-মণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় সৎসাহিত্য সৃষ্টি ও বৃদ্ধিই ছিল তাঁহাদের সাধনা এবং অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আচরিত ব্রত। সঞ্জীবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ ইহাতে নিয়মিত ভাবে লিখিয়া তাঁহাদের ভাবসম্পদ দ্বারা বঙ্গদর্শনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেন। ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-নির্ঝরিণী-নিঃসৃত উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী। বঙ্গবাণীর আরতির জন্য ইঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক ভাব ও কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনীষার সোনার কাঠির স্পর্শে সাহিত্যের সুপ্ত রাজকন্যার সুপ্তপাকরের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পূর্বে যে সাহিত্য সকলের অনাদৃত ছিল, যে সাহিত্য কেবল বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক বাহিত, সংবাদের অপরূপ ইন্দ্রজালের দ্বারা তাহাকে তিনি যে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে নিখুঁত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে সেকালের বঙ্গবাসীমাত্রই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে যতটা রসসৃষ্টির আনন্দের প্রেরণা, ঠিক সেই পরিমাণে ছিল বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গভাষার সেবা ও সমৃদ্ধির জন্য একনিষ্ঠ সাধনা ও তপস্যা। বঙ্গসাহিত্যের এই সেবায় 'বঙ্গদর্শনই' ছিল তাঁহার সহায়। বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে 'বঙ্গদর্শন' যে কতখানি সহায়তা করিয়াছিল তাহা কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের অভিমত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদ পত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। ... ... বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর মালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের

কত উর্দ্ধে সমুৎথিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। এবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাপ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকৃত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।" মনস্বী গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনে প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থাদির যে সমালোচনা হইত, তাহাতে প্রশংসার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আর যাহারা অনুপযুক্ত তাহারা বাধ্য হইয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উপযুক্ত পথ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন। আমার বোধ হয় এই দুইখানি পত্রিকা, বিশেষত বঙ্গদর্শন, যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল ও যে শক্তি প্রয়োগ করিত তাহা পূর্ব্বকালের রাজশক্তিরই বুঝি অনুরূপ ছিল। সকলেই বঙ্গদর্শন সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত, তিনি যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিতেন রাশি রাশি পাঠক তাহা অবিলম্বে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারকে পরোক্ষভাবে প্রোৎসাহিত করিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে গ্রন্থের নিন্দা করিতেন, সে গ্রন্থ বড় কেহ কিনিত না। পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে তাহা কীটদষ্ট হইয়া জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। বড় সহজ কি এই শক্তি! কিন্তু বঙ্গদর্শন একদিন তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা প্রভাবে, সর্ব্বোপরি পক্ষপাতশূন্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনাবশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন সাহিত্যজগতে এইরূপই রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিল।" গিরিজাপ্রসন্নবাবুর এই উক্তিতে যথেষ্ট সত্যতা আছে। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গদর্শনের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এইরূপ দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়। আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।"

যে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল সেই অমূল্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করিয়া ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানি বঙ্গসাহিত্যের অসীম উপকার করিলেন। ইহাতে বহু লুপ্ত রচনার সহিত বাঙ্গালী পরিচিত হইতে পারিবে। ইঁহাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং বঙ্গবাসীমাত্রেই ইঁহাদের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১০ই বৈশাখ, ১৩৪৬। শ্রীমন্মথমোহন বসু

উৎসর্গ পত্র

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
কর্তৃক
পুনর্মুদ্রিত "বঙ্গদর্শন" গ্রন্থ
জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে
সাহিত্য-রস-পিপাসু সকল বাঙ্গালীর হস্তে
অর্পিত হইল।

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

ইংরাজিভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিষ্কর্ম্মা বামুনের ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকাপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজি কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে

কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতা ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেক গুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত; সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালি হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন "ফিলটর ডৌন" করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালি জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য! এত কাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা তাঁহাদিগের ছিদ্র গুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য

হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে ?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ ফল জন্মিবে কি প্রকারে ? যে পৃথক, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায় ? যদি শক্তিমন্তব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে ? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায় ? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যত দিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, তত দিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যে রূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী ; এথেন্সে সকলে সমান ; স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যা প্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজ-পীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত পদাদি ছেদ করিয়া, যে

রূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ বিপ্লবে সেই রূপ সামাজিক মঙ্গল সাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে শিক্ষা, এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ; লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালি তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবরিত করিলাম। কিন্তু রচনা কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটী বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী, লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে; তাহাদের নিকট যশঃ হইলে তাহাতে লিপি-পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এ দিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালি—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনি এত হতাদর কেন?"

তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গলা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয় খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর এক খানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এই রূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, বাঙ্গালির অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপি কৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতক দূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজন পাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য বিবেচনা করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটী নূতন উদাহরণ স্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্বতনেরা এই রূপ এক এক বার অকাল গর্জ্জন করিয়া, কালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। এক-খানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।
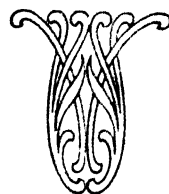
ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌষ্ঠব লইয়া আমরা অনেক স্পর্দ্ধা করি। বাস্তবিক, স্পর্দ্ধা করিবার বিষয় অনেক আছে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতিগণেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের পাণ্ডিত্য, শিল্প, সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা কখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য লইয়া গৌরব করি না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের চির কলঙ্ক; ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া কস্মিনকালে সুখ্যাত নহেন। এই জন্য, তাঁহারা বাহুবল-দর্পিত ভিন্ন জাতীয়দিগের কাছে কতকদূর ঘৃণিত। সাহেবেরা আধুনিক সিপাহীদিগকে যুদ্ধে কিছু দূর পটু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু সে পটুতা তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা ও বিলাতী যুদ্ধ প্রণালীর গুণেই হইয়াছে, বলিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয়েরা, এক্ষণে যাহাই হউন, কোন কালে যে যুদ্ধে অন্যান্য ইতিহাসকীর্ত্তিত জাতির সমকক্ষ ছিলেন না, এমত আমরা সহসা স্বীকার করি না। এবং পূর্ব্বকালিক ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবী-মধ্যে রণকুশলী জাতিগণের অগ্রে গণ্য হইতে পারিতেন, ইহা সমর্থন করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়-দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়-দিগের যে শ্লাঘনীয় সমরকীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই

নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

সে যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ব্বকালে যুদ্ধ-নিপুণ কি হীনবল ছিলেন, তদ্বিষয় স্থির করিবার জন্য ইতিবৃত্ত-ঘটিত প্রমাণ এক্ষণে অতি বিরল। ভাগ্যক্রমে ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশলী যুনানী লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছেলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষির পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্প সংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্য-নিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারাও এই দোষে এইরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। অন্যের কথা দূরে যাউক, এক্ষণে যিনি ফরাসিস্ রাজ্যের চূড়া, সেই মহাত্মার লিখিত প্রথম নাপোলেয়নের যুদ্ধবিবরণ এই কথার এক উদাহরণ স্থল। গত ফরাসিপ্রুষীয় যুদ্ধে ফরাসি লেখকেরা, যেরূপ যুদ্ধসম্বাদ প্রচার করিতেন, তাহা দ্বিতীয় উদাহরণ স্থল। অন্য উদাহরণ যাউক, সত্যনিষ্ঠ ইংরাজগণ প্রচারিত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত হইতে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পলাসীর যুদ্ধ, 'গ্লোরিয়স্ বিকটরি।' যাহারা "সয়ের মতাক্ষরিণ" নামক পারস্য গ্রন্থ বা তদনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ইংরাজের সে রণজয় কি প্রকার। ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার উল্লেখ না করিলেও হয়।

যে২ স্থলে মুসলমানদিগের লেখার সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দিগের লেখা তুলনা করিবার উপায় আছে, সেই২ স্থলে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদের স্বপক্ষবাদিত্ব পদে২ প্রমাণ হয়। কর্ণেল টডের প্রণীত রাজস্থান পাঠ করিয়া অনেক স্থানে দেখা যায় যে, মুসলমানেরাই চিরজয়ী নহে। রাজ-

পুতেরা বহুকাল তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইয়া, অনেকবার তাঁহাদিগকে পরাজিত এবং শাসিত করিয়াছেন। মুসলমান লেখকেরা সে সকল বৃত্তান্ত প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সে সকল বৃত্তান্তের কোন উল্লেখ করেন, তবে প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করেন, অথবা অতি সংক্ষেপে সে বিষয় সমাধা করেন। আর যেখানে মুসলমান মার্জারে হিন্দু মূষিকশিশু ধৃত করিয়াছে, সেখানে সেখজীরা অনেক কোলাহল করিয়াছেন।

এরূপ তর্ক হইতে পারে, যে উভয় পক্ষের কথা যখন পরস্পর-বিরোধী, তখন কোন্ পক্ষ মিথ্যাবাদী, তাহা কে স্থির করিবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাজপুত পক্ষে অনেক অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ আছে। কিন্তু সে সকল বিচারের এস্থানে প্রয়োজন নাই। অস্মদাদির বিবেচনায় উভয় পক্ষই কিয়দ্দূর অসত্যবাদী হইতে পারে। এইজন্য দেশীয় এবং বিপক্ষ দেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমা-পরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্‌বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও সিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয়বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক২ বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্ক-স্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য প্রথম মহালেবের সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ কাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাহা রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারতজয় দিগ্‌বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিনিষ্টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ।

আমরা বলি, রণনৈপুণ্য—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতিপদাবনত ?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়-বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি, প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে২ জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্প কালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক এবং কাবুল রাজ্য, এই সকল উচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষাও সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যুনানী রাজ্য আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একবারে নিঃশেষ-বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ একশত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা যুনানী রোমক রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে উচ্ছন্ন যায়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ; তাহাই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরি কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে,

তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকী বংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে; তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। *

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল— রাজলক্ষ্মী ক্রমে২ মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে যুনানীদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণন কালে, তাহারা এইরূপ পুনঃ২ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণকর্ত্তৃক যেরূপ যুনানী সৈন্য হানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতিকর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতাসম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি মাকিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্তলেখক-যুনানীদিগের গ্রন্থপাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভপূর্ব্বক ভারতবর্ষাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে; এবং সিন্ধু পারে বা তদুভয় তীরে স্বল্পপ্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত, আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণ স্খলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না, সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয়

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই; অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপরাগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটী কারণ আছে।—

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই—আপনার গুণগান আপনি গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমক লিখিত ইতিহাস। যুনানীদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়—যুনানী লোকের লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশলী, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেননা সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর-গৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়-নিষ্ঠা এবং বীর-গৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায়, "ভাল মানুষ" শব্দের অর্থ ভীরু-স্বভাবের লোক—অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দু রাজগণ যে একবারে পর-রাজ্যে লোভ শূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র২ মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশ জয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না;—কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারত স্বরাজ্য-ভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশে জয়যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও

হিন্দুদের ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাঁবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীর-গৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায়, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণ স্থল। মধ্য-কালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীক্‌দিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও য়ুনানীদিগের কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটী কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর, বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গম নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এ রূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটী বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশ-বাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং অন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদের বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" স্বজাতীয় রাজা,

পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে—পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কি জন্য স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন, রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয়, হউক; আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না। *

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরাজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধন সঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম, ধন সঞ্চয়ে একব্রত হইয়া, কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয় মধ্যে, কাহারও কার্য্য স্বাভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ যুনানীয়েরা স্বাধীনতাপ্রিয়, হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতি-গত স্বভাববৈচিত্রের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

* আমরা এত বলিনা যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার রাজপুতদিগের অপূর্ব্বকাহিনী যাহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যানুরক্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয়শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবী মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা সাধারণ হিন্দু সম্বন্ধে যথার্থ।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা তর্ক করেন যে হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম। এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমন আমরা বলিনা; ইহা হিন্দু জাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাতশত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বহিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণ গান নাই। মীবার ভিন্ন, কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এসকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই রূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুজ্ঞের্য় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্ব-সামগ্রীপরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্প কালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত

সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্লান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার—নির্ব্বাণই মুক্তি। পৌরাণিক ধর্ম্মের দর্শন ভগবদ্গীতা। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সকল কর্ম্মই বৃথা, কর্ম্মহীনত্বই ভাল। এরূপ নিষ্কর্ম্ম-ধর্ম্মদীক্ষিত জাতি, বহু যত্নসাধ্য স্বাতন্ত্র্যের অনুরাগী হইবে কেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দু জাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে যবনবিজয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতিবিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দু সমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর; হিন্দু সমাজ যে কখন শক যোনা যবন প্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দু-রাজগণ আপন২ রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রুবিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেননা আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধন প্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাঁহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্য রক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা যুনানী, শক বা বাহ্লিক কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্য জাতীয়, আর্য্য জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্য-

কুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরাজ—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ ; সাধারণ হিন্দু সমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দু রাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়োঃ ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না ; কেননা সাধারণ হিন্দু সমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই তর্কে হিন্দু জাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ—হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজ মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ২ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য, আর এই রূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এক রূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী, একত্র-মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি-পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না ; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয়ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এই রূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেক বার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে; বহু-লোক-ক্ষয়কারী "সক্সেষণ্-যুদ্ধ" এই সামাজিক চিত্তবিকারের ফল। গত বর্ষের ভয়ঙ্কর ফরাসি-প্রুষীয় যুদ্ধ এই বিষবৃক্ষে জন্মিয়াছিল। অদ্যাপি ইউরোপে অনেক কুসংস্কার এই বিষবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতেছে। যথা—"প্রোটেক্সন্।"

জাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতি মধ্যে ইহা বলবৎ হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে, বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবৎ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। তাৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধি-বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয় স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে২ এক২ খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজ ভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানাভেদ শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক

হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানাজাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্য সিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্ম-ভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার যবনেরা আসিল। যবনদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন যবন সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বত পার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়ায় যবন হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ যবন হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু মুসলমান, মোগল পাঠান. রাজপুত মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্য-জ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে, বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুতজাঠ এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালী বেহারী একবংশীয় হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ; তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা-জ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালি জাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীক জাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহু কাল পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন২ নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্নজাতিগণের সেই রূপ ঘটে। তাহাদের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্য-মধ্যগত জাতিদিগের এই দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন

হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয়-কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কারণ হিন্দু সমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাস-কীর্ত্তিত কাল মধ্যে কেবল দুই বার হিন্দু সমাজ মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। এক বার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল-সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। চিরজয়ী যবন হিন্দু-কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা, ইংরাজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খাল্‌সা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরাজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খাল্‌সা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজের ধার ভারতবর্ষ কখন শোধিতে পারিবে না। ইংরাজ বাণিজ্য বাড়াইতেছে, রেলওয়ে বসাইতেছে, টেলিগ্রাফ খাটাইতেছে, শান্তিরক্ষা করিতেছে, সদ্বিধি প্রচার ও সুবিচার বিতরণ করিতেছে, কিন্তু এ সকলের জন্য বলি না। ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে; যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে; শুনাইতেছে; বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সেপথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

১

কে চাহে খাইতে মধু বিনা বঙ্গকুসুমে ?—
এমন কোথায় আর,
কোমল কুসুম হার,
পরিতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে ?—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

২

কি ফুলে তুলনা দিব বল চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

৩

মধুর সৌরভময় ভাব দেখি চামেলি—
ঢালে কি অতুল বাস
মুখে তুলি মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি !

কি জাতি বিদেশী ফুল !
আছে এর সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে করে চিতপুতুলি ?
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

৪

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
প্রবেশে মুনির মনে নাহি জানে ছলনা ;
নাহি পরে বেশবাস,
ফুটে থাকে বার মাস,
অধরে অমিয় ধরে, হৃদে পূরে বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম পাব কোথা ললনা !

৫

কে দেবে বিলাতিফুল লিলি পদ্মে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে,
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী শোভে তায় কে বোঝে সে মহিমা —
কে দেবে বিলাতিফুল লিলি পদ্মে উপমা ?

৬

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরাণী গুল্
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা ফিঁকে ভায়োলেট্ গন্ধ নাহি তাহাতে—
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

৭

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে--
মালতী, কেতকী, জাতী
বাঁধুলি কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে,—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গকুল মাঝারে!

৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিময় মাধুরী!—
লতায় লতার পরে,
ভ্রমরে হৃদয়ে ধরে,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভাল বাসি
কালোতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি পেলে হেন ভ্রমরী?—
মরি কি অপরাজিতা নীলিময় মাধুরী।

৯

এ মাধুরী সুধারস পাব কোথা কুসুমে?
এমন কোথায় আর
কোমল কুসুম হার,
পরিতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে?

বিষবৃক্ষ

উপন্যাস

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রের নৌকা যাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও, নৌকা সাবধানে লইও, তুফান দেখিলে লাগাইও, ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন; নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার উল্লেখ করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজ্‌রায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন; নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—নাচিতেছে—হাসিতেছে—ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক

করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাতুর লইয়া কৃষকের মহিষীরা, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, তুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বাজার বসাইতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন,—মধ্যমবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গার স্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক এক বার আগ্রীবা নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যেতে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ; রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চীল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে,—আপনার প্রয়োজনে। ক্ষেয়া নৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম তুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘে আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কাল হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার ফুফু মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন, নেমাজ সমাপ্ত হইলে

বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ভয় কি হুজুর ! আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন্।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল ! তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। মাল্লারা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকার সজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে, নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?' ক্ষতি কি, আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, "হুজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহার সাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী, নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘপরিপূর্ণ ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশের মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষ কালেই ঘনান্ধ তমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল, বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক-খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবল গর্জ্জন-বিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের

ক্রোধ একবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবল নব-বারি-সমাগম প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল, ঝিল্লীরব মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্তরব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতন শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চার শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারি বিন্দু সকলের এককালীন পতন শব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া বৃক্ষচ্যুত-বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি-বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোক সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীপ নির্ব্বাণ

গৃহটী নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদলক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্যসমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবল পেচক, মষিক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ। একটীমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে মনুষ্যজীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রীই দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চার খানি তৈজস—ইহাই কক্ষালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুল; চারি দিকে আরস্থলা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় একজন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টক খণ্ডের উপর একটী মৃণ্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভা;

শয্যোপরিস্থিত নরদেহও তাই। আর শয্যাপার্শ্বে আরও এক প্রদীপ ছিল, —এক অনিন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়-রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশুভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, প্রবেশ কালে, নগেন্দ্রকে কেহই দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোক-পূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। একদিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল, লোক জন, দাস দাসী, সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্য-সমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্র কন্যার মুখমণ্ডল, হিমানীসিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকত শয্যায় শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট তারাগুলিনও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃ সমক্ষে চিরারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা সেই বিজন বনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পরস্পরে পরস্পরের এক মাত্র উপায়। কুন্দ-নন্দিনী, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক্, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এই রূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর, অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতিনিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তর-ময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখ-প্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে, তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল,

ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী, পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিল। নিশা ঘনান্ধকারা ; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ দ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়া পূর্ব্বগামিনী !

নিশীথ সময়! ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব! কুন্দ ডাকিল, "বাবা"। কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মনে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজন হস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেইখানে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেননা মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে ? দিবা রাত্র জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী দিবা রাত্র জাগিয়া পিতৃসেবা করিতেছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্ত হস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশ মণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়ন-স্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্র নাই ; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সনাথ

চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি চ্ছুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-মধ্য-শোভিনী, আলোকময়ী কিরীট-কুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা মূৰ্ত্তি স্ত্রীলোক আকৃতি। রমণীর কারুণ্য পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে স্নেহ পরিপূর্ণ হাস্যে অধর স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল, যে সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে, জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইতেছিস। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী উৰ্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে 'ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন বহু দূরবর্ত্তী, বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্র লোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ-জনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার আসিয়া দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতনীতনয়নে, আকাশ-প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটী মনুষ্য মূৰ্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলি সঙ্কেতের দ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল, সকরুণ, কটাক্ষ; তাহার মরালবৎ দীর্ঘ, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, এবং অন্যান্য মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে২ সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্‌বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধর বোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ," বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষ মূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশ-নয়না, যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারী বেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসম্বর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিত হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই সেই!

নগেন্দ্র গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং অর্থানুকুল্যে গ্রামস্থ কেহ২ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। এক জন প্রতিবাসিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে২ প্রত্যাশাপন্নাবৎ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছে।

চাঁপা কৌতূহল প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিতেছ ?"

কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল্ মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন, তবে আমি যাই। তাই ঘন ঘন আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে!"

তখন কুন্দ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়েমানুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চেন ?"

কুন্দ। না; তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখন দেখি নাই।

এ দিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই। তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যত দিন সে তোমাদিগের বাড়ীতে থাকিবে, তত দিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে, কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া, কেহই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া এক জন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থ কন্যার উপায় হয় এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং এই কথা বলিবার জন্য, কুন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে২ দূরে হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি, দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এই সেই!"

চাঁপা কহিল, "ওই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল্ রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকাদিগকে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মাতৃস্বস্পতির অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যাম-বাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল— সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লণ্ডর ফেয়ার্লির বাড়ীর মুতসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্য-গৌরবের সঙ্গে২

বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা, মিস টেম্পল্ নাম্নী এক জন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত রাখিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় তুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়াইলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতেহ স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন পরিচারিকা স্বয়ং কমলকে এই রূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি, আমি দিতেছি," বলিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিলেন, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নান করাইলে—কুন্দ শিশির-ধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল, তাহাকে অমল শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশ রচনা করিয়া দিলেন; এবং কতক গুলিন অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া, বলিলেন, "যা, এখন দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূর দেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর উল্লেখ করিলেন; যথা,—

"বল দেখি, কোন বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে চল্লিশ পরে, কেননা তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম, তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যে এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের

সহিত খেলা করিতে ছুটে। আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটী চক্ষু—চক্ষু দুইটী শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ-জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে২ অন্য-মনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুটী চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখন দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দ-নন্দিনীতে পৃথিবীছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী; তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্তভাব-ব্যক্তি—যদি স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে যে ভাব-ব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে, তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এই রূপ;—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিযের কাঁচারই আদর। কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা শশা লোকে ভালবাসে,

নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচা মিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার। কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না।

মেয়েটিতে আমার কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটী ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি, তা ত জান। যদি একটী ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় নাকি ছয় মাস থাকিলে মানুষ ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় না করিয়া থাক, তবে সঙ্গে লইয়া আসিও, তুমি আসিলেই বিবাহ দিব। যদি নিজে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণ ডালা সাজাইতে বসি।"

তারাচরণ কে, তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমত এক দিন আইল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম? কি কুক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজ্‌রা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রা কালে একবার তাহা স্মরণ পথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ ২ এমন পতঙ্গ-বৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদে মনুষ্যের পরিচ্ছদ-প্রণালীর এক একটী স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, এবং মনুষ্যের অবস্থার উন্নতির সহিত বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়মও উৎকৃষ্ট হইয়া আইসে। এই প্রথাটী এত সাধারণ যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে কে সভ্য, কে অসভ্য, পরিচ্ছদ দৃষ্টি মাত্রেই বলা যাইতে পারে; এবং তদ্দ্বারা কে কোন্ দেশের বা কোন্ জাতীয় লোক, প্রায়ই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, বন্য অসভ্য জাতিরাও যে সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতেও পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ আছে; দেখিলে বুঝা যায়, কে কোন্ জাতীয় বন্য।

কিন্তু আমরা "বড় লোক!" আমাদিগের পরিচ্ছদ দৃষ্টে আমরা কোন্ জাতীয়—বন্য কি সভ্য—তাহা বিচার করিয়া উঠা বিধাতারও অসাধ্য। কেহ যদি এ দেশের কোন সভামণ্ডলী অথবা জনতার প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, সেটী কি দুরূহ ব্যাপার। আমরা যে কত বার কত দিন অবাক্ হইয়া এই রহস্য দেখিয়াছি, বলিতে পারি না। অপরসাধারণের কথা থাক; ভদ্রলোকের কথাই মনে কর। যখন টাউন্‌হলে কোন সভা হয়, তখন বড় বড় চেরেট্, ব্রুহম্, ফেটিন, আপিসজান, এবং পাল্কিগাড়ী চড়িয়া সুসজ্জিত বাবুরা সমবেত হইতে থাকেন। কিন্তু বেশবিন্যাশ দেখিয়া উঁহারা যে কোন্ জাতীয় লোক, এক জাতীয় কি না, এবং কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন, স্থির করিয়া উঠে কাহার সাধ্য। সূর্য্যলোক কি চন্দ্রলোক হইতে নামিতেছেন, অথবা ভূলোকবাসী, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মনুষ্য জাতিকে বঞ্চনা করিতেছেন, নিরূপণ করা বুদ্ধির অগম্য। কেহ বা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের পুচ্ছবিশিষ্ট জামাজোড়া, কেহ বা বুককাটা কাবা, কেহ বা ঝক্‌মকে সাটিন মক্‌মলের চোস্ত চাপকান, কেহ বা দোদুল্য-

মান চোগা, লবেদা, কেহ বা আল্লাকা পাইনাপেলের আদ্‌সাহেবি চায়না কোট, কেহ বা বুক্‌ফোলান পূরোসাহেবী কামিজ কোট্, কেহ বা ইজের চাপকানের উপর পাটকরা অথবা কোচান চাদর, কেহ বা সুধু ধুতি চাদর পরেই আসিয়াছেন। তাহাতে আবার শাদা, কালো, গোলাপী, বেগুনে, জরদা, সবুজ, নীল রঙ্গের বিচিত্র শোভা। মধ্যে২ ফুট্‌কি, ফুলকাটাও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকের সজ্জা আরো অদ্ভুত। মরেশা, মোগ্‌লাই, আমামা সামলা, ক্যাপ, টোপর, টুপি, তাজ—কত শত প্রকার, তাহার সীমা পরিসীমা নাই।

পাঠকগণ স্মরণ করিও, এসকল ইংরাজী ধরণের সভায় সভাস্থ হইবার পোশাক্। দেশীয় সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে সভাস্থ হইবার পরিচ্ছদপদ্ধতি অন্যরূপ। তখন, দুএকটা শিশু ও বৃদ্ধ বালক ছাড়া প্রায় সকলেই বিলাতি-মিশনো দেশীচেলে সজ্জা করিয়া আইসেন। ধুতিচাদর হাফ্ মোজা, ফুল মোজা এবং সুভ্রবা পিরাণেরই ধুম পড়ে যায়। কালাপেড়ে, লালপেড়ে, নরুনপেড়ে, খড়কেপেড়ে, বিদ্যাসাগরপেড়ে অথবা শাদাপেড়ে—ফিন্‌ফিনে ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলের ধুতি এবং তদুপযুক্ত মীহি মল্‌মল্, ঢাকাই বা কেরেপের উড়ানীতে দালান, উঠান, বৈঠকখানা, বারাণ্ডা ফর্‌ফর্ করতে থাকে। পিরানের ত কথাই নাই, কতই রকমের, কতই রঙ্গের, কতই ফেসিয়নের চিত্রবিচিত্র করা ; দেখিলেই দুচারদণ্ড অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ফলে, পোশাকের চাক্‌চক্য এবং অসমদৃশ্যতার সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন জাতিই আমাদিগের সহিত তুলনা দিতে পারেন না। এ বিষয়ে আমাদিগেরও রুচি এবং প্রবৃত্তির সীমা নাই। বোধ হয়, নিউজিলণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তভাগ গ্রীণলণ্ড পর্য্যন্ত খুঁজিয়া সকল জাতীয় এক একটী মনুষ্য অথবা দ্বিপদ বন্য একত্র করিলে যত প্রকার পরিচ্ছদের সমাবেশ হয়, আমাদিগের মধ্যে তত্তাবতেরই অনুরূপ আছে। সুতরাং আমরা "বড় লোক!"

অনেক দিন আমরা মনে মনে ভাবিয়াছি যে, পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটী প্রধান জাতি—অতি সভ্য, বুদ্ধিমান-বিদ্বান ও বিচক্ষণ, তথাপি এপর্য্যন্ত এই একটী সামান্য বিষয়ের কিনারা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কেন? যে যখন আসিয়া আমাদিগকে পদানত করে, তখনি তাহাদের বস্ত্রাদির অনুকরণ করি। অনুকরণ ভিন্ন কি আমাদিগের উপায় নাই?

অথবা যে কোন রকম হউক, এমন একটা পোশাক অনুকরণ করিতে পারা যায় না, যাহা সকল সময়ে, সকলের জন্য, সর্ব্ব বিধায়ে উপযোগী হইতে পারে ? আমাদিগের পিতৃপৈতামহিক যে বস্ত্রাদি আছে, বিস্তর বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় না। ধুতি আর চাদর বড় আরামের জিনিস্ বটে, এবং তাহা পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বায়ুসেবন করা অপেক্ষা, বোধ হয়, উপাদেয় আর কিছুই নাই। কিন্তু ভব্যতা রক্ষা এবং লজ্জা নিবারণের পক্ষে তাহাতে সময়ে সময়ে মহা গোলোযোগ উপস্থিত হয়। বলিতে পারি না, এ বিষয়ে, মহাশয় ব্যক্তিরা কি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে, থানধুতিই হউক আর দিশি মীহি ধুতিই হউক, ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। আমরা বাঙ্গালি জাতি —অতি সাবধান—বিবেচক—বিপদ অথবা উৎপাতের উদ্যমেই পলায়ন করিতে অতিশয় পটু, সুতরাং সেই কার্য্যটি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়, তদুপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। ধুতিচাদ্দরে সেই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মে। ছুটিবার সময়, বিশেষতঃ ছুটিয়া পলাইবার সময়, কাছা কি কোঁচা খুলিয়া গেলে, লোকের নিকট অসম্ভ্রম এবং হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নতুবা ধুতিচাদর মন্দ নয়। আমাদের দেশের লোক সুশ্রী, সুপুরুষ বটে, বিবস্ত্র হইলে ক্ষতি নাই, বরং অঙ্গসৌষ্ঠব সুচারুরূপে প্রকাশ পায় ; সুতরাং যত অল্প এবং পাতলা কাপড় ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল ; এবং তজ্জন্য আমরাও পাতলা কাঁপড় ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু পলাবার উপায় কি ? সেইটিই আমাদের পক্ষে বিষম সমস্যা। অনেক সময়ে ইহাও ভাবিয়াছি যে, হিন্দুস্থানী কিম্বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় মালকোঁচা করিয়া ধুতি পরাই আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কিন্তু তাহাতেও, গুরুতর না হউক, একটী আপত্তি আছে। আমরা যে জোরোয়ার জাতি এবং যেরূপ দীর্ঘকায়, ঐ প্রকার মল্লবেশ ধারণ করিলে পাছে তাল্-পাতার সিপাহির মত দেখায়—আমাদিগের এই আশঙ্কা। যাহা হউক, সে বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা কর্ত্তারাই স্থির করিবেন, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের রুচির কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা এবং সমতা করিলেই ভাল হয়। অতঃপর গিন্নীপক্ষে কিরূপ, একবার দেখা আবশ্যক।

ঘরের লক্ষ্মীদের বেশ ভূষার কথা উত্থাপন করা বড় বালাই। বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদার কথা বলিলে কর্ত্তা গিন্নী উভয়েরই নিকটে লাঞ্ছনার ভাজন হইতে

হয়, এবং ঘরে বাহিরে ভাল করে মাথা তুলে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের সে ভয় নাই, কারণ এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যদ্যপি নিন্দা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকিত, তাহা হইলে এ কঠিন বিষয়ে আমরা হস্ত ক্ষেপণ করিতাম না। ছিদ্রানুসন্ধানের তিলার্দ্ধমাত্র স্থল নাই বলিয়াই আমরা ইহার উল্লেখ করিতেছি। স্ত্রীজাতি জগতের শ্রেষ্ঠ—সকল সৌন্দর্য্যের চরম সীমা। তাহাদিগের অঙ্গ অবয়ব এবং লাবণ্যমাধুরী যতই প্রকাশ পায়, ততই জগতের শোভাবৃদ্ধি হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের অঙ্গসৌষ্ঠবের তুল্য আর কি পদার্থ আছে? তবে যে বর্ব্বরজাতীয় বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক দেখিয়া আমাদিগের মনে অত্যন্ত ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তাহাদিগের কদর্য্যতাই তাহার একমাত্র কারণ। বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া নয়, বোধ হয় বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসী বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা করি। কিন্তু, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার। এতাদৃশ অপ্সরাদিগের অঙ্গ অবয়ব অনাবৃত না রাখিয়া কোন্ সুরসিক পুরুষ প্রাণ-ধারণ করিতে পারে? আমাদিগের দেশের লোক অতিশয় রসজ্ঞ, তজ্জন্যই এ দেশের মোহিনীগণকে একখানি দশহাত কাপড়ের শাড়ী পরাইয়া রাখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা নিবারণ এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশের এমন কৌশল বোধ হয়, কোন দেশে, কস্মিন কালে, কোন জাতিতেই উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। অন্ত্যজ অসভ্য জাতিরা স্ত্রীলোকদিগকে কৌপীন অথবা পত্রাচ্ছাদন পরাইয়া রাখে, কিন্তু সভ্য বাঙ্গালিরা একখানি প্রমাণ শাড়ী পরাইয়াছেন। ইহাতে দৃষ্টিকঠোরও হয় না, অথচ অনায়াসে সর্ব্বাঙ্গের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যখন কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বাঙ্গালি স্ত্রীলোককে বেশ ভূষা করিয়া যাইতে দেখি, তখন মনে মনে আমাদের দেশের লোকের বিচক্ষণতা ও অগাধ বুদ্ধির যে কত প্রশংসা করি, তাহা এক মুখে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। কিন্তু স্বপরিবারস্থ কাহাকেও দেখিলেই কিঞ্চিৎ জড়সড় হইতে হয়।

কালক্রমে সভ্যতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং এ দেশের স্ত্রীলোক-দিগের পরিচ্ছদও ক্রমশঃ আরো উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে শাড়ীখানি পূরো দশ হাত না হউক, মোটা গোচের ছিল। ক্রমে চক্রবেড়, চন্দ্রকোণা,

শান্তিপুর, কল্‌মে, সিম্‌লে, ঢাকাই ঢপে, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম হইয়া আসিয়া এক্ষণে কেরেপে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, আর কিছুদিন পরেই মাকড়সার জালে পরিণত হইবে, অথবা এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার স্বভাবের সরল ভাব ধারণ করিবে। তাহাতেও আমরা ক্ষতি বোধ করি না; কারণ আমাদের দেশের গৃহিণীরা অন্তঃপুরবাসিনী এবং তাঁহাদের ন্যায় পতিপরায়ণা সতী কুত্রাপি নাই। ইহাদের পরপুরুষের নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই এবং নয়নগোচর হইলেই বা লজ্জার বিষয় কি? কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এক্ষণকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা কত ভদ্র, মাতব্বর লোককে তাঁহাদিগের পরিবারগণকে একখানি শাড়ী পরাইয়া রেলওয়ের গাড়ী এবং সভাস্থলে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি; তাহাতে তাঁহাদিগের মনে কিছুমাত্র মালিন্য জন্মে নাই, এবং সেই সকল যোষাদিগের মনেও কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। ফলে আমাদিগের বিবেচনায় এমন সুরূপা সতী লক্ষ্মীদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া লোকালয়ে পাঠাইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমাদিগের ঘরের গিন্নী যদ্যপি লোকালয়ে বাহির করিবার যোগ্য হইতেন, তবে আমরাও তাহাই করিতাম। কিন্তু সঙ্গে যাইতে লজ্জা বোধ হইত।

পূর্ব্বে আমরা কখন কখন মনে করিতাম যে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে য়িহুদি স্ত্রীলোকদিগের পোশাক দিবা সাজে এবং উহাঁদিগকে কখন লোকালয়ে আনিতে হইলে ঐরূপ পোশাক পরাইয়া বাহির করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, আমাদিগের সেটি ভ্রম—যদি এক প্রমাণ শাড়ীতেই ঘরে বাহিরে অনায়াসে চলে, তবে এমন মনোহারিণী শাড়ীকে পরিত্যাগ করিতে কে উপদেশ দিতে পারে? পরন্তু যতই দেখিতেছি, ততই আমাদিগের প্রতীতি জন্মিতেছে যে, আমরা অতি সুবোধ, বিজ্ঞ, রসজ্ঞ এবং যথার্থই বিচক্ষণ লোক; সংক্ষেপে—"আমরা বড়লোক!"

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত, কিন্তু সুর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ২ তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেই রূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়; কর্ণমধ্যে এক খানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গ পরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ ধমনীতে নীত হইয়া মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দ জ্ঞানের মুখ্য কারণ। দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৫৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মস্যুর সাবর্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দ প্রকম্পে সেই রূপ থাকিলেই সুর জন্মে; যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুর রূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর" অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গ তত্ত্বে সঙ্গীত এই রূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব, বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দ্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং একবার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে তাহার প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দ্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে; কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দর কান্তি মাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দ্দোষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দ্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরম সৃষ্টিই কাব্য চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে; যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না, কেননা সে স্বরভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন ২ একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম, বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেননা সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদবাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব্ব লোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগ দ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীত-মধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র;

বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোক-প্রকাশক গীত আছে, গীত মধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রূরভাব নহে, ভক্তি ও প্রেমবাচক।

সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে সকল কালে সঙ্গীত আছে। এবং সকল দেশে সকল কালে সর্ব্ব লোকেই ইহা আদরণীয়। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে ইহার উৎকর্ষ সমরূপ নহে; অনেক দেশের ও জাতির গীত উৎকৃষ্ট নহে। বুদ্ধি-সভ্যতাতারতম্যে ও কালপ্রভাবে ভাল, মন্দ, মধ্যম ইত্যাদি হইয়াছে। বংশ ভেদে সঙ্গীতেরও প্রভেদ দেখা যায়। কাফ্রিদিগের, প্রাচীন আমেরিকান অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের, যিহুদী বংশের ও আর্য্যবংশের গীতপ্রণালীতে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। মনুষ্য সমূহ এক স্বভাবাপন্ন; সঙ্গীত স্বভাবপ্রবাচক শব্দ; বংশভেদে নিতান্ত ভিন্ন হইবেক, এমত নহে। কিন্তু সকল জাতি সমশক্তি বিশিষ্ট নহে, এই কারণে সঙ্গীতেরও তারতম্য হইয়াছে। সকল জাতিমধ্যে আর্য্য জাতি শ্রেষ্ঠ; এ জন্য আর্য্য জাতির গীতপ্রণালীও শ্রেষ্ঠ।

উত্তরাঞ্চলে আর্য্য বংশের আদি বাসস্থান। তথা হইতে তাহারা সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি করিয়াছে। কোন কোন শাখা অতি পূর্ব্বকালে, কোন কোন শাখা তৎপরে, কোন২ শাখা অন্য শাখার সহিত একত্রে দেশ ত্যাগ করে। কিন্তু সকলের ভাষার ও প্রাচীন ধর্ম্মের এবং ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রণালীতেও তদ্রূপ; দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা ভেদে এই সাদৃশ্যের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। কিন্তু মূল সকলেরই এক। সকলেরই সপ্ত স্বর, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ভেদে উচ্চারণ ও সময়ের নির্দ্দেশ; একত্রিত স্বর সমূহের ধ্বনি ও গাম্ভীর্য্যে আস্থা এবং সুরের নাম ও গ্রামের ঐক্য একরূপ। এসকল বিষয় ক্রমে প্রস্তাবের নিম্নভাগে বোধ হয়, সপ্রমাণ হইবেক।

স্বরের এবং সময়ের একমাত্র মিলন দ্বারা একে২ অথবা অনেকের একত্রিত হইয়া বেদধ্বনি করা আমাদের আদি সঙ্গীত। অপর২ সঙ্গীতও ছিল। কালে সে সকল পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া পুরাণাদিতে বিন্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গীত দুই প্রকার; গীত ও বাদ্য। কোন বিদ্যাই প্রথমোৎপত্তিকালে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না, ক্রমে তাহার উন্নতি হয়; বাদ্যও তৎপ্রথাগত। পিনাক, তানপুরা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র সকল ইহার

উদাহরণ। মৃদঙ্গ, বোধ হয়, দেশীয়যন্ত্র; সাঁওতাল হইতে প্রাপ্ত। সেতার এই মত নহে!

যেমন প্রাচীন কবিগণই উৎকৃষ্ট কবি, তেমনি প্রাচীন হিন্দু-গীত-প্রণালীও আশ্চর্য্য। গীতে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কল্পনা, ভাব ও মনোযোগ আবশ্যক। প্রাচীনেরা এই সকল বিষয়ে মহাবলবিশিষ্ট ছিলেন, সহজেই গীতের অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন।

নাভি, কণ্ঠ এবং তালু, সুরের তিন স্থান পৌরাণিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক২ স্থলসমুৎপন্ন সুরকে এক২ গ্রাম কহে। এক২ গ্রামে সাত২ সুর অর্থাৎ সা রি গা মা পা ধা নী। প্রথম পঞ্চম ও সপ্তম সুর ব্যতীত অপর সকল সুরের তীব্রতা ও কোমলতা থাকাতে, সে সকলকে অর্দ্ধ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সহজেই সংলগ্ন সুরের সংখ্যা ১২টী মাত্র। প্রাচীনেরা তীব্র ও কোমল অর্থাৎ অর্দ্ধ সুর সকলকে এত ভাগে বিভাগ করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। ইহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও মনোযোগের এবং বিচারশক্তির পরিচয় বটে, কিন্তু বারটী সুরই সহজসাধ্য এবং সামান্যতঃ আবশ্যক।

সকল গীতে সকল সুরের আবশ্যক হয় না; কোন গীতে সাত, কোন গীতে তিন, কোন গীতে পাচ ইত্যাদি আবশ্যক হয়। অতএব সকল গীতকে ভাগে২ বিন্যস্ত করিয়া কোন২ গীতকে সম্পূর্ণ, কোন২ গীতকে সঙ্কীর্ণ, কোন২ গীতকে খাড় ওড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবিধ বিভাগের গীত সকল পুনশ্চ সময়, ভাব এবং লাবণ্য অনুসারে রাগ রাগিণী আখ্যায় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই দেখা যায় যে, অসীম বুদ্ধি ও তর্ক কৌশলে তাঁহারা কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি তর্কশাস্ত্র কি অপর বিদ্যা, সকলকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার পূর্ব্বক প্রণালাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; আবার প্রত্যেক ভাগকে দেহবিশিষ্ট ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট করিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সঙ্গীতেরও তদ্রূপ। যেমন ভাষার দ্বারা কথা কহিয়া ভাব প্রকাশ করা যায়, চিত্রকর্ম্মের দ্বারা চিত্তের ভাবকে অবয়ব দেওয়া যায়, নিরর্থ-শব্দময় সুরের দ্বারাও সেইরূপ হইতে পারে। তজ্জন্য অতি চমৎকার নিয়ম সকলের বিধান হইয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুর কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষ। কণ্ঠভঙ্গী বিশেষে মনের কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত হয়। এমত অবস্থায় সহজেই বুঝা যাইতেছে যে,

কতকগুলিন স্বর বাছিয়া২ একত্রিত করিলে কোন একটি বিশেষ মানসিক ভাব সুস্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইবে। এইরূপ স্বর সমূহের সমষ্টিকে রাগ রাগিণী কহে। এক একটী রাগ বা রাগিণীর দ্বারা এক একটী পৃথক চিত্তবিকার বা নৈসর্গিক দৃশ্য অনুকৃত হয়। বসন্ত সময়ের অনুরূপ বসন্ত রাগ, বর্ষার অনুরূপ মেঘ রাগ, শোকের অনুরূপ জয় জয়ন্তী, বিরহের অনুরূপ ললিত ইত্যাদি।

কোন২ ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপি বিদ্যা ছিল না, * বেদ ও মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই গোত্র ও প্রবরের প্রমুখাৎ মুখে মুখে আসিতেছিল। সঙ্গীতের বিষয়ও সেই মত। সঙ্গীতে ভরত ও হনুমানের মত প্রধান। আমরা স্মরণ শক্তি প্রভাবে মুখে মুখে প্রাচীন সঙ্গীত সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অনেক প্রাচীন রাগ রাগিণী বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং আরও অনেকের এখনও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। দেশহিতৈষিরা সম্প্রতি লেখার দ্বারা রাগ রাগিণীগণকে চিরস্থায়ী করিতে আরম্ভ করিতেছেন; ইহা পরম সুখের বিষয়। যে২ মহোদয় ইহা করিতেছেন, তাঁহারা সকল বাঙ্গালির ধন্যবাদ ও প্রেমের ভাজন।

মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকৃত হইলে তাহারা এ দেশে বসতি করে। মুসলমানের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক লাভ হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়েও তাহা দেখা যায়।

মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে এবং সঙ্গীত শাস্ত্র আদ্যোপান্ত গ্রহণপূর্ব্বক নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে। অর্থব্যয় ও উৎসাহের দ্বারা সঙ্গীত অনুশীলন প্রবল রাখিয়াছিল, এবং যত্নের দ্বারা তাহার উন্নতিসাধন করিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতপ্রণালী কোন অংশেই ভিন্নজাতি সংসর্গে অপভ্রংশ প্রাপ্ত হয় নাই। স্বভাবেই রহিয়াছে। আরবী, তুরকী প্রভৃতি বিদেশীয় গীতপ্রথা ভারতবর্ষে নাই। আমাদের গীতি রীতি মাত্রেই দেশীয়। আমির খসরুর দ্বারা ৮টী দেশী গীতে বিদেশী ভাগ কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়া সরফরদা, দেওগিরি প্রভৃতি ৮টী রাগিণী প্রস্তুত হয়। কিন্তু দেশীয়ের ভাগ এই সকল রাগিণীতে এত প্রবল যে, সে সকলকে বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। বোধ হয় যে, দেশীয় সঙ্গীতপ্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীয় গীতপ্রথা তাহার বিকৃতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

* মাক্ষ মূলর এই কথা বলেন। গোল্‌ড ষ্টুকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মুসলমানদের দ্বারা বাদ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। সেতার এসরার সারঙ্গ ইত্যাদি সকল যন্ত্র নব্য। গীতেরও অনেক উপকার দেখা যায়। ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ইত্যাদি মুসলমানদের প্রযত্নে প্রকাশ হইয়াছে, রাগরাগিণী অনেক বাড়িয়াছে, এবং তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বাঙ্গালায় বহুকাল হইতে সঙ্গীতচর্চ্চার আদর ও মর্য্যাদা আছে, এবং বাঙ্গালিদের বুদ্ধি ও উৎসাহের প্রবলতায় সঙ্গীতের কয়েক নূতন প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কবি, আখড়া, হাফ আখড়া, সঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা, পাঁচালি এবং আড়খেমটা সম্যক্‌রূপে বাঙ্গালিদের সামগ্রী।

দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন সকল আমাদের বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্যাপ্রভাবে নব্য সম্প্রদায়ের দ্বারা এই দুর্ভাবনা দূর হইবার আশা হওয়াতে যে কিরূপ আহ্লাদ হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

ইউরোপীয়েরা বহুকষ্টে সঙ্গীত লেখন-প্রণালী চালনা করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা বহুকষ্টে প্রস্তুত করিয়াছেন, আমাদের তাহা সহজে গ্রহণ করামাত্র। ইহা বাঙ্গালিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ইউরোপে প্রচলিত হইলে, প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাপন ধর্ম্মমন্দিরে হিব্রু গীত গান করিতেন। এই সকল গীত কখন লেখা হয় নাই; স্মরণ দ্বারা প্রচলিত থাকে। বাস্তবিক ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রীক্‌দিগের সঙ্গীত হইতে উত্থিত ও প্রাপ্ত। গ্রীকদের গামা হইতে স্বরের উত্থান, এজন্য গ্রামের নাম "গমট" যাহাকে আমরা "গমক" কহিয়া থাকি। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত, স্বরের সময় ও হ্রস্ব দীর্ঘতা, যেমন বেদে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত, সেই মত "নিউএস" দ্বারা ইউরোপেও চিহ্নিত হইত। একাদশ শতাব্দীতে আরিজো নগরের গে নামক মহোদয়ের দ্বারা গীত লেখার প্রথম প্রণালী প্রচার হয়। গে সাহেব চতুষ্কোণ অঙ্কের দ্বারা চারি স্তম্ভে সপ্ত স্বর বিন্যস্ত করিয়া গীত সকল লিখিতে আরম্ভ করেন।

ক্রমে চতুষ্কোণ অপেক্ষা গোল চিহ্ন সহজসাধ্য বলিয়া ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। গালিন নামক একজন ফ্রেঞ্চম্যান অঙ্কের দ্বারা অর্থাৎ ১, ২, ৩ ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা সঙ্গীতলিপি সমাধা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ অক্ষরের দ্বারা কেহ বা স্বর ও হলের দ্বারা মিশ্রিত গ্রাম ও সময়

উভয় এক বারে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত, তাহাতে আবশ্যক বিষয় সকল সমাধা হইতেছে। তবে ১, ২ সুরের ইত্যাদি চিহ্ন স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

গীতের সুর, তাল ও ভাব যেমত আবশ্যক, সম, লয়ও সেইরূপ আবশ্যক। ইউরোপীয় গীতের সহিত উক্ত সকল বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য আছে। কেবল আমাদের বহুমিলন নাই, অর্থাৎ আমাদের গীতপ্রথায় গ্রামে গ্রামে মিলন আছে, কিন্তু এক গ্রামের মধ্যে পৃথক পৃথক সুরের একত্র মিলন নাই। তানপুরাতে জুড়ির সহিত পঞ্চম ও খরজের মিল এবং এসরার প্রভৃতিতে তিন গ্রামের তারের মিলন আছে। কিন্তু এই সকল মিল গ্রামানুযায়ী মাত্র। ভিন্ন সুরের একত্র মিলন নাই। ইউরোপেও এই প্রকার মিলন ছিল না। কেবল এক মিলন ছিল। [illegible]ই তিন শত বৎসর গত হইল, ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন হইতেছে, সঙ্গীতেও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। ভরসা করি যে, ইউরোপীয় লেখা প্রণালী যেমত গৃহীত হইতেছে, তদ্দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্র সেই মত গৃহীত হইয়া আমাদের সঙ্গীতের যাহা অভাব আছে, তাহা পরিপূরিত করিবেক।

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমি খণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গূলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশপূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।" (সভা মধ্যে লাঙ্গূল চট্‌চটারব।)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দর-বনের ব্যাঘ্রসমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান হইব। কেননা

আজি কালি সকলেই বিদ্বান হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।”

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটী প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভাগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে২ দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, তাহা ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দ বিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, “আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গূল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।”

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন২ নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, গর্জ্জন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন ;—

“সভাপতি মহাশয় ! বাঘিনীগণ ! এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ !

মনুষ্য এক প্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে২ অঙ্গ, যে২ অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেই রূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গূলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন২ মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা রক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মানুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে-মন্থর এবং কোমল প্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি। দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ। এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রা নামে একজন উদ্ধত-স্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বিষয় কর্ম্মটা কি?"

বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় কহিলেন, "বিষয় কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যালোকে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয় কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্তলোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয় কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা, যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ

রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্রের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?"

বৃহল্লাঙ্গূল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন২ সহস্র২ মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে২ রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্টক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশ-মণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া

পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গূলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমল-শ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহন করিয়া, ছাগ মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহ দণ্ডাদি ভূষিত এক সুরম্য গৃহ মধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশ বিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ, সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগ মাংস ত্যাগ করিতাম, মেষ মাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্মমাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গূলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই, দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব? পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গূলের অশ্রু পতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্‌চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে, দ্বারা মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্য চরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্য সম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্র-জীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐ রূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐ রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐ রূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যজাতি তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে। *

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গূলের তর্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষ মূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেম্‌স মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা। বস্তুত এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সম্পাদক।

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী ; এবং ফলমূলও আহার করে। বড়২ গাছ খাইতে পারে না ; ছোট২ গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভাল বাসে যে, আপনারা তাহার চাস করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐ রূপ রক্ষিত ভূমিকে খেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা, ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহুযত্নে আপন২ উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন ? এরূপ আমি এক জন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই ?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে ; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ মেষ গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে ; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ হয়, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য, গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি

মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গূল, অপর লাঙ্গূলশূন্য। সলাঙ্গূল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্য চরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন, তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে২ তাহা বিবৃত করিতেছি।”

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণ শিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এই রূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, “আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়াইয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।”

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গূলোত্থিত করিয়া, যে যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেক্‌চররও এই বিদ্যার্থিদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এই রূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন, সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

ভারতবর্ষে অনেক ভাল বস্তু ছিল। তাহার অনেক একবারে লুপ্ত হইয়াছে ; অনেক লুপ্তপ্রায়, অনেক নির্জীব ও মরণাপন্ন, ও অনেক বিকৃত ভাবাপন্ন। আবার অনেক ভাল বস্তু ছিল না। কিম্বা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল মাত্র। যা ছিল, তা আবার হইবে। কিন্তু যা ছিল না, না থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ ; অথবা যা ছিল, থাকাতেই এত সর্ব্বনাশ, তাহারই অনুসন্ধান আমাদিগের কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া যে ভাল বস্তুটি ছিল না, তাহা কিসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহার পোষণ করা, অতি কর্ত্তব্য। যে মন্দ বস্তুটি ছিল, তাহা যদি এখন আর না থাকে, তবে যাহাতে সেটি আর পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারে, এমন সাবধান হওয়া উচিত, এবং যে মন্দ বস্তু গুলি এখনও জীবিত রহিয়াছে, সে গুলি যাহাতে সমাজ হইতে একবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যুক্তিযুক্ত।

এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। এটি সমাজের স্বাস্থ্য জন্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। “ছিল না” এই শব্দটি ন্যায় মতের অভাব পদার্থ জ্ঞাপক বোধ করিতে হইবে না। “আমার রোগে রোগে আর শরীরে কিছুমাত্র বল নাই,” বলিলে বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুঝায় না। যত টুকু বল শরীরের সহজ অবস্থায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সে টুকু নাই, বুঝিতে হইবে। সেই রূপ সমাজ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়।

আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। উদ্দীপনা শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, কাইকিরো, আমাদের এক জনও ছিল না। যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকোয়েনস্ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদের ছিল না।

অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপন বিভাবের বর্ণন ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপন বিভাবকে তাঁহার রসের একটি অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" কিন্তু কবিতাশক্তি ও উদ্দীপনাশক্তি, দুটি যে ভিন্ন, এ কথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। যেমন কাব্যের সার রস, তেমনি উদ্দীপনার সারও রস। কাব্যসার রস যেমন করুণ, বীর, প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, উদ্দীপনার সার রসও ঠিক সেই রূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কাব্য রস বর্ণনে যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবের আবশ্যকতা ও যেমন স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব নানা প্রকার উদিত হয়, সেইরূপ উদ্দীপনা রসেও আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি নানা বিভাগের আবশ্যকতা ও তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয়। আপাত দৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই জনে কালে দুই বিভিন্ন গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুই জনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে। উদাহরণে শীঘ্র বুঝা যাইবে। একই বিষয়, উদ্দীপনা কিরূপ ভাবে বলেন, শুনুন ; আর কবিতাই বা কিরূপ বলেন, পরে শুনিবেন।

উদ্দীপনা বলিতেছেন ;—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরে গলায় হে, কে পরে গলায়॥
যবনের দাস হয়ে ক্ষত্রিয় তনয় হে, ক্ষত্রিয় তনয়।
এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে, মনেতে উদয়॥
ঐ শুন ঐ শুন ভেরির আওয়াজ হে, ভেরির আওয়াজ।
সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে, সাজ সাজ সাজ॥"

(পদ্মিনী উপাখ্যান।)

সেই স্বাধীনতা বিষয়েই আবার কবিতা কি বলেন, শুনুন ;—

"সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটিও অস্তে গেলে পুনরুদিত হয়।"　　(মৃণালিনী।)

দুইটিই রসাত্মক বাক্য। কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা আপনি বলা যাইতে পারে না। কোন এক বিশেষ ব্যক্তি ইহার উদ্দেশ্য, তাহার আর সংশয় নাই! রসাত্মক বাক্য বটে, কিন্তু বক্তার সম্মুখে একজন শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়টি স্বতঃস্খলিত রসাত্মক বাক্যমাত্র। হইতে পারে, কবি যখন ঐ কথা গুলি কণ্ঠ হইতে বহির্গত করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁহার নিকটে ছিল ও সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সে কথাগুলি উচ্চারণ করেন নাই। তিনি আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ শুনিল কি না, তাহাতে তাঁহার মনোযোগ নাই।

কিন্তু উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তাঁর চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস তোমার মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয় ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকে ডাকেনও না, নিজে হাত তুলে কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি কখন বসন্ত-সন্ধ্যাবাতান্দোলিতা, প্রস্ফুটিতা, ভূরি প্রস্ফুটিতা সদ্যঃজল-সিঞ্চিতা, ক্বচিৎ ভ্রমরভর-স্পন্দিতা যূথিকা লতা রূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না, চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কি না, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবামাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার নয়ন তৃপ্ত হইল, তোমার মানস মোহিত হইল, তুমি চরিতার্থ হইলে; লতার তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কবিতা কখন বা জ্বলন্ত অনল রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধূউ ধূউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে; মধ্যে মধ্যে চট্ চট্ শব্দে কর্ণকূহর বধির হইয়া যাইতেছে।

সহস্র শিখা গগন স্পর্শ করিয়াছে। চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। তেজে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তাপ ক্রমেই চারি পার্শ্বে বিস্তার করিতেছে। কবিতা রূপ ধারণ করিয়াই চরিতার্থ হইতেছেন। তুমি দূর হইতে ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখিতে পাইলে, ঝঞ্ঝা প্রধাবিত লক্ষণবাহী শব্দ সদৃশ সেই তুমুল আরব শুনিতে পাইলে, ভয়বিস্ময়ে তোমার চিত্ত পরিপূরিত হইল, তুমি নিকটে গেলে, উদগীরিত উত্তাপে তোমার গাত্র অভিষিক্ত হইল। যদি তুমি শীতার্ত্ত হও, তোমার সুখস্পর্শ হইল। পতঙ্গবৎ অতি নিকটে যাও তুমিই অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নির তাহাতে কিছুই এসে যায় না। কখন বা কবিতা প্রেতভূমিরূপ ধারণ করিয়া নদীকূলে শয়ন করিয়া থাকেন। রাশি২ অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে; অঙ্গারে অর্দ্ধ পূরিত চুল্লী; অর্দ্ধ দগ্ধ বংশখণ্ড; অর্দ্ধভঙ্গ অল্প ভঙ্গ, সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র, মৃৎকলস কত গড়াগড়ি যাইতেছে; কোন কোনটার ভিতর সন্ধ্যাবায়ু প্রবেশ করাতে হোহো করিয়া শব্দিত হইতেছে; সমস্ত স্থান অস্থি কপাল কঙ্কাল কেশ পরিপূরিত। দক্ষিণে জলসমীপে একটি চিতা জ্বলিতেছে। এক ব্যক্তি একটা বাঁশ লইয়া একটি চিতাস্থিত শবের উদরে বেগে আঘাত করিল। শব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিল; তোমার বোধ হইল যেন হাত নাড়িয়া বারণই করিল। তুমি পলায়নপর হইয়া বাম দিকে দেখিলে; দেখিলে, ভগ্ন ঘাটের উপরি প্রৌঢ়া মাতা অপোগণ্ড নব কুমার শিশুকে বটতলায় শোয়াইয়া ছন্দে বন্ধে ক্রন্দন করিতেছেন। দূরে, বোধ হইল, এক জন লোক বসিয়া আছে। নিকটে গেলে। একি! সদ্য মরা শব তেলান দিয়া বসান রহিয়াছে। তুমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিহরিয়া উঠিলে। একটা কৃষ্ণকায় কুকুর তোমার সেই চাহনি দেখিল; ঐ শবের দিকে দেখিল; উভয়ে কি প্রভেদ, যেন কিছুই না বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সমীরণ সঞ্চালনে তোমার কর্ণমূলে কে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল; সকলের হো হো শব্দে কে যেন হোহোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুমি আড়ষ্ট, আস্তব্ধ, নিস্পন্দ, তুষ্ণীম্ভূত, চকিত ও স্থগিতনেত্র। দূরে একটি শিবারব তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তুমি চারিদিকে দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা পরিপূরিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। তোমার এত ভাবান্তর হইল, শ্মশানের কি হইল? কিছুই নহে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জ্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের কবি,—পুঞ্জ২ কবি ছিল, ও একজনও উদ্দীপক ছিল না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত বোধ হয়, এমন নির্জ্জনস্পৃহ জাতি,—এমন নির্জনচিন্তাস্পৃহ জাতি, পৃথিবীতে আর ছিল না, এখনও বোধ হয়, আর নাই। বোধ হয়, এই জন্যই এত কবি,—প্রকৃত কবিপদবাচ্য কবি, এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভাল মন্দ মিশ্রিত; সুখ দুঃখ-জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তার সঙ্গে২ দোষ আছে; নিরবচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা, অত্যন্তাভাব, এগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থবাচক, সাংসারিক অবস্থাজ্ঞাপক নহে। এক দিকে কিছু বেশী লাভ হইয়াছে কি, অন্য দিকে সেই পরিমাণে ঠিক না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। জগতের জমাখরচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে কি না, তা বলা যায় না। কিন্তু চলতি কারবার। কোন কুঠীতে আজ মাল আমদানি হইল, জমার অঙ্ক দেখিতে খরচের অঙ্ক হইতে অনেক বেশী বোধ হইতেছে, অন্য কুঠীতে সেই সময় এত বিলাত বাকি যে সে কুঠী চালান ভার। কিন্তু সমস্ত জগতের কারবার চিরকালই চলতি। সামান্য খণ্ড সমাজেও সেই রূপ। যাঁহার উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী সরস্বতী তাঁর দিকে প্রায় চেয়ে দেখেন না; লক্ষ্মী আবার তেমনি সপত্নী বরপুত্রদের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোরাশি, মানধন, পণ্ডিতপ্রবর, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা লইয়া বিব্রত; দাসদাসী পরিবেষ্টিতা, রূপযৌবনসম্পন্না, সুশীলা সতী, মাদকসেবনশীল উদ্ধত স্বামী নিগ্রহে দিন২ ম্রিয়মাণা হইতেছেন। কেহ বা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আয়াসসাধ্য যজ্ঞ করিয়া একটি পুত্রের কামনা করিতেছেন, অন্য একব্যক্তি সোণারচাঁদ ছেলেদিগকে, ননীর পুতলি মেয়েগুলিকে দুবেলা দুটো মাছে ভাতে, পূজার সময়ে এক ২ খানি নীলে ছোবান কোরা কাপড় দিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই কেহ শীঘ্র আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চায় না। কিন্তু তবু যদি উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার অবস্থায় কে অসন্তুষ্ট?" প্রতিধ্বনি অমনি তখনি মুখের উপর উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিবে, "হায়! কে সন্তুষ্ট?" সকলেই

অসন্তুষ্ট, সকলেই সন্তুষ্ট। জগতের একটি বিচিত্র কৌশলই এই, যদি এক দিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয় আর এক দিকে কিছু বেশী আছে।

আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেই জন্যই আমাদের দেশে এক জনও উদ্দীপক ছিলেন না, উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না থাকার কারণ। সেই নিভৃত চিন্তাই এখনও আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে গুমরে পোড়াইতেছে। এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগান প্রিয়, তাহাতে কি বুঝায়? বুঝায়, এ দেশে এখনও উদ্দীপনার বীজও অঙ্কুরিত হয় নাই; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাই যথেষ্ট; এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃ সন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল মন্দ উভয়ই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে, গৃহে, আচরণে, সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্ত্তা।

বাস্তবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজন-শাসন সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান। এই জন্যই আমাদের সামান্য কথায় বলে যে, “গরজের উপর আইন নাই।” এই জন্যই সামান্য কথায় বলে যে “অরে দুই প্রহর বেলা সিঁধ কাটিতেছিস যে—না আমার গরজ।” কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের কিছুরই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

প্রথম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

সমাজ সমালোচন

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি ছিলেন, তাহা ভারতের যাহা কিছু পর্য্যালোচনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজ ভাগ দেখুন। ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা করিলেন, পরামর্শ দিলেন, ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে আভ্যন্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিলেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটি খণ্ড দেশ লইয়া যেমন একটি দেশ, তেমনি চারিটি জাতি লইয়া একটি হিন্দু জাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদায়। প্রয়োজন নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে? প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাহ্মণ শিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলেন। উপনয়ন হইল। সেইটি তাঁহার বিদ্যারম্ভ। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। (বোর্ডিং ইউনিবর্সিটির বোর্ডর।) কেহ চার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদীস্রোতের ন্যায় জীবন স্রোতঃ। পিতা মাতার অনুকরণ করিলেই, শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করা হইল। যুক্তি ও শাস্ত্রও তাহার বিপরীত

কিছুই বলিতে পারিত না। সুতরাং যুক্তিও শাস্ত্র সঙ্গত হইল; সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়া চলিতে লাগিল। এ দিকে দেখুন। বসুন্ধরা ভূরি শস্য-প্রসূতি, খনি রত্নগর্ভা; ফল ফুলের উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পৃথিবীর সকল জিনিষের নমুনা ভারতে আছে। পূর্ব্বকালে যে সেই রূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই। প্রয়োজন নাই। সুতরাং কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। যাহার কাহাকেও কিছুই বলিতে হয় না, তাহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? তিনি কবি হইলে হইতে পারেন। হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে কবি। যাঁহার লেখা পড়া বোধ আছে, যিনি আপনার মনের ভাব, ভাষায় সুন্দর রূপে গাঁথনি করিতে পারেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সকলেই কবি। যিনি মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, "হায় বুঝি হারাইলাম," বলিয়াছেন, তিনি অন্তরে কবি। এক্ষণে অন্তরে কবি নয় কে? তাহাতেই বলি, হায়! রোগশোকদুঃখজরামরণসঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? আবার এ দিকেও বলি—ও হো হো! সুখশান্তিসৌন্দর্য্যশোভাপ্রীতিপূরিত মজার সংসারে কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে কবি। কোন নারীর স্নেহ, আদর বা প্রীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি মা, দিদি বা প্রেয়সি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। যে হাসে নাই, কাঁদে নাই, সে মনুষ্য নয়; জীবন্ত পুতুল। মনুষ্যমাত্রেই অন্তরে অন্তরে কবি। সংসারে নানা রস ছড়ান রহিয়াছে, অবস্থানুসারে তিক্ত মিষ্ট লবণ আস্বাদন করিতে হইতেছে। মানব যদি কুশিক্ষায় অরসিক, অভাবুক না হইয়া থাকে, তাহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম্ম। উদ্দীপনা সে রূপ নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপে পরিণত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে ইহার বীজ মৃত্তিকা আশ্রয় করিতে পারে নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লাগিয়াছিল, ও সেই কয়বারই বীজ অঙ্কুরিত, লতা পল্লবিতা ও পুষ্পিতা এবং বোধ হয়, ফলভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুরাবৃত্তের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জলবায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বর্দ্ধিতা হয়, তাহা না জানিলে, কখনই আমরা কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষিকার্য্যও এখন বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতোবাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অধিক বার সঞ্চরণ করি নাই। ভারত নদী বিপুলা; চর দেখিয়াই, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তরি সেই প্রবাহে বিসর্জ্জন করিতেও ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, সুতরাং কয়টি বৃহৎ চরে লাগাইয়া, সেই কয়েটি দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি কখন দূরে একটি কাল মেঘের মত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি, ভরসা করিয়া যাইতে পারি নাই। আর পাঁচ জন সঙ্গী পাইলেও বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়, কাহাকেও দেখি না। তখন ভয়ে বিষাদে বাগশ্রীতে বলিতে হয়;—

"তরি নাহি দেখি আর, চারিদিকে অন্ধকার।

বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।"

এই রূপ অবস্থায় এক বার এক জন বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়। সাহেবেরা নৌবিদ্যায় কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরেজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল; সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, ঐ যে দূরে চর দেখিতে পাইতেছ, ঐটি মহাভারত আর তার এদিকে এই যে দেখিতেছ, এইটি রামায়ণ। আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। দ্বাপরের পর ত্রেতা যুগ হইল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি এক বারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তখন সেই পূর্ব্বের গানের মোহড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম;—

"কোথা আনিলে হে—

পথ ভুলালে হে—॥—"

সেই অবধি আর কাহারও সঙ্গে ভারত নদীতে যাই না।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়প্রাদুর্ভাবদমনসম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁহার পর রাম অবতার। দক্ষিণ-বিজয়ই রামায়ণযুদ্ধ। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যসন্তানেরাই বাস করিতেছিল, তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি; রামচন্দ্র, যে উদ্দেশেই হউক, এই অনার্য্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইহার সীমান্তর্বর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয়

করেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছাড়াইয়াই নির্জ্জনস্পৃহ আর্য্য মুনিগণের তপোবন ছাড়াইয়াই, রাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। আর্য্যগণের পীড়নে ইহারা বহিষ্কৃত হইয়া—উত্ত্যক্ত হইয়া, দক্ষিণে বাস করিতেছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে মাংসপ্রলোভী জানিয়া ঘৃণা করিতেন ও চণ্ডাল বলিয়া, হেয় অভিধান দিয়াছিলেন। শ্রীরামকে স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্র-নিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিবানর বধ ও সুগ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দুসমাজবহিষ্কৃত বটে, কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কেননা তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিম বাসী; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য্যনির্ব্বাসিত জাতি নহে। পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংস-ভোজী, বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী, নরবলি প্রতিষ্ঠাকারী অজতেকজাতির মধ্যে অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রবিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্ধারী, বেদাচারবহির্ভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম্ম এই, কিন্তু এ গুলি গুরুতর ঘটনা। বৈদিক এক-গতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি। কন্দমূলফলাশী বানর সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীররসের উদ্ভাবনা; পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের একত্রকরণ। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সাহায্যে আমমাংসলোভী, অতিবিক্রমশালী জাতিকে একবারে উচ্ছন্ন করা, শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জ্জনে তারস্বরে বেদপাঠ, আচার্য্য নিকটে ধনু-

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে২ একবার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যা-সংলগ্ন শালতালবনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্য করিয়াই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রভাবে আর্য্যবৈরী, প্রভুত-বিক্রমশালী (যে বিক্রম বর্ণন জন্য আর্য্যমুনি আর্য্যদেবগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন) সেই জাতিকে একবারে ভারতবর্ষ সন্নিহিত দ্বীপ হইতেও নির্ম্মূল করিয়াছেন। আর্য্যসন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্ত্তি মনে করিয়া, অদ্যাপি তাঁহাকে সপ্তমাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান্ ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ। অদ্যাপি রামজী হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার চরিত্র অসাধারণ অলৌকিক নহে। মনুষ্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেম। পরের সাহায্য না হইলে, কখনই মহৎকার্য্য সুসাধিত হয় না; এবং অন্যে কর্ত্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে। এক ব্যক্তির মনোভাবে আর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সমভাবী কে করে? রস ঢালিয়া দিয়া পান করিতে, কে বলে? কেবল রস অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রস উদ্দীপন করিতে চায় কে? উদ্দীপনা। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই, এই রামায়ণ চরে, দক্ষিণ বিজয় চরে, রাবণ বধ চরে, রাক্ষস ধ্বংস চরে, যাহাই নাম দিউন, এই স্থানে, প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎকার্য্য সাধন, এই সকল জল বায়ুর গুণে উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সে লতা বহু পল্লবিতা, ভূরিমনোহর-কুসুমশোভিতা হইয়াছিল। সে ফুলের মালা এখন রামায়ণের পাতে পাতে সাজান রহিয়াছে। রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে২ উদ্দীপনাপূর্ণ। রামোপ্তা উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়াছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারই গুটিকত অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লতা কত দিন জীবিতা ছিল? তাহা কে বলিতে পারে। যে দেশে মৌনব্রতাবলম্বী মুনিগণকে দেবসদৃশ ভক্তি করে, সে দেশে উদ্দীপনা কত দিন জীবিতা থাকিবে? কিন্তু আমরা এ সময়ের কিছুই জানি না। রাবণ নিপাতকারী রাঘব বংশের, সেই সূর্য্য বংশের, প্রাদুর্ভাব কিসে হ্রস্ব হইয়া, চন্দ্র বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইল, তা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত

নদীতে আর সহস্রৈক বৎসর এদিকে বাহিয়া আসিয়া, আমরা আর একটি বৃহৎ চর দেখিতে পাই। চর দেখিলেই আশা হয়। অবশ্য নানা তরুলতা আছে। হয় ত উদ্দীপনার লতা আছে। এ চরটি ভারতযুদ্ধ চর।

এই সময়ে বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তে নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যক্ষেত্রে সূত, মাগধ, বল্লব, গোপ, সূপকার প্রভৃতি নানা আগাছা পরগাছা জন্মিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী প্রভৃতি কত জঙ্গলী লতা উদ্ভূতা হইয়াছে, আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খস, দরদ, বাহ্লীক, চীন, যবন প্রভৃতি নানা অনার্য্য জাতি দিন দিন বিক্রম বিস্তার করিয়া আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ভারত রাজ্য, খণ্ড রাজ্য, উপরাজ্য, মণ্ডল, ছত্র, নগর, গ্রাম বিভেদে একবারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। চোল, কোল, চোর, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মথুরা, ত্রিগর্ত, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নানা দেশ, নানা রাজা। পরস্পরের একতা নাই, সৌহার্দ্দ নাই। এই সময়ে অষ্টম যমলাবতার কৃষ্ণার্জ্জুন জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিরবৈরী বেদদ্বেষী কংশ রাজাকে বিনষ্ট করিয়া, যে জরাসন্ধ স্বীয় কারাগারে ভারতের বীরগণকে অন্ধকারে বিনষ্ট করিতেছিলেন, যে শিশুপাল স্বীয় দম্ভে ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য, যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতার সাহায্য লইলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা আবার আপনাদের চিরজ্ঞাতিশত্রু দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থে দুই বিভিন্ন রাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সুসাধিত হইল, কিন্তু তৎপরেই জ্ঞাতিবৈরযুদ্ধে সমস্ত ভারত দুই দলে বিভক্ত হইল এবং কুরুক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চূর্ণীকৃত ভারত অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এক না হউক, দুই দল হইয়াছিল। এ গৃহবিবাদে আর কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অশ্বমেধ পর্ব্বের বর্ণনে বোধ হয়, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মহৎ কার্য্যের উদ্যমের কর্ত্তৃগণকেও আমরা দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অর্জ্জুন নরনারায়ণ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই দেবরূপী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত প্রণয়নের সমকালিক বৃত্তান্ত। বেদব্যাসের গ্রন্থ মহাভারত রামায়ণের ন্যায় সেই কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহোদ্দীপক বেদব্যাসের গ্রন্থোক্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাসের

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের লেখার একবার তুলনা করুন। ভারতোক্তা নায়িকা শকুন্তলার চরিতের সহিত নাটকের শকুন্তলাচরিত্রের এক বার তুলনা করুন। উভয়েই সতী সাধ্বী পতিব্রতা, মানবমোহিনী শক্তিতে ভূষিতা। উভয়েই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবীলতার সহিত উভয়েই বর্দ্ধিতা, উটজপর্য্যন্তচারিণী হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী। উভয়কেই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর বিস্মৃতি ক্রমেই হউক, বর্জন করিলেন, অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিলেন না, সহধর্ম্মিণী আখ্যা দিয়া মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিন্তু এই আচরণে দেখুন, কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন। কবির শকুন্তলা রাজার গোপন ব্যবহার দুই বার স্মরণ করিয়া দিতে গিয়া, পরে লজ্জাতে ঘৃণাতে নিবারিত হইয়া, আপনার দুঃখ আপনই প্রকাশ করিলেন।—যথা,—রাজা। আর্য্যে কথ্যতাম্।

গৌত। ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ,

তু এবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধু।

এক্কক্কস্সঅ চরি এ,

কিং ভণ্ণদু এক্ক একস্সিং॥

শকু। (আত্মগতম্) কিণ্ণু কখু অজ্জউত্তো ভণিস্সদি ?

রাজা। (সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে! কিমিদমুপন্যস্তং।

শকু। (আত্মগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! সাবলেবো সে বঅণাবক্‌খেবো।

* * * *

রাজা। কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

শকু। (সবিষাদমাত্মগতম) হিঅঅ সং পদং সংবুত্তা দে আসঙ্কা।

* * * *

রাজা। ভো স্তপস্বিনশ্চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃস্মরামি তৎ-
কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকু। (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো ভগ্‌গা দাণিং দূরারোহিণী আসালদা।

* * * *

শকু। (স্বগতম্) ইমং অবথন্তরং গদে তাদিসে অণুরাএ কিম্বা সুমরাবিদেণ, অধবা অত্তা দাণিং মে সোধনীও হোত্থত্তি কিঞ্চি বদিস্সং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত! (ইত্যর্দ্ধোক্তে) অধবা সংসইদো দাণিং এসো সমুদাচারো।

পৌরব! জুত্তং ণাম তুহ পুরা অস্সমপদে সব্ভাবুত্তাণহিঅং ইমংজণং তধাসমঅপুব্বঅংসম্ভাবিঅ সম্পদং ইদি সেহিং অক্খরেহিং পচ্চক্খাতুং।

* * * *

শকু। ভোদু জই পরমত্থদো পরপরি গ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেণ কেণবি তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং।

রাজা। প্রথমঃ কল্পঃ।

শকু। (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী! অঙ্গুলীঅঅসূণ্ণা মে অঙ্গুলী! (ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে) * * *

রাজা। (সস্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।

শকু। এত্থ দাব বিহিনা দংসিদং পউত্তণং অবরং দে কধইস্সং;

রাজা। শ্রোতব্যমিদানীম্।

শকু। ণংএক্ক দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীবত্তভাঅণগদং উদঅং তুহ হত্থে সণ্ণিহিদং আসী।

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ।

শকু। তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গোণাম মিঅপোদও উবট্ঠিদো, তদো তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅদুত্তি অণুকম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উদএণ, ণ উণ সো অপরিচিদস্স দে হত্থাদো উদঅং উবগদো পাদুং, পচ্চা তস্সিং জ্জেব উদএ মএ গহিদে কিদো তেণ পণও, এত্থন্তরে বিহসিঅ তুএ ভণিদং সব্বো সগণে বীসসদি, জদো দুবেবি তুহ্মে আরণ্ণকা ত্তি।

রাজা। আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্‌ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী। মহাভাঅ! ণারিহসি পব্বং মন্তিদুং, তবোবণসংবড্‌ঢিদো ক্খু অঅং জণো অণভিণ্ণোকইদবস্স।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে।

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং, সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃপরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি।

শকু। (সরোষম্) অণজ্জ! অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি; কোণাম অণ্ণো ধর্ম্মকঞ্চু অব্যবদেসিণো তিণচ্ছন্নকূবোবমস্স তুহ অনুআরী ভবিস্সদি।

* * * *

রাজা। ভদ্রে প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং, প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকু। তুম্হে জ্জেব পমাণং,

জাণধ ধর্ম্মথিদিঞ্চ লোঅস্স।

লজ্জাবিণিজ্জিদাও

জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

যুট্‌ঠুদাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিয়া সমুবট্‌ঠিদা।

গোতমী। জাদে ইমস্স পুরুবংসপচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্স হত্থং সমুবগদাসি।

শকু। (পটান্তেন মুখমাচ্ছাদ্য রোদিতি।)

* * * *

শাঙ্গরব। * * * গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ। [ইতিসর্ব্বে প্রস্থিতাঃ।]

শকু। অহংদাণিং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধা, তুম্হেবি মংপরিচ্চঅধ। (ইত্যনুপ্রস্থিতা)

* * * *

শাঙ্গ। (সরোষং প্রতিনিবৃত্য) আঃ পুরোভাগিনি! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে।

শকু। (ভীতা বেপতে)

শাঙ্গ। শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী। যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি কিংপুনরুৎকুলয়া ত্বয়া। অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্॥

* * * *

পুরোধাঃ। (বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাং—।

রাজা। অনুশাস্তু মাং গুরুঃ।

পুরোধাঃ। অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু।

রাজা। কুত ইদম্?

পুরো। ত্বং সাধুভির্ম্মন্ত্রিভিরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। সচেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি, বিপর্য্যয়েত্বস্যাঃ পিতুঃসমীপগমনং স্থিতমেব।

রাজা। যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরো। (উত্থায়) বৎসে ইত ইতোঽনুগচ্ছ মাম্।

শকু। ভঅবদি বসুন্ধরে! দেহি মে অন্তরং। (ইতি সহ পুরোধসা গৌতমী-তপস্বিভিশ্চ রুদতী নিষ্ক্রান্তা।)*

---

* রাজা। আর্য্যে, বলুন।

গৌত। এও গুরুজনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা কর নাই। একেলা একেলার কার্য্যে অপরে কে কি বলিতে পারে?

শকু। (আত্মগত) না জানি আর্য্যপুত্র কি বলেন?

রাজা। (শুনিয়া সভয়ে) কি গা? উপন্যাস আরম্ভ করিলে না কি?

শকু। (আত্মগতা) আ ছি ছি! এঁর বচনভঙ্গী যে কেমন কেমন।

* * * *

রাজা। কি আমি এঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম না কি?

শকু। (সবিষাদে আত্মগত) হা হৃদয়! যা ভয় করেছিলে, এখন তাই হলো!!

* * * *

রাজা। হে তপস্বিগণ! ভাবিয়াও ইঁহাকে পরিগ্রহ করা, আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তবে কুক্ষত্রিয়ের ন্যায় কেমন করে, এই স্পষ্টগর্ভলক্ষণাকে গ্রহণ করি?

শকু। (আত্মগত) ছি ছি! বিবাহেতেই সন্দেহ! এত দিনে আমার দূরারোহিণী আশালতা ভগ্ন হইল।

* * *

শকু। তেমন অনুরাগই যদি এমন অবস্থান্তর গত হইল, তবে আর মনে পাড়াইবার চেষ্টা করিলেই বা কি হবে? তথাপি আপনাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশ্যে)

আর্য্যপুত্র! (এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ সম্বোধন যুক্ত হইতেছে না।

পৌরব! পূর্ব্বে আশ্রমপদে প্রণয়-প্রফুল্ল-হৃদয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আদর করিয়া, এখন এই রূপে প্রত্যাখ্যান করা কি তোমার উপযুক্ত?

* * * *

শকু। ভাল, যদি যথার্থই পরস্ত্রীগ্রহণ শঙ্কা করিয়া, তুমি এরূপ করিতেছ, তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (অঙ্গুলি দেখিয়া) হায় হায়! অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই যে! (সবিষাদে গৌতমীর মুখ দর্শন)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে, স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

ব্যাসের শকুন্তলা সে প্রকৃতির নহেন, তিনি দুষ্মন্তকর্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া, ম্লান বদনে ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিয়া,

শকু। এ স্থলে এখন বিধাতাই প্রভুত্ব দেখাইলেন, ভাল আমি তোমাকে আর কিছু বলিতেছি।

রাজা। বল শুনিতেছি।

শকু। এক দিন বেতসলতামণ্ডপে তোমার হস্তে পদ্মপত্রে জল ছিল ?

রাজা। তার পর বল শুনি।

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার কৃতকপুত্র মৃগশাবক আসিল ? এই আগে পান করুক, এই কথা বলিয়া, তুমি আদর করিয়া, তাহাকে জল পান করিতে ডাকিলে ; কিন্তু সে অপরিচিত বলিয়া, তোমার হস্ত হইতে জল খাইতে আসিল না। তার পর আমি সেই জল লইলে, সে ভাল বাসিয়া খাইল। তাহাতে তুমি হাসিয়া বলিলে, সকলেই স্বজাতিকে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই বন্য।

রাজা। স্ত্রীলোকে আপন কার্য্য সাধন জন্য এইরূপ অমৃতমধুর মিথ্যা বচন দ্বারাই বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহারাজ ! এরূপ মনে করিবেন না। তপোবনে পালিত এই সকল লোকেরা কৈতব জানে না।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে ! পশু পক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তবে পরিবোধবতীদিগের কথা আর কি বলিব ! দেখ, কোকিলাগণ আকাশে উড়িতে পারিবার পূর্ব্বে আপনার শাবকদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়।

শকু। অনার্য্য ! এ কি আপনার হৃদয় অনুমানে সকলকে দেখিতেছ না কি ? তুমি ধর্ম্মছদ্মবেশী, তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত ! অন্যে কে তোমার অনুকরণ করিবে ?

রাজা। ভদ্রে ! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রসিদ্ধ ; আমার প্রজাদের মধ্যেও এমত দেখা যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্ম্মস্থিতিও তোমরাই জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হইয়া আসিয়াছি ?

গৌত। বাছা, পুরুবংশে বিশ্বাস করিয়া মধুমুখ গরলহৃদয় জনের হাতে পড়েছ।

শকু। (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন।)

* * * *

শার্ঙ্গ। গৌতমি ! অগ্রসরা হউন, (সকলে যাইতে লাগিলেন।)

প্রত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি লাঙ্গূলস্পৃষ্টা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া, গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়াই প্রত্যাবৃত্তা হইবেন? তাহলে ত কবির স্বষ্টা বীর-রসপ্রবলা নায়িকা হইলেন মাত্র। তা নয়, তিনি উদ্দীপনাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণকুহর দিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন। তিনি সফলাও হইলেন।

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যসি॥
মেনকা বিদশেষ্বেব ত্রিদশাশ্চানুমেনকাম্।
মমৈবোদ্রিচ্যতে জন্ম দুষ্মন্ত তব জন্মতঃ॥
ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরীক্ষে চরাম্যহং।
আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব॥

শকু। এখন এই শঠ আমায় ত্যাগ করিল, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিবে? (এই বলিয়া সঙ্গে২ গমন।)

শার্ঙ্গ। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্টশীলে! স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতেছিস্।

শকু। (ভয়ে কম্পান্বিতা।)

শার। শকুন্তলে! তুমি শুন, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুলটা তোমায় লইয়া কি হইবে? আর যদি আপনাকে তুমি শুচিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে দাস্যবৃত্তিও তোমার ভাল।

পুরোধা। (চিন্তা করিয়া) যদি এরূপ করেন—

রাজা। মহাশয় উপদেশ দিন।

পুরোধা। ইনি প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা কেন?

পুরোধা। সাধুনৈমিত্তিকেরা বলিয়াছেন, যে আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেই রূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইঁহাকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়, তবে ইহার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির।

রাজা। গুরুর যাহা অভিরুচি।

পুরো। (উঠিয়া) বাছা আমার সঙ্গে এই দিগে আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে অন্তরে স্থান দেও। (পুরোধা ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ক্রান্তা।)

মহেন্দ্রস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
ভবনান্যনুসং যামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ॥
সত্যশ্চাপিপ্রবাদোয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তে হনঘ!
নিদর্শনার্থং নদ্বেষাৎ শ্রুত্বা তং ক্ষন্তুমর্হসি
বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখং।
মন্যতে তাবদাত্মানমন্যেভ্যো রূপবত্তরং ॥
যদা স্ব মুখমাদর্শে বিকৃতংসোহভিবীক্ষতে।
তদাহন্তরং বিজানীতে আত্মানাং চেতরং জনং ॥
অতীব রূপসম্পন্নো ন কিঞ্চিদবমন্যতে।
অতীব জল্পন্ দুর্ব্বাচোভবতীহ বিহেটকঃ ॥
মূর্খোহি জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বা বাচঃশুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বা বাচঃ শুভাভস্তাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাং হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ ॥
অভিবাদ্য যথা বৃদ্ধান্সন্তো গচ্ছন্তি নির্বৃতিং।
এবং সজ্জনমাক্রুশ্য মূর্খো ভবতি নির্বৃতঃ ॥
সুখং জীবন্ত্যদোষজ্ঞা মূর্খো দোষানুদর্শিনঃ।
যত্র বাচ্যাঃ পরৈঃ সন্তঃ পরানাহুস্তথাবিধান্ ॥
অতো হাস্যতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্নবিদ্যতে।
যত্র দুর্জ্জন মিত্যাহ দুর্জ্জনঃ সজ্জনং স্বয়ং ॥
সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকো হপ্যুদ্বিজতে জনঃকিং পুনরাস্তিকঃ ॥
স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যো ন মন্যতে।
তস্য দেবাঃশ্রিয়ংঘ্নন্তি ন চ লোকানুপাশ্নুতে ॥
কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমব্রুবন্।
উত্তমং সর্ব্বধর্ম্মাণাংতস্মাৎ পুত্রং ন সং ত্যজেৎ ॥
স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লব্ধান্ক্রীতান্ বিবর্দ্ধিতান্।
কৃতানন্যাসু চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মনুরব্রবীৎ ॥
ধর্ম্মকীর্ত্ত্যাবহা নৃণাং মনসঃপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
ত্রায়ন্তেনরকাজ্জাতাঃ পুত্রাধর্ম্মপ্লবাঃ পিতৃন্ ॥

স ত্বং নৃপতিশার্দ্দূল পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি।
আত্মানাং সত্যধর্ম্মৌ চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে॥
নরেন্দ্রসিংহ কপটং ন বোঢ়ুং ত্বমিহার্হসি।
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ॥
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং॥
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং॥
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বাস্যান্নবা সমং।
নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদমৃতাদিহ বিদ্যতে।
রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ॥
মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্ত তে।
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি নচেৎ স্বয়ং॥
আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতং।
ঋতেঽপি ত্বয়ি দুষ্মন্ত শৈলরাজাবতংসিকাং॥
চতুরন্তামিমামুর্ব্বীং পুত্রোমে পালয়িষ্যতি।

(মহাভারতে আদিপর্ব্বণি সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে।*)

* মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না? মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এ স্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর, রুষ্ট হইও না। দেখ কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, তত ক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপের প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে; সেই রূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে, শুভ কথা

এই রূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা মহাভারতের নানা স্থানে আছে। এখানেও দেখুন প্রয়োজন হইয়াছিল। জরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমান্তপ্রদেশে নূতন দ্বারকা নগর স্থাপন করা, এক বার রাজসূয় যজ্ঞকালে সমস্ত ভারতের মিলন, আবার কুরুক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতের সসৈন্য আগমন ও বল পরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারত বিজয় করা প্রভৃতি নানা মহৎকার্য্য সাধন, প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের প্রবৃত্তিচালন প্রয়োজন, সেই খানেই উদ্দীপনার আবশ্যক,

পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেই রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন; কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধন করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও, তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সজ্জনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত, এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালের ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে, এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে, আত্মকৃত সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্ব তীর্থে অবগাহন করিলে, সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, এবং

এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রসূতি। তাৎকালিক উদ্দীপনা তাৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। ভারতপল্লবিতা উদ্দীপনা লতার পুষ্প ভারত গ্রন্থে রাশি ২ রহিয়াছে;—শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীষ্ম বচনে, ভীমের ভর্ৎসনে, খাণ্ডবদাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে, ভূরি ভূরি বচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, স্তূপে স্তূপে রাশীকৃত রহিয়াছে। মহাভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে রস। কবিতার রস, উদ্দীপনার রস, দুই রস সমভাবে থাকাতে, মহাভারত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহাকে মহাপুরাণ বলে—পঞ্চম বেদ বলে।

অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করে। দুষ্ট ছেলেগুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া, প্রায়ই মায়ের কোলে গিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রা যায়। অতি আয়াসসাধ্য কার্য্য করিলে পরই, একটু বিশ্রাম করিতে হয়। পর্ব্বাতে, পূজায়, উৎসবে, ব্রতনিয়মে, নাম-সংকীর্ত্তনে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র কার্ত্তিক যাপিত করিয়া, বঙ্গসমাজ একবার চান্দ্র অগ্রহায়ণ, চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম করেন। মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন, জিরেন। যিহুদিবিবরণে, এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকেও ছয় দিন জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া, রবিবারে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারত ঘটনার পর হিন্দু সমাজ যে দিন কত বিশ্রাম করিবে, তার আর বৈচিত্র কি? একে প্রাচীন কালের হিন্দু সমাজ, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ্যাপি সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল, এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আমরা পাঁচ জনকে একত্র হইয়া, গোলমাল করিতে

সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না, কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই গিরিরাজবিরাজিতা সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত
১ম খণ্ড, ১২৪—১২৬,)

দেখিলে বলিয়া থাকি, ওখানে ভারি কুরুক্ষেত্র হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহু সংখ্যক সৈন্যনাশ হইয়া গেল, এখন যে হিন্দু সমাজ কতকাল নিদ্রা যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যে হিন্দু জাতি, কাষ্ঠ আহরণকারী ছেদকের শিরেও নিপীড়্যমান বৃক্ষ, ছায়া দান করিতে বিরত হয় না, ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া "অহিংসা পরমধর্ম্ম" বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল বলিয়া অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দু জাতি দৌড়ান চেয়ে দাঁড়ান ভাল, দাঁড়ান অপেক্ষা বসা ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল, শোয়া চেয়ে ঘুমান ভাল, ইত্যাদি ধারা-বাহিক বচন নিচয় সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের আলস্য পরতন্ত্রতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রদান করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি পৌরাণিক শাসন প্রমাণ বিবৃতি জন্য, কেহ বাল্যক্রীড়াকালে কৌতুকপ্রিয়তাবশতঃ শলভপুচ্ছে শলাকা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া, তাহার শত জন্ম পরে শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি অতি সামান্য রক্তপাতকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছে; সেই হিন্দু জাতি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিল। ভারত বীর্য্যহীন, ভারত বীরশূন্য, কুরুবংশ লুপ্তপ্রায়, যদুবংশ লুপ্ত, গৃহবিচ্ছেদে গৃহ দগ্ধ। নির্জীব ভারত ঘুমাইতে লাগিল। সহস্র বর্ষ এই রূপ নিদ্রাভঙ্গ হয় না। পরশুরাম একবিংশ বার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়েরা গৃহবিবাদে সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া। নিঃক্ষত্রিয় ভারতে ব্রাহ্মণেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল হোতাপোতা, দীক্ষা-শিক্ষা দাতা, শাস্ত্রপ্রণেতা নহেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকল কার্য্যেই হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহারাই এখন সমাজের কর্ত্তা, তাঁহারাই এখন শাসনবিধাতা। সে কঠোর শাসন-ভাবও আমরা এখন মনোক্ষেত্রে বিচিত্র করিতে পারি না। নিঃক্ষত্রিয়, ক্লান্ত ভারত সেই কঠোর শাসনে অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব হইতেই যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছিল। এখন সেই সমাজের এক দল পৃথক হইয়া যন্ত্রচালক হইল। বিপ্রবর্ণ যন্ত্রচালকের কর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া কেবল যন্ত্রচালনাতেই সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের সেই শান্তভাব, সেই বিশুদ্ধভাব, একটু অপূর্ব্ব পারলৌকিকভাব, ঐহিক চিন্তা অবিচলিত ভাব হারাইলেন। কলচালনেই ব্যস্ত, কঠোর

নিয়ম সমস্ত প্রচার করিলেন। ছায়াবাজীর পুতুলের যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজের সে স্বাধীনতাটুকুও রহিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণী রজ্জু ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে, পুতুল তখন আর চালকের আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমনি সুকৌশলযুক্ত, যদি একটির আকর্ষণী রজ্জু ছিঁড়িল, আর একটি আসিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

প্রত্যেক দিনের রাত্রির শেষ ছয় দণ্ড হইতে পর দিন রাত্রি প্রহরৈক পর্য্যন্ত এক নিয়ম; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে চতুর্দ্দশী তিথি নিয়ম; সপ্তাহের প্রত্যেক বারের এই২ ক্রিয়া; সূর্য্য-সংক্রমণে এই নিয়ম; উত্তরায়ণে এই; দক্ষিণায়নে এই; বিশেষ চতুর্মাসে এই; মলমাসে এই; বর্ষগতিতে এই রূপ; মাতৃগর্ভে অঙ্কুরসংস্থাপন অবধি, শবদাহের পর বর্ষৈক কাল পর্য্যন্ত, শুদ্ধ যাবজ্জীবন নয়, যাবজ্জীবনের মাথায় একটি চূড়া, পায়ে পাদুকা, এই আগা পিছা বাড়ান যাবজ্জীবনে এই২ সংস্কার; এই বর্ষক্রিয়া; ঋতুকলাপ; মাসবিধি; দৈনিক কর্ম্ম; প্রতি প্রহরের পদ্ধতি, প্রতিক্ষণে এই করিতে হইবে; এই গুলি দেশাচার; এই গুলি কুলাচার; এইটী এই বংশের রীতি; এটী গোত্রের পদ্ধতি; এ শাখার এইটি ধর্ম্মশাস্ত্র; এই রূপে জন্ম লইতে হবে, এই ভাবে জন্ম দিতে হবে। এই প্রকারে কাঁদিতে হবে, এই রূপে মরিতে হবে, এটি খাবে, এটি খাবে না, এখানে এই ভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান করিবে; হিন্দু শাস্ত্র পালনের জন্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দু শাস্ত্র নহে। তোমার প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি ব্রাহ্মণ সেবা করা কর্ত্তব্য, তুমি চারি জনের অধিকের সেবা করিতে পারিলে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচটী তুষারধবল বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান করা। পাঁচটি বৎসই তুষারধবল হয় নাই উত্তম; ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতৈক বার গায়ত্রী জপ করিয়া, অষ্টোত্তর শতনিষ্ক ব্রাহ্মণে দান। গায়ত্রীজপকালে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে; বেশ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত ত্র্যহ উপবাস-পূর্ব্বক গোদাবরী নদীতে স্নাত হইয়া অষ্টাবিংশ স্নাতক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্র দান; গোদাবরী স্নানকালে জীবিত শম্বুকপৃষ্ঠে তোমার পদ স্পর্শ হইয়াছে, ভাল ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণারণ্যে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ ভোজন। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ হস্তের তার ছিঁড়িয়া গেল, ৫৭ নম্বরের পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সে বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে, ২৬৪

সংখ্যার পুতুল বাতাস করিতেছে ; ৩ নং পুত্তলিকা সেই বাতাস করা ভাল করে্য হইতেছে কি না, তাহাই দেখিতেছিল, ঐ ২৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। এই রূপে ঋষিদিগের, শাখাকর্ত্তাদিগের কাল্পনিক গাঁথনির উপর গাঁথনিতে এক বৃহৎ মায়াময় অট্টালিকা হইল। উপবাসে, জপে, জাগরণে, নিত্য কর্ম্ম পালনে, কঠোর শাসনে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাজনক্রিয়ার একায়ত্তকারী ব্রাহ্মণ জাতির উপর সাধারণের দিন২ অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্ত্তিতা অবহেলা করিয়া, লোকে যে ভক্তিতে ভগবানকে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। শাস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও মহাপাপ, এই সংস্কার অনেকের মনে হওয়াতে তাহারা ঘৃণিত হইয়া, কদর্য্য বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায়, ধরণীবিবরে, পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ শাসনরজ্জু ক্রমেই পেঁচাও করিয়া, অসংখ্য ফাঁশ, লোকের গলে, বক্ষে, হস্তপদে, করাঙ্গুলিতে, পদাঙ্গুলিতে দিয়া, তুজনে২ ফাঁশ জড়াইয়া, দশ জনে দশ জনে ফাঁশ জড়াইয়া, জাতিতে২ ফাঁশ জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দু সমাজ এক বড় ফাঁশে জড়াইয়া, রজ্জুর তুই মুখ একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া, কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন ; একটু টান পড়ে, আর তৈয়ারি দড়ি গেরো দিয়ে বাড়াইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের একে বিশ্রামপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়মবিষ সমাজের শাখায়, পাতায়, শিরে২ প্রবেশ করিয়া, লোকের মস্তকে, মস্তিষ্কে, কেশে, অস্থির মধ্যগত মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া, সব একবারে জ্বর জ্বর করিয়া রাখিল।

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত বিপদ জঞ্জাল দূরীভূত করিতে হইবে। এক এক গাছি করিয়া তার ছিঁড়িলে এ কার্য্য হইবে না, আর এক জন আসিয়া বাঁধিয়া দিবে, অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী দড়ি একবারে ছিঁড়া চাই। ফাঁশের দড়িতে একটু একটু করিয়া টান দিলে ত হইবে না। মাঝ খানে এমন একটি আঘাত করা চাই, যে সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ছড়াইয়া পড়িবে যে, ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাঁধনের তুই মুখ খুলিয়া যাইবে, সে মুখ তাঁহারা আর ধরিতেও পারিবেন না. অথচ নূতন দড়ি পাকাইয়া জোড়া দিয়াও, আর বাঁধন রাখিতে পারিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি এক বিরাট আঘাতে সমস্ত তার খণ্ড২ করিয়াছিলেন। তিনি এই অবসন্ন, দিন২ জড়ীভূত সমাজকেন্দ্রে এমনি একটি গুরুতর কেন্দ্রবিযোজক বল প্রয়োগ করিলেন যে, ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন এক বারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই পর্য্যবসিত হইল না; ভারত সাগরের উর্ম্মিসঙ্কুল নীলজলরাশি তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না, হিমালয়ের তুষারাবৃত শুভ্র শিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্লীক, লাডক, তিব্বৎ, তাতার, চীন, মহাচীনে, ব্রহ্ম, সুহ্ম, মলয়ক, কোচীনে; যব, বলি, সুমাত্রা, সিংহলদ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল; সমস্ত পূর্ব্ব আশিয়া জীবিত হইল। নববর্ষের মধ্যে পঞ্চ বর্ষ নব ভাব ধারণ করিল। শাক্য মুনি ব্রাহ্মণদিগের সেই মায়াময় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার উপকরণ লইয়া, একটি অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রবসপিয়ারের ন্যায় হিন্দু সমাজকে একবারে অধঃপাতে দিয়া, অতলে ডুবাইয়া, গভীর রসাতলে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কচলাইয়া ধুইয়া, সেইখানে তাহার দোষ ক্ষালন করিয়া, আবার নেপোলিয়নের ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সামান্য কথায় বলে, ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া কঠিন। বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে; ভাল পাকা মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কষ্টকর, অতীব আয়াসসাধ্য এবং সময়ে সময়ে হয় ত একবারেই দুঃসাধ্য। অতি কাচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ, তেমনি বিপদ পরিপূর্ণ; অনেকে ভাঙ্গিতে গিয়া, চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। সে গুলি ভাঙ্গা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। শাক্য সিংহ হিন্দুসমাজের গাঁথনি যেমন ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটি পাকা গাঁথনির সুবৃহৎ সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্যাটি যেমন সুমহৎ, তেমনি সুকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্দীপনার সাহায্যেই সমাজ সংস্করণে সফলার্থ হয়েন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থান পর্য্যটন করেন; সকল স্থানই তাঁহার উদ্দীপনাতে মাতিয়া উঠে। শাক্য সিংহ মগধরাজ অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও কাশীরাজ, এই তিন জন অতি প্রতাপশালী নরপতিকে স্বীয় মতাবলম্বী করেন। তিনি

কালান্তক ধর্ম্মশালায় কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত বিস্তার করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া, লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। আর্য্যধর্ম্মধ্বংসকারী নিজ অসীম ক্ষমতাবলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীর * অর্দ্ধেক লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ লোক তাঁহাকে ফো, বোধ, গডামা, মহৎ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানির সার স্বরূপ জাতিভেদ-সংঘটিত অন্নবিচার লোপ করিয়া, হিন্দুয়ানির সার হরণ করিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধর্ম্মপদ কঠোর নাস্তিকের পর্য্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুজন অমানুষ মানুষের নাম করিতে হইলে, যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁহারি নাম করিতে হয়।

আর্য্যচরিত এত দূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া, আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহাসাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তিন সহস্র বৎসর মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিস্তারিত হইতে তিন বার দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব যে লতা বর্দ্ধিতা করেন, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিতা ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, মৌদগলায়ন সারি পুত্র প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া, হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন। নানা বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

শাক্য সিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ভারতসৌভাগ্য, চতুষ্পাদ পরিমিত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্যসূর্য্য কি রূপে অস্তগত হয়; শঙ্কর দিগ্বিজয়ে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে, কতই বা লাভ হইয়াছে; তাহা বর্ণন করা এ প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না, ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা

* পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১০০ বলিলে, প্রায় ১৬ জন হিন্দু ও ৩২ জন বৌদ্ধ হয়, সুতরাং ১০০র মধ্যে ৪৮ জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকার করে।

তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মহাসাগর যেমন জলময়, ভারত তেমনি কবিতাময়। মহাসাগরে দ্বীপ আছে, ভারতেও সেইরূপ উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার কথা গুলি সংহত ভাবে প্রদর্শন করিয়া, কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, উপসংহার করিতেছি।

আমাদের কি ছিল না, তাহা দেখা উচিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দ্বারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা, বা অন্যকে কার্য্যে লওয়ান যায়, তাহাকে উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা কবিতা হইতে পৃথক্। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দেশ্য, রসাত্মিকা কথা। নির্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি, অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে ; নির্জনে চিন্তায় অধিক কবিতা হইল ; উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল ; তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি। ভারতের সমাজভাগ ভূগোল ভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের জীবন, স্রোতের ন্যায় ; আবার তাহাতে স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই। কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও মানুষ কবি হইতে পারে, সাধারণ সুখ দুঃখ বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ ঘটনায় বিশেষ রূপে পরিবর্দ্ধিতা হয়। প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আমরা দ্বীপের ন্যায় উদ্দীপনা-প্রবল কাল তিনবার মাত্র দেখিতে পাই। পরের ঘটনাবলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এত বিস্তৃতভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জল বায়ুতে উদ্দীপনা লতা বর্দ্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা কখনই উদ্দীপনারোপণী কৃষিবৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও এ সময়ে বিশেষ আবশ্যক।

উপন্যাস

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তারাচরণ

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কবি কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্য গুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটী অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কার স্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টী কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনী সখি! চলিলে যে?"

মালিনী বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। মালিনী! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূত কাব্যস্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতা গুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পর দিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্র মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণী মধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা একজন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতার কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থ-কন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বালসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ এক জন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীন বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরাজি শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে, গ্রাণ্ট্ ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে ২ তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ, নিরীহ ভাল মানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ এক জন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে

হইয়া উঠিলেন। বিশেষত তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে, তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!" বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ২ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেটায়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখা পড়া শিখাও, তাদের পিঁজরায় পূরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল; তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এপর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায়, কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের স্বরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আইল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল, এত বড় বাড়ী সে কখন দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটী মহল এক একটী বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুঃপার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের

মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে২ মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে, বড় উচ্চ দেড় তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড়২ মোটা ফ্লুটেড থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ জটাবিলম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়া আছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি এক তালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তর খানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বার রক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারী বাড়ী।" উহার পাশে "পূজার বাড়ী।" পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্তর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দর দালান পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারীসকল আসবাবে ভরা—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেব-মন্দির; সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট, "নাটমন্দির," তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারিদিগের থাকিবার ঘর, এক অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল, কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাস দাসীরা, কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণ-দিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও, ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছে। কোথাও শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট, গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ সাধু ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও, বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া,

কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নাড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না,—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রস-কলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে, "মধো কানের" কি গোবিন্দ অধিকারীর গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গাাহতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাট মন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝকড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতা পিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিনটি, তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত ; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত ; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কার। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বকন্যা, মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভায়ের স্ত্রী, মাসীত ভায়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় দিবা রাত্রি কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ী, বালিকার রোদন, "জল আন," "কাপড় দে," "ভাত রাঁধলে না," "ছেলে খায় নাই," "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে, ঠাকুর বাড়ীর পশ্চাতে রন্ধন শালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জাল দিয়া, পা গোটা করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছে। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে ২ ধূঁয়ায় বিগলিতলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছে, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাট কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছে। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেননা তপ্ত তেল

ছিট্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা স্নানকালে বহু তৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি, চড়ার আকারে সীমন্ত দেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছে—যেন শ্রীকৃষ্ণ, পাচনী হস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছেন। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটোল, শাক, কুটিতেছে; হাতে ঘস্২ কচ২ শব্দ হই-তেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল; চাঁদীর স্বামী বড় মাতাল; কৈলাসীর জামায়ের বড় চাকরি হইয়াছে, সে দারোগার মুহুরি; গোপালে উড়ের যাত্রার মত, পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই; পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই; ইংরাজেরা নাকি রাবণের বংশ; ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন; ভট্টাচার্য্যদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস; এই রূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থুলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণ সংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন রূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশ মতে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকার প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটোলের বোঁটা এক্‌কলার পাত অমৃত বোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দর মহলের পরে, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘখণ্ড তুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিনমহল, ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে

দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে, আস্তাবল, হাতিখানা, কুক্কুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে২ শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। সূর্য্যমুখী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্র সঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে২ এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী, পূর্ণচন্দ্র তুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণিনী। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু যে প্রকৃতির চক্ষু কুন্দ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণ তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত। উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর, এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি; সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত মাধবীলতার ন্যায় সৌন্দর্য্য-ভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই— সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্‌বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া কুন্দ সচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, তাহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধান, তাহাকে কহিলেন, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত, এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ

স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই ত সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা অগ্রেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিচয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীর-পুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢল্২ করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলের মহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দ-নন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু২ ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধ সকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক কালে মাষ্টর সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচার হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে তুমিও কি ওল্‌ড ফুলেদের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদিগের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দ-

নন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয়, পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করেন। এই মত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, কুন্দকে বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া, দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিবেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে, দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটী বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া, নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভৎসনা করিলেন, যে সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসরকাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন! জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এতদূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

১। সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা

সকলেই দেখিয়াছেন যে, আকাশ হইতে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। অনেকেই জানেন যে, বাস্তবিক সে সকল নক্ষত্র নহে, নক্ষত্র কখন খসে না। ভূপতিত হইলে পর, দেখা গিয়াছে যে, উহা লৌহ বা প্রস্তর বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ। এইরূপ ধাতু বা অন্য দ্রব্যাত্মক অসংখ্য বস্তু আকাশপথে বিচরণ করিতেছে। উহাকে ইংরাজিতে মিটিয়র বলে। বাঙ্গালাভাষায় যে সকল নাম প্রচলিত আছে, তাহা ভ্রমাত্মক। কিন্তু উল্কাপিণ্ড নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা আমরা গ্রহণ করিলাম। ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে, উল্কাপিণ্ড সকল, সূর্য্যাদির মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বলে, গ্রহগণের ন্যায় আকাশ-মণ্ডলে নিয়মিত বর্ত্মে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন কোন উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর আকর্ষণ পথে পড়ে, তখন তদ্বলে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রপাতকালে পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে বেগে প্রহত হওয়ায়, বায়ু এবং উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়। আলো সেই জন্য।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উল্কাপিণ্ড সকলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বলিলেও বলা যায়। উল্কাপিণ্ডের দুইটি মণ্ডল বিশেষ লক্ষিত। ঐ দুই মণ্ডল পার হইয়া পৃথিবীর পথ। এক মণ্ডলের ভিতর দিয়া ১০ই ১১ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ শ্রাবণের শেষ ভাগে, পৃথিবীকে চলিতে হয়। আর এক মণ্ডল লঙ্ঘন করিবার সময় ১২ই ১৩ই নবেম্বর অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ। অন্য সময় অপেক্ষা ঐ ঐ সময়ে উল্কাপিণ্ডের অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। এই দুই উল্কাপিণ্ডক মণ্ডলের আয়তন অর্থাৎ তদন্তর্ব্বর্ত্তী উল্কাপিণ্ডের পথ, পণ্ডিতেরা গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। একটী ইউরেন্‌স নামক অতি

দূরবর্ত্তী গ্রহের পথ হইতেও বিস্তৃত। দ্বিতীয় উল্কাপিণ্ড সমষ্টির পথ আরও ভয়ানক। লেপ্‌চ্যুননামক সৌর জগদন্ত-স্থিত গ্রহের পথ হইতেও বহুদূর। ইহাও সামন্য কথা। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অনেক উল্কাপিণ্ড অন্য সৌর-জগৎ হইতে আগত ; অন্য সৌরজগতেও যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন যে, এই সকল উল্কাপিণ্ড কোন জগতের বিপ্লবে চূর্ণিত গ্রহগণের ভগ্নাংশ। এ কথার কোন প্রমাণ নাই, এবং অনেকে এক্ষণে একথায় শ্রদ্ধা করেন না। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত বিলাতীয় বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি সর উইলিয়ম টম্‌সন তন্মতাবলম্বন করিয়া, এক কৌতুকাবহ তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন।

পৃথিবীতে চিরকাল জীব ছিল না, এ কথা ভূতত্ত্বের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। বহু কোটি বৎসর পৃথিবী জীবশূন্য ছিল। পরে জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে ? বহু কাল হইতে ইউরোপে এই তর্ক হইতেছে। দেখা যায় যে, জীব ভিন্ন জীবের জন্ম নাই। অনেকে বলিতেন, অণ্ডাদি ব্যতীতও জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। যে সকল জীব পূর্ব্বে "স্বেদজ" অথবা "মলজ" অথবা "স্বতঃসৃষ্ট" বলিয়া স্থির ছিল, তাহাও অণ্ডজ বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি জীব ভিন্ন জীবোৎপত্তি নাই, তবে প্রথম জীব জন্মিল কি প্রকারে ? পূর্ব্বে জীব ছিল না, পরে জীব আসিল কোথা হইতে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা।" এই কথা, সকলে উত্তর বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা মানি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়মে পরিণত। নিয়ম ভিন্ন ঐশী ক্রিয়া কোথাও দেখা যায় না। জগদীশ্বর, সকল কার্য্যই চিরপ্রচলিত, অলঙ্ঘ্য নিয়মের দ্বারা সম্পন্ন করেন, নিয়মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন না। জীব হইতে জীবের জন্ম এই নিয়ম ; তবে বিনা জীবে জীব হইল কি প্রকারে ?

উল্কাপিণ্ড যে বিনষ্ট গ্রহের ভগ্নাংশ, এই কথা মনে করিয়া, সর উইলিয়ম টম্‌সন প্রাগুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি কহেন যে, অনেক উল্কাপিণ্ড বীজবাহী। অন্য গ্রহ হইতে বীজ আনিয়া এই পৃথিবীতে বপন করিয়াছে।"

তিনি বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হইল কি প্রকারে ? পৃথিবীর ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে২ প্রকাশ পায় যে, এক কালে পৃথিবী অগ্নি-দ্রব, তাপ-লোহিত গোলকমাত্র ছিল, তদুপরি জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে

না। অতএব যখন পৃথিবী প্রথমে জীবাধিষ্ঠান-যোগ্য হইল, তখন তত্নুপরি যে কোন জীব ছিল না, ইহা নিশ্চিত। তখন পর্ব্বত, জল, বায়ু ইত্যাদি ছিল; সূর্য্য তাবৎকে সন্তপ্ত এবং আলোকোজ্জ্বল করিতেন, তখন পৃথিবী উদ্যানবৎ হইবার উপযুক্ত হইয়াছিল। তখন কি, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া, আপনা হইতে বৃক্ষ, পুষ্প, তৃণাদি, একবারে পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল? না, উপ্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি ক্রমে পৃথিবী ব্যপ্ত করিয়াছিল?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সর উইলিয়ম, আগ্নেয় পর্ব্বতের উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, "বিসিউবিয়স বা এট্‌না পর্ব্বত-নিঃসৃত অগ্নি-দ্রব পদার্থের স্রোত তৎসানুবাহী হইয়া নামিলে, অচিরাৎ তাহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। কতিপয় সপ্তাহ বা বৎসর পরে, অন্য স্থান হইতে বায়্বাদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ, অথবা অন্য স্থান হইতে স্বয়মাগত জীবের প্রসাদে, তাহা বৃক্ষ জীবাদিতে পরিপূরিত হয়। যখন আমরা দেখি যে, সমুদ্রমধ্যে অগ্নিবিপ্লব সমুৎপন্ন কোন দ্বীপ, কতিপয় বর্ষমধ্যে বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন তাহা যে বায়ুবাহিত, বা জলচর জীবাদি দ্বারা আনীত বীজ হইতে ঐরূপ হইয়াছে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হই না।"

তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সেই রূপ জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষ২ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি অনবরত বিচরণ করিতেছে। যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ২ জাহাজ, সহস্র বৎসর বিনা নাবিকে বিচরণ করে, তবে অবশ্য মধ্যে২ জাহাজে২ আঘাত হইবে। আকাশ সমুদ্রেও তদ্রূপ, পৃথিবীতে পৃথিবীতে কখন কখন অবশ্য প্রহত হইবে। হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রঘাত-জনিত তাপে প্রহত গ্রহাদির অধিকাংশ দ্রব হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কোন২ ভাগ দ্রবীভূত না হইয়া উল্কাপিণ্ড ভাবে, আকাশপথে বিচরণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে যে সকল ডিম্ব, জীব ও বৃক্ষাদি ছিল, তাহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহখণ্ডে অবশ্য থাকিবে। কালে তদ্রূপ কোন সবীজ গ্রহাংশ উল্কাপিণ্ড স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, তদ্বাহিত বীজে পৃথিবীকে প্রথমে উদ্ভিজ্জপূর্ণা, পরে জীবময়ী করিয়াছে।

এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট অদ্যাপি গ্রাহ্য হয় নাই, এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ভাল, ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করা যাউক। তাহা হইলে কি হইল? জীবসৃষ্টির ত কিছুই বুঝা গেল

না। বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্যগ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিজ ও জীবাদি সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম জীব কোথা হইতে আসিল? আবার বলিবেন, "অন্য গ্রহ হইতে।" আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারম্পর্য্যের আদি নাই। প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল।

২। আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকানিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্য চক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা বিসিউবিয়সের অগ্নিবিপ্লব, যেরূপ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধকটাহে দুধ উছলান, সেইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য, সূর্য্যের প্রকৃতি-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক, আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে২ ভাগ করা যায়, তাহা হইলে, উনিশ কোটি, ছয়ট্টি লক্ষ ছাব্বিস হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে, এরূপ ২৫৯,৮০০০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ

লক্ষ গুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী চূর্ণ করিয়া একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনা অনুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দ্দশ লক্ষ, উনষষ্টি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা। এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ের ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কতকালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিনরাত্রি, ট্রেণ অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্য মধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্যতেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষের উপর কালিমাখা কাঁচ না ধরিয়া, হৃততেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাঁচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত হয়, সেই সময়ে দেখা যাইবে যে, লুক্কায়িত মণ্ডলের চারিপার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটী মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটী মণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন২ দেখা যায়। কিরীটিমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের ছবি অঙ্গের উপরে

সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উদগত দেখা যায়। যথা (ক)। ঐ সকল উদগত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই
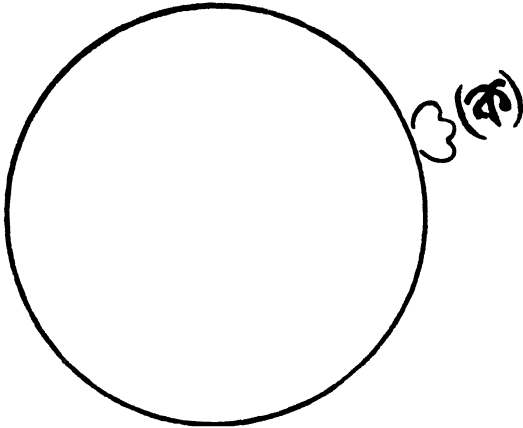
তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন২ অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না।

এই সকল উদগত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বত শৃঙ্গবৎ, কখন অন্যপ্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বলরক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীলকপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত। পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যে রূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপতিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে. এই সকল সৌরমেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌরমেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে

সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলিন পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত, অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণদ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্‌স্ প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরি ভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌরবায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ্ পূর্ব্ব দিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভ গুলিন উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তন্নিম্নে মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম২ সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌরবায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল উর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪০০০ মাইল। বারটি পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টী পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থাপরিবর্ত্তনের কিছু২ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন, যে চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড

ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থ সকল অতি প্রবল বেগে উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আলোক, বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্‌ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি-বেগবান হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহুশত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধেও এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে এত বেগবান, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানে যে, যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ; প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যলোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যা-কর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ২১০ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতিসেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্দ্ধে বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাক্‌টর সাহেব গুড্‌ ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে, সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা-হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্য মধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল,

তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রাক্‌টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ, যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পঁহুছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে, তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গম কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব ঈদৃশ বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশ-সাগরে বিচরণ করিয়া, ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচর রূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রাক্‌টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃষ্টভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষযোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

(সুন্দরী)

১

কেননা হইলি তুই, যমুনার জল,

রে প্রাণ বল্লভ।

কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,

শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥

রে প্রাণ বল্লভ!

২

কেননা হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,

মোর শ্যামধন।

দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,

করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥

ওহে শ্যামধন!

৩

কেননা হইলি তুই, মলয় পবন,

ওহে ব্রজরাজ।

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,

নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥

ওহে ব্রজরাজ!

৪

কেননা হইলি তুই, কানন কুসুম,

রাধা প্রেমাধার।

না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,

চিকন গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥

মোর প্রাণাধার!

৫

কেননা হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণেশ!

৬

কেননা হইলে তুমি, চিকন বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করে, হৃদয় উপরি ॥
পীতাম্বর হরি!

৭

কেননা হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধা মনোহর ॥
শ্যামল সুন্দর!

(সুন্দর)

১

কেননা হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা কমল।
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

২

কেননা হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপন নন্দিনী!
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতেম দেহ তার, নবীন নলিনী।
যমুনা জল হংসিনী ॥

৩

কেননা হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন।
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন।
সে আমার প্রাণ ধন॥

৪

কেননা হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে, জীবন যাতন।
মেখে শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥

৫

কেননা হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতেম রাধারূপে, অন্য জন মন।
পর ভুলান কেমন?

৬

কেনমা হইনু আমি, চিকন বসন,
দেহ আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁইয়ে চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদ বদন॥

৭

কেননা হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখ রত্নাকর?

মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়।

মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই অভিলাষ যে, তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিকে অথবা এক জাতিকেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। কেবল মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হইতেছে না। যে সমস্ত গুণের সদ্ভাবে লোকে মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আবশ্যক। সেই সকল গুণ এবং উপায়প্রণালী সর্ব্বদা মনোমধ্যে চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য্য না করিয়া, কেবল মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা করা, বামনের চন্দ্রধারণের আশার ন্যায় নিষ্ফল। অতএব এই সংস্কার যে জাতির মনে বদ্ধমূল আছে, সেই জাতিই মহত্ত্বলাভ করে, এবং যত দিন এই সংস্কার অবিচলিত থাকে, তত দিনই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়; ইহার অন্যথা হইলেই পতন দশা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহৎ হইবার বাসনা লোকের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং সুশিক্ষিত যুবা পুরুষদিগের ন্যায় অনেকের মনে সেই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সেই বাসনাকে পরিণামে ফলপ্রদ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই সমস্যাটী অতি গুরুতর। ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া উঠা অনেক পরিশ্রম, বিবেচনা এবং আয়াসসাধ্য। এ বিষয়ের সম্যকরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠি, আমাদিগের তাদৃশ ক্ষমতা নাই, এবং তাহাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা মনোমধ্যে এই চিন্তাকে স্থান দান করেন, এবং ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে

মনোযোগী হইয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যোগী হন, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, এস্থানে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই কথার মীমাংসা করিবার জন্য ইতিহাসই প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে, কিম্বা এখনও যাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই প্রায় একটী সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সেই নিয়ম। দেশ কাল এবং জাতিভেদে সেই প্রবৃত্তিটী বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। কখন বা মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ, কখন বা ধর্ম্মানুরাগ, কখন বা জ্ঞানতৃষ্ণা, কখন বা বাহুবলগৌরব, কখন বা অর্জ্জনস্পৃহা, ইত্যাকার কোন না কোন একটী প্রবৃত্তি সমাজমণ্ডলীতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফলাফল সর্ব্বত্রই প্রায় এক রূপ হইয়া থাকে। সমাজের সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যত্নবান্ এবং তদর্থ জীবনসর্ব্বস্ব পরিহার করিতে পরাঙ্মুখ না থাকায়, সেই জাতির লোকদিগের মধ্যে একতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বলিয়া, সকলেরই মনে একটী স্পর্দ্ধা জন্মে, এবং সংকল্পিত কামনা সফল করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া, সকলেই কায়মনোবাক্যে তদনুকূল আচরণ করিতে থাকে, এবং অচিরাৎ এই সমস্ত গুণের সহযোগে মহত্ত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রীস্, রোম, আরব, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড ইহার উদাহরণস্থল।

গ্রীস্—প্রাচীন গ্রীকেরা জগতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাতি ছিল। কোন জাতিই আজি পর্য্যন্তও ইহাদিগের তুল্য মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন, সকল বিষয়েই ইহারা অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া, আজি পর্য্যন্তও পৃথিবীর সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়। আজকাল যে সকল ইউরোপীয় জাতিদিগের এত প্রাদুর্ভাব, তাহারাও অনেক বিষয়ে সেই গ্রীকদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাব্য, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এখনও উহাদিগের ছায়া অবলম্বন

করিয়া চলিতেছে। গ্রীকেরা এই অনুপম মহত্ত্ব অতি অল্প কালের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টের প্রায় ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং খ্রীষ্টের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা সংসারলীলা সম্বরণ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছে, সে সকল ভাবিয়া আথিনীর ধ্যান করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

গ্রীকদিগের মহানুভাবতা এবং উৎকর্ষপ্রিয়তাই এই অপূর্ব্ব উন্নতির প্রধান কারণ। উৎকর্ষজনিত আনন্দই যেন তাহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল। তাহাদিগের মন ক্ষুদ্র বিষয়ে ধাবিত হইত না এবং যখন যে বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিত, তাহারা সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন না করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনি তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তরের পরুষভাব দূর করিয়া, এরূপ কোমলাভ মূর্ত্তি এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিল যে, দুই সহস্র বৎসর গত হইল, আজিও সেই সকল প্রস্তরময়ী প্রতিমা এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, নয়ন মন বিস্ময়রসে মুগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদিগের ইতিহাস, দর্শন এবং নাটকাদি আজিও ইউরোপখণ্ডে আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজে অতি সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, এবং সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য সাম্ভোগ করাই যেন তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাও সেইরূপ মহাশয় এবং মহানুভাব ছিলেন। আলেকজণ্ডরের জড় ব্রহ্মাণ্ড জয় করিবার ইচ্ছা এবং অরিস্ততলের মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা, উভয়ই তুল্য এবং তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ে অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি আজিও অপ্রতিহত হইয়া, ভূমণ্ডলে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। যে সক্রেতিস্ জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞানবিতরণের জন্য বিষভক্ষণে অপমৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল লোকে আজিও তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। মহামতি প্লেটোর নিকট আজিও লোকে সমাদরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এবং পণ্ডিত-মণ্ডলী অক্ষয়-কীর্ত্তি অরিস্ততলের বাক্য আজিও শিরোধার্য্য করিতেছেন।

গ্রীকদিগের সাহস, বীর্য্য এবং রণনৈপুণ্যও ইহার অনুরূপ ছিল। যে দিন পারসীক সম্রাট গ্রীকদিগের পবিত্র মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া, তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন, সেই দিন অবধি উহাদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তার করিয়া উদয় হইয়াছিল। কেবল আথিনীয়েরাই দশ হাজার সৈন্য লইয়া, মারাথনক্ষেত্রে দুই লক্ষ পারসীককে পরাজয়, এবং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করে। থার্ম্মপলির যুদ্ধের কথা স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গিরিসঙ্কটে কেবল তিন শত জন স্পার্টীয় বীরপুরুষ উদ্বেল সাগরতরঙ্গ সদৃশ বিপক্ষসেনাকে সুদীর্ঘ কাল প্রতিরোধ করিয়া, সম্মুখসমরে শয়ন করে। সেই দিন হইতেই গ্রীকদিগের উন্নতি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং উহারা বল, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সভ্যতায় অদ্বিতীয় হইয়া, মাতৃভূমিকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

রোম—বাহুবলগৌরব ও অর্জ্জনস্পৃহা হইতে যে মহত্ত্বের উদয় হয়, প্রাচীন রোমকেরা, তাহারই উদাহরণ স্থল। বীরত্ব, সাহস, এবং রাজনীতি-কুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান, কোন জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোমনগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোম-নগরবাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, লাটিন জাতির বাহু-বল ও পরাক্রমে ধরাতল শঙ্কিত হইবে, ইহাই উহাদিগের মহাসঙ্কল্প ছিল। এই সঙ্কল্পের সাধন জন্য, উহারা ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া, অৰ্দ্ধ ভাগেরও অধিক বসুমতী জয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে পারথিয়া, (এক্ষণকার পারস্য এবং কাবুল,) পশ্চিমে হিস্পানী, (এক্ষণকার স্পেন এবং পর্টুগেল,) উত্তরে দানুবাঞ্চল, (এক্ষণকার জর্ম্মণ রাজ্য,) এবং আরো উত্তরে বৃটন দ্বীপ (আধুনিক ইংলণ্ড,) এবং দক্ষিণে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্যে রোমকেরা একচ্ছত্রে আধিপত্য করে। উহাদের শাসনপ্রণালী অতি পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে, এক্ষণে কত শত প্রধান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র এবং ব্যবহারজ্ঞদিগের ব্যবস্থা এক্ষণে সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে আলোচিত হয়। রোমকদিগের ঐক্য, একাগ্রতা এবং

অধ্যবসায় যে কি রূপ ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে।

আরব—আরবেরা প্রভূত ধর্ম্মানুরাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে। খ্রীঃ ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, শ্রীভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল। প্রণালীবদ্ধ সমাজের নিয়মাধীন ছিল না। পরস্পর অসম্বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল, নগর, গ্রাম কিম্বা পল্লীতে থাকিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্যদ্বারা দিনপাত করিত; কিন্তু অনেকেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিত না। বিবাদ, বিসম্বাদ এবং শ্রমশীল জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারে রত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই অসভ্য অসম্বদ্ধ মানবদিগকে মহম্মদ এক অলৌকিক ধর্ম্মসূত্রে বন্ধন করিয়া যান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে একখানি অদ্ভুত গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঐক্য এবং একাগ্রতা সংস্থাপন করেন যে, নিমেষ-কাল মধ্যে সেই অসভ্য শ্রীভ্রষ্ট আরবেরা ঘৃত সিক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া, সমস্ত বসুন্ধরাকে উদরসাৎ করে। পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য প্রায় রণ-দুর্ম্মদ আরবদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এইরূপে বহুকাল উহারা গৌরবের সহিত পৃথিবীতে একাধিপত্য করে। এখনও ইউরোপ, আশিয়া এবং আফ্রিকা-খণ্ডের বহুতর স্থানে মুসলমানদিগের নাম ও আধিপত্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহম্মদ যে কোরাণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভূমণ্ডলের কোটি২ লোককে শাসন করিতেছে। আর সকল ধর্ম্মই প্রায় অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছে; মুসলমান ধর্ম্ম এখনও সজীব আছে। পাঠকগণ, এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আরবেরা কেবল রণকুশল এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য শিল্প এবং গণিতাদির বিলক্ষণ উন্নতি হইযাছিল। ফলে কোন একটি প্রবল মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, একবার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, সমাজের শ্রীবর্দ্ধক সকল বিষয়ই আপনা হইতে উন্নত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। আরব্য ইতিহাস দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেবল বলিষ্ঠ, তেজস্বী এবং স্বাধীনতা-প্রিয় হইলেই মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব হয় না। আরবেরা আজন্ম মহা বলবান্ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল; আসুরীয় মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই বহু আয়াসেও তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই; তথাপি যত দিন মহম্মদ

ধর্ম্মসূত্রে তাহাদিগের একতা বন্ধন না করিয়াছিলেন, এবং অনন্যকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে না পারিয়াছিলেন, তত দিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ—প্রাচীনভারতনিবাসিরা যে কিরূপ উন্নত, প্রতিভান্বিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্য্যবংশের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে হেয়, অপকৃষ্ট, অপদার্থ, অক্ষম, এবং অসার হইয়াছি। তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্য মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখনও সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ও গৌরব ভাবিয়া, অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের মহত্ত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কতবার অনুসন্ধান করিয়া থাকি? ইদানীং ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাঁহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা, একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের হইতে ভারতনিবাসী আর্য্যবংশীয়েরা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং কাহাদিগের কীর্ত্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই; কিন্তু যৎসামান্য যাহা আছে, নিবিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণেরাই সেই মহত্ত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্য জনগণকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমধিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অনুপম অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পণ্ডিতকুলের বিস্ময়জনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজ বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত পূজ্য শাস্ত্রকলাপকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অনুভব করিত। এস্থলে

আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মাতৃভূমিস্নেহ এবং বাহুবলগৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রবৃত্তি তৎকালে সমাজমণ্ডলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃত্তির প্রাধান্যে তৎকালের জনসমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু; এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসিদিগের মহত্বের অদ্বিতীয় কারণ; কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণের মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কিসে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড—অর্জ্জনস্পৃহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ব হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অর্জনস্পৃহা উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পরস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত নর্ম্মাণজাতি, ইউরোপের উত্তর খণ্ড হইতে আসিয়া, এদেশের আদিমবাসী সাক্ষণদিগকে পরাজয় করিয়া তথায় বাস করে। কাল সহকারে নর্ম্মাণ এবং সাক্ষণ জাতি মিলিত হইয়া, এক্ষণকার ইংরাজদিগের উৎপত্তি হয়। সহজেই নর্ম্মাণ জাতির দুরন্ত অর্জ্জনস্পৃহা উহাদিগকে অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় এবং অনুর্ব্বর দ্বীপ। মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তথায় তাদৃশ সুলভ নহে। সুতরাং তাহার অন্বেষণে, উহাদিগকে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিরূপে সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে, প্রত্যেক ইংরাজেরই মনে আজন্ম এই চিন্তাটী বলবতী হইয়া আসিয়াছিল; এই চিন্তার অনুগামী হইয়া সকলেরই চিত্ত ক্রমশঃ এক দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সকলেরই বল, বুদ্ধি, যত্ন একপথাবলম্বী হইয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে সমধিক সাহসিক পুরুষেরা অল্পচেষ্টায় দুস্তর পারাবার অতিক্রম ও বিদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে থাকায়, সকলেরই মন ক্রমে বাণিজ্য পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অর্থোপার্জ্জনই উহাদিগের একমাত্র কাম্য এবং উপাস্য

হইয়া উঠিল। সকলেই তখন নিরতিশয় উৎসাহের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত হওয়ায়, বাণিজ্যলক্ষ্মী সদয়া হইলেন। সহিষ্ণুতা, সাহস, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল গুণ বাণিজ্যের শ্রী-বৃদ্ধিকর, তৎসমুদায় ক্রমশঃ ইংলণ্ডবাসিদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিগৌরব এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার আধিক্য হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঐকান্তিক উপাসনাই ইংলণ্ডের মহত্বের মূলীভূত কারণ। ইংলণ্ডেশ্বরীর অতুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার মধ্যে অমূল্য রত্ন স্বরূপ যে ভারতভূমি, তাহাও ঐ অর্জ্জনস্পৃহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। এইরূপে ফরাসী, জর্ম্মাণ, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, আরো বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কোন একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহার চরিতার্থতা সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়াই মনুষ্য জাতির মহত্ব লাভের একমাত্র উপায়। পুরাকালে যে যে জাতি মহত্ব লাভ করিয়াছে, সকলেই এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহাই ঘটিতেছে। কেবল বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান হইলে অথবা কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই, মনুষ্যজাতি কখন মহৎ হয় না ; এই কথাটী সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমরা মহৎ হইতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যে নিয়মে মনুষ্যজাতি মহৎ হয়, তাহা অবলম্বন না করিলে সকলই নিষ্ফল হইবে।

পরিশেষে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসিরা আর কখন মহৎ হইতে পারিবে না। ইহা কতদূর সত্য, তাহার নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে এক বার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমকদিগের কীর্ত্তিমন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা বহু কালাবধি হতশ্রী এবং হীনাবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া একটী প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া

জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক আছে, সত্য, ইহা বহু বিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম্ম প্রবল আছে। তথাপি সম্যগ্ উপযোগী একটী প্রবৃত্তি সকলের মনকে অকর্ষণ করিলে এই সমস্ত লোক যে এক সঙ্কল্পে ব্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও ইহার মধ্যে কোন একটী জাতি যে পুনরুত্থিত হইয়া সমুদায় ভারত ভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবে না, তাহার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীস অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আথিনীয়েরা গ্রীক নামের সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারত ভূমির এক্ষণকার এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্ জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক; কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

প্রথম সংখ্যা

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যে রূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হয় না।" আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু, মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন?

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা, ঝিল বিল হ্রদের যে রূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর

---

* উত্তর চরিত। বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র।

নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস্, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী বটে।

সেক্ষপীয়র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও, ইউরোপে তাঁহার সমুচিত মর্য্যাদা অল্পকাল হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত, কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য্য নাটক সকলের মর্ম্ম বুঝিতেন না। ড্রাইডেন, পোপ, জন্সন্, প্রভৃতি সকলে স্বয়ং কবি, এবং সকলেই সযত্নে সেক্ষপীয়রের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বল্টের নিজে অতি প্রধান কবি—তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সেক্ষপীয়রের কিছুই মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং তিনি অনেক নিন্দা এবং উপহাস করিয়াছিলেন। এই ইংলণ্ডীয় কবির যথার্থ মর্য্যাদা প্রথমে ইংলণ্ডে হয় নাই—শ্লেগেল এবং অন্যান্য জর্ম্মাণগণ আধুনিক সেক্ষপীয়র-পূজার সৃষ্টিকর্ত্তা।

যদি সেক্ষপীয়রের এইরূপ হইল, তবে ভবভূতিরও যে এতকাল সমুচিত মর্য্যাদা হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আমরাও যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প। কিন্তু এই সময়ে নৃসিংহ বাবু কর্ত্তৃক ইহার একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং টানি সাহেব কর্ত্তৃক একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রচার হইয়াছে, এই উপলক্ষে আমরা উত্তরচরিত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রাম কর্ত্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থুল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যানবর্ণন কার্য্যাদি সকল ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যে রূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

কেননা যাহা একবার বাল্মীকিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? ভবভূতি অথবা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন কবি ঈদৃশ শক্তিমান নহেন যে, তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন। যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যান ভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব্ব কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন্ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকাবের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বলা কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্ব লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান ভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্ব্বাসনবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবি-গুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ † বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই। ইহাতে এই নাটক অসম্পূর্ণগুণ বলিয়া বোধ হয়। কবি যদি সীতার জীবনোপযোগী পরিণাম প্রযুক্ত করিয়া নাটক

* ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে। প্রস্তাবনা

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥ সাহিত্যদর্পণে।

সমাপ্ত করিতেন, এবং অন্যান্য কয়েকটি দোষের প্রতীকার করিতেন, তাহা-হইলে বোধ হয়, এই নাটক ভারতভূমিতে অদ্বিতীয় হইত।

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠক সমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেননা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতা নির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জনমাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে? পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,————"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা, প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ। তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো, বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ ॥"*

*"এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখ ভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে; অথবা মদ (মাদকদ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

যাহার পক্ষে—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥" †

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপধান,—

আবিবাহসময়াদগৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যয়া,
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥" ॥

যার পত্নী—

"——গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ। অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ" *

তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্রপ্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণস্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিতোদ্যানমালামণ্ডিত, এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

---

†"কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদি সন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণ স্বরূপ, কর্ণের অমৃত স্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধ স্বরূপ।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

॥ "রামবাহু বিবাহের সময় হইতে কি গৃহে কি বনে, সর্ব্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।" ঐ ঐ পৃষ্ঠা।

*"ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ, ইঁহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইঁহারই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহার স্বরূপ। ঐ ঐ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

স্বরের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হয়, ইহা সকলেই জানেন, এবং আমরাও বলিয়াছি। উচ্চারণের প্রকরণভেদে, আমরা প্রেম, বাৎসল্য, শোক, সন্তাপ, আহ্লাদ, রাগ প্রভৃতি চিত্তবিকার কণ্ঠ হইতে সহজে প্রকাশ করিয়া থাকি। শব্দের রসব্যক্তি গুণের সম্প্রসারণে গীত। অতএব গীতের দ্বারা প্রেম ও শোকাদির প্রগাঢ় রূপ অভিব্যক্তি অবশ্যই সম্ভাব্য। সহজে উচ্চারিত সপ্ত স্বর সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নী, আহ্লাদ বা সুখবাচক; এবং এই সকল স্বরের কোমল ও তীব্র শোকবাচক স্বরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা স্বরের উক্ত দুই বিভাগই গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের "পিয়ানো" "হার্ম্মোনিয়ম" প্রভৃতি যন্ত্র সকলের, এবং সাধারণতঃ সঙ্গীতপ্রণালীর "মেজর" ও "মাইনর" দুইটি মাত্র শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবেচনা করিলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, এ দুই শাখার দ্বারা নানা ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। আহ্লাদবাচক শব্দে উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, সুতরাং প্রেম প্রভৃতি ভাবও প্রকাশ পায়, এবং শোক বা দুঃখবাচক শব্দে ভক্তি, নৈরাশ্য, বিরহ প্রভৃতি ব্যক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এই রূপ বিভাগ সহজসাধ্য।

গীত লিখিত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব হয় না। আমরা পদের কথা বলিতেছি না, তাহা সচরাচর লিখিত হইয়াই থাকে। স্বরও লিখিত না হইলে, গীতের স্থায়িত্ব হয় না; এবং স্থায়িত্ব না হইলে তাহার সম্যক্ অনুশীলন ও ক্রমে উৎকর্ষসাধনপক্ষে অনেক বিঘ্ন হয়। বিশেষতঃ বহুমিলনলিপি ব্যতীত সম্ভব নহে। সহজেই ইউরোপে গীত লেখার পরে

প্রায় দুইশত বৎসর হইল, বহুমিলন প্রকাশিত হয়। এবং রেমস্ কর্ত্তৃক তাহার বিধি সকল ধার্য্য হইয়াছে।

নির্জ্জনে চক্ষু মুদিয়া ভাব হৃদয়ঙ্গম করা এক ব্যক্তির সাধ্য। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যে, এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা সাধ্য নহে। দুই তিনটি স্বর এক ব্যক্তি দ্বারা এককালে উচ্চারিত হওয়া অসাধ্য। সুতরাং বহুমিলনপ্রণালীপক্ষে যন্ত্রই একমাত্র অবলম্বন। তৎপক্ষে, ইউরোপীয় "পিয়ানো" এবং "হার্ম্মোনিয়ম" চমৎকার পরিপাটী যন্ত্র। দুই বাহু সহজে প্রসারিত করিয়া, যে আয়তন গ্রহণ করিতে পারা যায়, তত্তৎ যন্ত্রের আয়তনও তাই। অতএব সুখে সমাসীন হইয়া, দুই হস্তের দশাঙ্গুলি দ্বারা তত্তদ্‌যন্ত্র হইতে স্বর সমুদ্ভূত করা যাইতে পারে। আরও, এক একটি সুরের সম্ভবস্থান এক একটি অঙ্গুলিমাত্র পরিমিত। সুতরাং এক এক সুর এক এক অঙ্গুলি দ্বারা বিনা কষ্টে ধ্বনিত হয়। প্রত্যেক যন্ত্রে তিন গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামে ১২ সুর থাকায়, কাজে কাজেই অনেক ভাবের গীত ঐ ঐ যন্ত্রে সম্পন্ন হইয়া, তাহার বহুমিলনও অল্পায়াসে সাধ্য হয়।

কবিরা আক্ষেপ করেন যে, কমলেও কণ্টক আছে। সকল আহ্লাদের বিষয়ে. এবং সকল উন্নতির সূচনায়, কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে। ইউরোপীয় যন্ত্রেও সেই রূপ। ইউরোপীয় যন্ত্রের স্বরসমুৎপাদিকা শক্তি চমৎকার, সহজেই শিখা যাইতে পারে, এবং বাজাইতেও বড় আরাম। তিন গ্রাম একবারে ধ্বনিত হয় বলিয়া, উহা বহুমিলনেরও আধার। কিন্তু ঐ সকল যন্ত্র অল্প সুরবিশিষ্ট বলিয়া, এ দেশীয় সকল গীত তাহাতে বাদিত হইতে পারে না। ঈশ্বরদত্ত, বিচিত্ররচনারমণীয় আদিযন্ত্র মনুষ্যকণ্ঠের সহিত যে২ যন্ত্রের সাদৃশ্য আছে, সেই সকল যন্ত্রেই সকল গীত বাজিতে পারে। মনুষ্যকণ্ঠের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র, এবং সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪টি সুর হয়। শাস্ত্রকারেরা এক২ সুরের চারি পাঁচ সাতটি স্ত্রী অর্থাৎ সুরাণী এবং সুরাণীদিগেরও পুত্র পৌত্র অবধারিত করিয়াছেন। এপ্রকার কল্পনাপ্রসূত সুর সমুদায় কোন বাঁধা যন্ত্রেরই আয়ত্ত হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হার্ম্মোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অভাবতঃ ২৪টি সুর রাখা উচিত। তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় যন্ত্রে কেবল ১২টি মাত্র স্বর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রীনিঃসৃত ভগ্নাঙ্গ রাগরাগিণীদিগের দশার ন্যায় হইয়া উঠে।*

আমাদের অঙ্গুলি বড় মোটা নহে। প্রত্যেক স্বরের স্থান অল্পায়ত করিয়া, তিন গ্রামে ২৪।২৪টি স্বর স্থাপিত করিলে বোধ হয়, দেশীয় গীত ধ্বনিত হইতে পারিবে। যে সকল মহাত্মা সঙ্গীত বিষয়ে এক্ষণে যত্নবান, তাঁহাদের এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মহাদেবের পিনাক, ভোলা ভূতনাথের আদি যন্ত্র—মোটে, এক ধনুকে এক তার—দুইদিকে দুই লাউ; লাউয়ের গুণেই ধ্বনি। এই ত যন্ত্র; কিন্তু হস্তকৌশলে ইহা হইতে স্বরাণী প্রকাশ হইতে পারে, কেননা বাঁধা যন্ত্র নহে,—ইচ্ছানুসারে শব্দ সমুদ্ভূত হয়। এই কারণবশতঃ আমাদের সকল বাদ্যযন্ত্রই হস্তকৌশল দ্বারা কোমল, তীব্র, স্বর, স্বরাণী এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্রকৃতপ্রকাশপূর্ব্বক দেশীয় গীতবাদনের সম্যক রূপে উপযোগী হইয়াছে।

আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল, আমাদের গীতের উপযোগী সত্য বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োগ কষ্টসাধ্য। আমাদের অনেক বাদ্যের ধ্বনি উৎকৃষ্ট বলিয়া কোন মতেই গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্রের শব্দই ইউরোপীয় যন্ত্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এজন্য এ দেশীয় হার্ম্মোনিয়ম্ প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমরা ভরসা করি, যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা আমাদের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়। যে২ বিদ্যা কেবল কল্পনাসিদ্ধ, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্বাংশেই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; গীতবিদ্যা কল্পনাসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহার অসাধারণ মনোমোহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি তাঁহাদের কল্পনা, তর্কশক্তি ও পরিশ্রমের

* কথিত আছে যে, নারদের মনে২ বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছিল যে, তিনি বড় সঙ্গীত-পটু। দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে দেখাইলেন, যে রাগ রাগিণীগণ ভগ্নহস্তপদাদি হইয়া পড়িয়া আছে। নারদ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাগরাগিণীগণ কহিল যে, "আপনি বাজাইতে জানেন না, আপনিই আমাদিগকে অঙ্গহীন করিয়াছেন।"

পরিচয় দিতেছে। এক মিলন সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত অদ্বিতীয় এবং জগৎ পূজ্য। এমন রমণীয় বিদ্যার উন্নতিপক্ষে কোন্ হিন্দু যত্নবান্ না হইবেন, এবং প্রচুর আয়াসসহকারে ইহার উন্নতিসাধন না করিবেন ?

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি দেবতা হইতে তেত্রিশকোটি দেবতা হইয়াছেন, সেই রূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্র পৌত্রাদি সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনাকুতূহলিনী। শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্র-বিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তি মাত্রেরই দেবত্ব ; পৃথিবী দেবী, আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু সকলেই দেব ; নদ নদী, দেব দেবী। দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট ; তাঁহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্ম্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাহি। একটী ব্রহ্মাণীও হইলেন। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন,—নহিলে গতি বিধি হয় কি প্রকারে —ব্রহ্মালোকে গাড়ি পাল্‌কির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থ ; আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ,—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—কামাদি মনোবৃত্তি,—এ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্র কলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ব বিষয়ে মনুষ্য প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন ? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে২ রাগিণী হইল। কেবল যে একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে “বাবু” করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন ? তাহাও হইল। তখন

রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ রাগিণীকে আকার বিশিষ্ট করা, কেবল কল্পনা মাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটি শব্দ বিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব—আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেই রূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখাবয়ব দেখিয়াই তাঁহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেই রূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্নস্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মুখকান্তিতেও শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই সেই রূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এই রূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমা স্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্ত্তির এই রূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই, প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়

স্থল। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহানুভাবতা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

দুই একটী উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে কবিরা "আবেশ" বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে; যাহা কিছু নির্ম্মল সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। সে পরমসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া, মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী; দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বর পরিধানা নানালঙ্কারভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কারসম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তার্কিকেরা বলিতে পারেন,

যে কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায়, সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলণ্ডেরা বাগ-পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে; পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন; অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে, যে সঙ্গীত-সুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক দূরমাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক ভাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডু ভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেননা উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রগিণী পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালির কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালির মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাশক্তির কারণ—সঙ্গীত-প্রিয়তা হইতেই অনেকের লাম্পট্য জন্মে।

কি প্রকারে রাগ রাগিণী মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইল, তাহা বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের পরিবারবৃদ্ধি কি প্রকারে হইল, তাহা বলি। ইহার কারণ প্রাচীন রাগে নূতন সুরসংযোগ। গোপাল নায়ক, তান সেন, ব্রজ বাওরা

প্রভৃতি ব্যুৎপন্ন মহাশয়েরা সঙ্গীতকুশল রাজগণ ও হিন্দু মুসলমান জাতীয় অন্যান্য গায়কগণ ঐ রূপ নূতন স্বরসংযোজনা দ্বারা নূতন রাগিণীর উৎপত্তি করিয়া, সঙ্গীতবিদ্যা অধিকতর সৌন্দর্য্যসম্পন্না করিয়াছেন। যথা কামদ হইতে মিঞা* কামদ, মহ্লার হইতে মিঞা মহ্লার, কানড়া হইতে দরবারি কানড়া, ভৈরবী হইতে পিলু, কাফি ইত্যাদি। টোড়ি ও কানড়ার যে কত রূপান্তর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

রাগ রাগিণীর রূপসংস্করণে শাস্ত্রকারদিগের যেমত কল্পনাশক্তির চাতুর্য্য সপ্রমাণ হইয়াছে, সেই প্রকার রাগ রাগিণীর মিশ্র লক্ষণ নিরূপণ দ্বারা তাঁহাদিগের তদ্রূপ বিচারক্ষমতার, এবং যত্ন ও পরিশ্রমের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উদাহরণ দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যথা,—

বারোঁয়া——মুলতানী এবং ভৈরবীযোগে উৎপন্ন।

বাহার——পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন।

বাগশ্রী——ইমনকানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।

দরবারি কানড়া——কানড়া এবং মহ্লার হইতে উৎপন্ন। ইত্যাদি।

অনেক রাগ রাগিণী কেবল এক অথবা দুইমাত্র সুরভেদে নূতন রূপ ধারণ করে। যথা ভীমপলাশী কেবল এক কোমল সংযোগে মুলতানী হইয়াছে।

* তান সেন মুসলমান হইলে তাঁহার মিঞা উপাধি হইয়াছিল

———

প্রথম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

উপন্যাস

নবম পরিচ্ছেদ

হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা, সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বর কৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব২ মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে, অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশাবর্ষীয়সী পর্য্যন্ত, সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল তোলাইতেছিল, কেহ ধান্য হস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী, চুলের দড়ী বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন; ছেলে মুখব্যাদান করিয়া কোমল তীব্র উভয়বিধ স্বরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কারপেট বুনিতেছিলেন, কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়ীতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদগ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাসুরায়ের পাঁচালি পড়িতেছিল। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে

স্বামির রস কৌশলের বিবরণ সখীদের কানে২ বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন। অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিল। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজ বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভৎর্সিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাক নৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ড মূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটী কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা; এসকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না, এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেই খানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত। ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী, কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এইজন্য অন্তঃপুর মধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুর বাড়ী যা!" কিন্তু এই কথা বলিতে২ সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ওমা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো?"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী; তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিতরমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত, তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দিবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুক্ত নিটোল

ললাট, বাহুযুগের মৃণালবৎ গঠন, এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণী কুলদুর্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন, ফেরন, এসকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় পেটে পাড়া, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিতলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুন্‌বে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তবে খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেই খানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে"। যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতেছিলেন, তিনি তাহারই কামনা করিলেন। দুই এক জন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসম্বাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুরটপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতী।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হাঁগা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই এক জন বয়স্যার কানে২ কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো?" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া, কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু২ যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠ মধ্যে অতি মৃদু২ নববসন্তপ্রেরিতা একা ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল এবং তৎসঙ্গে, শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিত চিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ মার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীনতাললয়স্বর পরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত, এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণ বিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

দেখ্‌বো বলে হে,—শ্রীমুখ পঙ্কজ—
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে॥
মানের দায়ে তুই মানিনী।
তাই সেজেছি বিদেশিনী॥
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে।
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে॥
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভোরে।
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে॥
যখন রাধে বোলে বাজে বাঁশী।
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি॥

তুমি যদি না চাও ফিরে।
তবে যাব সেই যমুনা তীরে ॥
ভাঙ্গব বাঁশী তেজবো প্রাণ।
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে।
বিকাইনু পদতলে ॥
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে।
পশিব যমুনার জলে ॥

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখ চাহিয়া বলিল, "গান গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আমার হাতে ঢালিয়া দাও আসিয়া, আমি জাত বৈষ্ণব নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পুর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ২ জল ফেলিবার যে স্থান, সেই খানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু২ কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া, কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুয়িতে লাগিল। ধুয়িতে২ মৃদু২, অন্যের অশ্রাব্যস্বরে, বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল,

"তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। তোমার শ্বাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ?

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শ্বাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শ্বাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন. তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদ্‌তেছেন—আহা! হাজার হোক শ্বাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পার্‌বে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়া তাকে দেখা দিয়ে এস না?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃ২ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয় ত তোমার শ্বাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শ্বাশুড়ী দেশ ছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদা কাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতেও স্বীকৃত হইল না, এবং বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখ প্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একবারে বন্ধ হইল, অল্প বয়স্কারা সকলেই একটা২ কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী, গান গায়িতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসি! একটি ঠাকুরুণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গায়িলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় হইল। সূর্য্যমুখীর চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু২ খেম্‌টা বাজাইয়া মৃদু২ গায়িতে২ গেল,

"আয় রে চাঁদের কোণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পর্‌তে দিব সোণা।

আতর দিব সিসি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা কোরে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা।

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে২ একটু২ খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা, হৌক সুন্দর, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙ্গটা বাপু বড় ফেকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল, "চুল গুলো যেন শণের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপালটা একটু উচু"—কমলা বলিল, "ঠোঁট দুখানা পুরু", হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এই রূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয়া কুৎসিতা বলিয়া প্রতিপন্না হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই, চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল, "ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাসুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তাল বোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যারপরনাই কুৎসিতা এমত নহে—তাহার গানও যারপরনাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ

বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিগে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহ রেইল পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠক খানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃ হইতে স্তনযুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিতলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুয়িল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানান্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ

দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোর বয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবা পুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশ সম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি, দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছিল। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায়, দেবীপুরের বাবুরা একবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা, ক্ষুণ্ণধনগৌরব পুনঃবর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার, হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোন সুখেরই আশা নাই। বয়স গুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়স গুণে দম্পতী প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায়, গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যান মধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া, কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার

পরলোক হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণানিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি২ সুরাভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবন-গৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে২ আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানা রূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন, মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থ বিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবী বেশ ত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন।—একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছুকাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকু দেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখ ভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বলোক-চিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদা যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁকে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনী-নিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটিমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবক্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির

গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজন প্রতি-পালিনী, ভার্য্যাভৎ'সিত জনের চিত্তবিকারবিনাশিনী,—প্রভুভীত জনের সাহস প্রদায়িনী। মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে! তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখ প্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর! তোমার সুগন্ধ দিনে২ বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোলে মেঘ গর্জ্জনবৎ ধ্বনি হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদ ভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতল-বাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্যগগন-শোভি রক্তাম্বুদ তুল্য বর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট্‌গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্‌ জগ্‌ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ্চ পুরোহিত হট্‌ওয়াটরপ্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট, মটন এবং কট্‌লেট্‌ নামক সুগন্ধি কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিতে ব'সলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার আবশ্যকীয় সংগীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতল কান্তি এক যুবা পুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্র ইঁহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সম্বাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং।

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, তোমারই অনুরোধে করিব। আর——"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসম্বাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি, সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজল নয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত২ গালি দিতে২ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর পত্র

প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি

তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম "ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিন কাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভাল বাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা—তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, তাঁহার চরিত্রের এখনও শত্রুতেও কলঙ্ক করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎ‍সনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণ বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এই জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এত কাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে; কাহার্ সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারিনা? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন; কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার্ কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান তুলিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দের স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারিনা? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা· প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনা কেন? কথা বলিলে কথা কানে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ';—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনাঃ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্য-বৈধব্য, অনাথিনীত্ব, এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন এক জন নূতন দাসী রাখিয়াছি—তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ্ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ্ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর; ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার এক খানা বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায় কচকচি ঠাকুর, মাস রস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র,—বিধবা বিবাহের সপক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটী টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা বিবাহের দিগে নয়!

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজি ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, ঠাকুরজামাইকে এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সম্বাদ ও ঠাকুরজামাইয়ের সম্বাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বা বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামির হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামির প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামির প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বিতীয় সংখ্যা

পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তর চরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি না—ইহা রূপক, কি উপরূপক,—নাটক, কি প্রকরণ, কি ব্যায়োগ কি ত্রোটক;—ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি—এ সকল তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি! মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি নির্ব্বাচনে আমরা অসমর্থ। নায়ক ললিত কি শান্ত, ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত—নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা, মুগ্ধা কি প্রৌঢ়া—কোথায় তিনি বাসকসজ্জা, কোথায় উৎকণ্ঠিতা, কোথায় বিপ্রলব্ধা, কোথায় প্রোষিত ভর্ত্তৃকা—তাঁহার হাবভাব হেলা, লীলা বিলাস বিচ্ছিত বিভ্রম বিকৃতাদি কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—তাহার বিচার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহি। কথিত আছে, ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কি না—কোন্ অঙ্কে কোন্ রস প্রধান—কোথায় কোন্ ভাব,—হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,—নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারীভাব—স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব;—কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন্ বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি—এই কবির সৃষ্টি মধ্যে কি ভাল লাগে,

কি ভাল লাগে না ; পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে আমাদিগের অনুবর্ত্তী হউন।

অঙ্কমুখে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মণায়মানা গর্ভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্র দর্শন" কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায়২ এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথা উল্লেখমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন —তখন সীতার কেবল "হোতু অজ্জউত্ত হোতু—এহি প্রেক্‌খন্ধ দাব দে চরিদং"—এই কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

অম্মহে দলন্তণবণীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেণ দেহসোগগেণ বিহ্ময়থিমিদতাদদীসমাণসোম্মসুন্দরসিরী অণাদরকৃখুড়িদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুগ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদো।"*

যখন রাম, সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন,

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহর কুন্তলৈর্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতীমুখম্। ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈরকৃতমধুরৈরম্বাংমে কুতূহলমঙ্গকৈঃ। †

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন, .

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ। অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো।

---

* আহা! আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্ল প্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহসৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর।

† "মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অনতিনিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তল, মনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণ সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাস রহিত ক্ষুদ্র২ হস্ত পদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।' নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বর্ণনার চূড়ান্ত।

রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥*

যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদা-
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্রনিদ্রামবাপ্তা ॥ +

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,

ভোধু মে কুবিস্সং জই মে প্রেক্খমাণা অত্তণো পহবিস্সং। ‡

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্ব-কৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?" মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—"স্মরামি! হন্ত স্মরামি!"—মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিত করণ ইত্যাদি। সূর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয়, আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং
রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ।
সীতা। যধাতধাহোতু দুজ্জণো অসুহংউপ্পাদেই॥

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

*"একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে উভয়কে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।" ঐ। + "যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্ তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দ্দন দায়ক আর দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।" ঐ বাবুর অনুবাদ। ‡ হৌক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।

§ সীতা। হা আর্য্য পুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।
রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।
সীতা। যাহাই হৌক না—দুর্জ্জন হইলেই মন্দ ঘটায়।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধা, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা শক্তি তদপেক্ষা হীনা নহে—বরং অনেকাংশে তাঁহার প্রাধান্য আছে। কালিদাসের বর্ণনা, তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল ; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি২ করিয়া বাছিয়া২ সুন্দর সামগ্রী গুলিন একত্রিত করেন ; সুন্দর সামগ্রী গুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল ধ্বনিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতক গুলিন সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এ জন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হয় ; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না ; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন, যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তর-চরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনা শক্তির বিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

"বচ্ছএসো কুসুমিদকঅম্বতরুতণ্ডবিদবরহিণো কিন্নামহেও গিরী, জথ, অনুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধূসরসিরী মুচ্ছন্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুণ্ণেণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরম-স্বরূপ চিত্র সৃজিত করিলেন!

---

* বৎস, এই যে পর্ব্বত, যদুপরি কুসুমিত কদম্বে ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্য পুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিশেষমাত্র ধূসরশ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন,—কাঁদিতে২ তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্ম্মুখ আসিয়া াপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, এবং সেই জন্যই ভারতে তাঁহার দেবত্বে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বগুণ বিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণ গীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ; কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষ গুলিনও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা; তাই বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন।—যথা বালিবধ। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম! গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস কৃত আত্ম পুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ। রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও দাঁতঁ কৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই,

এবং ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথাসৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা। *

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন,

সতাং কেনাপিকার্য্যেন লোকস্যারাধণং ব্রতম্
যৎপূজিতং হিতাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চমুঞ্চতা। †

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চমে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পতিমাত্র-জীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে? আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক, বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্য জাতীয়েরা বীরজাতি ছিলেন—আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা আলস্যাদির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ।

* "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা, জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপে ক্লেশ বোধ করিব না।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

† "লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ। কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।" ঐ।

তাঁহার চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন২ কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতাপবাদ শুনিয়া, ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে, বোধ হয়, যেন কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা—শব্দের বড় ঘটা, কিন্তু অন্তঃশূন্য—

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে। হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি। কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।" *

এই রূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য—কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কারদিগের যোগ্য। এইরূপস্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সকলে কি এই রূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছা গেলেন না,—মাথাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া কাতরতাশূন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পূর্ব্ববৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে

* "হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণ পবিত্রিতবসুন্ধরে হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বশিষ্ঠদেব এবং অরুন্ধতী সদৃশ প্রশংসনীয় চরিতে! হা রামময় জীবিতে! হা মহাবনবাসপ্রিয় সহচরি! হা মধুরভাষিণি! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল!"
নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

ত্যাগ করিব।” স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, “তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।” যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। “মর্ম্মাণি কৃন্তুতি” ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কটি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! রামায়ণের মূল সচরাচর পঠিত হয় না, এবং এতদংশের অনুবাদও আমরা কোথাও দেখি নাই। অতএব এই স্থল উত্তরাকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তি মাম্॥
সর্ব্বেতু শিরসাভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্নসংশয়ঃ॥
শ্রুত্বাতুবাক্যংকাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাংসমুদীতিরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাসতদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ।
বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যানিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভ লক্ষণং।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নঞ্চ পরাজিতং॥

* * * *

তেতু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়াপরিবর্জ্জিতং॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মমুখংবীক্ষ্য চ তস্য তে॥
ততোভিবাদ্যত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥
তান্‌পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততোবাক্যং জগাদহ॥
ভবতমেম সর্ব্বস্বং ভবন্তোজীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চকৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ॥
ভবন্তঃকৃত শাস্ত্রার্থাবুদ্ধ্যাচ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সংভূয়চ মদর্থোয়মন্বেষ্টব্যোনরেশ্বরাঃ॥

তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধান পরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্থতি॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রম্বোমাকুরুধ্বং মনোন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা॥
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথাজনপদস্য চ।
বর্ত্ততে ময়িবীভৎসা মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুনাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলেজাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥

*　　*　　*　　*

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ।
অয়ং তু মে মহান্বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে॥
পৌরাপবাদঃ সুমহাং স্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্ত্তিযস্যগীয়তে লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥
পতত্যেবাধমালোকান্ যাবচ্ছব্দ প্রকীর্ত্তিতে।
অকীর্ত্তিনিন্দ্যতে দেবৈঃকীর্ত্তিলোকেষু পূজ্যতে॥
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অথাহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্বা পুরুষর্ষভাঃ॥
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জ্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্ত্ব পতিতং শোকসাগরে॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকং।
সত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়াপন্তেসমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তপরে পারে বাল্মীকেস্ত মহাত্মনঃ॥
আশ্রমোদিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন।
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
নচাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যং সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥
তস্মাত্বং গচ্ছসৌমিত্রে নাত্র কার্য্যবিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরামহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে॥

শাপিতা হি ময়ায়ুয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ।
যেষাং বাক্যান্তরে ক্রুয়ুরমুনেতুং কথঞ্চন॥
অহিতানামতে নিত্যং মদভিষ্ট বিঘাতনাৎ॥
মানয়ন্তুভবন্তো মাং যদি মচ্ছাশনেস্থিতাঃ।
ইতোঙ্গনীয়তাং সীতাং কুরুধ্ব বচনং মম॥*

* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই রূপ কি আমাকে বলে?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এই রূপই বটে—সংশয় নাই।" তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্য বর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধিদ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারীককে এই কথা বলিলেন যে, শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপন পূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর", এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া যাহা বলি, তাহার অর্থানুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজা কি বলেন," ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্ক মুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজন মধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদ রূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনক-রাজার সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজন মধ্যে এবং জনপদে সুমহান

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম, ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বল-কুলসম্ভূত মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে শুদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকদের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোস্মিসংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥
তৎকিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষযামি।
(সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষণ্)

অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্ত্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত হইবে, তাবৎ সে অধম লোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি, তোমাদিগের ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম, হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতা পরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছু করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এবিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমা-প্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চমাম্।
শ্রিতাসিচন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

উত্থায়। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ অসারঃ সংসারঃ কষ্টপ্রায়ং শরীরম্ অশরণোস্মি কিংকরোমি কা গতিঃ। অথবা।

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামেচৈতন্যমাহিতম্
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্বজ্র কীলায়িতংস্থিরৈঃ।

হা অম্ব অরুন্ধতী হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ হা ভগবন পাবক হা দেব ভূতধাত্রি হা তাত জনক হা তাত হা মাতরঃ হা পরমোপকারীন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ হা প্রিয়সখ সুগ্রীব হা সৌম্য হনূমন হা সখি ত্রিজটে মুষিতাস্থ পরিভূতাস্থ রাম হতকেন অথবা কশ্চতেষামহমিদানীমাহ্বানে।

তেহি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়াগৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোহম্

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্॥
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

সীতায়াঃ পাদৌ শিরসিকৃত্বা। দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসাপাদপঙ্কজ-স্পর্শঃ

ইতি রোদিতি।*

---

* হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; যিনি গাঢ় প্রণয় বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে, মাংস বিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কাল গ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দন-বৃক্ষ ভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায়, এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ

ইহার অনেক গুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজা রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালী বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই। তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তাহা পাঠ কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তর চরিত নাটক ; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র ; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান, কাব্যের * উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্য পরম্পরায় সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন, সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে

অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবল ক্লেশের নিদান স্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এতদিনে আশ্রয় বিহীন হইলাম। এখন কি করি, (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তর কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন বিশ্বামিত্র! হা ভগবন অগ্নে! হা নিখিল ভূত ধাত্রি ভগবতি!' হা বসুন্ধরে তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবল সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও পাপ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

* আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে কাব্য বলেন না—ইতিহাস বলেন।

কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজনই তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তর চরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে, সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেম-মুগ্ধ অসারবান যুবকের কথা।
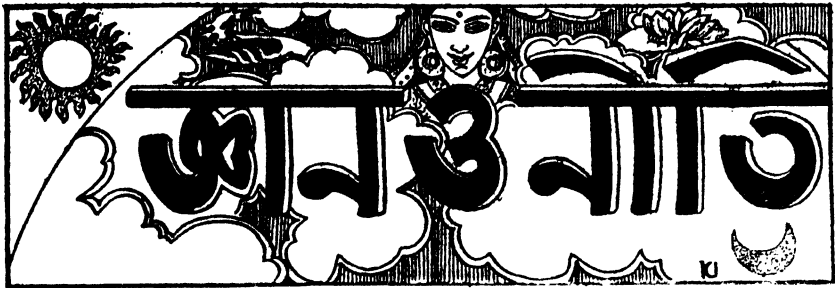
প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেকে বলেন যে, মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই।* বিজ্ঞান দিন দিন কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন নূতন কথা কহিতে পারে না। দূরবীক্ষণ সহযোগে গগনচর অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আকৃতি প্রকৃতি নির্ণীত হইতেছে, অণুবীক্ষণ সহকারে জলবিন্দুস্থিত কোটি কোটি কীটাণুগণের জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈসর্গিক নিয়ম নিরূপণ দ্বারা সমুদায় বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধ ঘটনা মালা বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বে বিজ্ঞানের যে রূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে কত বিভিন্ন হইয়াছে। গতি, আলোক, তড়িৎ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি পদার্থ নবীন ভাব ধারণ করিয়াছে; জ্যোতিষ, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে কত অভিনব সত্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অসভ্য য়িহুদী ব্যবস্থাপক মুসা যে সকল নীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন, সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসীরা তাহা অপেক্ষা কি অধিক দিতে পারেন? আর যে ভারতবর্ষকে উপধর্ম্মসঙ্কুল বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা করেন, সে ভারতবাসী মনু ও বুদ্ধ প্রাচীনকালে যেরূপ সুনীতির নিয়ম সংস্থাপন করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহারা কি জানেন? যদি মত পরিত্যাগ করিয়া চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ইদানীন্তন কালীন সভ্যজাতি-

* সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ বকল "সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

দিগকে অন্যাপেক্ষা সচ্চরিত্র বোধ হয়? যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার মদ্যপায়িতা, অর্থলোভ, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি ও স্বার্থপরতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই একথা স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের সভ্যনামগর্ব্বিত সমাজ সমূহে ভীষণমূর্ত্তি দরিদ্রতার প্রবলতা ও দীনা হীনা নিরুপায়া অবলাকুলের দুরবস্থা দেখাইয়া উন্নতপদবী-বিশিষ্ট শুভ্রকান্তি মহাত্মাগণের নৈতিক অনুন্নতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বলেন, যেখানে একদিকে কতকগুলিন লোকে অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জগতীতলস্থ সমস্ত উপাদেয় পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, আর অন্য দিকে "হা অন্ন, হা বস্ত্র" করিয়া- অসংখ্য বুদ্ধিজীবী জীবে কষ্টশ্রেষ্টে কথঞ্চিতরূপে দিনপাত করত অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হইতেছে; সেখানে কখনই সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যদেশীয়দিগের অপেক্ষা অধিক নাই।

মনুষ্যের নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে কি না এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি রূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, আমরা এই প্রস্তাবে মীমাংসা করিতে যত্ন করিব; কতদূর কৃতকার্য্য হইব, সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মনুষ্যের আদিমকালের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, অন্যূন লক্ষ বর্ষ নরজাতি অবনীমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সময়ের মধ্যে আমরা কেবল কোন কোন দেশের শেষ তিন চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র অবগত আছি। যদি এই অল্পকালের মধ্যে বিশেষ নৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে নীতিবিষয়ে লক্ষ বৎসরে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, এ প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রায় সকল দেশেই জনপ্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে লোকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক ছিল, আমাদিগের দেশীয় সত্যযুগ এবং যবন ও রোমক জাতির স্বর্ণযুগ প্রাচীনদিগের নীতিশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টান-দিগের ধর্ম্মপুস্তকেও বলে, প্রথমে মনুষ্য নিষ্পাপ ছিল, পরে শয়তানের কুহকে পড়িয়া পাতকপঙ্কে পতিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির পুরাতন গ্রন্থপাঠে প্রতীত হইতে পারে যে, কালসহকারে নরজাতির নৈতিক অবনতি হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই যে, স্বভাবতঃ পিতা মাতা এবং বৃদ্ধগণের প্রতি মানবগণের যথেষ্ট ভক্তি আছে, আপনাদিগের সমবয়স্ক চপল-স্বভাব যৌবনোন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে সচ্চরিত্র দেখিয়া

প্রাচীনদিগকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে; বিশেষতঃ সমকালীন লোকদিগকে যেমন পাপে লিপ্ত দেখিতে পায়, অতীত-কালের বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতে পূর্ব্বকালস্থ লোকেরা সেরূপ পাপে লিপ্ত ছিল, পুরাবৃত্তানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান কাল ও সমীপস্থ পদার্থের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ তাহাদিগের দোষ পদে পদে লক্ষিত হয়; কিন্তু দূরস্থ ও অজ্ঞাত বস্তুচয় আমাদিগের নিকট রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। এজন্যই আমরা পদতলস্থ শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট বিজন বন্ধুর তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করি। এজন্যই আমরা সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহ পরিহারার্থে স্মৃতিপথে বাল্যকালাভিমুখে গমন করি, এবং আশার সাহায্যে অজ্ঞেয় ভবিতব্যবর্ত্মে ধাবিত হই। এজন্যই লোকে অন্ধতমসাবৃত অলক্ষ্য অতীত প্রদেশে সত্য বা স্বর্ণযুগ বিরাজমান দেখে। এজন্যই দুঃখময় কলির অবসানে ভারতবাসীগণ পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব এবং য়িহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়িরা "মিলিনিয়ম" কল্পনা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে মনুষ্যের যে অতীব হীনাবস্থা ছিল, যাঁহারা "ডারউইন্ ও ওয়ালেস্" সাহেবের মতাবলম্বী, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।* যদি নর ও বানর উভয় জাতিই এক বংশজাত হয়, তাহা হইলে মানব কুলের যে নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানবেত্তৃপ্রিয় দিগন্তপ্রসারী মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পুরাতন জনশ্রুতি, অসভ্য জাতিদিগের বর্ত্তমানাবস্থা, এবং বিগত ত্রিসহস্র বর্ষের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে সভ্যজাতিগণ যে অপেক্ষাকৃত সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে নরবলি প্রচলিত ছিল।† পরে যখন বিবেচনা হইল যে, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" তখন

---

* ডারউইন ও ওয়ালেস উভয়েই পরিণামবাদী। ইঁহাদিগের মতে অবস্থা ভেদে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কাল সহকারে ইতর জন্তু হইতে উচ্চতর জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

† বালকাণ্ড রামায়ণ, ৬১ ও ৬২ সর্গ, শুনঃশেপের উপাখ্যান দেখ। কয়েকটী শ্লোকমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

এতস্মিন্নেব কালেতু অযোধ্যাপতি র্মহান।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥

কি আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ নীতি বিষয়ে উন্নতির পথে এক পদ অগ্রসর হন নাই? মহাভারতে প্রকটিত আছে, আদিমকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা সৎকার্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত; কোন স্বজাতীয় পুরুষে বাসনা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই নারীগণের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। পরে যখন শ্বেতকেতুর ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে সতীত্বের সৃষ্টি হইল, তখন কি আর্য্যগণ নৈতিক উন্নতিসোপানে কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধগামী হন নাই?* শক্র-

---

তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রোজহার হ।
প্রণষ্টেতু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ॥
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রণষ্টস্তব দুর্ণয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতৎনরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥

এই কালে অম্বরীষ নামে খ্যাত মহান অযোধ্যাধিপতি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের পশু ইন্দ্র হরণ করিলেন। সে পশু অপহৃত হইলে বিপ্র রাজাকে বলিলেন, "রাজন্, তোমার দুর্নীতি নিমিত্ত সংগৃহীত পশু অপহৃত হইয়াছে। হে নরেশ্বর, রক্ষাকার্য্য পরাঙ্মুখ রাজাকে দোষ সকল নষ্ট করে। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, হে পুরুষর্ষভ, হয় সেই পশুকে নতুবা মহৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কোন নরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাংকৌমারাৎসুভগেপতীন্
না ধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে সহিধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টোধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরুকুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মিংস্তুলোকে ন চিরান্মর্য্যাদেয়ংশুচিস্মিতে।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু।
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যা ভবন্মুনিঃ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থংতংনিবোধ মে॥

বিনাশের অনেক প্রশংসা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখা যায়; কিন্তু "যেমন চন্দন বৃক্ষ ছেদনকালেও ছেদনকারীকে সুগন্ধ দান করে, তেমনি সাধুব্যক্তি মরণকালেও প্রাণাপহারক অপকারকের উপকার করেন," এই মহাবাক্য যখন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইল, তখন কি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র সুনীতি বৃদ্ধি হয় নাই?

শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষংমাতরংপিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ॥
ঋষি পুত্রঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকারচৈব মর্য্যাদা মিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয় মিতি নঃ শ্রুতম্॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকং।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখবহম॥

১২২ অধ্যায়। আদিপর্ব্ব। মহাভারত।

হে সুমুখি চারুহাসিনি, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম, ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন. উত্তর মেরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি, শুন। শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন। এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধরিলেন এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন সচ্ছন্দ

প্রাচীনকালে যে সর্ব্বদেশে নরবলি প্রদত্ত হইত, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই। ফিনিসীয়া, কার্থেজ, গ্রীস্, য়িহুদী ভূমি, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি এতদ্দেশস্থ অসভ্য-জাতিদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা চলিত আছে। যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, সেখানেও এই নৃশংস ব্যাপার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। আমাদিগের অনুমান হয়, যাহারা নরবলি প্রদান করিত, তাহারা কোন না কোন সময়ে নরমাংসাশী ছিল; কারণ নরমাংস সুখাদ্য বলিয়া বোধ না হইলে কখনই দেবতাগণের সন্তোষ সাধনার্থে তাহা দিতে প্রথমে প্রবৃত্তি হইত না। এখনও অনেক অসভ্য জনপদে নরমাংস-ভক্ষণ চলিতেছে। এতদ্দেশীয় গ্রন্থনিচয়ে যে রাক্ষসদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা, বোধ হয়, এইরূপ মানবভোজী ছিল। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আদিকালে মনুষ্যগণ অন্য লোককে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া আহার করিত। এই রাক্ষস বংশে বর্ত্তমানকালস্থ সভ্য-জাতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ভাবিলেই, তাঁহারা নীতি বিষয়ে কত উন্নত হইয়াছেন, কতক দূর অনুভূত হইবে। ইহাঁদিগের যে রূপ দয়া দাক্ষিণ্য, আচার ব্যবহার, তাহাতে ইহাঁদিগকে মুক্তকণ্ঠে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিতে হয়।

অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানে না। যদি বর্ত্তমান কালীয় সভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাদৃশ দশাপন্ন এক কালে ছিলেন, এই মতটী প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনেক নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মে বলে, কোন নারীর বিষয়ে মনে মনে অসৎ ইচ্ছা করাও পাপ।

অসভ্যজাতিগণ অন্যজাতীয় লোকদিগকে শত্রুজ্ঞান করে, এবং শত্রুবধ করাকে পুণ্য ভাবে। সভ্যজাতিগণমধ্যে এই ভাব অনেক দূর তিরোহিত

বিহার করে, মনুষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে সচ্ছন্দে বিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে, আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু অন্যান্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণ হত্যার সমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনুবাদিত।

হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ অন্ততঃ মুখেও বলিবেন, “সকল মনুষ্যই পরমেশ্বরের সন্তান, আমরা সকলেই এক পিতার পুত্র, আমরা সকলেই ভ্রাতা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।” কার্য্যে যাহা হউক, এরূপ মিষ্ট কথা শুনিলেও কর্ণ জুড়ায়—এরূপ মত প্রকাশ অনেক নীতিবিষয়ক উন্নতির নিদর্শন। যথার্থপক্ষে ইহাও বলা উচিত যে, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা পরোপকারব্রতে নিয়ত ব্রতী রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ না দেখিয়া চিরজীবন মানববংশের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন।

অসভ্য জাতিগণ যাহাদিগকে আহার না করে বা মারিয়া না ফেলে, তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সভ্য জাতিও দাসত্ব অবৈধ জ্ঞান করেন নাই। আরিষ্টটল্ ও মনু দাসত্বকে নীচ জাতির স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শূদ্র, গ্রীসের “হেলট,” রোমের “গ্লাডিয়েটর,” সমাজের দাস স্বরূপ ছিল, তাহারাই উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের সেবা শুশ্রূষা করিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেণ্ট পল নামক বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক অসামান্য ধীশক্তি-প্রভাবেও দাসত্ব যে নীতিবিরুদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে অল্পদিন হইল এই নীতি বিষয়ক প্রত্যয়টী সভ্যজাতিদিগের মধ্যে জন্মিয়াছে যে. মনুষ্যকে দাস করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়; সকল লোকই সমান, সকল লোকই স্বাধীন হওয়া উচিত। মানবগণের সমানতা ও স্বাধীনতা রূপ মহাবাক্য প্রথম ফরাসিস রাজ্যবিপ্লবে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চারিত হয়। ইহা একটী নীতি শাস্ত্রের নূতন তত্ত্ব—বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের প্রকাশিত। ইহা অত্যল্পকাল মধ্যে অনেক গুলি মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার প্রতাপে আফ্রিকার দাস বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, আমেরিকা ও রুষিয়ার বহু সংখ্যক লোকে স্বাধীনতা প্রপ্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীজাতির নীচাবস্থা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, পরিণামে যে ইহা দ্বারা মনুষ্যসমাজের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে, যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা উপরে২ দেখেন, তাঁহারা নরজাতির নৈতিক উন্নতি দেখিতে পান না; তাঁহারা বলেন, প্রাচীনেরাও যে উপদেশ দিতেন, নব্যেরাও তাহাই দেন। মিথ্যা কথা কহিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা

হরণ করিবে না, পরের অপকার করিবে না, এই কথাই চিরকাল শুনা যাইতেছে ; কিন্তু যখন ঈশা বলিলেন যে, মনের সহিত ঈশ্বরকে ও লোক সকলকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্মের সার ; তখন কি জগতীতলে নূতন নীতিপুষ্প বিকশিত হইল না? যেমন জগদ্বিখ্যাত নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জড়পিণ্ড সম্বদ্ধ, তদ্রূপ ঈশা প্রকাশ করিয়াছেন যে মনুষ্য সমাজ সুখময় করিতে হইলে প্রীতিবন্ধনে সকলের বদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রীতির অর্থ অদ্যাপি লোকে ভাল বুঝিতে পারে নাই। নবাবিষ্কৃত সমানতা ও স্বাধীনতা এই প্রীতির গাঢ় ভাব দিন২ উজ্জ্বলতর করিবে ; এবং সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখ ভোগে সমান অধিকারী, এই ভাবিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন প্রীতিপূর্ণ-চিত্তে সকলের প্রিয় কার্য্য করিতে সযত্ন হইবে, তখন অবনীমণ্ডল নূতন শোভা ধারণ করিবে।

পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে।—

১। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে পরিমাণে নির্দ্দয় ও অশিষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সভ্য জাতিদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক কম।

২। অনৈতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীনদিগের যে রূপ নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জনশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নব্য সভ্য জাতিদিগের সেরূপ অহিতাচার নাই।

৩। ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটী নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া দিন২ মনুষ্য সমাজের সংস্কার করিতেছে।

অতএব বলা যাইতে পারে, মানবকুলে জ্ঞানেরও যেমন উন্নতি আছে, নীতিরও তেমনি উন্নতি আছে।

অনুষ্ঠান পত্র

ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্য্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান ; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জরমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়। তত্তদ্দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্য এক একটী পৃথক ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক হইতে আল্পস্ পর্য্যন্ত সকল জরমান জাতি, সাবয় হইতে পালারোয় পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে

হইতে মারসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিসেরা এবং কাটালন গালিসিয়ান, আণ্ডালুসিয়ান কষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্ণীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণ ভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

অথচ প্রাচীন কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ ঐ ভাষার ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডে "হাবলক দি ডেন" লিঙ্কন প্রদেশের স্থানীয় ভাষায়, "পিয়র্স প্লৌমান" হাণ্ট্‌স্‌ প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় লিখিত। বারবর এবং সর ডেবিড লিণ্ডসে উত্তর প্রদেশীয় ইংবাজি অর্থাৎ "লোলাণ্ড" স্কচে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকার যে স্থানীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধিও হয় নাই। মধ্যস্থিত সর্ব্বমান্য কোন ভাষার সহিত তুলনা না করিলে খণ্ড দেশস্থিত কোন ভাষাকে স্থানীয় ভাষা অথবা অপভ্রংশপ্রাপ্ত ভাষা বলা যায় না, এবং মধ্যস্থিত সাধারণের গ্রাহ্য কোন ভাষা "লিণ্ডসের" স্কচ, এবং লাংলাণ্ডের ষ্ট্রাফোর্ডশায়র ইংরাজি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে না।

সপ্তম হেনরির রাজ্য কালে বিদ্রোহ শান্তি হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্রের অমাত্যবর্গ মহাপ্রভাশীল ধনগুণবিশিষ্ট মহাত্মাগণ লণ্ডন মহানগরকে শোভিত করাতে সহজেই ঐ স্থানের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতভাব গ্রহণ করিয়াছিল। এবং এলিজাবেথের রাজ্যকালে অদ্বিতীয় এবং চিরস্মরণীয় কতিপয় লেখকচূড়ামণির দ্বারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হইলে ইংরাজি ভাষা স্থিরীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাষায় সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন, তাহার সহিত অপর স্থানীয় ভাষার তুলনা বিরহ জন্য, তদবধি আধুনিক ইংরাজি ভাষা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফ্রান্সে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে তদ্রাজ্যের যেরূপ ছিন্নাবস্থা, ভাষারও তদ্রূপ। উক্ত দেশে তৎকালে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সে সকল ভাষাই লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু কেল্ট এবং জরমান ভাষা মিশ্রিত প্রবেন্‌সল্‌, অর্থাৎ অক ভাষা এবং ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ অএল ভাষা প্রধান। নরমান্‌ পিকাদে এবং অপরাপর ভাষা সকলেই সমভাবাপন্ন ও সমকক্ষ হইয়া প্রচলিত হয়, এবং বড়২ লেখকেরাও আপনাপন স্থানীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত সকল ভাষার মূল দুইটী, প্রথম ফ্রেঞ্চ, দ্বিতীয় প্রবেন্সল। উত্তর প্রদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, ফ্রান্সের সীমার

বাহিরেও ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়, ইটালীয় ও জরমানির ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও এই ভাষা ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও তাহার উচ্চারণ, বর্ণবিধান, এবং ব্যাকরণের বিশুদ্ধাবস্থা হয় নাই। ১৫৫৯ অব্দে এলিয়ট এবং ১৫৮০ অব্দে মণ্টেন ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রথমে একতাবদ্ধ করেন।

১৬৩৫ অব্দে কার্দিনাল্ রিশলু ফ্রেঞ্চ একাডেমি স্থাপন পূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় সংশোধন ও একতা বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

জর্ম্মানি ফ্রান্স হইতে অধিকতর বিস্তৃত। সহজেই তদ্দেশে ভাষাভেদের আরও আধিক্য ছিল, এবং জরমানি রোমরাজ্যের অধীন না হওয়ায় একতা লাভের বিশেষ উপায়ও হয় নাই।

জরমানির প্রাচীন ভাষার অল্প মাত্রই উদাহরণ এক্ষণে পাওয়া যায়, যথা ; ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে আলফিলাসের মিসোগথিক, ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটী শব্দ ফ্রাঙ্কিস এবং কিঞ্চিৎ আলিমানিক পাওয়া যায়। অনেক দিবসাবধি এক রাজার শাসনাধীন হওয়া প্রযুক্ত ফ্রাঙ্কিস্, আলিমানিক এবং বাবেরিয়ান্ ভাষাত্রয় ক্রমে মিলিত হইয়া এক ভাষা প্রায় হইয়া, "হাইজরমান" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এবং অপর অপর ভাষা ঐরূপ মিলিত না হওয়া প্রযুক্ত "লোজরমান" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় জরমান ভাষা সকল যে প্রণালীতে ক্রমে একতাভাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে "কারল দি গ্রেট" কর্ত্তৃক বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ছিল। রাজবংশ ফ্রাঙ্কিস্ থাকা জন্য ভাষাও ফ্রাঙ্কিস্ ছিল। অটফ্রিড রেবেলসের এবং অপর অপর গ্রন্থকারের রচনা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে কতক লোজরমানে, কতক সাক্ষণে কতক ফ্রাঙ্কিসে লিখিত। অনেক কালাবধি এই মত ভাষা ভেদই প্রচলিত থাকে। কখন সাক্ষণ কবিরা, কখন স্বাবিয়ান লেখকেরা, কখন লোজরমান গ্রন্থকারেরা উন্নতিশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু নব্য হাইজরমান সাধুভাষা মহাতেজস্বী, বহুজ্ঞানাপন্ন লথর মহোদয়ের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তরাঞ্চলের লোডচ এবং ববেরিয়ার ভাষার মধ্যবর্ত্তী সাক্ষণির ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থে বহু পরিশ্রমে এবং মহাযত্ন সহকারে ভদ্র সমাজের সাধুভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করিয়া তাহা ১৫০৪ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। এই সাধুভাষা ক্রমে

স্থানীয় ভাষা সমূহকে লুপ্ত করিয়া জরমানির ভদ্র সমাজের ভাষা হইয়াছে।

ইটালীও ঐ মত নানা স্থানীয় ভাষায় পূর্ণ ছিল। এই দেশে যদিও ভদ্র সমাজে শত শত বৎসরাবধি লাটিন ভাষা ব্যবহার হইত, কিন্তু অনুমান করিতে পারা যায় যে, সাধারণ লোকে আপন আপন স্থানীয় ভাষা কখনই ত্যাগ করে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইটালীতে বিদ্যা লুপ্ত হয়, এবং পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ভাষার একতা ও উদ্দীপনা সাহিত্যাদির আলোকাভাবে ইটালী অন্ধকারপূর্ণ ছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে কিঞ্চিৎ উন্নতি আরম্ভ হইয়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইটালীর প্রভাত তারার স্বরূপ দান্তে এবং পেত্রার্কার উদয় হয়। এই কবিদ্বয়ের গভীর ও স্থায়ী গুণ সকল সমস্ত দেশ মধ্যে প্রচারিত হইলে, ইটালীয় ভাষার একতা আরম্ভ হয়, কিন্তু দেশীয় "একাডেমি" হইতে তাহার স্থায়িত্ব এবং নির্ণীতাবস্থা প্রাপ্তি হয়।

ইটালী দেশীয় সমস্ত একাডেমি মধ্যে ফ্লরেন্স নগরের একাডেমি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই সভা ১৫৪০ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এতৎকালে ইটালীয় ভাষা টস্‌কান্ নামে বিখ্যাত ছিল। টস্‌কান্ ভাষার সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই একাডেমির নিয়োগ করা হয়। ইটালির অন্যান্য নগরে বহু সংখ্যক এই প্রকার একাডেমি স্থাপিত হয়, কিন্তু ফ্লরেন্সের একাডেমি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল। এই একাডেমির কয়েক জন সভ্য মূলসভা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর এক সভা স্থাপিত করেন, তাহার নাম "একাদামি দেলা ক্রস্কা"। চালুনির মত দোব ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঐ নাম। স্বদেশে যে যে পুস্তকাদি প্রকাশ হইত, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এই সভার সভ্যদিগের কার্য্য, এবং রচনা সকলের গুণের প্রশংসা এবং দোষের নিন্দা করিয়া তাঁহারা দেশীয় লোকের বিচারশক্তির এবং রসগ্রাহিতার উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রীঃ এই সভা হইতে "বকেবলেরিয়া ডিলা ক্রুস্কা" নামক প্রথম শুদ্ধ ইউরোপীয় অভিধান প্রকাশিত হয়।

গথদিগের আক্রমণের পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেন দেশ মূর্খতান্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিয়দংশ রাজ্য আরবগণের দ্বারা শাসিত হয়, এবং অপরাপর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে সহজেই সমস্ত দেশ নানা স্থানীয় ভাষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কাষ্টিলিয়ানেরা

তাহাদের বিখ্যাত নাটকাদি লিখিতে আরম্ভ করে। উসিনা নাহারো এবং রুহো স্পেনের আদ্য বিখ্যাত নাম, কিন্তু তথাকার অসামান্য গ্রন্থকারত্রয়,—সরবন্টিস্, লোপ দে বেগা এবং কালদেরণ আর এক শতাব্দীর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৬০৩ খ্রীঃ সরবন্টিস কৃত "ডন্ কুইক্জট" প্রকাশ হয়। লোপের নাটকাদি তৎপরে, এবং কালদেরণের পুস্তকাদি তৎপরে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম চারল্স্ এবং দ্বিতীয় ফিলিপের রাজ্যকালে যে২ মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করত স্বদেশকে মহাপ্রভাসম্পন্ন এবং শোভমান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই কাষ্টিলিয়ান। কবিতা ও প্রবন্ধে স্পেন অতি বিখ্যাত, কিন্তু প্রাচীন কবিতা সকলই প্রায় কাষ্টিলিয়ান ভাষাতে প্রস্তুত। কাটালান আরাগণ বিসকে গালিসিয়া আন্দালুসিয়া বলেনসিয়া এবং স্পেনের অপরাপর প্রদেশস্থ লোকে সাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কাষ্টিলিয়ান্ স্পেনের সাধুভাষার পদে অভিষিক্ত হইয়াছে। সরবন্টিসের স্বদেশস্থ সকল লোকে দেশ সম্বন্ধে অদ্যাপি আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাষার উল্লেখে তাহা "কাষ্টালো" বলিয়া থাকে। স্পেনে, ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদৃশ এক সভা আছে, এবং তদ্দ্বারা স্পেনের সর্ব্বতোভাবে হিতসাধন হইয়াছে।

সংক্ষেপে এবং অস্পষ্টরূপে ইউরোপীয় প্রধান পঞ্চ ভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির ইতিহাস উপরে বর্ণন করা হইল। সম্প্রতি উক্ত ভাষা সকলের যে যে কারণে ক্রমে সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব বিধান হইয়াছে, তাহা লিখা যাইতেছে। এই কারণ সমূহের মধ্যে প্রধান উক্ত "একাডেমি।"

ফ্লোরেন্সের একাডেমি, এবং তদনুকরণে যে যে একাডেমি স্থাপিত হয়, তত্তৎ সভ্যেরা পেত্রার্কার গ্রন্থ সকল আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অপরাপর প্রধান কবিদিগের, অর্থাৎ দান্তে আরিয়স্তো এবং তাসোর রচনা এবং পলসি, বইয়ার্দো প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কবিদিগেরও গ্রন্থ সকল পরীক্ষিত ও সমালোচিত করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশের সাহিত্যের এবং ভদ্র সমাজের কথোপকথনের উপযুক্ত ভাষা নির্ণীত ও স্থাপিত করা সভ্যদিগের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্প ছিল। এতদভিপ্রায়জনিত প্রথা ও কর্ম্মপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে। সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যাকরণ পদ্ধতির বিচার করিতেন। যে যে

শব্দ নিয়ম সঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, সভার মতামত প্রকাশ করিতেন। এইরূপ উৎকর্ষের এক আদর্শ ধার্য্য হইলে, লেখকেরা আপন আপন গ্রন্থ সমুদয় আদর্শ সদৃশ হইয়াছে কি না, তাহার বিচার করিয়া ও নিয়মানুসারে সংশোধিত করত একাডেমির সভ্যদের বিচার জন্য অর্পিত করিতেন। সভ্যদিগের দ্বারা সংশোধিত হইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইত। এইরূপ বিচারে যদ্যপি মধ্যে মধ্যে বাগাড়ম্বর, এবং বৃথা ও কঠোর তর্কে সামান্য শুদ্ধাশুদ্ধের অনেক অলীক কল্পনা হইত, কিন্তু পরিণামে যে তদ্দ্বারা সামাজিক সাহিত্যের পরিমার্জ্জিতাবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইটালীর একাডেমি হইতে ফ্রেঞ্চ একাডেমি অধিকতর গৌরবান্বিত এবং বিখ্যাত ছিল। ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যেরা কেবল শব্দের ও সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে তৃপ্ত হয়েন নাই। তাঁহারা প্রথম উদ্যম হইতেই অভিধান এবং ব্যাকরণ সৃজনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। অভিধান সংগ্রহে, ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থকারদিগের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ কথামাত্র উদ্ধৃত, এবং অশুদ্ধ অসামাজিক এবং দূরকল্পিত ভাববোধক শব্দ সকল ত্যাগ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। ভদ্র সমাজে সাধারণ বাক্যালাপে যে যে কথা চলিত ছিল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন এবং ইতর লোকের ব্যবহৃত শব্দ সামান্য হইলেও তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে তাহাও উদ্ধৃত করিতেন। বহু পরিশ্রমে এবং যত্নে ১৬৯৪ খ্রীঃ এই অভিধান প্রকাশিত হইয়া ১৭০০ খ্রীঃ সংশোধিত হয়। সমাজে ইহার এমত মান ছিল যে, কখন কোন গ্রন্থকার তাহার অবহেলা করিতে পারেন নাই। যে সময়ে এই মত ভাষা নির্ণীত হয়, তখন পাস্কল বসুএট মালেব্রান্‌শ এবং আর্ণল্‌ড্ নামক লেখক সকল অতি পরিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহ লিখিয়া স্বদেশকে পূজ্য করিয়াছিলেন। কেবল ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচনা করিতে হইলে সামান্য লোকের উদ্যম ভঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত মহাত্মারা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও নিজ নিজ প্রভাসম্পন্ন শক্তির আশ্চর্য্য গুণে রচনা একবারে দোষশূন্য করিয়াছিলেন! তাঁহারা জানিতেন যে, যেমন বাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মাদি অলঙ্ঘ্য, সেই মত কাব্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদিরও গতি অলঙ্ঘ্য। যেমন পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মাদি মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে সুফল প্রদায়িনী হইতে পারে,

কিন্তু তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করা অনর্থক ও বিফল, সেই মত সাহিত্য রচনার এবং ব্যাকরণের নিয়মাদির গতি রোধ কাহারও সাধ্য নহে। কেহ তাহা করস্থ করিতে সক্ষম নহেন। উত্তম রচনার চিহ্ন এই যে, তাহা শুদ্ধ, অর্থবোধক এবং সহজ হইবেক। কোন গ্রন্থকার বিশেষ গদ্য লেখক আপন মাতৃ ভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাদি ভঙ্গ অথবা চিত্তাকর্ষণ জন্য নূতন কথা কিম্বা নিয়মাদি ব্যবহার করিতে কোন মতে সক্ষম নহেন।*

ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার পৃথক। ফ্রান্সে ভাষা পদ্ধতি সাধারণের ঐক্যে ও যত্নে নির্ণীত হইয়াছে, ইংলণ্ডে তাহা ক্রমে সময়ানুসারে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন চর্চ্চায় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্সে যাহা সাধারণের জ্ঞানকৃত সমবেতচেষ্টায় সম্পাদিত, ইংলণ্ডে তাহা স্বতঃসৃষ্ট। কি প্রকারে জন্মিল, তাহা হঠাৎ বোধগম্য নহে।

ফ্রান্সে এবং ইটালীতে পর্য্যটন করায় ইংরাজদিগের আপনাদিগের রূঢ় অথচ ব্যক্তিক্ষম ভাষার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন ইংরাজি কবি "চসর" নিজ কবিতাবলী সুমিষ্ট করণ জন্য অনেক ফ্রেঞ্চ শব্দ তাহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। লিলী আপন ইউফিস গ্রন্থে অপর প্রকারে ভাষাশুদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং কিয়দ্দিনের জন্য তাঁহার পুস্তক মহামান্যও হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে যথার্থ নাম, তাহা তাহাকে না দিয়া, প্রকারান্তরে প্রচুর শব্দ প্রয়োগদ্বারা সামান্য ভাবে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা, ভাষার ব্যভিচার বলিতে হইবেক। লিলীর সময়ের ভদ্র সমাজেরও কথাবার্ত্তা অশ্লীল ছিল। ইউফিসের প্রণালীদ্বারা সামাজিক ভাষার অনেক উপকার হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। ইউফিস্ ১৫৭৯ খ্রীঃ প্রকাশ হয় এবং ৫০ বৎসর পরেই গদ্য লিখিবার এ প্রকার বিশুদ্ধ নিয়ম দেখা যায় যে, তাহার তুল্য রচনা এখনও পাওয়া দুঃসাধ্য। সর ফিলিপ সিডনির "আরকেডিয়া," বেকনের সারবতী ও গভীরা রচনা, এবং হুকর ও টেলরের অসামান্য মধুরতা, ইংরাজ মাত্রেরই আদরের স্থল। ১৬৪৪ খ্রীঃ প্রকাশিত মিলটনের "আরিওপেজিটিকা" বোধ হয়, ইংরাজি গদ্যের অদ্বিতীয় আদর্শ। এই প্রবন্ধ গ্রন্থপত্রাদির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লিখিত হয়, এবং কবিবর পদ্যে যেমন আপনার অসামান্য মধুরতার

*"হালমস্ ইউরোপীয় লিটেরেচর" ৪, ২৯৩।

পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার এই গদ্য প্রবন্ধ গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য এবং সুমিষ্ট রসের পরিচয়।

পর শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুতর সুলেখক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তৎকালপ্রচলিত পদ্ধতির দোষে মনকে তাদৃশ আকর্ষণ করে না। প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর, ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জন্‌সন্ কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা, কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজি শব্দ ঐ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ধৃত করিবার জন্য পুস্তকের অভাব ছিল না। তিনি নিজ অসাধারণ বিচারশক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা অসীম পরিশ্রমে এই কঠিন ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এলিজেবেথের সময়ের লেখকদের ব্যবহৃত অনেক কঠিন লাটিন শব্দ সাধারণের বোধগম্য নহে। জন্‌সন্, তৎসমুদায় এবং অপর অপর লেখকের স্থানীয় অনেক রূঢ় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া, অভিধানে কেবল বিশুদ্ধ অর্থবোধক ইংরাজী শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অভিধান প্রকাশ মাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার "মাগ্নাচার্টা" হইয়া, পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।

জরমানদিগের ভাষার আদ্যোপান্ত জন্ম বৃত্তান্ত কলহপূর্ণ। তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার অনাবশ্যক। এক্ষণে উক্ত সকল তর্কবিতর্ক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে উচিত কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ সমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভবপর বোধ হয়। বাঙ্গালায়

এমত কোন সর্ব্বজনপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম, দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবেক, এবং পাঠ্য পুস্তকেরও এমত আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে, তাহা হইতে জন্‌সন্‌ সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালীর মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করত তদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যদি এমত সভা স্থাপিত হয় এবং তদ্দ্বারা ভাষার নির্ণয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের পরমোপকার হইবেক, সন্দেহ নাই। আর সভা স্থাপিত হইলে যে এই কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান হয়। সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে২ শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষা-প্রণালীবদ্ধক হইবেক।

ইউরোপীয় একাডেমিতে প্রায় ৫০ জন সভ্য থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু এদেশ বহু বিস্তীর্ণ এবং এ দেশে স্থানীয় ভাষাও অনেক। অতএব বঙ্গ একাডেমির শতাধিক সভ্য হইলেও হানি নাই। কলিকাতা রাজধানী, অতএব আদিসভা কলিকাতায় হওয়াই উচিত এবং ৩০ জন সভ্যের তথায় বাস করা আবশ্যক। অপর সভ্যগণ অন্যত্র নিবাসী পণ্ডিতবর্গ হইতে মনোনীত হইতে পারেন।

কলিকাতার সভ্যেরা সময়ে সময়ে একত্রিত হইবেন। অধিবেশনের জন্য একটী গৃহ অবধারিত করিলেও হানি নাই। কিন্তু প্রাচীন ফ্লরেণ্টাইনদিগের ন্যায় সভ্যগণের মধ্যে কোন এক সভ্যের বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখ-কর হইতে পারে। কলিকাতায় এপ্রকার উদ্যানের অভাব নাই। এবং বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন সাধুগণ একত্রিত হইলে অবশ্যই সকলেরই পরমাহ্লাদজনক ও শুভকর হইবেক। সুখদ বলিয়া ক্রমে সভার কার্য্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক দেশের কুশল সাধন করিতে পারে।

অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম। অথচ ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদি এবং তর্ক বিতর্ক হইবার বাধা নাই। গ্রন্থকারেরা নিজ২ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সভাতে পাঠ করিবেন এবং পণ্ডিত সমূহের পরামর্শে তাহার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবেন। এমতে সাহিত্যের ক্রমে নির্ম্মলতা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি হইবেক। সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা সভার মনোরঞ্জনও হইতে পারে। এবং প্রাচীন

কবিগণের গীত ও নব্য গীতের সমালোচন সহকারে সঙ্গীতেরও উন্নতি লাভ হইতে পারিবেক।

প্রথম উদ্যমে টাকার আবশ্যক দেখা যায় না, কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচারের আবশ্যক। ঈশ্বর প্রসাদাৎ সম্প্রতি কলিকাতায় এবং দেশাভ্যন্তরে পল্লীগ্রামেও ইহার অভাব নাই। সভার দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার এই হইবে যে, ঐক্য এবং প্রীতিবন্ধনে সকলে বাঁধা থাকিবেন, এবং একতাবলে বলিষ্ঠ হইবেন। পল্লীগ্রামস্থ পণ্ডিতেরা মফঃস্বলে কোন কথা প্রচলিত থাকিলে তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক কিনা এবং সংস্কৃত যে যে শব্দ সহজে অর্থ বোধক হইবেক, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন। বঙ্গভাষা অপার। ইহা প্রণালীবদ্ধ করা মহৎকার্য্য মনে করিলে আহ্লাদ হয়।

অধিকাংশ সভ্যগণ সহজেই বাঙ্গালী হইবেন, এবং কোন কোন হিতৈষী এবং বিজ্ঞ ইংরাজ মহোদয়গণকে গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। অনেক উৎসাহ-শালী এবং বঙ্গহিতৈষী ইংরাজ মহাত্মা আগ্রহ সহকারে এবিষয়ে উৎসাহদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভরসা হয়, সভা স্থাপন পরে ভারতবর্ষের মহামহিম গৌরবান্বিত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সভার অধিপতি পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়া সভাকে সম্মানিত করিতে পারেন।

যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীম্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীম্‌স্ সাহেব দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত প্রস্তাব যে পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকী রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি। বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক।

রাত পোহালো, ফর্‌সা হলো,
ফুট্‌লো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুট্‌লো অলিকুল॥

পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌লো দিবাকর।
সোনার বরণ, তরুণ তপন,
দেখ্‌তে মনোহর॥

হেরে আলো, চোক্‌ জুড়াল,
কোকিল করে গান।
বৌ কথা কয়, করো বিনয়,
ভাঙ্‌চে বয়ের মান॥

ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাকুচে কত কাক।
পূজ বাটীতে, জোর কাটিতে,
বাজ্‌চে যেন ঢাক॥

পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী।
ঝরয়ে নয়ন, তিত্‌য়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী॥

গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে উষার বায়॥

মাথা তুলি, মরাল গুলি,
নদীর কূলে ধায়।
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়॥

ঘোম্‌টা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বোয়ের কুল।
মাজ্জে বাসন, বাজ্জে কেমন,
তাবিজ লঙ্গ ফুল॥

পরস্পরে, মধুস্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়॥

অনেক মেয়ে, গামচা দিয়ে,
ঘসচে কোমল গা।
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা॥

উঠে কূলে, এল চুলে,
বসে সুলোচনা।
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা ॥

গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুদে কেঁড়ে ভরে।
গজ গামিনী, গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ॥

কত কুমারী, সারি সারি,
দুল্‌চে কানে দুল।
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল ॥

হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা,
মুচ্‌কে মধুর মুখ।
গোপের মনে, দুদের সনে,
উঠ্‌ছে ফেঁপে সুখ ॥

আস্তে ঝাড়ি, তুঁষের হাঁড়ি,
আগুন করে বার্।
থর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্চে চাসার সার ॥

গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে ববম্ বম্।
জটা শিরে, সন্ন্যাসীরে,
মার্চ্চে গাঁজায় দম্ ॥

পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়।
গোরু চরাতে, পাঁচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায় ॥

তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়।
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ॥

এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদুধন ॥
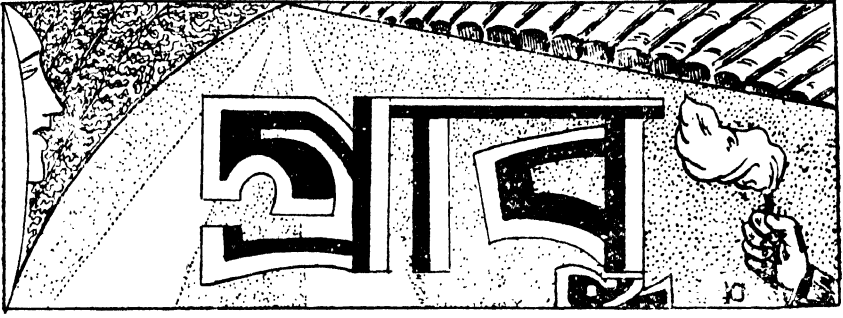
জলতলে একটি মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত হইলে, সমকেন্দ্রি বীচিচক্র খেলিতে থাকে। চক্রের পরিধি ক্রমেই আয়ত হয়, কিন্তু তরঙ্গ বেগের ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে; দূরে ক্রমে মিশাইয়া যায়। কিন্তু প্রবাস চিন্তাবেগের ভিন্ন ধর্ম্ম; পরিবারের মধ্যে থাকিলে যে সামান্য বিপদের অনুপাত একবারে গ্রাহ্যই করিতাম না, প্রবাসে দেখ, সেই অশুভ সংবাদজনিত চিন্তার বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ করিয়াছে। বাস হইতে প্রবাস যতদূর হইবে, তোমার হৃদয় কন্দরস্থ ভাবনাপিণ্ড ততই বেগে তাড়িত প্রতিতাড়িত হইয়া দুলিতে, চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ডুবিতে, ভাসিতে থাকিবে। আবার আকর্ষণী শক্তি বলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও, ভালবাসার কেন্দ্রের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, তরঙ্গের বেগ ততই বাড়িতে থাকিবে। প্রবাসে একদিন এইরূপ দুর্ভাবনায় আলোড়িত হইতেছিলাম। চাঞ্চল্য নিবারণজন্য, হে কাগজাবতার তাস! আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম। তুমি নানারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত করিয়া, আমার মনকে ভুলাইয়াছিলে। মন তখন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তান্ত্রিক পূজার জন্য মানসিক উপকরণ আহরণ করিতেছিল। কখন বা ধূপদীপ নৈবেদ্য রাশি রাশি গন্ধ পুষ্প উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত ছিল; কখন বা মনোমোহিনী প্রতিমা সম্মুখে ক্ষুদ্র দীপ মালা জ্বালনে অভিনিবিষ্ট ছিল; কখন বা বলিদান অবসানে মন সদ্যঃ নিঃসৃত শোণিত পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণে ঘোর রোল সমুত্থানকারী ঢক্কারবে প্রোৎসাহিত হইয়া সমারোহ মধ্যে ভয়ানক ভাবে নৃত্য করিতেছিল। কখন বা নিরঞ্জনান্তে আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণঘট মস্তকে ধারণ করিয়া, আবার কবে ষষ্ঠী সপ্তমী আসিবে, ভাবিতে ভাবিতে মন, মনে মনে ক্রন্দন করিতেছিল। হে কাগজাবতার!

দ্বিপঞ্চাশদবয়বি, তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তান্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিরত করিয়াছিলে। তুমি ধন্য! তুমি আমার যথার্থ উপকার করিয়াছিলে; আমি তোমার সেই উপকার স্বীকার জন্য আজ মুক্ত কলমে তোমার মহিমা বর্ণন করিব।

হে সুদৃশ্যসুচিত্রচারুচৌকোণরূপধারি! তুমি আমাকে যে মনোপূজা হইতে বিরত করিয়াছিলে, তাহারই কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য আমি তোমার গুণগান করিব। আমি সামান্য পৌত্তলিকদের ন্যায় ফল মূল গঙ্গাজল বিল্বদল "এতে গন্ধ পুষ্পে" দিয়া তোমার পূজা করি নাই। আমি মূঢ় পৌত্তলিক নহি, আমি পরম জ্ঞানীর ন্যায় নিরন্তর তোমার মহিমা ধ্যান করিয়াছি। তোমার গূঢ়তত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি কৃপালু, আমি তোমার প্রসাদে তোমার অগাধতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছি, তোমার জয় হউক। আমি তোমার মহিমা জগতে প্রকাশ করিব।

ইতি প্রস্তাবনা।

তাস খেলা এই জটিল সংসারের অতি সুন্দর অনুলিপি। প্রথম খেলা;—

খেলা এই সংসার লীলা। অনেকে বলেন যে, চতুরঙ্গ ক্রীড়া অতি উত্তম, কেননা প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্র রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল; যাহার বুদ্ধি বিদ্যা বা বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই জয় লাভ করিবে। এটি সত্য হউক মিথ্যা হউক, ঘোর অনৈসর্গিক। কোথায় দেখিয়াছেন যে, রণে হউক, বনে হউক, কর্ম্মস্থানে হউক, বিলাস ভবনে হউক, শিক্ষায় হউক, পরীক্ষায় হউক, কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জনে সমান উপকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হইল? কোন্ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন যে, দুই দল যোদ্ধা সমান উপকরণ লইয়া রণক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়াছে? জীবনে কোথায় দেখিয়াছেন, দুই জন সমযোধ সমান উপকরণ পাইয়াছে? তা হয় না। তা পায় না। বৈসম্যই জগতের নিয়ম; সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। তবে কেন খেলিবার সময় আমরা সমান উপকরণ লইয়া বসিব? কেন অপ্রাকৃতা শিক্ষা লাভে আমরা যত্নবান হইব? চতুরঙ্গ ক্রীড়া আমাদিগকে অতি ভুল শিক্ষা প্রদান করে। তাসখেলায় তাসের বৈসম্য সংস্থাপনই নিয়ম, সুতরাং তাসের একটি প্রশংসার কথা।

চতুরঙ্গের ক্রীড়ক সংখ্যা ও ক্রীড়া পদ্ধতিও অস্বাভাবিক। সংসারে মাত অথবা সাথী না থাকিলে চলে না; খেলাতেও মাত চাই। সংসারে সহায় নাই কার্? যার নাই, তার আর খেলা কি? সে কিসের সংসারী? তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহারা তোমার অতি নিকটে বাম পার্শ্বে দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহারা তোমার মাত নহে, তোমার প্রকৃত বন্ধু সম্মুখে সর্ব্বদাই আছেন; তোমার স্বার্থে তাঁহার স্বার্থ, কিন্তু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ন্যায় তিনি তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসারে, হিন্দু সংসারে পতির যে একমাত্র সহায়, দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী, ব্যথার ব্যথী, অহ্লাদে আহ্লাদিনী, বিষাদে অবসন্না, সেই সঙ্গিনী, সংসার খেলার সেই মাত, কখনই তোমার নিকট কুটুম্বিনী হইতে তোমার নিজ গোত্র হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে না। দূর বংশ হইতেই তুমি তোমার মাত পাইয়াছ।

তাস ক্রীড়ায় দেখুন, মাতের দোষে কত সময় কত ফল ভুগিতে হয়; মাতের গুণে কত সময় কত লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁথনিই এইরূপ। যদি তুমি সৌভ্রাত্রসুখ আস্বাদন করিতে চাও, তবে তোমার সহোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক কদন্ন সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার রোগ শান্তির জন্য কিছু দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া অনশনে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া কষ্ট ভোগ কর। যদি প্রণয়িনীর প্রণয় প্রার্থনা কর, তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয় পচনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে না চাও, তুমি কোন সুখই পাবে না। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। সুখ দুঃখ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায়। তুমি এ সব না চাও, আমরা তোমায় চাই না। তুমি সন্ন্যাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্য ও সাজান। তাস খেলায় কাহার্ হস্তে কি আছে, কেহ জানে না, কেহ কোন রূপ নিয়মিত সাজান উপকরণ পায় না। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি এই এই উপকরণ লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি? তুমি যদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়া দিয়া সমরক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হও, তাহা

হইলে তুমি নির্ব্বোধ। তোমাকে নিশ্চয় হারিতে হইবে। হতে পারে, তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহায্য না লইয়া, "কাহাকেও ভয় না করিয়া" এক হাতেই নিজ হাতেই ছক্কা করিতে পার ; তখন তোমার উপকরণ ভার বলিয়া দিলে কোন ক্ষতিই নাই বরং সে ত আর তখন বিলক্ষণ স্পর্দ্ধার কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এক হাতে ছক্কা করা যায়, এমন তাস কয় জন কয় বার এ সংসারে পাইতে পারে ? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্ব্বদাই গুপ্ত থাকে। পরচিত্ত অন্ধকার ; এবং ইহলোকে আমাদের পরচিত্ত লইয়াই ব্যবসায়, সুতরাং প্রধান উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে ; যে গুপ্ত অনুমান করিতে পারে, সেই বিষয়ী ; প্রকাশিত উপকরণ চালনা করিতে পারিলেই কি, না পারিলেই কি ? তবে উপকরণ কাহার্ স্থানে কি আছে, তাহা কিরূপে অনুমান করিবে ? তাস খেলায় যাহা কর, সংসারেও তাহাই কর। অথবা সংসারে যাহা করিতে হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে। এক ব্যক্তির কি উপকরণ আছে, জানিতে হইলে আমরা কি করি ? তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করি, তিনি কখন কি কার্য্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়া পর্য্যালোচনা করি, তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করি, স্মরণ করিয়া অনুমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন দুটা দশের উপর তুরুপ করিলেন না, তখন ইহাঁর স্থানে তুরুপ নিশ্চয় নাই। ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন, আর হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে ইস্কাবনের টেক্কার পরই দশ ছিল, তবে টেক্কা, এঁর স্থানেই আছে ; আমার মাতের হাতে ত নাই, থাকিলে তিনি এমন সময় ফ্রাই ভেঙ্গেও রঙ খেলিবেন কেন ? আমার দক্ষিণ-দিকের দ্বন্দ্বীর স্থানেও নাই ; থাকিলে কেন আমার সাহেবের উপর তুরুপ করিবেন। তবে টেক্কাটা এঁর স্থানেই আছে। যা সংসারে করি, ঠিক্ তাই করিলাম।

তাস খেলার কাটানও সংসারের অনুলিপি। কাটান সংসারে প্রবেশ—বা জন্ম পরিগ্রহ। এক জন্ম পরিগ্রহেই সমস্ত উপকরণ নির্ণীত হইয়াছে ; জন্মই বলুন, আর কাটানই বলুন, একবারে সম্পূর্ণ অদৃষ্ট মূলক। আপনার জন্মের উপর কাহার হাত আছে ? তুমি কেন হাজার বিদ্যাবুদ্ধি লাভ কর না, তোমার জন্মফল ভোগ তোমাকে করিতেই হইবে। কেবল জন্ম বৈগুণ্যেই দেখ, ঐ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছে। সে যদি আঢ্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে তাহাকে উদর পূর্ত্তি জন্য

চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত না। আর বিচারপতি সাহেবও তাহার শেষ বিচারের দিন তাহাকে নীচ নরাধম উপাধি দিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতেন না। তাস খেলায় এক জন কিছু না পাইয়া যদি হারিয়া যায়, তবে সে কি নীচ নরাধম? তা যদি না হয়, তবে চোর কি করিয়া হইল? তবে কি সকলেই পেটের দায়ে চোর হয়? তা কে বলিতেছে? তিনখানা তুরুপেও অনেকে যে নওলা ধরা দিতেছে। তাস খেলায় যেমন বোকা আছে—সংসারে তাহা অপেক্ষাও অধিক বোকা আছে। তবে যে পেটের দায়ে নীচ, তাহাকে যে নীচ বলে, সে আরো নীচ।

কাটান যদি জন্ম পরিগ্রহ হইল, তাহলে এখন তুরুপ কি, তা বোঝা গেল। জাতিগত বৈলক্ষণ্য জনিত প্রাধান্যই তুরুপ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ তুরুপ, এখন ইংরাজই তুরুপ; কোথাও অসভ্য জনগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তুরুপ, আবার কোথাও বৈশ্য তুরুপ। প্রাচীন কালে ড্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক, পারসী ও ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নানা স্থানে ধর্ম্ম তুরুপ ছিলেন। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ধন তুরুপ এবং বোধ হয়, কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে।

ধনীরাই রঙ্গ, আর সকলই বদ রঙ্গ। ধনীর জন্ম পরিগ্রহই জগতে প্রচারিত হইল। কাটান কি, তা জানা গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নিধ ন কে, তাও জানা গেল, বদ রঙ্গ কি, তা বোঝা গেল।

চারি রঙ্গ কি তা, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে সমাজের যে চারি ভাগ ছিল, ইহা তাহাই মাত্র। যে ইস্কাবন, সে ইস্কাবনই আছে, তবে কাটানর জন্যই ইস্কাবনের সাতাও এখন হরতনের টেক্কা অপেক্ষা অধিক বলশালী। যে শূদ্র, সে নামে এখনও শূদ্রই আছে, কেবল জন্মগুণে, সে দেখ, উচ্চ গদির উপর আসীন। সে এখন তুরুপ বলিয়াই, ঐ দেখ, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর অভিজিৎ ছত্তন ও বাল মুকুন্দ দরবৎ তাহার দুয়ারের দুয়ারী। সে এখন তুরুপ হইয়াছে—বলিয়াই আমাদের গাঙ্গুলি শিবের সন্তান ঐ পাঁচকড়ি গোমস্তা নীচে মসিপূর্ণ ছিন্নশপে বসিয়া, বাবুর গোলাল গালাল কাল কোল হাসুলি পদকপরান ছেলেটিকে কোলে করিতেছে। এখন তুরুপ হয়েছে বলিয়াই ইস্কাবনের সাত্তা হরতনের টেক্কার উপর হইল কি না? ছেলেবেলা ভাবিতাম, এরূপ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে করিল? এখনও এই সমাজের খেলার কথা ভাবি যে, এ খেলার সৃষ্টি কেন হইল? কে

করিল ? উভয়ই মনুষ্যে করিয়াছে। যখন গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছ, তখন তুরুপের বল মানিতেই হইবে। তুরুপ বেশী না পাও, বিরক্ত হইও না। যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই খেলিতে হইবে। খেলাতে কোন চুক ভুল না হইলেই হইল। আর খেলিতে না চাও, তাহলে ত কথাই নাই। আর যদি এবার বেশী তুরুপ পাইয়া থাক, তাহলে একবারে গর্ব্বিত হইও না, হয় ত সাততুরুপ হইলেও হইতে পারে। এ হাত এই হইল, আর হাত কি হইবে, তার স্থির কি আছে ? ছক্কা পঞ্জা রেখে খেলা ভেঙ্গে উঠে যেতে পার, তবেই ভাল; কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার ৪ খানা কাগজ ও এক ছক্কা এক হাতেই উঠিতে পারে! অতএব ক্রীড়ক, গর্ব্বিত হইও না। অতএব ধনি, তাস খেলা মনে করে একটু সাম্য অবলম্বন কর।

সাততুরুপ আটতুরুপে খেলে না কেন ? এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে সমতা রাখিবার চেষ্টা মাত্র। বাহ্য দর্শনে সকলেই দুই পদ দুই হস্ত, দুই চক্ষু দুই কর্ণ লইয়া—জগৎ খেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু জন্ম বৈলক্ষণ্যে এক ব্যক্তি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগত ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও নিধন—আর অপর ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান, ইহাকেই পূর্ব্ব অদৃষ্টের ফলাফল বলিতেছিলাম। আমরা ষোল-খানা পাইয়াছি, তোমরাও ষোলখানা পাইয়াছ, কিন্তু আমার ষোলখানা এমন কাগজ, তাহার প্রত্যেক খানায় যে বল ধারণ করে, তাহা তোমার সকল গুলিতে একত্রে নাই। তাসদেব একটু দয়া করিয়া নিধনের দিগে একটু মুখ তুলে চাহিয়াছেন। যদি ধনি, তুমি নিধনের-সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস বিধাতা বলিতেছেন, আমি এই নিয়ম করিলাম যে, তুমি সমস্ত ধন (তুরুপ) নিজে লইও না, অথবা তাহার সপ্ত গুণক পরিমিত ধন লইও না।—এত বৈসম্য আমরা দেখিতে পারিব না। তাস বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। সমাজ বিধাতৃগণ, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যদি সকল সময় এই রূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কতক মঙ্গল হয়; অনেক সময় সাত তুরূপে এক তুরুপে খেলিতে বসাইয়া খেলা দেখিতে থাকেন। হে ফলকাবতার! তাঁহারা তোমার অবমাননা করেন। তুমি প্রেমারা মূর্ত্তিতে তাঁহাদের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ কর। আমার প্রার্থনা পুরণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন যে, সাত তুরুপের পর পড়তা ফিরিয়া যায়। তাস খেলায় তাহা নিত্য হয় কিনা, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে, বা খণ্ড সমাজে প্রায়ই হয় না—কেননা

—শাসনকর্ত্তৃগণ অনেক সময় সাততুরুপের আইন মানিয়া চলেন না ; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এরূপ সাততুরুপ মধ্যে মধ্যেই হইয়া থাকে ও পড়তাও ফিরিয়া যায়। পুরাকালের দৃষ্টান্ত পুরাণ কথায় কাজ কি, তাতে শ্রদ্ধাই বা কে করিবে ? আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাত-তুরুপের অথবা আটতুরুপের প্রধান দৃষ্টান্ত ফরাশিস বিপর্য্যয়। এটি আট-তুরুপ, হাতের কাগজ পর্য্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ডবাসিদিগের দেশত্যাগ ও আমেরিকায় নূতন পড়তা লইয়া খেলা আরম্ভ করা। তৃতীয়, সাততুরুপে মহাজন পীড়িত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ। চতুর্থ, স্পেইনে রাজবিপ্লব ; পঞ্চম, এখন চলিতেছে ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবিগণের (Strike) অর্থাৎ এক মতে অধিক বৃত্তি প্রার্থনা করা। তাহারা এত দিন সাততুরুপে খেলিতেছিল, হারিতেও ছিল, আর তাহারা তুরুপ না পাইলে কিছুতেই খেলিতে চায় না। হে লালকাল ফোঁটা সমন্বিতপঞ্জাপতাকা চিহ্ন ধারি ! তুমিই তাহাদের মনে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছ। আমরা তোমাকে সুতরাং ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চারি রঙ্গ সমাজের পূর্ব্বকালিক চারিটি ভাগ মাত্র ; কোন্ রঙ্গটি কোন্ ভাগ ছিল ? উত্তর। হরতন, রুইতন, ইস্কাবন ও চিড়িমার এই চারিরঙ্গ। ইহাদিগকে ইংরাজিতে (Heart) বা হৃদয়, (Diamond) বা হীরক, (Spade) বা কৃষিযন্ত্র ও (Club or Dagger) যুদ্ধাস্ত্র কহে। ভারতবর্ষের জনগণের এখন যেরূপ ভাগ, এও ঠিক তাই। এখনকার ভাগ ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লইয়া নহে। এখন শূদ্রেরা একটু উন্নতি পদবী প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ক্রীতদাস নহে। কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে এখন কেহই নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কতক কৃষিজীবী, তাহারা শূদ্রভাবাপন্ন। কতক কুসিদজীবী বা আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ী। ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি রাওজি, পশ্চিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া, আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া, এবং বঙ্গে বণিক। তাসের ভাগ দেখুন। যে পরের হৃদয়ের উপর, বিশ্বাসের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে কি ? সে ধর্ম্মযাজক বা ব্রাহ্মণ, তিনি হরতন। যে হীরা মণিমুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে, সে কি ? সে জহুরি বা বণিক্, বৈশ্য বা ধনী ; তিনি রুইতন। কৃষিযন্ত্রই যার জীবনের এক মাত্র উপায় বা চিহ্ন, সে কৃষি, শূদ্রই বলুন বা

বৈশ্যই বলুন, তিনি ইস্কাবন। আর গদা বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন, তা কে না জানে। সুতরাং তাসের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিরূপ মাত্র।

চারি রঙ্গ যদি এইরূপই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি? সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। কিন্তু কোন্‌টি কি, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সংসারে আমরা প্রাধান্য স্বীকার দুই ভাবে করিয়া থাকি। একজন প্রভুত্ব করে, আমরা সেই প্রভুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই বলিয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করি। আর কতকগুলি লোককে আমরা মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম গৌরব আদর ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকি। তাস খেলাতেও এইরূপ দুই প্রকার প্রাধান্য গণনা আছে। এক ফোঁটা গণনা আর এক উপর্য্যুপরি গণনা। দওলা তিন খানা তাসের পর বটে কিন্তু ইহার মর্য্যাদা বিস্তর। মর্য্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত, কেবল টেক্কার নীচে মাত্র। সাহেব গণনায় টেক্কার নীচে বটে, কিন্তু তেমন আদর নাই, ফোঁটা গণনায় তিন ফোঁটা মাত্র। কেন এমন হয়, তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি যে, সাত্তা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। সাত্তা হইতে টেক্কার ক্রমে বয়োধিক্য জনিতই একের উপর অন্যের সংস্থান বুঝিতে হইবে। সাত্তা অবিবাহিতা কন্যা।

আট্টা তাই; তবে বয়োধিক্য বশতঃ সাত্তার উপর বটে। হিন্দু পরিবার মধ্যে ইহাদিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া নারী জাতির উপর আমাদিগের সাম্য দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদান করেন।

বচনের শেষ ভাগটি এই—

কন্যাপ্যেব পালনীয়া
শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

কন্যাকেও পালন করিবে, অতি যত্নে শিক্ষা দিবে।

মহাত্মা মনুর অবমাননা হয়, এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত হইতেছে না। তবে তাঁহার বচনোদ্ধৃত কারকদিগের দোষ তাঁহাকে শিরে ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মে না পতিত হই, এমন করিয়া বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের তুলনা করিলে আর অবমাননা কি হইল? বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মত্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাটীতে

কখন শূদ্র ভোজন দেখিয়াছেন ? মনে করুন, গৃহস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দালানে দণ্ডায়মান, শ্রীবিষ্ণু, দালানের থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ভৃত্যে তাঁহাকে পাখা করিতেছে, বেলা সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর ; পল্লীর নবশাখগণ নূতন ঘাসছোলা তিন বার গোবর দেওয়া প্রাঙ্গণে উঁচু হইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর। বাঁড়ুয্যে মহাশয় পরিবেশকদিগকে বলিলেন, "ওহে শূদ্রদেরও লাউচিংড়ি আর বঁদে দিও।" এই হল কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ, সুতরাং সাত্তা আট্টার কি ক্ষমতা থাকিবে ?

নওলা। অবিবাহিত বালক ; অবশ্য অনুজা ভগিনীদিগের উপর ইহার প্রভুত্ব আছে। আর যখন বড় মানুষের ছেলে অর্থাৎ তুরুপ হয়, তখন তার কথা পরে বলিব।

দওলা। নবোঢ়া বধূ। বাড়ীর কনে বৌ। এঁর গৌরব কেবল দ্বিতীয় গণিত। আহা ! বঙ্গ পরিবার মধ্যে নবোঢ়া বধূর আদর দেখিলে কাহার্ না কনে হতে ইচ্ছা করে ? বৌমা সর্ব্বদা অলঙ্কারে ভূষিতা, ভাল সাটী পরিহিতা, ধনী গৃহে দাসীমণ্ডলীপরিবেষ্টিতা,—কাঙ্গালির গৃহে নিভৃতদেশে গুণ্ঠনাবৃতা স্থিতা। কিন্তু লোক যে অবস্থারই হউক না কেন, বৌয়ের আদর কত ; পুতের বৌ, তিনি কোলে কোলে ফিরিতেছেন। যদি কর্ত্তার ভোজন হইল, তবে এখন বৌমার খাবার কি ? বৌকে খাওয়ালে, বৌকে শোয়ালে শাশুড়ীর, পরিবারের কতই আনন্দ। "বাছা পরের মেয়েকে আপনার করিতে হইবে।" আহা বঙ্গাঙ্গনাগণ, কেন তোমরা চিরকালই কনে বৌ থাক না ? আহা দওলার গৌরব, কত গৌরব।

গোলাম। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। গোলামকে ইংরাজিতে Slave এবং Knave উভয় উপাধি প্রদান করে, Slave শব্দে গোলাম, Knave শব্দে পাজি, সেই জন্য গোলামের আর একটি নাম পাজিও বলা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। বাস্তবিক ধূর্ত্ততা গণনা করিয়া ইহার স্থানাবধারণ হইয়াছে। সে কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে ; এক্ষণে সাধারণতঃ গোলাম পুরুষ বলিয়া গৌরবে এক ফোঁটা মাত্র, জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি তাসের উপর। বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন গুণ নাই, তবে পেজোমি পূর্ণ। সে গুণের কি ফল ফলে, পরে দেখিবেন।

বিবি। প্রৌঢ়া বঙ্গ মহিলা। বাড়ীর বড় বৌ। যখন কনে বৌ, তখন ইহার গৌরব দশ ফোঁটা ছিল, এখন দুই ফোঁটা মাত্র। বাড়ীর গৃহিণী—

বয়সে তৃতীয়া, তিনি সর্ব্বদাই বঙ্গ সংসার লইয়া ব্যস্ত, কে তাঁহাকে আদর করিবে। তাঁর সময়ে আহার হয় না, রাত্রিতে শোবার অবকাশ নাই, দিবসে কথার অবকাশ নাই, কর্ত্রী বটেন, কিন্তু দাসী। যাহাকে সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইল, সে সকলের দাসী বই আর কি বলিব? তবে তিনি ধনশালীর বনিতা হইলে তাঁহার কোন বিশেষ গৌরব কখন কখন হয়, কিন্তু সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণত তিনি বঙ্গ মহিলা, কর্ত্রী, গৌরবে কেবল পাজি হইতে অর্থাৎ গোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক।

সাহেব। বঙ্গীয় কৃতী পুরুষ। তাহাতেই ইহার নাম সাহেব। সাহেবেরাই কৃতি। ইনি কর্ত্রীর অগ্রে ভোজন করিতে পান, কিন্তু কনে বৌ দওলার পরে। "এই যে বৌমাকে খাওয়াইয়া আসিয়া তোমাকে ভাত দি।" সাহেব ছয় তাসের উপর, কিন্তু গণনে তিন ফোঁটা।

টেক্কা। বাড়ীর কর্ত্তা। সাধারণতঃ ইহার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব সকলি অধিক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি, আদরে কনে বৌকেও ইহার পরে গণনা করিতে হয়। প্রভুত্বে কৃতী সাহেবকেও ইহার অধীনে থাকিতে হয়। ইনি টেক্কা, ইহার চিহ্ন এক। কর্ত্তা কি একজন ভিন্ন দুইজন হয়? গণনায় ইনি একাদশ। এক পাজির এগার গুণ।

তবে তুরুপের সময় এমন বিপর্য্যস্ত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। সে হইতেছে নাকি ধনীদের কথা, সাধারণ নিয়ম হইতে একটু বিপর্য্যস্ত হইবে বই কি? যে ধনী অথচ পাজী, পৃথিবীতে সেই বড় লোক। সেই রঙ্গের গোলাম। সেই কর্ত্তা, সেই কৃতী, কিন্তু অথচ পাজি বলিয়া সে কৃতী হইতে কত গুণ; কর্ত্তা হইতে কত গুণ অধিক। গোলাম গৌরবে টেক্কার প্রায় দ্বিগুণ, প্রভুত্বে কর্ত্তার উপরে স্থিত। অমুক মুখুর্য্যে বড় লোক কেন জানেন? তিনি ধনী আর পাজি। তাঁর মত ধনীও বিস্তর আছে, পাজিও বিস্তর আছে, কিন্তু তাঁর এত প্রশংসা কিসে! না তিনি ধনী পাজি। রঙ্গের গোলাম। বাপ রে! তাহাতেই রঙ্গের নওলা দ্বিতীয় তাস। বড় মানুষের ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক, কাজেই উদ্ধতস্বভাব; প্রভূত বিক্রমশালী ও সমধিক গৌরবান্বিত। গৌরবেও দ্বিতীয়, প্রভুত্বেও দ্বিতীয়। বায়রণ ছেলেবেলা কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের নামপত্রে লিখিত ছিল, "এই কাব্য লর্ড বায়রণ নামক কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বিরচিত"। সমালোচক ব্রুম সাহেব এই কথার উপর নানা উপহাস

করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? নাবালকের লেখা বলে? না লর্ডের লেখা বলে? না—নাবালক লর্ডের লেখা বলে? আমরা উত্তর দিতেছি। নাবালক লর্ডের লেখা বলে। একজন নওলা শ্রেণীর লোকের লেখা বলে। সংসারে সকলেই যাহা করে, বায়রণের গ্রন্থ-প্রকাশক তাহাই করিয়াছিলেন মাত্র, ব্রুমের এতটা উপহাস করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা তাসভক্ত লোক, নওলার নিন্দা আমাদের সহ্য হইবে কেন? ঐ যে অমুক কুমার বড় ঘোড় সওয়ার হইয়াছেন, ইহার অর্থ কি? অর্থ যে তিনি বড় মানুষের ছেলে ঘোড়ায় চড়েন আর দুধারি লোককে চাবুক মারেন, কেননা তিনি বড় মানুষের ছেলে সুতরাং উদ্ধতস্বভাবান্বিত। তিনি একজন নওলা। ছোট বাবুর আদরের কথা সকলেই জানে। ছোট বাবুর দৌরাত্ম্য উপদ্রব সকলি অধিক, সুতরাং নওলা গৌরবে ও প্রভুত্বে কেবল পাঞ্জি গোলামের অপেক্ষা কিঞ্চিত ন্যূন মাত্র।

এক্ষণে তাস খেলায় আরো একটি অতি সুমহৎ উপদেশ পাওয়া যায়। তাস খেলায় বিন্তি আছে, পঞ্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তুক আছে। তিন খানা তাস একত্র হইলে এক কুড়ির কার্য্য করে, পাঁচ খানা একত্র হইলে একবারকার খেলায় জয় হয় ও খেলা শেষ হয়। তোমরা দুই কোটি প্রজায় আর্ত্তনাদ করিলে কি রাজার এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইবে না, তা কখনই নহে। একতাই উন্নতির মূল, একতাই সমাজের বন্ধন, একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি। একজন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার নওলা ও দুই জন বঙ্গকুমারী সাত্তা আট্টা একত্র মিলিত হইলে, কর্ত্তা কর্ত্রী ও কৃতীর সহিত তুল্য বল ধারণ করে। একতা এই রূপ পদার্থ বটে, যে তিন তাসের কিছু মাত্র গৌরব নাই, একত্র হইয়াছে বলিয়া তাহারা এখন গৌরবে প্রধান তাসের সমকক্ষ হইল। বঙ্গবাসীগণ তাস, খেলিবার সময় যখন বিন্তি বলিয়া ডাকিবে, তখন একবার তোমার ভ্রাতার সহিত যে মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিও। যদি গোঁড়া হিন্দু হও, তবে একবার আধুনিক নব্য সম্প্রদায়কে—নব্য বলিয়া, ব্রাহ্ম বলিয়া, কৃশ্চান বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া,—অভক্ষ্য ভোজী জানিয়া, যে আধুনিক হিন্দুয়ানির সারময়ী ঘৃণা প্রদর্শন কর, তাহা একবার স্মরণ করিও। নব্য ভ্রাতৃগণ, আপনারাও একবার বিদ্যাবত্তার সারতত্ত্ব ভূত যে অপূর্ব্ব বিদ্বেষ

ভাবটি বুড়ো বোকা পৌত্তলিকদের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহা একবার স্মরণ করিবেন। তাহা হইলেই তাসাবতারের কার্য্য সিদ্ধ, আর আমি এই অবতারের অদ্বৈত প্রভু অভিষেক কর্ত্তা যোহন, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

ইস্তকও একতার গুণের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এবার দম্পতি মিলন। ধনবান কৃতী যদি ধনশালিনী কর্ত্রীর সহিত একযোগ হয়েন, তাহা হইলে সাধারণের তিন জনের মিলনের ন্যায় গৌরবান্বিত হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র কি? সাধারণের দম্পতি মিলনের গৌরব কি? সে ত হতেই হবে। যাহাদের মধ্যে সচরাচর হয় না, তাহাদের মধ্যে হলেই না গৌরব? আমাদের যুগল রূপ দেখিয়া কে তৃপ্ত হইবে? তবে দম্পতি প্রণয়ের কথা? সমাজ বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গসমাজ কবে দম্পতি প্রণয়ের গৌরব করিয়াছে? সে তোমার ঘরের কথা। তুমি তাহাতে সুখী হও, আমরা সমাজ, তাহার জন্য কিছুই করিতে পারি না—তবে বড়মানুষের স্ত্রীপুরুষের মিল। হাঁ, গৌরব করা উচিত বটে। ইস্তকে এক কুড়ি দেওয়া গেল।

যেমন শ্রেণীবদ্ধ পাঁচজনের মিলে এক শত হয়, তেমনি চারিবর্ণের এক রূপ লোক একত্রিত হইলে সেই শত গৌরব পায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণের এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্রিত হইলে যে গৌরবের কথা হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তবে চারি জন কনে বৌয়ে, নবোঢ়া বধূ একত্রিত হইয়া কি করিতে পারে? তাহাদের আপনাদের যে চল্লিশ সংখ্যার গৌরব আছে, তাঁহারা যদি নিজ কুলে থাকিয়া যান, তবেই সে কুলের গৌরবের বৃদ্ধি করিলেন। নতুবা তোমার কুল ভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছে, খেলার শেষ গণনায় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরই গৌরব বাড়িল।

সেইরূপ চারিজন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক বা বালিকা একত্র হইয়া কি করিতে পারিবে? এই জন্য চারি সাত্তায়, চারি আট্টায়, চারি নওলায়, চারি দশে শ হয় না।

হাতের পাঁচ। কোন সংগ্রামে যে পক্ষ শেষ যুদ্ধে জয়ী হয়, তাহার কিছু অতিরিক্ত গৌরব করিতেই হয়। শেষ জয়ের সুখ্যাতির নামই হাতের পাঁচ। কিন্তু যেমন খেলায় নির্ব্বোধ আছে, তেমনি সংসারে তদপেক্ষাও নির্ব্বোধ আছে। সংসারে কৃপণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল

হাতের পাঁচ রাখিবার জন্যই যাবজ্জীবন ব্যস্ত, কিন্তু হাতের পাঁচ রাখিলেন, অথচ গুণিয়া দেখেন যে দুকুড়ি সাত নাই। আগে খেলা রাখ, তার পর হাতের পাঁচের চেষ্টা কর। তা না করিলে তুমি বড় নির্ব্বোধ।

যে হাতের পাঁচ রাখিয়াছে, শেষ রক্ষা করিয়াছে, অথচ খেলা আছে, সে পর হাতে কাগজ তাসিবে। শেষ যুদ্ধে আমি জয়ী। এক্ষণে আমি যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছি, তোমাকে আসিয়া সেই খানে লড়াই দিতে হইবে। গত বৎসর তোমায় আমায় ভিন্ন২ রূপে কারবার করিয়া তোমার চৈত্র মাসের শেষে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে বৈশাখের প্রথমে তোমার দর লইয়াই আমাকে কারবার করিতে হইতেছে। অর্থাৎ তোমার হাতের পাঁচ ছিল, তুমিই কাগজ দিলে। তুমি কাগজ দিয়াছ, তোমার কতগুলি সুবিধা; এখন তোমায় আমায় যদি দুই জনে এক রকমের বিন্তি পঞ্চাশ ডাকি, তাহা হইলে আমার গৌরব অধিক হইবে। বাস্তবিক মধ্যস্থ হইতে হইলে এইরূপ বিচার করাই উচিত।

আর কুড়ি খানি কাগজের কথা বাকি আছে। এগুলি সামান্য ত গৌরবচিহ্ন মাত্র। যতদিন তুমি গৌরবের পাতসাই পঞ্জা উড়াতে না পারিলে, তত দিন তোমার গৌরব ঢাকা থাকাই বিধেয়। অর্থাৎ চারি খানা পর্য্যন্ত কাগজ উপুড় করিয়া ধরিও। সংসারের একটী রীতিই এই যে, তুমি চারিবার অনেক কষ্ট করিয়া যে খ্যাতিপত্তিটুকু সঞ্চয় করিলে, তোমার এক বার খেলা না হওয়াতে তাহা তৎক্ষণাৎ লীন হইয়া গেল। তবে যদি তুমি একবার পঞ্জা জাহির করিয়া থাক, তাহা হইলে পাঁচ হাত অন্ততঃ না গেলে তুমি আর একবারে হীনগৌরব হইবে না। পাঁচ হাত নহিলে পঞ্জা উঠে না। ছক্কা বড় বাড়। পঞ্জার উপর এক ফোঁটা। হুতোম যাঁহাদিগকে সহরের হঠাৎ অবতার বলেন, তাহাদেরই চিহ্ন এই তাসের ছক্কা। তাঁহারা ভোগাইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিয়া যান। ধূমকেতুর ন্যায় গগনপথে উদিত হইল; শিখায় গগনের একদেশ উজ্জ্বলীকৃত হইল; কত লোকের মনে কত অশুভ ভাবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল। কিন্তু কত কাল যে স্থায়ী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? যখন গেল, হঠাৎ চলিয়া গেল। এই জন্য ভাল খেলওয়াড়ে ছক্কা করিবার বড় আস্থা প্রদর্শন করে না। খেলা ত পঞ্জা, ছক্কা কেবল বৃথা জাঁকজমক মাত্র।

তাস খেলা যে সংসারের অবিকল প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক প্রকার দেখাইলাম। কিন্তু অতি গূঢ় কথা এখনও বলি নাই। সংসারে অতি গূঢ় বিদ্যা কি? জুয়াচুরি। তিনি বড় পাকা লোক বলিলে কি বুঝায়, যে তিনি এক জন জুয়াচোর। তোমার হাতে কিছু মাত্র তাস নাই, কিন্তু তুমি এমনি মুখভঙ্গী করিতেছ যে সকলেই মনে করিল, তুমি একজন আঢ্য লোক। তুমি তাসে পাকা খেলোয়াড় হইলে, সংসারে তুমি পাকা লোক হইলে। যখন "খেলার গুরু কেননাই" আমরা বলি, তখন যেন মনে থাকে, যে তিনিই এই লোকযাত্রার গুরু। তবে তাস খেলার সময় আমরা স্বীকার করি, ভবের খেলাতে স্বীকার করাটা বড় প্রথা নয়।

সকল কথাই বলা হইল। এখন হে তাস দেব! তোমার বাওয়ান্নপীঠ মূর্ত্তিতে একবার আবির্ভূত হও। হইয়া তোমার ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তি আমার ঊনপঞ্চাশ অবয়বে ভর কর; আর তোমার প্রধান তিন মূর্ত্তি আমার লেখনী মসী ও কাগজে আশ্রয় কর, আমি এক বার,—

"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।"

সাত্তা আট্টা কুমারীগণ। তোমাদের গৌরব কি, এতক্ষণে বুঝিতে পারিলে ত?

নওলা ভাই! যদি তুরুপের হও ত মনে করিও যে বিপক্ষের গোলামে তোমাকে লইয়া যাইতে পারে।

দওলা ভগিনী! কুলে থাকিলেই কুলের গৌরব; কিন্তু বাঙ্গালায় যত দিন কনে থাকিবে, তত দিনই তোমাদের সুখের দিন, অতএব শীঘ্র ঘোমটা খুলিও না।

অহে গোলাম! অদৃষ্টক্রমে এবার তুরুপের হয়েছ, মনে থাকে যেন, বদ রঙ্গের বেলা তোমার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা কম।

বিবি সাহেব! কর্ত্রী! ও কৃতি!—তোমাদিগকে আমার আর কিছু বলিতে হইবে না! কিন্তু ধনি! ও ধনশালিনি, যেন ইস্তকটা কি, তাহা মনে থাকে।

টেক্কা কর্ত্তা মহাশয়! বদ রঙ্গের সময় আপনাকে রঙ্গের সাত্তা দলন করে বলে আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। ফিরে হাতে কি হয়, দেখিবেন?

ভাই খেলওয়াড়গণ, তুরুপ পাইবার সময় যেন সাত তুরুপ মনে থাকে, আর হাতের পাঁচ রাখিতে গিয়া যেন খেলা খোয়াইও না। মহাপ্রভু তাস! যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুরু, কিন্তু তুমি ভাবাবতার; তোমাকে নমস্কার করি।

অনেক কবি, দার্শনিক, এবং অন্যান্য মহাত্মাগণ "সুখ কি?" এতদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে রসিকতা প্রকাশ করাতেই মনুষ্যের সুখ। নচেৎ রসিকতা করিবার জন্য লোকে এত অস্থির হইবে কেন? ধনের চেষ্টায় সকলেই ব্যস্ত বটে, কিন্তু আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, রসিক বলিয়া নাম কিনিবার জন্য লোকে যেমন উদ্যোগী, ধনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য কেহ তত নহে। অনেকেই স্বীকার করে, "আমি নির্ধন।" "আমি গরীব—আমি দিতে কোথায় পাইব?"—"আমি কাঙ্গাল, আমার উপর এ দৌরাত্ম্য করিও না," এই রূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাওয়া যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে কাহার কাছে স্বীকার করিয়াছে যে "মহাশয় আমি অরসিক?" কে কোথায় কবে বলিয়াছেন, মহাশয়, আমি অরসিক, আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবেন না,—কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে, আমার কথায় রস নাই—আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না? কে না উপযুক্ত লোক দেখিলেই আপনার রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়? কেহ কাহার্ সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার ঐশ্বর্য্যের বা বিদ্যাবত্তার, বা যশস্বিতার বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।

অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। "তামাসা ঠাট্টা" "ইয়ারকি" "রং" "মজা" ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে।

সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ লোকের কাছে, বা শোকদুঃখাদির সময়ে, বা বিষয় কর্ম্মের সময়ে, অনেক বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। সুসময়ে, অসময়ে; সৎকথায়, কুকথায়; যেখানে সেখানে; যখন তখন, রসিকতা করা আজি কালি কতকগুলিন লেখকের ব্যবসায়।

এমত বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে যে, পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শ মাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিকাংশ সাপ্তাহিক লেখক এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

অপর সম্প্রদায়ে অন্য কাজ নাই; কেবল প্রাণপণে রসিকতা করাই কাজ। প্রথম সম্প্রদায় কৃষ্ণযাত্রার মুনি গোঁসাই, দ্বিতীয় বাসদেব। এক সম্প্রদায় শ্বেতশ্মশ্রু, জটা এবং বিজ্ঞতা লইয়া ব্যস্ত, রসিকতায় বড় বিরক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় সম্প্রদায় তাহা মানে না; নিয়ত রসিকতা করিবার জন্য অস্থির, সুতরাং মুনি গোঁসায়ের বিজ্ঞতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। বাসদেবদিগের রসিকতা সকল সময়ে সরস হয় না,—না হউক—রসিকতা করিতে হইবে। রচনা সরস হউক বা নীরস হউক—তাহাতে কেহ হাসুক বা না হাসুক—তাঁহারা রসিকতা করিবেন। রসিকতার কথার অনুরোধে সত্যকে মিথ্যা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; নিন্দনীয়কে পূজা করিতে হয়, বা পূজ্যকে নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই; রসিকতার স্রোতঃ না মন্দ পড়ে। পূর্ব্বে এ শ্রেণীর লেখক এদেশে সচরাচর দেখা যাইত না। পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার দলে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল। কুক্ষণে হুতমপেঁচার নক্‌সা এদেশে প্রচার হইল। সেই পর্য্যন্ত এই লেখকগুলির রসিকতায় দেশ প্লাবিত হইতেছে।

রসিকতা, বাচনিক হউক বা লিখিত হউক, সর্ব্বত্র সমান প্রকৃতি দেখা যায়। প্রচলিত রসিকতা নানা প্রকার।

প্রথম, প্রাচীন রসিকতা। কেহ কাহাকে সম্বন্ধ নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই আপনাকে রসিকতায় পারদর্শী বিবেচনা করেন। এই প্রকার রসিকতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আদৃত। বৃদ্ধ গাঙ্গুলি মহাশয়, যদি কোন প্রকারে ইঙ্গিত করিতে পারিলেন, যে রাম শ্বাশুড়ে, কি

যত্ন বউও, তবেই তিনি সে দিনের মত রসিকতার জয়পতাকা বাঁধিলেন।

ইহারই সম্প্রসারণে দ্বিতীয় প্রকারের রসিকতার সৃষ্টি। কেহ কাহাকে যে কোন প্রকারের গালি দিলেই মনে করেন যে আমি বিশেষ রসিকতা করিলাম। পরের মাতৃ পিতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধে কদর্য্য কথা বলিতে পারিলেই এরূপ রসিকতার চরম হইল। সুতরাং গ্রাম্য বালকেরা এই রূপ রসিকতায় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত! হুতোমপেঁচার অনুকরণে ব্রতী লেখকেরা প্রায় তাহাদের কাছে কাছে যান।

তৃতীয় শ্রেণীর রসিকেরা রসিক চূড়ামণি। অশ্লীলতাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কোন ক্রমে অনুচ্চার্য্য কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিলেই, তাঁহারা রসিকতার একশেষ করিলেন। যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য, এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা। কথাগুলি স্পষ্ট বলিতে পারিলেই তাঁহাদের মনের মত রস ছড়ান হয়, কিন্তু আইনের দৌরাত্ম্যে কেবল ইঙ্গিতে রসিকতা করিয়াই অনেককে ক্ষান্ত থাকিতে হয়।

আর এক প্রকারের রসিকতা কেবল চাপল্য মাত্র। গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম "ঝাপাই ঝোড়া।" অনবরত মুখভঙ্গী, নিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন, দিবারাত্র হাসিবার এবং হাসাইবার নিস্ফল উদ্যম, এই রসিকতার সামগ্রী। যাত্রার, "ভুলুয়া" এবং "মটরূ" এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ। যে ব্যক্তি মুখে মুখে এইরূপ রসিকতা করিবার জন্য কষ্ট করে, তাহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়, রাগ হয় না। কিন্তু যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়া-গিরিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের রসিকতা অসহ্য। আধুনিক নাটক-লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীর রসিক। রসিকতা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত অস্থির ; দন্ত সর্ব্বদাই বহিস্কৃত ; অঙ্গ-ভঙ্গীর বিরাম নাই ; চক্ষুর নানারূপ বিকৃতি ; কিন্তু রসিকতার উপকরণের মধ্যে কতকগুলিন নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য ইতর কথা। তাঁহাদের গ্রন্থে একটু একটু তাড়িখানার গন্ধ থাকে।

প্রথম বর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা

১। ওগুস্ত কোম্‌ৎ

মহাত্মা ওগুস্ত কোম্‌তের তুল্য দর্শনবিৎ অতি দুর্লভ। অনেকে তাঁহাকে অদ্বিতীয় দার্শনিক বলিয়া মান্য করেন। সে যাহা হউক, তিনি যে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত-প্রসবিনী ফ্রান্স ভূমিতে তাঁহার তুল্য ব্যক্তি জন্মে নাই। কোম্‌ৎ দর্শন, কাপিল সূত্রের ন্যায় নিরীশ্বর; কিন্তু নিরীশ্বর বলিয়া অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ঐ দর্শনের কোন২ অংশ ভ্রমাত্মক বিবেচনা করিয়াও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না।

২। বহির্বিষয় জ্ঞান.

বস্তুতত্ত্ববিষয়ে কোম্‌তের মত এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমাত্রেই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা বস্তু সকলের গুণ জানি এবং বিশেষ অবস্থায় তদীয় বিশেষ কার্য্য জানি। কিন্তু বস্তুসকল যে কি, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদের মূল প্রকৃতির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। চম্পক পুষ্পের এই গুণ যে তাহা হইতে অণু উত্থিত হইয়া তোমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে গন্ধ বোধ হয়। ঐ গন্ধগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর এক গুণ যে তাহা হইতে জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া তোমার চক্ষুতে লাগিলে তুমি চম্পক পীতবর্ণ দেখ। ঐ বর্ণগুণের বিষয় তুমি জানিতেছ। চম্পকের আর এক গুণ এই যে তাহা স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়। তুমি ইহার কোমলতা গুণ জানিতেছ। চম্পক চর্ব্বণ করিয়া তিক্ত রস বোধ করিতেছ।

স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারায় চম্পকের বিস্তৃতি জানিতেছ। গন্ধ, বর্ণ, রস, কোমলতা ও বিস্তৃতি গুণ ত্যাগ করিলে, চম্পকের বিষয় কি জ্ঞান? কিছুই না। মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সংস্কার এই যে, যেস্থলে গুণ জানিতে পারে, সে স্থলে গুণের আধার বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

যাঁহারা মায়াবাদীদিগকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। বস্তুত মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী। তাঁহাদের ভ্রম এই যে তাঁহারা গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের সত্ত্বোপলব্ধি অমূলক বিবেচনা করেন। যদি কোন মায়াবাদী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুণ হইতে গুণাধার বিষয়ের উপলব্ধি কেন কর?" ইহার উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে, "এ সংস্কার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।" মায়াবাদীদের মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

৩। কারণ জ্ঞান

কারণ শব্দ প্রয়োগ করিতে কোম্‌তের বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি বলেন, যাঁহারা তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যাহাকে কারণ বলেন, সে কারণের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। কেবল প্রাকৃতিক ঘটনা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটিয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

সূর্য্যের তাপ জলরাশিতে পড়িলে জলরাশির কিয়দংশ বাষ্প হয়। ঐ বাষ্প জলরাশির উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ জন্য আকাশ মার্গে উত্থিত হয়। ঊর্দ্ধস্থ বায়ুর শৈত্য গুণে বাষ্প সঙ্কুচিত ও দ্রবীভূত হইয়া জল হয়। এই রূপে বৃষ্টি হয়। তাপে জলাদি জড় বস্তুর যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়, তাহাতে উত্তপ্ত বস্তুর পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এই রূপে উত্তপ্ত বস্তু স্ফীত ও প্রসারিত হয়। কিন্তু তাপে কেন যোগাকর্ষণের হ্রাস হয়? কেন জল বাষ্প হয়? এ প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারে না।

শ্বেত বর্ণ পারদ ও পীত বর্ণ গন্ধক রাসায়ণিক যোগে রক্ত বর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন করে; কিন্তু শ্বেত বর্ণ, পীত বর্ণ অথবা অন্য বর্ণের দ্রব্য উৎপন্ন না হইয়া কেন রক্ত বর্ণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রাকৃতিক ঘটনা কিরূপে হয়, আমরা জানিতেছি; কেন হয়, জানি না। কোম্‌ৎ বলেন, "কেন হয়," না জানিলে কারণ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত

নহে। অমুক ঘটনা হইলে অমুক ঘটনা হইবে, ঘটনা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হইবে, ইহাই আমরা জানি, এপর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের সীমা। যাহাকে লোকে কারণ কার্য্য সম্বন্ধের নিয়ম বলে, তাহা কোম্‌তের মতে প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্ব্বভাব ও উত্তরভাবের নিয়মমাত্র।

যিনি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলেন, তিনি যে বিশ্বের আদি কারণজ্ঞান মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার মতে বিশ্বের উৎপত্তির বিষয় মনুষ্য কখনই জানিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা বৃথা।

৪। দৈববলে বিশ্বাস

পুরাকালে মানবজাতি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা দৈববলঘটিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক্ষণেও ঐ রূপ বিশ্বাস ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে আছে। বায়ু বহিতেছে; অতএব বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। স্রোতঃ চলিতেছে; অতএব নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। বৃষ্টি হইতেছে; অতএব মেঘ দৈব বলে সৃষ্ট ও চালিত হইয়া বারি বর্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যত অনুশীলন হইতেছে, তত সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে এ প্রকার দৈববলে বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে। কোম্‌ৎ বলেন, যখন মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন দৈববলে বিশ্বাস একবারে অন্তর্হিত হইবে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ জড়োপাসক হয়, পরে বহুদেবোপাসক হয়, তৎপরে একেশ্বরবাদী হয়; পরিণামে নিরীশ্বর হইবে। বিশ্বে যে নিয়ম আছে, একথা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইতে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন না।

৫। কোম্‌ৎ নাস্তিক কি না?

ইহাতে অনেকেই মনে করিবেন, কোম্‌ৎ নাস্তিক; কিন্তু তাঁহাতে ও অন্যান্য নাস্তিকে অনেক প্রভেদ আছে। তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের ৯২, ৯৩ বা ৯৪ সূত্রের ন্যায় কোন সূত্র নাই। মহর্ষি কপিলের ন্যায় তিনি কোন স্থলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বচন প্রয়োগ করেন নাই। বরং তিনি স্বরচিত এক গ্রন্থে কহিয়াছেন, "আমি নাস্তিক নহি; যাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা না মানিয়া প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি মানে,

তাহারাই নাস্তিক। (১) তাহাদের মত হইতে ঈশ্বরবাদীদের মত অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।" কিন্তু যদিও তিনি কোন স্থলে ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এমন কথা বলেন নাই, তথাপি তাঁহার দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, নিরীশ্বর বলিয়া প্রতীত হইবে।

৬। কোম্‌ৎ দর্শনের দোষ

কোম্‌ৎ দর্শন নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, সন্দেহ নাই—এমন কি, সর্ব্বদর্শনশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। কোম্‌ৎ মনুষ্যজাতির ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দৈববলে বিশ্বাসের ক্রমে হ্রাস হইতেছে, আরও হইবে। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে, পরিশেষে ঐ বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

বিশ্বনিয়ম দৃষ্টে বিশ্বনিয়ন্তা উপলব্ধি কেন অযৌক্তিক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোম্‌ৎ এ বিষয়সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু ঐ প্রমাণ কোন ক্রমেই প্রচুর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঈশ্বরবাদীদের মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নিয়ম হইতে নিয়ন্তা উপলব্ধি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ও বিশ্বাসের সীমা সর্ব্বতোভাবে সমান হইতে পারে না। কালের আদি আছে বা অন্ত আছে, ইহা কেহই অনুভব করিতে সক্ষম নহে; এ জন্য সকলেই বলে, কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু অনাদি ও অনন্ত বিষয় মনে ধ্যান বা ধারণা করা কাহার্ সাধ্য? কাহারও সাধ্য নাই। আকাশের সীমা আছে, ইহা কেহ অনুভব করিতে পারে না; এ জন্য সকলেই বলে, আকাশ অসীম। কিন্তু অসীম পদার্থ মনুষ্যের পরিমিত বুদ্ধিতে কখনই ধারণা করিতে পারে না।

অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থ আমরা মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়াও বিশ্বাস করিতেছি—কাল অনাদি ও অনন্ত, এবং আকাশ অসীম। এ স্থলে আমাদের বিশ্বাসের সীমা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার বিষয়ে

(১) যথা;—

প্রকৃতিবাস্তবেচ পুরুষসাধ্যাসসিদ্ধিঃ। সাংখ্যপ্রবচন ২য় অধ্যায়, ৫ম সূত্র।

আমাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট ; কিন্তু এ কারণে তাঁহাতে বিশ্বাসের লাঘব হওয়া উচিত নহে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঘনাবৃত হইলেও তিনি অস্তগত হন নাই বুঝিতেছি।

৭। কোম্‌ৎ কপিল

সাংখ্যদর্শন ও কোম্‌ৎদর্শন নিরীশ্বর হইলেও এই দুই দর্শনে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই। মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ করাই উভয় দর্শনের উদ্দেশ্য। গত শতাব্দীর অধিকাংশ নাস্তিক চার্ব্বাক ছিলেন ; এক্ষণেও জর্ম্মনি দেশের প্রসিদ্ধ নাস্তিক লুড্‌উইগ্‌ ফুএয়ার্বাক্‌ এবং ডাক্তর বুক্‌নেয়ারের শিষ্যেরা চার্ব্বাক্‌। ইহাঁদের অধিকাংশের মতে ইন্দ্রিয় সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু কোম্‌ৎ ও কপিল ইন্দ্রিয় সংযমের যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, এরূপ কঠিন নিয়ম ঈশ্বরপরায়ণ দার্শনিকদের গ্রন্থেও দুষ্প্রাপ্য। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "ঈশ্বর আছেন বলিয়া কর্ম্মফল হয়, এমন নহে, তিনি থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে।" (১) এই বচন সাংখ্য দর্শন, কোম্‌ৎ দর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র বলিলে বলা যায়। এ পর্য্যন্ত কোম্‌তে ও কপিলে ঐক্য আছে।

৮। পুরুষার্থ

কপিলের মতে তিন প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দৃষ্ট উপায়ে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ভোগে, ইন্দ্রিয় ভোগে, বাহ্যাড়ম্বরে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া ঔদাসীন্যভাব প্রাপ্ত হইলেই অপবর্গ লাভ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদই পুরুষার্থ। (২)

পুরুষার্থ লাভের জন্য বানপ্রস্থ হইবার প্রয়োজন নাই ; আপন আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ হইবে। (৩) ওগুস্ত কোম্‌তের

---

(১) নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ৫ম অধ্যায়, ২য় সূত্র।

(২) অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১ম অধ্যায়, ১ম সূত্র।
নদৃষ্টাত্তৎসিদ্ধি নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ। ঐ, ২য় সূত্র।
দ্বয়োরেকতরস্য চৌদাসীন্যমপবর্গঃ ; ৩য় অ ৬৫ সূত্র।
যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭০ সূত্র।

(৩) স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানম্‌। ৩য় অধ্যায়, ৩৫ সূত্র।
বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ঐ, ৩৬ সূত্র।

মতে আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ। "কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই মানবাধিকার," ইহা তাঁহার প্রসিদ্ধ বচন। কর্ত্তব্য সাধনে আমাদের সুখ হইতে পারে ; কিন্তু সুখ আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য নহে।

৯। পরমসৎ

কোম্‌তের আর এক বচন "পরোপকারার্থে জীবনধারণ।" সমস্ত মানবজাতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। এই দেবের নাম তিনি "পরমসৎ," (১) রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, কালে সকলে অন্যদেবের উপাসনা ত্যাগ করিয়া পরমসতের উপাসনা করিবে। যে পরিমাণে উপচিকীর্ষাবৃত্তি স্বার্থপরতাকে জয় করিবে, যে পরিমাণে মনুষ্যজাতি স্বার্থবিরত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, সেই পরিমাণে পরম সতের সেবা হইবে ও পুরুষার্থ লাভ হইবে। কেবল উপচিকীর্ষার দ্বারায় সম্যক্‌ উন্নতি লাভ করা দুঃসাধ্য। বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান। কোম্‌তের মতে ভক্তিরূপা মাতা, প্রীতিরূপা ভার্য্যা, এবং স্নেহরূপা কন্যা আমাদের প্রত্যক্ষ গৃহদেবতা।

১০। প্রেম

নারীকুলের ভূষণ মাদাম্‌ দেষ্টাল কহিয়াছেন, "পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ নাই।" কোম্‌ৎ এই বচনের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। পূর্ব্বে তাঁহার কেবল পরিমিত ও পরিমেয় পদার্থে বিশ্বাস ছিল ; বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় যাহা কিছু বুঝিতে পারা যায়, কেবল তাহাই তিনি মানিতেন। পরে মাদাম্‌ ক্লোতিল্‌দ্‌ দেভো নাম্নী এক গুণবতী রমণীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, "বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।"

(১) Grand être পদের প্রকৃত অনুবাদ "মহাসৎ।" পাঠকবর্গ মহাসৎ পদের বিপরীতার্থ "মহা অসৎ" করিতে পারেন ; এজন্য পরমসৎ প্রয়োগ করা গেল।

১১। বিবাহ

পুরুষ ৩৫ বৎসর বয়সে, নারী ২৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করিবে ; অবস্থা বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে, এবং নারীর ২১ বৎসরে বিবাহ হইতে পারে। জীবদ্দশায় ব্যভিচার দূরে থাকুক, দম্পতির একের মরণান্তেও জীবিত ব্যক্তি অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোম্‌ৎ বলেন, মৃতভর্তৃকা নারী অথবা মৃতভার্য্যা পুরুষ পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিশুদ্ধ প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।

১২। শ্রাদ্ধ

অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নাস্তিকের আবার শ্রাদ্ধ কি ? বস্তুতঃ কোম্‌তের মতে শ্রাদ্ধ আছে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার কার্য্য করা যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। ঐ শ্রাদ্ধে খোলা, ডোঙ্গা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই। প্রণয় ও স্নেহের পাত্রদের মৃত্যু হইলে সময়ে২ তাহাদের স্মরণ করা, ধ্যান করা, ও উপাসনা করাই শ্রাদ্ধ। কোম্‌ৎ এই-রূপে মাদাম্ ক্লোতিল্‌দ্ দেভোর শ্রাদ্ধ করিতেন। শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার নাই বটে ; কিন্তু তাহাতে শ্রাদ্ধকারীর চিত্তোৎকর্ষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদের সমস্ত আচার ব্যবহারের প্রতি উপহাস করেন, তাহাদের একবার এ বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কেবল আপনার উপাসনা না করিয়া মধ্যে২ ভক্তিভাজন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয় ; অবনত হয় না।

১৩। বৈরাগ্য

কোম্‌তের মতে যে দ্রব্য আহার করিলে আমাদের বলবান ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হয়, তাহাই আহার করা উচিত। যাহাতে কেবল জিহ্বা ও তালু পরিতৃপ্ত হয়, তাহা একেবারে আহার করা উচিত নহে। শরীরের বলাধানের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমসত্বের সেবা। তিনি সুরাপানের দোষ দিয়া সুরাপান প্রতিষেধকারী মহম্মদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি কামরিপু সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এই রিপু সকল রিপু অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ; এবং ইহার শাসন বহুকাল পর্য্যন্ত চিত্তশাসনের প্রধান উপায় থাকিবে।" তিনি ভরসা করেন, ক্রমশঃ সংযত হইয়া ঐ রিপু একবারে নির্ম্মূল হইতে পারিবে। কাম নির্ম্মূল হইলে মনুষ্য জাতিও নির্ম্মূল হইবে। তাহাদের রক্ষার উপায়

কি? কোম্‌ৎ বলেন, "কালে স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।" আমাদের এই বক্তব্য যে যিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানব-জাতির ইতিবৃত্তের উপর আপন দর্শনশাস্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন, এ মীমাংসা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। তিনি যাহা সম্ভব বলিয়াছেন, শরীরতত্ত্ব ও আয়ুস্তত্ত্ব অনুসারে তাহা অসম্ভব। মানব-জাতির ইতিবৃত্ত অনুসারেও তাহা অসম্ভব। "না শক্যোপদেশ বিধিরুপদিষ্টে যপানুপদেশঃ।" সাংখ্যদর্শন ১ম অধ্যায়, ৯ম সূত্র।

উপদেষ্টার পক্ষে যাহা অসম্ভব, সে উপদেশ উপদেশই নহে। কোম্‌ৎ যদি কামরিপু সংযমের উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। যখন কামোচ্ছেদের বিধি দিয়াছেন তখন ভারতবর্ষের দার্শনিক-শ্রেষ্ঠের বচন দ্বারায় ইউরোপীয় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের মত খণ্ডন করিতে হইল। (১)

(১) কোম্‌ৎ যে এমন কথা বলিয়াছেন, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। পজিটিভ্‌ পলিটীক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ অনুবাদ অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। অতএব আমরা মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে বাধিত হইলাম ;—

"Si 'appareil masculin ne contribute a notre generation que d'apres une simple excitation derivée de sa destination organique, on conçoit la possibilité de remplacer ce stimulant par un o u plusieuy autres, dont la femme disposerait librement. L' absence d'une telle faculté chez les espéces voisines ne saurait suffire pour l' interdire á la race la plus éminente at la plus modifiable. Ce privilége s'y trouvait en harmonie avec d'autres particularités relatives a la meme function, oú la menstruation constitute surtout une amélioration décisive, éleauchée chez les principaux animaux, mais developpée pur notre civilisation."
--Comtés Sytéme de politique positive, Tome IV, p. 68.

তৃতীয় সংখ্যা

প্রচলিত সঙ্গীত লিখিবার ইউরোপীয় প্রণালী কঠিন। আমরা বন্দনীয় কোন ইউরোপীয় বন্ধুর সাহায্যে নিম্ন লিখিত কতিপয় গীতাবলী সঙ্কলন করিয়াছি, পাঠকদিগের মনোরঞ্জন জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য দুই,—প্রথমত, এতৎপ্রণালীর দ্বারা সঙ্কেত স্তম্ভে কোমল তীব্র প্রভৃতি কঠিন প্রথা সকল পরিত্যাগ করত গীত লেখা সহজ-সাধ্য বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, "হারমোনিয়মের" স্থুর অনুসারে লিখিত হওয়াতে রাগিণীগণের ব্যত্যয়ও দৃষ্ট হইবেক, এবং হিন্দু হারমোনিয়ম হইবার আবশ্যকতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেক। সহজেই নিম্নলিখিত গীতসকল যে উচিতমতে আদর্শিত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ছয়টী দেশীয় গীত দেওয়া গেল, সপ্তম গীত বহুমিলনের সামান্য দৃষ্টান্তমাত্র। ভাল হইয়াছে, এমত বলা যায় না, কেবল পথদর্শক স্বরূপ হইয়া সমাজে গৃহীত হইলে, আমরা চরিতার্থ হইব এবং উদ্দেশ্যের মূল ফল প্রাপ্ত হইব।

লিখন প্রণালীর সঙ্কেতের অর্থ

	খরজ			মধ্যম												সপ্তম				
	…১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
প্রাচীন নাম			গা	মা	তী	পা	তী	ধা	নি	তী	সা	তী	রে	তী	গা	মা		পা		ধা
তীব্র=তী					কো		কো			কো		কো		কো						
কোমল=কো																				

এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল স্থুরই এক এক পূর্ণ স্থুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, অতএব ৭ সহজ স্থুর এবং ৫ কোমল স্থুর লইয়া

১২টি মাত্র অঙ্ক দেওয়া গেল। প্রত্যেক অঙ্কে এক তাল এবং তালের বৈষম্য অর্থাৎ সময়ের তারতম্য প্রকাশ জন্য (°) শূন্য দেওয়া হইল। এক শূন্যে (°) এক তাল, অতএব (১°) অর্থ দুই তাল (১°°) তিন তাল (১°°°) চারি তালের সময় নির্দ্দেশ করিবেক। সমের (০) এই চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এক এক অঙ্ক এক স্তম্ভ অথবা দুই স্তম্ভের মধ্যে লিখিত হইলে অর্দ্ধ তাল অথবা দ্ব্যর্দ্ধ তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক যথা—

৫ =একতাল | ৫ ৬ | ৫ ০ ৬ ৬ ৩ ৮ | ১ ৫ ৮ ১ | ৬০৮

ইত্যাদি।

গীতাবলী

(১ সংখ্যা)

রাগিণী মূলতানী।

৬ ৮ ৮ ৬ ৪ ৩ ১ ১ ১ ৪ ৬ ৮ ৮
আর যাব না লো সই য মু না রি জলে

৫ ৫ ৫ ৫ ৮ ১২ ১ ১ ৮৮৮ ৬৬,৫
ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে

৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
কি হেরিলাম রূপতার ঘরে আসা হলো

১ ১ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯ ৬ ৬ ৬ ৬ ৭ ৫
তার নাম যে জানিনে তার সে থাকে গোকুলে

(২) বারোয়াঁ।

১১২ ১ ১ ৪ ২ ২ ১ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬
ঘরে রহিতে নাদিলে শ্যামের বাঁশরী কিগুণ

৮ ৪ ১ ১২ ১ ১ ৪ ৬ ৬ ৬ ৮ ৮ ৪ ৪
জানে ঘরে ইত্যাদি একেত চিকন কালা গলে

৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৪
শোভে বনমালা হাতে শোভে মোহন বাঁশরী

(৩) ভৈরবী।

১ ১ ১ ১২ ১ ১ ১°৮ ৮ ৮ ১° ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩
কাজল নয়নে আর দিও না কখন প্রাণ

১ ৩ ৫ ৬ ৮ ১০ ১২ ১ ৮ ১১ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩ ৪
শরে কেবা নাহি মরে বিষ যোগ তাহে কেন,

১ ১ ১ ১২ ১১ ১২ ১০ ৪ ৪ ৪ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৬
সবে মাত্র এক প্রাণ উপায় তা কহি শুন

১৩ ৫ ৬ ৮ ১০ ১২ ১২ ৮ ১১ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩ ৪
সুধা হলাহল সুরা নয়নেরি তিন গুণ

(৪) পরজ।

১২ ১ ৩ ৫ ৬ ১ ১ ২ ০ ৫৫৫ ৫৫৬
কেনরে প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়

৩ ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ ৬
তপন সবারে দহে নাদহে কমল

৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ১০ ৮ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায়

১০ ১০ ১০ ১০ ১৩ ৫ ৬ ৬ ৫ ৩ ১ ১২ ১০ ৮ ৬
তব কেশ ঘন ঘন পীড়ন করিত প্রাণ

৩ ৬৬ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৬ ৮ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৫
এ খন তা নয় এরে ফণিময় হেরি কাতর

৬ ৭ ৬ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৮ ৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ৮ ৬ ৫
পরাণ নিকট না হতে পারি দংশে পাছে ভয়

(৫) সুহিনী।

২ ২ ২ ২ ২ ৬ ৩ ২০ ১০ ১০ ২০ ৬
তোদের কায কি শ্যামের কথা কয়ে

১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৬ ৬ ৫ ৬ ৬
শ্যাম জানে আমি জানি তোরা পরের মেয়ে

৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৮ ৬ ৫ ৫ ৬
আপনি করেছি মান আপনি বুঝিয়ে

(৬) বসন্ত।

১২১২১২১২ ১২১২১২১২ ১০১০১০ ৩ ৫ ৬
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে

৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৫ ৬
নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং

৩ ৩ ৫ ৫ ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬
সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে

৬ ৬ ১১ ১১১১১১ ১১১০ ১১ ৪ ৩ ৩
ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন

১২১২১২ ২২২ ২ ৩ ২ ১০১০ ২২
কোমল মলয় সমীরে মধু কর

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ২
নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে

১ সংখ্যা। মূলতানী রাগিণীর বহু মিলনের যথাসাধ্য উদাহরণ।

সপ্তম	৬৮৮৬ ৪৩১	১১ ৪৬৮৮
মধ্যম	৩৩৩২ ১১১৮	৯১০১১৪৪
খরজ	১২ ১১ ১২ ১০ ১০ ৮ ৪	৫ ৭ ৮ ৯ ১ ১২
	আর যাব না লো সোই	যমুনার জলে
সপ্তম	৫ ৫ ৫ ৫ ৮ ১২ ১ ১	৮ ৮ ৮ ৬ ৬ ৫
মধ্যম	২ ২ ২ ২ ৩ ৮ ৮ ৯	৩ ২ ১ ২ ২ ১২
খরজ	১১ ১১ ১০ ১০ ১১ ২ ৪ ৫	১২ ১১ ১০ ১০ ১১ ৫
	ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ	নয়ন সলিলে
সপ্তম	৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১২ ১	১ ১ ১ ১ ১ ২
মধ্যম	৩ ৩ ২ ২ ৫ ৮ ৮	৮ ৯ ৯ ৮ ৭° ৬
খরজ	১২ ১২ ১১ ১১ ১১২ ৪	৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২
	কি হেরিলাম রূপ তার	ঘরে আসা হলো
সপ্তম	১ ১ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯	৬ ৬ ৬ ৬ ৭ ৫
মধ্যম	১০ ১০ ২ ৩ ৪ ২ ২ ৩ ৩	২ ১ ১ ২ ২ ১
খরজ	৭ ৫ ৮ ১১ ১০ ১১১১১১১১	১০ ১০ ১০ ১১ ১০ ৯
	ভার নাম যে জানিনে তার	সে থাকে গোকুলে

আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। অসাধারণ কল্পনা ও তর্কবিশিষ্ট প্রাচীন পুরুষগণ কর্ত্তৃক বহু পরিশ্রমে নির্ম্মিত হয়, কালক্রমে তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই, মাথায় তাজ, কাল দাড়ি, বড় পেট, বড় তানপুরা, খরজ শব্দ, এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে। বিবেচনা করা উচিত যে উৎসাহ ব্যতীতই এবং সময়ের গতিতেই এই সকল গায়ক ধৈবত বাঁচাইতে গিয়া রাগ রাগিণীকে দগ্ধ করেন। সভ্যতার প্রধানচিহ্ন সঙ্গীতানুরাগ। ভরসা করি, বাঙ্গালীগণ এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন, এবং অসাধারণ সৌষ্ঠব সম্পন্ন পূর্ব্বসঞ্চিত ভারত-সঙ্গীতপ্রণালী পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহ প্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে২ অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক কালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্রা।—পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গূল।—অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেননা সকল পুরোহিত চালকলা-ভোজী নহে; অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক। পক্ষান্তরে, চাল কলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেক গুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া

থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতক গুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের এক প্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে,

"হে বরকন্যে! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চাল কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে, চাল কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্ব্বণে, যাগ যজ্ঞে, রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চাল কলা পাইব; অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক২ চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিক-বিবাহকারিকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই

গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে !

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাস কালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্য পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মান বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেননা তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। যদি আপনা-দিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মনুষ্যগণ রাত্রি-দিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,— এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য

মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকেন। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে ; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি ? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা, প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচহাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে ইঁহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে ২ প্রান্তর মধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত, করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই, যে এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি

জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয় কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এই খানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহলাঙ্গূল, বিপুল লাঙ্গুলচট্‌চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউমাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ, মিথ্যা কথা পরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। "আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।"

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রাকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুল রক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী (সহচরী, সঙ্গে চরে) করে, তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং

প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক২টি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক২ জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভুনিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরাহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষির নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় বিবাহ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এই রূপ :—

পুরোহিত। 'বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?'

বর। 'আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।'

পুরো। 'আর কি?'

বর। 'আর আমি জন্মের মত ইহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর ;—খাইবার ভার উঁহার উপর।'

পুরো। (কন্যার প্রতি) 'তুমি কি বল?'

কন্যা। 'আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণ সেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সেদিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।'

পুরো। 'শুভমস্তু।'

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা এক প্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহ জন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে 'না জানি মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পর দিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?"

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন ;—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয় কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কাল হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি, যে আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবন ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদু হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এই রূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গূলচট্চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্র্যাঘ্র-দিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয় কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলিন বড়২ গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর, তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্র-মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি, ভায়া ডালে আছ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম বানর। "আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।"

দ্বি, বা। "কেন?"

প্র, বা। "এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।"

দ্বি, বা। "অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।"

প্র, বা। "আচ্ছা, তবে দেখ বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত ?"

দ্বি, বা। "না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।"

প্র, বা। "সেই কথাই ভাল। নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সমুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।"

দ্বি, বা। "বলুন কি দোষ !"

প্র, বা। "প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।"

দ্বি, বা। "তার পর ?"

প্র, বা। "ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।"

দ্বি, বা। "হাঁ ; উহারা বাঁদুরে কথা কয় না !"

প্র, বা। "ঐ যে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগের সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,' ইহা না বলিয়া যদি বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন, তাহা হইলে সঙ্গত হইত।"

দ্বি, বা। "সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন ?"

প্র, বা। "কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফ ঝম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয় ; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।"

দ্বি, বা। "আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।"

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যা বুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি ?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি ; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

এই রূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

তৃতীয় সংখ্যা

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যবধান। উত্তর-চরিতের একটী দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইণ্টর্স টেল্ নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এ দিগে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্ব রক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে শম্বূক নামক কোন নীচ জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে তপশ্চারণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বূক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেই রূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ব্বে একটি২ বিষ্কম্ভক আছে। এ গুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী

সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা ;—

"অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে বন দেবতেয়ং
ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে। (১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"বিতরতি গুরুঃপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈবতথা জড়ে
নচখলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তিচ।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলংপ্রতি তদ্‌যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥ (২)

হরেস্ হেমান উইল্‌সন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতক গুলিন এমত সুন্দর ভাব আছে যে তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বূকের সন্ধান করিতে২ পঞ্চবটীর বনে শম্বূককে পাইলেন। এবং খড়্গাদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বূক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপবিমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপ-কথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

স্নিগ্ধশ্যামাঃক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্‌গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

* * *

এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ড শ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্ত-দীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

---

(১) ঐ দেখ, এই বনদেবতা ফলপুষ্প পল্লবার্ঘ্যের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

(২) গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

তথাহি

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাস প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃপ্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

* * *

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণাণি পর্ব্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহুলচ্ছায়তরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়াঃ বহন্তি
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ॥ (১)

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

---

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রূক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝরঝরশব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে; কোথায় তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে২ অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যস্থ দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণ দিগে চলিতেছে। এ সকল সর্ব্ব লোক লোমহর্ষণ—তত্রস্থ গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একবারে নিঃশব্দ, কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জ্জনপরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষ সমূহে শোভিত; এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী সকল বহুস্রোতে বহিতেছে; আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতস লতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধি

শম্বূক বিদায় পরে পুনরাগমন পূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎ কীচক
স্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃক্রৌঞ্চাবতোয়ংগিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষুকুম্ভীনসাঃ॥
এতেতে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ
রুত্তালাস্ত ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥ (১)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়া-পারম্পার্য্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়া-পরম্পরা নায়ক নায়িকাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য, এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্য্যগত

এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকার শব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

---

(১) এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদীকুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলে ঘুৎকারের ন্যায় শব্দায়মান বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকা রবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বত কুহরে গোদাবরী বারি-রাশি গদ্গদ নিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘ মালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোধিক। গোদাবরীসংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতা বিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে চিত্রিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা কাল এই সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পূটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণোরসঃ। (১)

এই রূপ মর্ম্ম মধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজি পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে২ সীতা-সহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে২ মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরী স্রোতোস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদী গুলিন দেখিল যে আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বিপদ। দেখিও, রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু২ তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে

(১) অবিচলিত গভীরত্ব হেতুক হৃদয় মধ্যে রুদ্ধ, এজন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবন্ধ পাত্র মধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছেন "ছায়া"।—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণ দেহমাত্র-বিশিষ্টা হতভাগিনী রামমনোমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগিরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তরচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগিরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কি রূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল-কপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদা-তপসন্তপ্ত কেতকী কুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিশলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান বনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্তযূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!" রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্য পুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্য পুত্র? কোথায় আর্য্য পুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিগে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেই খানে বিমান রাখিতে বলিলেন। সে কথার শব্দ মূর্চ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি মহারাজা রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুতলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।"—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রুটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।" এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রুটি হইতেছে না।" কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতা বিরহ প্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে "সীতে! সীতে!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া

ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামিকে বাঁচাও!"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!" এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী, সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সেই হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

যেনোদগচ্ছদ্বিসকিশলয়স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতমুলবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যং কল্যানং বয়সিতরূণে ভাজনং তস্য জাতঃ।
সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য
মপি শিক্ষিতং বৎসেন।

---

(১) "যা হউক তা হইক।" এই কথার কত অর্থ গাম্ভীর্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না, জানি না; কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।" ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক!" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তরচরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কবির গৌরবার্থ আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল। সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক!" সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময়ে এক বার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।" তাই ভাবিয়াই সীতাস্পর্শে রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন "ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম জই দাবং মং পেক্‌খিস্মদি তদো অণত্তণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্মদি।" তবু "মম মহারাও!"

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পৎ পুষ্করবাসিতস্থ পয়সো গণ্ডুষসক্রান্তয়ঃ
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিত কামং
বিরামেপুনর্যংস্নেহাদনরালনিলনলিনীপত্রাপত্রং ধৃতম্। (১)

এদিগে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজপুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামীদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,—পুত্রমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিরত হইব।

মমপুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধবলদসণুজ্জল
কবোলং অণুবন্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধ
কাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ
পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ। (২)

---

(১) যে নবফুল্ল মৃণাল পল্লবের ন্যায় স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরে তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যানভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি দেখ, বাছা স্ত্রীর মন রাখিতেও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধিপদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডুষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণার দ্বারা তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

(২) আমার সেই পুত্রদুটির অমলমুখপদ্মযুগল যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্রকর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না!

উপন্যাস

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সরল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘ কালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামির চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত। বোধ হয় তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটী ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পাশে এক চীক থাকিত; চীকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এই রূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। "কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।"

সূ। "বাবু কিছু বলেন নাই ?"

ডা। "না—কি অসুখ ?"

সূ। "কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি ?"

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্টওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস্, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, সিসি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া, প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন ; নগেন্দ্র সিসি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে সিসি ছুঁড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল ?"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে ?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী এক খানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া এক জন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতি পূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায়২ রাগ।

শুধু রাগ নয়। এক দিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন ; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত ; নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিত হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ ঐরূপ হইতে লাগিল। এক দিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটী চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোন রূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক

অনুনয় করিলেন ; বলিলেন "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখি, আমি মাতাল। মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মাঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন ?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয় গেল গেলই। আমি আপনার বিষয় রাখিতে পারিলে বাঁচি।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক দিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় যোড়-হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে ?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দেও।"

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার এক জন গোমস্তা এক জন প্রজাকে মারিয়া একটী টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটী টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে ? তুমি কি করিতেছ ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাই-ই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাতা মুণ্ড কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?

তা বল না কেন ? মোকদ্দমা হারিয়াছ ? তাই বা বল না কেন ? আর কিছু বল না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে২ বলিলেন, "কি এ ? অর্থচিন্তা ? বন্ধু বিচ্ছেদ ? দেবেন্দ্র দত্ত ? না কিছুই নয়—এ প্রেম ?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই, "এক বার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃৎ কেহ নাই। এক বার এসো।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামির কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয় ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরাজি সংবাদ পত্রখানি অধিকার করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামির নিকটে গিয়া গললগ্ন কৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারির যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা চুরি নাকি ?"

ক। "শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।"

শ্রী। "কোথায় কি চুরি হলো ?"

ক। "গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদার একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়ে গিয়েছে।"

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদার সোণার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি ?"

ক। "সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।"

শ্রী। "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে। আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই তোমার হাত ছাড়া হলো। তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। "তা ত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগি এমন পত্র লিখিবে কেন?"

শ্রী। "পত্রখানি দেখিতে পাই?"

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হস্তে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এসকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আমার আহার নিদ্রা হবে না—ঘূরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না, কথাটা কি তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হইবে কি, তাই বল?"

ক। "করতে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।"

সতীশবাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুল সমেত উলটাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম —ভাজের বাড়ী মশাইয়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখবে কেন?"

ক। "শুধু কি তাই। সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ, আর তোমার নিমন্ত্রণ।"

শ্রী। "আমার নিমন্ত্রণ কেন?"

ক। "আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে?"

শ্রী। "এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর জামাই দেখিয়া দিতে পারি।"

কমলমণির বড় রাগ হইল। তিনি ভ্রূকুটি করিলেন, শ্রীশকে ভেঙ্গাইলেন, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজ খানায় লিখিতেছিলেন, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "তা লাগ্‌তে এসো কেন?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি বল্‌বো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইলেন। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া, ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইলেন।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিলেন।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে মুখচুম্বন তাঁহারি ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন, এবং ভূরি ভূরি মুখচুম্বন করিলেন! সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার সুবর্ণময় পেন্‌সিলটি দেখিতে পাইয়া অপহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুনপ্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম

জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাঁদের এরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য? সত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। "তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধ্‌তেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে তুদিগে তুজনে কাঁদ্‌তে বস্‌বো।"

শ্রী। "আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।"

ক। "আয়, সতীশ! আয়, আমরা তুজনে তুদিগে কাঁদ্‌তে বসি।"

মার আদরের ডাক সতীশের কানে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিলভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল। সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাতুরি দেখিয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে, কমল আবার কহিলেন,—

"এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। "তুমি যাও, মানা করি না। কিন্তু তিসির মৌসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?"

শুনিয়া, কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ্‌ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলে, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এই রূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। "ফিরিবে কবে?"

ক। "জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?"

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারিরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে সে শ্রীশবাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজ কর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। একথা শ্রীশচন্দ্র এক দিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ্য!" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর্। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসি মুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না।" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাতায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন "কমল কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া নিরীহ ভালমানুষের মত বলিলেন "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজি কে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐ রূপ আলাপ হইল “ওলো কুঁদী—কুঁদী মুদী তুঁদী—ভাল আছিস ত কুঁদী ?”

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, “আছি।”

“আছি দিদি—আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুণ ধরিয়া দিব। আর নহিলে গায়ে আরস্‌লো ছাড়িয়া দিব।”

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি, চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক২ ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামির গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সূর্য্যমুখী বলিলেন, “না ভাই! আর দুদিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।” কমল বলিলেন, “তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।” সূর্য্যমুখী বলিলেন “আমার কি কাজ করিবে!” কমলমণি মুখে বলিলেন “তোমার শ্রাদ্ধ,” মনে২ বলিলেন, “তোমার কণ্টকোদ্ধার।”

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া২ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন ?”

কুন্দ বলিল, “তুমি যাবে কেন ?”

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

কমলমণি বলিলেন, “তাতে কাঁদিস্ কেন ?”

কুন্দ। “তুমিই আমায় ভালবাস।”

কম। "কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না ?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। "কে ভাল বাসে না ? বউ ভাল বাসে না—না ? আমায় লুকুস্‌নে।"

কুন্দ নীরব।

কমল। "দাদা ভাল বাসে না ?"

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না ?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে ?"

কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল কথা ত নয়। ইট্‌টি মারিলেই পাটিখেলটি খেতে হয়। দাদা ইট খেয়েছেন—ছুঁড়ি পাটখেল খেয়ে বসে আছে। আমার শ্রীশচন্দ্র মন্ত্রীবর কাছে নাই—কাহাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি ?"

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি ?"

কুন্দ বলিল "কি ?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব ? আমি তোর দিদি—আমি তোকে বোনের মত ভালবাসি—আমার কাছে লুকুস্‌নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল ?"

ক। "তুই দাদাকে বড় ভাল বাসিস্।—না ?"

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝিয়াছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে২ অনেকে মরে যে ?"

কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী চোকের মাথা খেয়েছ ? দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভালবাসে ?"

ঘুরিয়া সেই উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কুন্দ ?"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

ক। "আমার সঙ্গে চল।"

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল,

"নহিলে নয়। চক্ষের আড়াল হইলে, দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছার খার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি ? মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে ?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন ? কমল তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল ? কমল বুঝিয়াছিলেন যে কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরা

এমত সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

"কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কালকলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে
পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"*

(*) রাগিণী শঙ্করা—আড় খেমটা।

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

হরিদাসী বলিল, "কেন?" কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, "কেন? একটা বাবলার ডাল আন্‌ত রে—কাঁটা ফোটা কত সুখ মাগিকে দেখিয়ে দিই।"

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিল, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল "আচ্ছা", বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

স্মৃতিশাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে॥

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ভাই, বউ—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর২ স্ত্রী লোকেরা আপন২ প্রবৃত্তিমতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্য মনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেই খানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এদিক সেদিক বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথা বার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল,

"কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। "মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?"

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। "আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব —কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠ!"

কমল। "রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেল। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দুরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—এবং সিন্দুর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকারা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্রগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেক গুলিন পরিচারিকা কায়স্থ কন্যা—হীরাও কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসিবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটী সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসী মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামির কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসের বিশেষ প্রিয় ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘ ঢাকা চাঁদ; চুল গুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে বসে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। "না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না—আমি বৈষ্ণব ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগিদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।"

সূ। "এ ঠাকুর বাড়ির বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাব বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্ তবে তোকে নূতন বাণারসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।"

নূতন বাণারসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূর্য্য। "তোর যখন খুসি। কিন্তু এখন ওর পাছু২ না গেলে ঠিকানা পাবিনা।"

হীরা। "আচ্ছা।"

সূর্য্য। "কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।"

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসী হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু ঢাকাই নিবনা।"

সূ। "কি নিবি ?"

কমল বলিল "ও একটি বর চায়। ওর একটী বিয়ে দাও।"

সূ। "আচ্ছা তাই হবে—ঠাকুরজামাইকে মনে ধরে ? বল, তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।"

হী। "তবে দেখ্‌বো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।"

সূ। "কে লো ?"

হী। "যম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"না"

সেই দিন প্রদোষ কালে, উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া, কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা ; তাহার জল অতি পরিষ্কার, এবং সর্ব্বদা নীল-প্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তররচিতহর্ম্ম্য লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতা-মণ্ডপের সম্মুখেই, পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহু-কালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া, স্বচ্ছসরোবর হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদি সহিত আকাশ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলিন নাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁঠাল, জাম, লেবু, লীচু, নারিকেল, কুল, বেল প্রভৃতি ফলবান ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখি বিকট রব করিয়া সরোবরের শব্দহীনতা ভঙ্গ করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া, ইন্দীবর-কোরককে ঈষন্মাত্র বিধুত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর শিরস্থ বকুলপত্রমালায় মর্ম্মরশব্দ করিতেছিল। এবং নিদাঘ-প্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল—বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা, এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারিদিগে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছবারির উপর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফুটিতেছে, নিবিতেছে। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে, দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ সেই শব্দ করিতেছে—দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ। "ভাল, সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোক যাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখন মনে হইত না; এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এই মাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছিলেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হয়েছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্র গুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখিতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক ও আর ভাবিব না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া! জলে ডুবিয়া? বেশ ত? মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে—হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলেম—কাল ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা

হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভাল বাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য! কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল বাসেন? কিসে ভাল বাসেন? কি দেখে ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?" (এই বলিয়া কালামুখী সচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দর। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কমলের মন-রাখা কথা—আমায় কেন ভাল বাসিবেন? তা, কমল মন রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছেই কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না। পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত অসুখী করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;"—

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা, অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমাকে ঐ নক্ষত্র লোকে যাইতে বলিয়া-

ছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না—আমি কেন গেলেম না!—আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিত সংকল্পে সে মাতার আজ্ঞা পালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে২ তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবা মাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলোনা।

আর নগেন্দ্র? এই কি তোমার এতকালের সুচরিত্র! এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা! এই কি তোমার সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! তুমি চোরের অপেক্ষায়ও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থ হানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণ হানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর!

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনী—! চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি—দেখ! পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছা পূর্ব্বক! হরি, হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল! তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,

"শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্যপ হইয়াছি। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিল, "কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল—বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুমবাস-সুবাসিত—পবন হিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে কুন্দ বলিতে লাগিল "না!" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

প্রথম সংখ্যা*

ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই, একথা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোমক এবং গ্রীকগণ পুরাবৃত্ত রচনায় অতীব নিপুণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনা সমূহ অলৌকিক বর্ণনায় এত পরিপূর্ণ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে সার ভাগ উদ্ধৃত করা দূরপরাহত। ইতিহাস নিচয় গদ্যে রচনা করাই বিধেয়। পদ্যে কোন প্রস্তাব রচিত হইলে তাহা নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতে হয়, সুতরাং তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা অভিধান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল প্রস্তাব গদ্যে রচনার যোগ্য, তাহা সমুদায় কণ্ঠস্থ রাখিবার জন্য শ্লোকে রচনা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যে যে সকল বিষয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম হয়, পদ্যে তাহা হয় না। পুরাণনিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার, অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অণুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই। হিন্দুরা প্রকৃত ইতিহাস রচনা প্রণালী জানিতেন না বলিয়া আমরা মহাবীর, ও পণ্ডিতগণের জীবন চরিত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চৈতন্যদেব, জয়দেব গোস্বামী, গৌড়েশ্বর সেন রাজগণ আমাদিগের দেশে কএক শত বৎসর হইল বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের জীবন চরিত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই অবগত নহি।

* লঘু ভারত। কলীতিহাস ১।২ খণ্ড। শ্রীগোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বোয়ালিয়া ও তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

প্রচীন লেখকগণ একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজাকেও "সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদব্যাস যদি একালে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে মহারাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া ও ইংরাজ জাতির কিরূপ প্রতাপ বর্ণনা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ঋগ্বেদসংহিতার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীনগ্রন্থ ভূমণ্ডলে নাই। বেদে মানবজাতির রচনাকুসুম প্রথম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এ জন্য হিন্দুরা চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, এবং এজন্যই জর্ম্মন দেশোদ্ভব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায়গণ একমাত্র বেদাধ্যয়নে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত—ছন্দ—মন্ত্র—ব্রাহ্মণ এবং সূত্র। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, ছন্দো ভাগ ১২০০ হইতে ১০০০, মন্ত্র ভাগ ১০০০ হইতে ৮০০, ব্রাহ্মণ ভাগ ৮০০ হইতে ৬০০, এবং সূত্র ভাগ ৬০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই চারি অংশের রচনা পরস্পর বিভিন্ন। ছন্দোভাগে ভারতবর্ষীয় সমাজের শৈশবাবস্থার প্রতিকৃতি ও বৈদিক ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা, এবং মন্ত্র ভাগে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে উপাসনার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং সূত্রভাগে বেদার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় অংশ শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ—মন্ত্র ভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে রচিত।

বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, উষা, মরুৎ, অশ্বিনী-কুমার, সূর্য্য, পূষা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, আর্য্যেরা মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ব্বরজাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব সাহস সহকারে আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সম্বর নামক তাহাদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি একশত নগরীর অধিপতি হইয়া পরম সুখে পার্ব্বতীয় প্রদেশে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষীয় নিবিড় অরণ্য মালা অগ্নি সংযোগদ্বারা ক্রমে ভস্মসাৎ করত প্রাচীন অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে

কৃষি-কার্য্যদ্বারা উদর পোষণ করিতেন, এবং বেদুইন আরব গণের ন্যায় দেশে২ পর্য্যটন করিতেন। তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। মেষ পালন ও পশুহনন তাঁহাদিগের প্রধান ব্যবসা ছিল, এবং দৈনিক কার্য্য সমাধা করণান্তর কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেই বেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইবামাত্র বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করত অস্ত্র লইয়া অকুতোভয়ে বর্ব্বর জাতির সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতেন। পরে ক্রমে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সহকারে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা পোতারোহণে নানা দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী বাণিজ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভারতবর্ষের ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল; ভীষণ শ্বাপদপূর্ণ অরণ্যানি সকল পরিষ্কৃত হইয়া জনপদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টক, সপ্তদশ অনুবাক, অষ্টম বর্গের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে, তুগ্রারাজ দ্বীপবাসী কোন শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াতে তাহার দমনার্থ তৎপুত্র ভূজ্যকে সুসজ্জিত রণপোতারোহণে প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায় পোত সমুদ্র মগ্ন হইয়া যায়, এবং কুমার ভূজ্য মহাকষ্টে প্রাণধারণ করিয়া উপকূলে নীত হয়েন; এতৎপ্রমাণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ ফিনিসিয়ানদিগের পূর্ব্বে পোত নির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব রাজ্যে বাস করিতেন। মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়, কিছুকাল তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া সরস্বতী নদীর পরপারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; এই সময় তাঁহাদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক অসভ্য আদিমবাসিগণ সমরে পরাজিত হইয়া স্ব২ আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা সরস্বতী হইতে গঙ্গার উপকূলস্থ ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করত মধ্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে২ ভারতবর্ষ আর্য্যগণের বাসস্থল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না; পরে সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে বৈদিক মহর্ষিগণ ঋগ্বেদ পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি প্রকাশ করিলেন। মনুসংহিতায় প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য ও উপাস্য দেবতার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে। বেদ ও মনুসংহিতা পাঠে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা এবং নৃপতিগণের রাজ্য শাসন প্রণালী কিছুই উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকির রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে রাম রাবণের যুদ্ধ

এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণও কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারত কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও বহুজানপদের বিবরণে পরিপূর্ণ। এ সময় হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন প্রণালী, শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃতির উত্তম পরিচয় মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের সুচারু প্রাসাদবর্ণনা হিন্দু আবালবৃদ্ধ বনিতা, সকলেই অবগত আছে। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া পাণ্ডবেরা স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে পুরোচন নামক যবন (গ্রীক) জতুগৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং সৈনিক কার্য্যেও এই সকল শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত। ইন্দ্রপ্রস্থ আধুনিক দিল্লীর এক ক্রোশ ব্যবধানে পুরাণ কেল্লা নামক দুর্গ সন্নিকটে ছিল। এস্থান এক্ষণে মুসলমান নৃপতিগণের নগরীর ভগ্নাবশেষে পূর্ণিত রহিয়াছে। হিন্দু ভূপতিগণের প্রাসাদাদির কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে এই মহাতেজা কুরুপাণ্ডবদিগের কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লোপ হইল। এক্ষণে বোধ হইতেছে—

"ভীষ্ম দ্রোণকর্ণবীরে, কে জানিত যুধিষ্ঠিরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।"
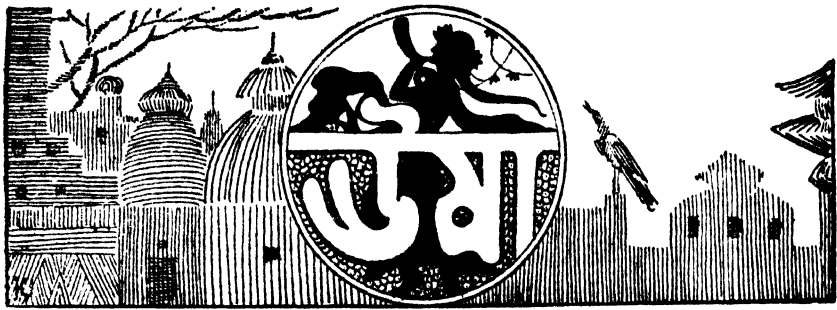
১

অদিতিনন্দিনী, উষা বিনোদিনী,
প্রফুল্ল বদনা, মধুর ভাষিণী,
আলোক বসনা, কুসুম মালিনী,
এস তুমি, দেবি, অবনীতলে,
হাসিতে হাসিতে, নয়ন ভঙ্গিতে
আনন্দের ধারা ঢালিতে ঢালিতে,
স্বর্গীয় সৌরভ শ্রীঅঙ্গ হইতে
বর্ষিতে বর্ষিতে করুণাবলে ;

২

যথা স্বয়ংবরে নবীনা যুবতী,
রূপের আভায় পূরিয়া জগতী,
চলে সভা তলে মৃদু মন্দ গতি,
নানা অলঙ্কার পরিয়া অঙ্গে ;
কিংবা রে যেমতি পতির মিলনে
যায় রূপবতী সহাস্য বদনে,
সাজাইয়া দেহ বিবিধ ভূষণে,
ভাসিতে ভাসিতে সুখ তরঙ্গে ;

৩

অথবা যেরূপ সলিল হইতে
সরোবর কূল শোভিতে শোভিতে,
উঠে একাকিনী সুন্দরী নিভৃতে,
রম্যতর কান্তি সরসী স্নানে ;
কিম্বা যথা আশা সাহস নন্দিনী,
অঙ্গের আলোকে উজলি মেদিনী,
ধায় তাড়াইতে দুখের যামিনী,
মোহিয়া সকলে মধুর গানে।

৪

প্রণয়ের রাগে রঞ্জিত তপন,
মধুরতাময়, সতেজ দর্শন,
ছুটে পিছে পিছে উৎসুক লোচন,
চুম্বিতে তোমার বিকচ মুখে ;
ভরসার ভরে আসিয়া সত্বরে,
অম্বরে তোমায় প্রেমানন্দে ধরে,
প্রাণের মিত্রের হেম কলেবরে,
মিশহ অমনি পরম সুখে।

৫

দেখেছ যদিও যুগ যুগান্তর,
অনন্ত যৌবনা তুমি নিরন্তর ;
প্রত্যহ নবীনা নববেশ ধর,
সাজাতে নিয়ত নূতন অঙ্গ।
রাশি চক্রে ঘুরি উঠি প্রতি দিন,
দেখিতেছ ক্রমে কত জাতি ক্ষীণ,
কত বংশাবলী ক্রমশঃ বিলীন,
অবনী মণ্ডলে কালের রঙ্গ।

৬

বিচক্ষণ বুদ্ধি বৃদ্ধ শ্বেতকেশ
কৃতান্ত কবলে করিছে প্রবেশ ;
উঠি তার স্থলে যুবক বীরেশ
নবদন্ত ভরে শাসিছে ধরা ;
সেও লুকাইছে কিছু দিন পরে,
তার পদে আসি উঠিছে অপরে ;
এই রূপে ভাসি কাল স্রোতোপরে
চলিছে শৈশব, যৌবন, জরা।

৭

প্রতাপে প্রমত্ত কত নরপতি
তুলি জয়কেতু মৃত্যুর সংহতি,
সমরে অমর, কীর্ত্তির সন্ততি,
তোমার সমক্ষে পাইছে ক্ষয় ;
বৃহৎ সাম্রাজ্য বীর-বিভূষিত
ধরণী মণ্ডল করিয়া কম্পিত
তোমার সম্মুখে কত বিগলিত,
হেরিতেছ তুমি কালের জয়।

৮

কিন্তু নারে কাল জিনিতে তোমারে,
আদি হৈতে তুমি আছ একাকারে,
হাসিতে হাসিতে প্রত্যহ ধরারে
নব নব বেশ দিতেছ তুমি,
অমর মাধুরী, অচল যৌবনা,
নূতন বসনা, নূতন ভূষণা,
নিয়ত নবীনা, প্রফুল্ল বদনা,
অটল-বিমল-লাবণ্য-ভূমি।

৯

নক্ষত্র-কুসুম নীলাম্বর-শিরে,
শ্যামাঙ্গী যামিনী লুকায় অচিরে
তোমার প্রভায়, যবে ধীরে ধীরে
উঁকি তুমি দাও উদয়াচলে।
ধরণীর দেহ করি পরিহার
পলাইয়া যায় ঘোর অন্ধকার,
নূতন সৌন্দর্য্য ছুটে অনিবার,
মুক্ত যেন শশী রাহু-কবলে।

১০

জীবের জীবন তুমি অবনীতে ;
তব আগমনে উঠে আচম্বিতে
মৃত্যু-সহোদরা-নিদ্রাঙ্ক হইতে
জাগি জীব-কুল সুখ-হিল্লোলে।
বসি তরু-ডালে বিহঙ্গমগণে
সংগীত বরষে নিকুঞ্জে, কাননে ;
মনের বাসনা পূরিতে যতনে
মিশে গিয়া লোকে কর্ম্ম-কল্লোলে।

১১

অর্থের আকাঙ্ক্ষা, পদের লালসা,
জয়ের প্রত্যাশা, প্রেমের ভরসা,
কীর্ত্তির কামনা, সম্ভ্রমের তৃষা,
আনন্দের বাঞ্ছা, বিদ্যানুরাগ,
এই রূপ কত বাসনার বশে,
মায়ার বাজারে নরগণ পশে,
জাগি উঠি সবে তোমার পরশে,
তব বাক্যে করি আলস্য ত্যাগ।

১২

তোমার প্রসাদে ছুটে নববল,
উঠে কর্ম্ম স্থলে করম সকল,
ফুটে কাম্যবনে আহ্লাদ কমল,
জগতে নূতন শোভা বিরাজে।
তোমার কৃপায় কবিতা উদিত,
মনোহর শিল্প রঙ্গে বিকশিত,
বিজ্ঞান নিয়ত নব পল্লবিত,
ধরম নূতন ভূষণে সাজে।

১৩

উদয় অচলে উঠিতে উঠিতে
পুরাকালে তুমি পাইতে দেখিতে
উৎসুক উল্লাসে তোমায় পূজিতে,
আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ।
চাহি দেখ, দেবি, এখন আবার,
তোমার চরণে দিতে উপহার,
আনিয়াছে নব কবিতার হার,
এই দীন হীন অধম জন।

১৪

পুরাকালে তুমি যেমন হাসিতে,
এখনো হাসিছ ভারত ভূমিতে,
পুরাকালে যথা সৌন্দর্য্য বর্ষিতে,
এখনো বর্ষিছ প্রত্যহ আসি।
এখনো তেমনি সুমধুর স্বরে,
গায় তব গুণ বিহঙ্গ নিকরে,
গাইত যেমন ভারত ভিতরে,
পুরাকালে সুখ সাগরে ভাসি।

১৫

সেই হিমাচল তুষার মণ্ডিত,
অলংঘ্য প্রাচীর উত্তরে শোভিত,
সেই সপ্ত-সিন্ধু পশ্চিমে বাহিত,
পুরাকালে যাহা দেখিতে তুমি।
এখনো তেমনি ভীষণ সাগর,
রক্ষিছে দক্ষিণ দিক্ নিরন্তর,
পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র তেমনি প্রখর,
পূর্ব্বেতে যেমন হেরিতে তুমি।

১৬

পুরাকালে তুমি যেমন দেখিতে,
প্রকৃতি তেমনি আছে চারি ভিতে,
ভারত-নিবাসী আর্য্যগণ চিতে
নাহি কেন তবে পূর্ব্বের বল ?
কেন দীন-ভাবে পড়ি কর্ম্মস্থলে,
অচেতন প্রায়, কি পাপের ফলে,
কি নিদ্রার বশে, কি মায়ার বলে,
শূর-কুলোদ্ভুত হিন্দুর দল ?

১৭

এ সুপ্ত নিস্তেজ অবস্থা হইতে,
পারিবে গো উষা কবে জাগাইতে,
পারিবে কি উষা কভু জাগাইতে,
বীর্য্যহীন আর্য্য সন্তানগণে ?
কবে ভারতের এ দুখ শর্ব্বরী,
হবে অবসান, হে সুরসুন্দরি ?
পূর্ব্বের মহিমা কখনো কি স্মরি,
ধাবে হিন্দুসুত কীর্ত্তি সদনে ?

মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, সূক্ষ্ম কথাটি বুঝিতে পারিবার অগ্রে স্থূল২ কথাগুলি বুঝিয়া লয়। পরের দ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, একথা সকলেই জানে, কিন্তু কি কারণে অনুচিত, তাহা লইয়া অদ্যাপি অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। প্রত্যহ "প্রাতে গৃহ মার্জ্জন করাইবে, এবং আপনি দন্ত ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবে"—যত লোকে এই নিয়ম প্রতিপালন করে, তাহারা সকলেই কিছু পরিষ্কার থাকার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না।

ফলতঃ সভ্যতার প্রথমাবস্থায় সামান্য লোকে সদাচরণ করিবে, এ জন্য অনেক নিয়ম নিবদ্ধ থাকে। তখন তাহারা সে সকল নিয়মের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুভব করিতে পারে না। দণ্ড কি লোকনিন্দা ভয়ে তাহা প্রতিপালন করিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তির চালনা সহকারে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। তখন, পরদ্রব্য অপহরণ করা অন্যায়—পরকে আঘাত করা নিষিদ্ধ, ইত্যাদি নিয়মের পরিবর্ত্তে—পরের ক্ষতি করা অন্যায়, ইত্যাকার ধারণাই প্রবল হইয়া উঠে। তদ্রূপ প্রাতঃকৃত্য সমাধানের নিয়ম গুলি অভ্যস্ত হইলে তৎপরিবর্ত্তে লোকে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

এই রূপে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে২ বহুসংখ্যক বিশেষ বিধির পরিবর্ত্তে এক একটী সাধারণ বিধি প্রচলিত হইয়া উঠে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হয়, কারণ যে সকল বিষয়ে বিশেষ বিধির অভাব থাকে, সাধারণ বিধি প্রবল হইলে তাহা দূরীকৃত হয়। যাহারা শৌচ বিষয়ক নিয়ম এত অভ্যাস করিয়াছে যে, শুচি-বায়ুগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়; এবং পরের ক্ষতি সংক্রান্ত নিষেধ গুলিও যথাযোগ্য মতে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহারাও একথাটী বুঝেনা যে জলপানার্থ-অভিপ্রেত-পুষ্করিণীতে দেহ বস্ত্রাদি ধৌত করা অন্যায়। এবিষয়ে

বিশেষ-বিধি প্রচলিত না থাকাতে এইরূপ হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান না জন্মিলে ইহার প্রতিবিধান হইবেক না।

এতদ্ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন২ দেশে অথবা ভিন্ন২ ধর্ম্মে বিশেষ বিধিগুলি অনেক স্থলে বিভিন্ন থাকে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকাশ হয় যে, সকলের মধ্যে এক এক সাধারণ বিধি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র সমান।

আমাদিগের দেশে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অদ্যাপি এতদূর প্রবল আছে যে, সাধারণ লোক ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার নিগূঢ় মর্ম্মের প্রতি কেহ লক্ষ্য করে না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্টানদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র রোমান ক্যাথলিক মত প্রচলিত ছিল, তখন তথায়ও বিশেষ বিধির প্রাধান্য দৃষ্ট হইত। পরে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচার হইলে ঐ সকল বিধি লইয়া এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরিশেষে ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপে এক প্রকার মহা প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। যে কোন নিয়মই হউক, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিলে চিন্তাশক্তি-বিশিষ্ট একজন মনুষ্যও তাহা প্রতিপালন করিতে সম্মত হয়েন না।

খৃষ্টানেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বভাবতঃ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী কেহই পূর্ব্বে আপন শাস্ত্রীয় কথার যুক্তি লইয়া আন্দোলন করিতেন না, কিন্তু ইদানীং তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে প্রতিপক্ষ-গণকে নিরস্ত করণোদ্দেশে ঈশ্বরাদেশের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মবিধিগুলি সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। তবে যেন যুক্তিসঙ্গত না হইলে ঈশ্বরাদেশ অবহেলা করাতে দোষ নাই। একথার বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু ইহার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, এইক্ষণ সকল কার্য্য ও নিয়মের যুক্তি অবধারণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

আবার যাঁহারা কোন ধর্ম্মকেই ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না, তাঁহা-দিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ম নির্দ্দেশার্থ কতকগুলি মূল কথা স্থির করা অত্যাবশ্যক। সেই গুলি সর্ব্ববাদীসম্মত হইলে যিনি যেরূপ বিশেষ বিধি প্রতিপালন করুন, মৌলিক কথার সহিত সম্মত হইলেই তাহার প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

এই প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত কতকগুলি মৌলিক নিয়ম স্থির করা যে অতীব কঠিন তাহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ অদ্যাপি এমত একটী নিয়মও স্থির হয় নাই যে, তদনুসারে সকলেই স্ব২ কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করিবেক।

উপস্থিত প্রস্তাবে এই রূপ একটী মৌলিক নিয়মের আলোচনা করিতে সংকল্প করা গিয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভিপ্রায় আমরা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব এত দূর সাহস হয় না, তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহা মূল গ্রন্থের অনুরূপ বলিয়া গ্রাহ্য হইলেই আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবেক।

মিল বলেন যে জনসমাজে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রস্তাব হইলে কেবল এই বিচার করা উচিত যে, কথিত আচরণের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় কি না। ক্ষতি হইলে তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। নতুবা তাহার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা পুণ্য বৃদ্ধির উদ্দেশে দণ্ডবিধির দ্বারাই হউক, বা গুরুতর লোক নিন্দার দ্বারাই হউক, তাহার স্বেচ্ছাচার প্রতিবিধান করিবার অধিকার অন্য ব্যক্তি মাত্রেরই নাই।

মিল আপন মত সমর্থন জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, এবং স্থল বিশেষে এতদ্দেশের পুরাবৃত্ত ও ব্যবহার প্রণালী সহযোগে প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে।

সচরাচর সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে বুদ্ধিই মনুষ্যের পরম পদার্থ; যে ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করে না—কেবল অন্যের অনুকরণ করিয়াই কার্য্য করে, তাহাকে তাবতেই হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি প্রত্যেকেরই নিজের আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধি চালনাতে ভ্রম উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দোষ ঘটিলেও লোকে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষতি বৃদ্ধি না বুঝিয়া দেশাচার প্রতিপালন করাতে কোন প্রশংসা নাই। পরন্তু বুদ্ধি চালনার প্রতি লোকে যেমন প্রসন্নচিত্ত, মনের বাসনা পূরণ বিষয়ে তাদৃশ নহেন। প্রত্যুত, বাসনা তীব্র হইলে সকলেই নানা বিপত্তির আশঙ্কা করেন। কিন্তু বুদ্ধি যেমন, বাসনাজনিত প্রবৃত্তিগুলিও তদনুরূপ, মনের অঙ্গ বিশেষ। তাবতের মনে সর্ব্বপ্রকার স্পৃহারই মূল আছে, তৎসমুদায় তুল্যরূপে পরিবর্দ্ধিত না হইলেই তন্মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়া বিপদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, ব্যক্তি বিশেষে যে কুকর্ম্মানুরত হয়, ইহার হেতু এই যে, তাহাদিগের সদসৎ বিচারের ক্ষমতা

দুর্ব্বল, নতুবা স্পৃহার আতিশয্যেই যে তাহা ঘটে, এরূপ বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তির বাসনাগুলি অপেক্ষাকৃত সতেজ হইলে, যদিও তৎকর্তৃক কোন কোন অহিত ঘটনা হইলেও হইতে পারে, তথাচ তাহার দ্বারা অনেক বিশেষ২ হিত সাধন হওয়াও সম্ভাবিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহার তেজ থাকে, সে সকল বিষয়েই আপনার স্পৃহার স্থল দেখিতে পায়, যাহার কোন বিষয়ে স্পৃহা হয় না তাহার তেজ নাই। স্পৃহার তীব্রতা তেজের লক্ষণ। তেজীয়ান পুরুষ সৎ কি অসৎ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে নিশ্চয়ই নিস্তেজ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কার্য্যের সময় আপনার ইচ্ছার অনুগামী হইতে অক্ষম, সে ঘড়ির ন্যায় জড় পদার্থ বিশেষ, তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।

মিল এতদ্বিষয়ে উইলিয়ম হম্বোল্টের একটী বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক গুণসমূহের মধ্যে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগের সমুন্নতি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। হম্বোল্টের মতে ইহা আমাদিগের ক্ষণভঙ্গুর অভিলাষ বিশেষ মাত্র নহে—ইহা মনুষ্যের বিবেক শক্তির অনিবার্য্য প্রসব স্বরূপ, কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

মনুষ্যকে স্বভাবতঃ স্বেচ্ছা পরিপূরণ জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধি পরম্পরা দ্বারা তাহার প্রতিরোধ হইয়া থাকে; এইজন্য মিল বলেন যে, মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন অভিপ্রেত হইলে এরূপ বিধি পরম্পরা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল। কেননা পদে পদে ইচ্ছাকে বাধা দিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইবেক।

মনুষ্য একটী নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে২ তাহা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তদ্বিপরীত ইচ্ছা আর মনে উদয়ও হয় না। নিয়মের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই তদনুসারী ব্যক্তিগণের বিভিন্নতা হ্রাস ও সাদৃশ্য বৃদ্ধি হয়। তখন লোকে নিয়মগুলির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল তাহার বাহ্যিক অঙ্গগুলি প্রতিপালন করিতে থাকে। যেমন এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাত্রিকালে গৃহের প্রত্যেক কুঠরিতে দীপ রক্ষার নিয়মের স্থলে, এই ক্ষণ, এক ব্যক্তি একটী প্রদীপ লইয়া একবার তাবৎ কুঠরী ভ্রমণ করিলেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব মিল বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্পৃহাগুলি সুপ্রণালী মতে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে সকল মনুষ্যই বিভিন্নপ্রকৃতি এবং স্ব২ প্রধান হইবেন। প্রত্যেকেই অন্যের পক্ষে এক একটী স্বতন্ত্র আদর্শ স্বরূপ হইবেন। সামান্য ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বপ্রকৃতি পরিপালনের জন্য যত্ন করিতে এবং তাহার উন্নতি সাধনের উপায় করিতে পারিবে। অপিচ, সকলে এক নিয়মাবলীর অধীন না হইয়া প্রত্যেকে ভিন্ন২ পথে স্ব২ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলে রাজ্যের শাসন প্রণালীর অত্যাচার নিবারিত হইবে।

কোন দেশে রাজাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, কোথাও সম্প্রদায় বিশেষ অপর লোককে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের মতের অনুগত করিয়া রাখেন। কোন দেশে রাজ্যের অধিক সংখ্যক লোক যাহা বলিবেন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা সহস্র প্রকারে অনভিমত হইলেও তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। এরূপ রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেদ না করিলে তাঁহাদিগের অত্যাচারের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সতেজ প্রবৃত্তি না থাকিলে জেদ করা যায় না, আর আপন প্রকৃতিকে পরিপালন না করিলে প্রবৃত্তি সতেজ হয় না। অতএব, স্ব২ স্পৃহার অনুবর্ত্তী হওয়াই আপন প্রকৃতি পরিপালনের এক মাত্র উপায়। এইরূপ, আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার গুণকে ইন্‌ডিবিজুয়ালিটি অর্থাৎ স্বস্বভাবানুবৰ্ত্তিতা কহে।

অনন্তর মিল এই প্রকার স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতার একটী দোষ দেখাইয়াছেন। এই গুণ বশতঃ যাঁহারা স্বনামে ধন্য হয়েন, তাঁহারা অন্যের সমকক্ষতা সহ্য করিতে পারেন না। তাবৎ লোকের উপরে শ্রেষ্ঠতা লাভের ইচ্ছা করেন, এবং পারিলে নিকৃষ্ট ব্যক্তি গণকে আপনাদিগের ক্ষমতাধীন করিয়া ফেলেন। এরূপ লোককে কথঞ্চিৎ নিবারণ না করিলে নিকটস্থ সামান্য ব্যক্তিরা আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে পারে না; সুতরাং যে গুণের মাহাত্ম্যে এরূপ লোক জগতের রত্ন হইয়া উঠেন, তাহাতেই সামান্য ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইবার উপক্রম হয়। অতএব স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে এই নিয়ম আবশ্যক যে, আপন বাসনা পূরণের জন্য অন্যের স্পৃহার ব্যাঘাত জন্মাইতে নাই।

মিল কহেন যে, ইহার দ্বারা প্রত্যেকের মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতি হইবেক বটে, কিন্তু তদ্বিনিয়মে দুটী প্রত্যুপকার দৃষ্ট হইতেছে।

এক, স্বস্বভাবানুবর্ত্তী স্বনামেধন্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক। অপর, যাঁহারা পরের সাধ মিটাইবার জন্য আপনাদিগের স্পৃহা দমন করিবেন, তাঁহাদিগের পরোপকারিতাবৃত্তির চালনা হইবেক।

নিয়মের দাস হওয়া অপেক্ষা স্পৃহা সেবা যে শ্রেষ্ঠ, মিল এসিয়া এবং ইউরোপ খণ্ডের পরস্পর তুলনার দ্বারা তাহার এক প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, চীন ও ভারতবর্ষে সকল কার্য্যেরই এক একটী বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইহার ফল এই যে, ঐ দুই রাজ্য এই ক্ষণ নিষ্প্রদীপ হইয়াছে। এখানে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এক সময়ে সভ্যতার বিলক্ষণ উন্নতি ছিল, অতএব তাহার উদ্ভাবন কালে অবশ্যই অনেক মহাপুরুষও এখানে জন্মিয়া থাকিবেন। কিন্তু এইক্ষণ আর সেরূপ লোক হয় না। সেই মহাত্মারা নিজ২ ক্ষমতাতে যে সকল কার্য্য বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণকার অন্ধদিগের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। চীন ভারতের ঋষিরা ইউরোপের মহাপুরুষগণ অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিলেন না; তবে কেন ইউরোপের এত প্রাধান্য? মিলের বিবেচনায় ইহার এক মাত্র হেতু এই যে;—

ইউরোপের মধ্যে ভিন্ন২ দেশের ভিন্ন২ জাতিই বল, কি এক জাতির ভিন্ন২ ব্যক্তিই বল, প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে নানা প্রকারে বিভিন্ন। প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু চীন ভারতবর্ষে শাস্ত্র ও দেশাচারের এরূপ প্রবলতা যে, তাবৎ লোকে প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের অনুরূপ। ইউরোপে যে সকল মহৎ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাতে অনেক সময়ে পরস্পরের মধ্যে, এবং তাঁহাদিগের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে, নানা বিরোধ ও একদল কর্ত্তৃক অন্যের গতি রোধের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু ফলে কেহই অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই, বরং সমুদায় লোক বিভিন্নমতাবলম্বীদিগের সমগ্র উপদেশের ক্ষীরগ্রাহী হইয়াছেন। অতএব এই রূপে বিভিন্ন পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করাতেই ইউরোপীয়েরা জগতে অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

মিল বলেন যে, মতের ঐক্য বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যেখানে লোকে সকল প্রকার বিভিন্ন মত পরীক্ষা করিয়া একটী অবলম্বন করে, সেই খানেই এক মত ভাল। কারণ, একই বিষয়ে দেশকালপাত্র ভেদে মতের বিভিন্নতা হইতে পারে। অতএব যত কারণে কোন মতের বিভিন্নতা হওয়া সম্ভব, সে গুলি যত দিন বুঝা না যায়, তত দিন অসঙ্গত অযৌক্তিক বলিয়া কোন মতের প্রতি দোষারোপ করা অবিধেয়। তত দিন বিভিন্ন মতসমূহ প্রকটিত হইলে, কেবল সত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং অবস্থানুসারে কত প্রকার কথা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কেবল তাহাই প্রকাশ হয়।

এইক্ষণ মিল আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইউরোপেও স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ইংরাজ ফরাসি জাতির মধ্যে পূর্ব্বে যত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখা যাইত, এইক্ষণে আর সে রূপ দৃষ্ট হয় না, বরং অনেক বিষয়ে অনেকের মধ্যে সাদৃশ্যই দেখা যায়; ইহার হেতু এই যে, ইদানীন্তন, লোকের অবস্থা বিষয়ে অনেক সমতা হইয়াছে। এইক্ষণ বড়২ সহরে শ্রেণী বিশেষের বাসস্থান পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সকলে একই পুস্তক সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন—সুতরাং সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র আদি বিষয়ের আলোচনা সকলের মনে একই প্রকারের হইতেছে। রেলরোড ষ্টীমার আদির দ্বারা সকলে অনায়াসে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে—সুতরাং দেশ ভ্রমণ জন্য পূর্ব্বে লোকের জ্ঞান বুদ্ধির যে ইতর বিশেষ হইত, এই ক্ষণ তাহাও ক্রমশ বিলুপ্ত হইতেছে। বাণিজ্য ও কারখানার শ্রীবৃদ্ধিতে ছোট বড় তাবৎ লোক নির্বিশেষে একই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তুল্য রূপ ফলভোগী হইতেছে। এতৎ প্রসঙ্গে মিল আর একটী কারণকে অতি প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ক্ষণ উল্লিখিত দুই দেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় সর্ব্বোচ্চ-শ্রেষ্ঠ-পদ পাইয়াছে। গোপনে যে যাহা বলুক, যখন কোন বিষয়ে অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে একটী অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তখন তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। এই দুর্গতি নিবারণের কোন উপায়ও হয় না, কারণ এমন কোন সম্প্রদায় নাই যে, কেবল এই অত্যাচার নিবারণ জন্য সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করে।

প্রাগুক্ত দেশদ্বয়ে যেমত কার্য্য বিষয়ে, ঐরূপ মতামতের বিষয়েও লোকের বিভিন্নতা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। যখন রোমান ক্যাথলিক

ও প্রটেষ্টাণ্ট মত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাবৎ লোকেই তর্কপ্রিয় এবং বিবেচক হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ে আর সে রূপ মতভেদ নাই, ইহাতে সাধারণ লোকে কেবল মতটী জানিয়া ক্ষান্ত হয়, তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষের কথার প্রতি অনুধাবন করেনা, এবং কেহ তর্ক করিতে উদ্যত হইলে ইহারা আপন মতের যথাযোগ্য পোষকতা করিতেও পারে না।

ফলতঃ সভ্যতার উন্নতি সহকারে উল্লিখিত ঐক্য অবশ্যই পরিবর্দ্ধিত হইবেক। মিল তাহা অস্বীকার করেন না ; তিনি কেবল এই মাত্র কহেন যে, ঐক্যের বহুবিধ মঙ্গলের সহিত এই দোষ অনিবার্য্য এবং মতভেদের সহস্র দোষের সহিত এই মঙ্গলটী স্বীকার করা উচিত যে ঐক্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতাগুণের ইতর বিশেষ হয়, এবং তত্তৎ কারণে আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষেও ব্যাঘাত অথবা তদ্বিপরীত ফল হয়। সভ্যতাজনিত এই অমঙ্গলের প্রতিকারার্থ মিল পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরের ক্ষতি ভিন্ন অন্য কোন কারণে, কোন উপায়ের দ্বারা কাহারও স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করা অনুচিত। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। যথা ;—

১। লোকের মতামত সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম করাই দূষণীয়। সকলে স্ব২ জ্ঞান ও বিবেচনানুসারে যে মত ইচ্ছা তাহাই অবলম্বন করিবে, তাহাতে প্রচলিত মতের বিরোধীদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা অন্যায়।

২। লোকে স্ব২ মতানুসারে কার্য্য করিলে যে পর্য্যন্ত অন্যের ক্ষতি না হয়, তদবধি কোন প্রকারে তাহাদিগের কার্য্য রোধ করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রথম বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা

চতুর্থ সংখ্যা

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটীর বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্‌গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্তকাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায়, একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শীলাতলে, পূর্ব্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেই খানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব্বে পঞ্চবটী বাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন, যে সেই কদম্ব বৃক্ষে দুই একটি নব-কুসুমোদ্‌গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালী দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্ব-স্মৃতিপীড়িত করিয়া, সখীনির্ব্বাসন জনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না—তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবৰ্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতে-

ছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল," এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন মুক্ত-কণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে?

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নযোরমৃতং ত্বমঙ্গে।

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শত২ প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে তাহাকে—" বলিতে২ সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া একাজ করিলেন?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!"

এই কথোপকথনের প্রশংসা করা বৃথা। সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণাস্বরূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন; সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ,—তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থ ই সীতা-বিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।—মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখাইলেন যে সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখাইলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এক

প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা, যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জন দুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

> অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
> সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী সৈকতে।
> আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্যবদ্ধ স্তয়া
> কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভোমুগ্ধঃপ্রণামাঞ্জলিঃ। (১)

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে

---

(১) সীতা গোদাবরী সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন!

চারিদিগ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে ; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব ?” বলিতে২ রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ২ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িতা হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, “আর্য্যপুত্র ! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার ! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার২ সংশয়িতজীবন হইতেছ ? আমি যে মলেম !” এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতাপ্রায় ! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন—“রামকে বাঁচাও” বলিয়া উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাটস্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপ যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, “সখি বাসন্তি ! আমাদের কপাল ভাল !”

বাসন্তী। কিসে ?

রাম। আর কি সখি ! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি ?

রাম। আমি স্পর্শসুখেই জানিয়াছি। দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না ?

বাসন্তী। এমনতর মর্ম্মচ্ছেদ দারুণ প্রলাপে কি ফল ? আমি একে প্রিয় সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, আবার এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইলেন ?

রাম বলিলেন, “সখি, প্রলাপ কই ? বিবাহকালে যে হাত আমি কঙ্কণসহিত ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত ! সেই বর্ধাকরকতুল্য শীতল ললিতলবঙ্গকন্দলীনিভ হস্তই আমি পাইয়াছি !”

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ সীতার অদৃশ্যহস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই চিরসদ্ভাবসৌম্য শীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন। অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিতহস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃত-শীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ !" শেষে যখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না ; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি এক বার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইঁহার প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব ? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র কেন চলিলেন ?" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি প্রসীদ! আমি ক্ষণকাল এই দুর্ল্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে২ এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকটে বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে ?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল ; বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এত দিনে আমার পরিত্যাগ লজ্জাশল্ল বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধচক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "ণমো ণমো অপূব্বপুন্নজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকালজন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র!"

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রাম-সীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, যে অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। নাটকাংশে ইহা যতই দূষ্য হউক না কেন, কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্ল্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে, যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্টদশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ; লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাল্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন, এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত

করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কালে এতদূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, "স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।" (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিগে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে ;—

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধ লক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণ ধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥ (২)

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহুসেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে মাম্?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, একথা অনেক ইউরোপীয়ে সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লব কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—

---

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহশিশুও হস্তি বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ।

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি, দুই দিগ হইতে বায়ু সঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনু শোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈরুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে মীলন্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিরকূটৈরিব। (১)

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে এক বার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধরমিথুন, গগন মার্গে থাকিয়া লবচন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে২ সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাস ঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভক মধ্যে ঐ রূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টিঃ ;—

"অবিরলললিতবিকচকনককমল কমনীয় সন্ততিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্প নিপাতঃ

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি ;—

"উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙ্গ বিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালা সম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ।"

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্র সৃষ্ট মেঘ ;—

---

(১) পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতিঃবিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক পিঙ্গল বর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

"অবিরলবিলোলধূম্মন্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা ;—

"প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায় মানমেঘমেতুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবারবিশ্বগ্রসনবিকচবিকরাল কালকণ্ঠকণ্ঠকন্দরবিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগ-নিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনার দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থ বোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেননা ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বরং উত্তর-চরিতের অনেক সরলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিতে পারি না। কেন পারি না? যিনি একথার উত্তর জানিতে চাহেন, তিনি এই সমাস গুলিন ত্যাগ করিয়া সরল পদে তন্নিবিষ্ট ভাব ব্যক্ত করিতে যত্ন করুন। দেখুন, কয় পৃষ্ঠা লাগে। দেখুন, তাহাতে রসের হানি হয় কি না। (১) যদি হয়, তবে ভবভূতির দীর্ঘ সমাস নিন্দনীয় নহে। ভবভূতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি আছে, রত্নাবলী নাটকের একটি সমগ্র অঙ্ক-মধ্যে তাহা আছে কি না, সন্দেহ।

(১) সেই আশঙ্কায় আমরা এই কয়েকটি পদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, বা অন্যের কৃত অনুবাদ গ্রহণ করি নাই।

দ্বিতীয় সংখ্যা

কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটাচরণ করা হয়। যে ব্যক্তি আপনার মতকে অন্যের বিবেচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, স্বভাবতঃ তাহার এই ইচ্ছা হয় যে, সকলেই তাহার অনুগামী হউক। সুতরাং মতগ্রহণ বা মত উদ্ভাবন বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে গেলে তাহার প্রকটন পক্ষেও তদ্রূপ করিতে হয়। অতএব যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের ক্ষতিজনক কোন কার্য্য না হয়, তবে কেহ প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কোন কথা প্রকাশ করিলে তাহাকে নিবারণ করা অবৈধ হইতেছে।

প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। (১) ন্যায় সঙ্গত। (২) সর্ব্বতোভাবে ন্যায় বিরুদ্ধ এবং (৩) ন্যায় অন্যায় উভয়মিশ্রিত অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতের কতক সত্য এবং কতক অমূলক হইতে পারে।

১। যখন বিরুদ্ধমত ন্যায্য হয়।—নূতনমত ন্যায্য হইলে তাহা নিবারণ করা যে ক্ষতি জনক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ফলত প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা যুক্তি সিদ্ধ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। যত দিন মনুষ্য দেবতুল্য না হয়েন, তত দিন কেহই এমন স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না যে, আমার ভুল নাই এবং আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে কি আমার বিরুদ্ধে নূতন কথা প্রকাশ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই আপনাদিগের মতি স্থির করিবার অগ্রে বিবেচ্য বিষয়ে যত প্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তৎ সমুদায়ের প্রতি অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রচলিত মতের

বিরুদ্ধ কথার প্রতি যত্ন পূর্ব্বক কর্ণপাত করা অত্যাবশ্যক। কারণ ঐ সকল মত-স্থাপকেরা বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ রূপ করিতেন।

এতদ্বিষয়ে মিল জন্‌সনের একটী আপত্তির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন।

আপত্তি। নূতনমতের উদ্ভাবকদিগকে যতই যন্ত্রণা দেও, তাহাদিগের কথা সত্য হইলে কালসহকারে তাহা অবশ্যই প্রবল হইবেক। কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ কথা উত্থাপিত হইলে পীড়নের দ্বারা সত্বরই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা যায়; অতএব বিরুদ্ধমত নির্যাতনের দ্বারা এক প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবেক।

খণ্ডন। যদি এ কথাটী সত্য হয়, তবে মনুষ্য সমাজের বড়ই দুরদৃষ্ট। যে ব্যক্তি নূতন মত প্রকাশ করিয়া তাবতের মঙ্গল সাধন করেন তাঁহাকে, কষ্ট দিলেই কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবেক? কোথায় এরূপ ব্যক্তি জগন্মান্য হইবেন, না অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার মত সাব্যস্ত করা আবশ্যক! বাস্তবিক তর্কটী সত্য নয়। কোন মতের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করা কেবল তৎপ্রতি অনুরাগের লক্ষণ। যে মতের প্রতি সম্যক প্রকারে বিশ্বাস ও মায়া জন্মে, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক তাহা সমর্থন জন্য অনেকে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন।

ইহার প্রমাণ এতদ্দেশেও পাওয়া যায়। যথা, বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধ। বৌদ্ধধর্ম্ম এতদ্দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া চীন ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিলেন। আবার মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাবকালীন কত হিন্দু সনাতন ধর্ম্মও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে ভারতবর্ষে শাক্যমুনির নাম লোপ হওয়া আশ্চর্য্য ঘটনা। যদি মিথ্যা হয়, তবে চীনে গৌতমের আধিপত্য হওয়াও তদ্রূপ। আবার যদি বৈদিক ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে মুসলমান ধর্ম্ম কিরূপে অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে? যদি মিথ্যা হয়, তবে বৌদ্ধ মতকে কি প্রকারে পরাস্ত করিল?

এই জন্যই মিল বলেন, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বলপূর্ব্বক কোনও মত রহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

২। যখন বিরুদ্ধমত অন্যায় হয়।—মনে করা যাউক যে, প্রচলিত মতই সর্ব্বতোভাবে ন্যায্য এবং ঋষি-নির্দ্দিষ্ট অথবা ঈশ্বরাদিষ্ট; আর নূতন মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এরূপ স্থলেও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে নিবারণ করা মিলের বিবেচনায় অকর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। প্রকাশ করিতে না দিলে বিরুদ্ধ কথা ভ্রান্ত কি না, তাহা জানা যায় না। যদি বল যে, যে সকল কথা ঈশ্বরাদিষ্ট, তাহার বিরুদ্ধ কথা যে ভ্রান্ত, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব তাহা ব্যক্ত করিতে দেওয়া অনুচিত। কিন্তু কোন্ কথাটী ঈশ্বরাদিষ্ট এবং তুমি ঈশ্বরাদেশের যে অর্থ বুঝিয়াছ, তাহা সত্য কি না, সে বিষয়ে ত মত বিরোধ অবশ্যই হইতে পারে। ঈশ্বরাদেশের মধ্যে ভুল থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু তোমার মতের ভুল প্রকাশ হইলে তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইবেক; সুতরাং প্রচলিত মতানুসারে যে কথা গুলি ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া গণ্য, তাহার বিপরীত কথা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে; অতএব যতক্ষণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা ন্যায়সঙ্গত হইবার পক্ষে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে, ততক্ষণ এতাদৃশ কথা প্রকটনের প্রতি কোনও প্রতিবন্ধক থাকা মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না।

মিল লিখিয়াছেন যে, এতদ্বিষয়ে কোন কোন প্রতিপক্ষেরা বলিতে পারেন যে নূতন কথার বিচার করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, এবং তাঁহাদিগের বিবেচনায় অভ্রান্ত স্থির হইলে ইহা সাধারণের গোচর করা উচিত; নতুবা এতদ্দ্বারা অনর্থক সামান্য লোকের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিবেক। এ কথাটী মিলের মতে উপস্থিত প্রস্তাব সম্বন্ধে গৌণ কথা। কারণ, ইহা বিরুদ্ধমত প্রকাশের প্রণালী বিষয়ক বিচার হইতেছে, এবং ইহাতে মত প্রকাশের প্রতি আপত্তি না থাকাই বোধগম্য হয়। ফলতঃ ইঁহার বিবেচনায় এই উপায়ের দ্বারা উভয় দিক রক্ষা করাও দুঃসাধ্য। যদি পণ্ডিত ভিন্ন অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে না দেও, তাহা হইলে নূতন মতাবলম্বী এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদানুবাদ ভালরূপে হইবেক না, সকল কথার পরিষ্কার উত্তর প্রত্যুত্তর চলিবেক না। এবং দুর্ব্বলপক্ষ বলবানের নিকট অন্যায় মতে নিরস্ত হইবেন। আবার যদি এই সকল দোষের প্রতিবিধান করা যায়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিক কাল গুপ্ত থাকিবেক না।

দ্বিতীয়তঃ। ভ্রান্তিমূলক নব্যমত প্রকাশ হইলে কেহ না কেহ অবশ্য তাহার খণ্ডন করিয়া দিবেন, এবং এই প্রকারে যত কথা অসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবেক, ততই প্রচলিত এবং ন্যায়সঙ্গত মত উত্তরোত্তর সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ীভূত হইবেক। নাস্তিকদিগকে সমাজ হইতে দূরীকৃত করিয়া

দিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের যে প্রকার বিশ্বাস থাকে, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে, সেই বিশ্বাস গাঢ়তর হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যখন কোন বিষয়ে দুই জন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেন, তখন হীনবল ব্যক্তিকে উপহাস বা অবরুদ্ধ না করিয়া বরং উভয়কে সুপ্রণালীমতে তর্ক করিতে দেওয়াই ভাল ; কারণ একটী মত প্রকাশ্যরূপে অপসারিত না হইলে অন্যটীর প্রতি লোকে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারে না। সুতরাং সত্য মিথ্যা উভয়েই প্রায় তুল্য রূপ ধারণ করে। যেমন কোন নৈয়ায়িক দিগ্বিজয়ী হইতে বাসনা করিলে প্রতিপক্ষদিগের নিকট তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহাকে বিচারে পরাঙ্মুখ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। সেইরূপ বিরুদ্ধমতের পথ মুক্ত না রাখিলে সত্য কদাচ দিগ্বিজয়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। দিগ্বিজয়ী না হইলে সত্যের মাহাত্ম্য নিঃসংশয় হয় না। অতএব সত্যের জয় হউক, এই উদ্দেশেও ভ্রান্তমতাবলম্বীদিগকে আশ্রয় দান করা অতীব কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ। ভ্রান্তচিত্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বিদিগকে আশ্রয় দান করা পদ্ধতি থাকিলে চলিত-মত সমর্থন জন্য তাবৎকে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিতে হয় ; সর্ব্বদাই আত্মপক্ষের বক্তব্য কথা গুলির আন্দোলন করিতে হয় ; নতুবা কুতর্কীরা সত্যমতকেও পরাজিত করে।

আমরা দেখিতেছি যে, এতদ্দেশে খ্রীষ্টানদিগের সমাগম হইলে প্রথমতঃ কেবল হিন্দুধর্ম্মের দোষই প্রকাশ হইয়াছিল। অনেক বিষয়ে লভ্যের আশয়ে তৎসংযুক্ত অপরিত্যজ্য ক্ষতিগুলি অগত্যা বহন করিতে হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কোন্ কোন্ স্থলে কি কি গুণের সহিত কি২ দোষ মিশ্রিত আছে, তাহা যত দিন বুঝা না যায়, তত দিন ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় না। গোঁড়া এবং ছিদ্রানুসন্ধায়ী উভয়ই মন্দ ; কিন্তু দুই না থাকিলে প্রকৃত কথা ব্যক্ত হয় না। অতএব ন্যায়সঙ্গত কথা কালসহকারে হীনবল না হয়, এ জন্যেও কুতর্ক ও কুতর্কীদিগকে আশ্রয় দান করা কর্ত্তব্য।

৩। উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীস্থ বিরুদ্ধমত সম্পূর্ণরূপে সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। পৃথিবীতে যত প্রকার কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীভুক্ত। কিছু গুণ না থাকিলে লোকে কখনই নূতন মত অবলম্বন করে না। অতএব সেই কণামাত্র সত্য প্রদর্শনের জন্যও বিরুদ্ধ

মতকে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন মতের উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ন্যায্য কথা থাকে, নতুবা, সর্ব্বতোভাবে অমূলক হইলে তাহা অল্পকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ সময়, বুদ্ধির পরম সহকারী; অতি মূর্খ ব্যক্তিও কালবিলম্বে কাল্পনিক কথার হেয়তা বুঝিয়া লয়।

একটী নূতন কথা প্রচার হইলে প্রথমকল্পে নব্য ও প্রাচীনমতাবলম্বিদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা অল্প দিন পরেই শান্তিলাভ করে। তখন উভয় পক্ষই আপনাপন ভ্রম ও প্রতিপক্ষের গুণ দেখিতে পান। মনুষ্য সর্ব্বদাই নিজের ভ্রম সংশোধনের জন্য সচেষ্ট। এই গুণ না থাকিলে আমরা অদ্যাপি আদিম বর্ব্বরাবস্থাতেই থাকিতাম। অতএব প্রচলিত মতের ভ্রম সংশোধন জন্য তাহার বিরোধিদিগকে উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবেই বৈদিক-দিগের যজ্ঞকালীন-হত্যাকাণ্ড এবং জাতিগর্ব্ব অনেক দূর খর্ব্ব হইয়াছিল। এবং শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধেই বামাচারিদিগের মত প্রায় অদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ফলতঃ মিলের বিবেচনায় বিরুদ্ধমত ভ্রান্তই হউক বা অভ্রান্তই হউক, ইহাকে আশ্রয় দিলে সকলেই তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। তদর্থে স্ব স্ব বক্তব্য কথা গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে তর্কানুশীলনে পটু হইলে সকলেই আপন বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতে শিখে। কেহ পরের বুদ্ধিতে চলে না, কেহ নিষ্প্রয়োজন নিয়মের দাস হইয়া থাকে না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে। ইহাতে মনোবৃত্তির উন্নতি ও মানব প্রকৃতির বিভিন্নতা সাধন, দুই উদ্দেশ্যই বিলক্ষণরূপে সম্পন্ন হয়।

এই স্থলে বিরুদ্ধমতাবলম্বিদিগের সহিত কি প্রণালীতে বিচার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা লেখা আবশ্যক। মুখে২ বিচার করাই এতদ্দেশের পদ্ধতি। অন্যত্র মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লিখিত-বিচারও বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

মুখে২ বিচারের দোষ এই যে, কোন পক্ষ আপনমত সমর্থন জন্য জেদ্ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সহসা আন্তরিক বিরোধ এবং কুৎসিত বচসা হইয়া উঠে। আর সকলে তর্কের সময় মনোগত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং সত্যেরও পরাজয় হইয়া যায়।

আদালতের উকিলদিগের বাদানুবাদ বাচনিক বিচারের আদর্শস্বরূপ। কিন্তু কত সময়ে এক পক্ষের চাতুর্য্যে অপর পক্ষ অকারণ নিরুত্তর হইয়া যান এবং বিচারপতিও অমূলক কথা গ্রাহ্য করেন। পরন্তু উকিলদিগের মহৎ গুণ এই যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বচসা কি আন্তরিক বিরোধ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পক্ষে এই গুণটী অতিশয় বাঞ্ছনীয়।

ইহার কৌশল এই যে, প্রতিপক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে কেবল সেই দোষটীকে বিশ্লিষ্ট করতঃ তদ্বিষয়ক বক্তব্য কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। আদালতে বিচারপতি, ইংরাজি প্রণালীর সভাতে সভাপতি এবং লিখিত বিচারে সর্ব্বসাধারণ সেই তৃতীয় ব্যক্তির পদে অভিষিক্ত হয়েন। নতুবা কেবল প্রতিপক্ষকেই সম্বোধন করিয়া বলিলে তিনি এবং বক্তা উভয়েরই মনোমোলিন্য বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার উদাহরণ এতদ্দেশীয় দলাদলির বিচার। এই জন্য এক্ষণকার ভদ্রমণ্ডলী দলাদলির বিচারকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজি দলাদলির বিলক্ষণ গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা দলাদলির স্থলে কেহই আপন মত প্রকাশ করিতে আশঙ্কা করেন না। আমরা গুরুজন, সাহেব, কি স্বজাতীয় উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিকে সমীহা করিয়া থাকি। এই জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সকল বক্তব্য কথা প্রকাশ করিতে পারি না। ইহার এই কারণ অনুমান হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যেই এই রূপ সংস্কার আছে যে মতভেদ প্রকাশ করিলে শত্রুতাচরণ করা হইবেক। ফলতঃ ইহাকে ভীরুতার লক্ষণ মনে করা অন্যায়!

সম্প্রতি বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগের অনুকরণ পূর্ব্বক যে সকল সভা করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধদোষ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। সভাতে বিভিন্ন মত হইলেই যাঁহারা হীনবল, তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া কিছু কালের মধ্যে সভ্যশ্রেণী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এতকাল এক বাক্যে শাস্ত্র পালন করাতে আমরা কখনই মতভেদ জানিতাম না। এক্ষণ অনেক স্থলে বর্ত্তমান অবস্থাগুণে নানাপ্রকার মতভেদ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এতাদৃশ স্থলে কি কর্ত্তব্য, তাহাও শিখিতে পারি নাই। কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজ সংসর্গের আধিক্য বশতঃ মতামত বিষয়ে লোকের স্বতন্ত্রতা

পূর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে। কিন্তু দলবদ্ধ করিলে যে বল হয়, তাহাতে পূর্ব্বদেশবাসিরা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।

যাহাদিগের উদ্দেশ্য এক নহে, তাহারা কখনই একত্রে কার্য্য করিতে পারে না। অতএব সভাস্থাপন বা দলবাঁধিবার অগ্রে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনাপন মনোগত অভিপ্রায় গুলিও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐক্য হইতে না পারিলে, সভার দ্বারা কোন কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনের গোলযোগ না থাকিলে তাহার সাধনোপায় লইয়া বড় একটা মতভেদ হয় না। উপায় স্থির করিবার সময় স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা কথঞ্চিৎ দমন করিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। বাঙ্গালিদিগের প্রকৃতি এই যে, প্রবল কারণ উপস্থিত না হইলে আপন মত রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে না—কিন্তু জন্মিলে তাহাকে শাসন করিয়া রাখিতে পারে না।

এতদ্বিষয়ে ইউরোপের যুদ্ধ ব্যবসায়িদিগের এক মহৎগুণ আছে। যুদ্ধের সময় বিপদ উপস্থিত হইলে প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারিরা সমবেত হইয়া পরামর্শ করেন। তৎকালে নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতই প্রকাশ হয়, কিন্তু পরিণামে যে মত স্থির হইয়া যায়, বিরুদ্ধ মতাবলম্বিরাও তাহা স্বকীয় বলিয়া গণ্য করেন এবং ঐকান্তিকচিত্তে তাহার সম্পাদন করেন। এরূপ স্থলে বাঙ্গালিরা কেহ বা প্রথমতঃ "দাদার মতে" সম্মত হইয়া পরে কার্য্য সম্পাদন কালে গুপ্ত ভাবে তাহার ব্যাঘাত জন্মান এবং কেহ বা শিথিলচিত্ত হইয়া বেগার দেন। সুতরাং আমাদিগের কখনই মঙ্গল হয় না।

উদ্দেশ্য স্থির করিবার সময় অথবা উপায় সংক্রান্ত পরামর্শ কালে স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু উপায় স্থির হইবার পরে কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত হইলেও তদ্রূপ জ্ঞান না করিয়া তৎপ্রতি কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই উচিত; তখন আপন মতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিলে কেবল অনর্থের মূল হয়।

আমাদিগের দলাদলির কার্য্যবিধান এই যে, তাবতে এক বাক্য না হইলে কোন কর্ম্ম করা হইবেক না। ইংরাজদিগের দলাদলিতে অধিকাংশের মত তাবতের মান্য। মিল ইংরাজি নিয়মের এক দোষ দেখাইয়াছেন যে, এতদ্দারা অধিকাংশ সংখ্যার অসঙ্গত প্রাধান্য হইয়া উঠে। আমাদিগের নিয়মে তাহা হইতে পারে না বটে, কিন্তু কার্য্য

চালান দুর্ঘট হয়। অথবা পদে পদে দল ভাঙ্গিয়া সকলেই হীনবল হইয়া যায়।

লিখিত বিচার। ইহার গুণ এই যে, অনেক লোকের সহিত একবারে বিচার করা যায়, বক্তব্য কথাগুলি মনে করিবার অনেক সময় পাওয়া যায় এবং গুরুতর বিরোধ জন্মে না। দোষ এই যে, মনের ভাব গোপন করিবার অনেক সুযোগ হয়, সুতরাং ফাঁকির সমূহ প্রাদুর্ভাব ঘটে। এবং পরস্পরের মুখ দেখিলে যেমন পরিষ্কার রূপে অভিপ্রায় গুলি বুঝা যায়, লিপিতে তাহা হইতে পারে না। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত লোকের অভিলাষ জানা আবশ্যক, তাহাতে লিপি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে লিখিত বিচার চলিতে পারে না, এবং লোকের পাঠানুরাগ না থাকিলে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে না। আমাদিগের দেশে এখনও মুদ্রা-যন্ত্রের সম্যক উন্নতি হয় নাই। কেহ একখানি বহি লিখিলে সঙ্গতি অভাবে তাহা ছাপান হয় না। ইউরোপ অঞ্চলেও পূর্ব্বে ঐ রূপ হইত। না জানি, কতই কাব্য কবির দারিদ্র্য বশত কীট পতঙ্গের গ্রাসে পতিত হইয়াছে! ধনবান ব্যক্তিরা যশঃ লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। যদি দরিদ্র লেখকদিগের গ্রন্থ ছাপাইয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয়, কাল সহকারে এ দেশেও মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বাদানুবাদ চলিতে পারিবেক। ফলতঃ ইংরাজেরা এই রূপ যশকে সামান্য জ্ঞান করেন বলিয়া আমাদিগেরও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর মিল বলিয়াছেন যে, লোককে কেবল মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেই হয় না—তদনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়াও অত্যাবশ্যক। যেখানে অন্যের ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ স্থলে কার্য্য বা মত প্রকাশ উভয়ই নিবারণ করা উচিত। কিন্তু যাহাতে কেবল কর্ত্তা বা মত প্রকাশকের নিজেরই ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে এরূপ করা অন্যায়।

সকল লোকের অভিরুচি সমান নহে, একটী কার্য্য কাহারও মনে ভাল এবং কোন ব্যক্তির মনে মন্দ, দুই প্রকার বোধ হইতে পারে। হয় ত, উভয়ের মধ্যে এক জন একটী দোষ এবং অপর ব্যক্তি প্রস্তাবিত বিষয়ের একটী গুণ দেখিতে পান নাই। যদি সকল দোষ গুণ প্রকাশ হইবার পরে উভয়ে একমতাবলম্বী হয়েন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এক জন যে আপন

বুদ্ধি বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের মত গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্য্য বিষয়েও ঠিক এই রূপ। কেহ এক প্রকার, কেহ অন্য প্রকার সুখবাসনা করে। না ঠেকিলে কেহই আপনার দোষ গুণ বুঝিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃতির কিছুই ধ্বংস করা কর্ত্তব্য নহে, কোন্ প্রকৃতির লোকের দ্বারা পৃথিবীর কি মঙ্গল হইতে পারে, কি প্রকার আচরণ করিলে লোকের সুখ বৃদ্ধি হইবেক, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অতএব কাহারও ক্ষতি না হইলে কোন ব্যক্তির আচরণ গর্হিত অথবা তাহার প্রকৃতি মন্দ বলিয়া, তাহার ইচ্ছারোধ করা কর্ত্তব্য নহে।

এতদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড আমেরিকা এত যে সভ্য, কিন্তু তথায় যদি এক জন মুসলমান কোন রাস্তাতে দাঁড়াইয়া খ্রীষ্টিয়মতের কুৎসা করেন এবং তাবৎ লোককে মহম্মদের অনুগামী হইতে বলেন, তবে তাঁহার বস্ত্রাদি দূরে থাকুক, হস্তপদাদি অক্ষতভাবে প্রত্যানয়ন করা দুষ্কর হয়। এতদ্দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্যের পূর্ব্বেও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই। আমরা শুনিয়াছি যে এক বার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানকার একজন সাহেব কোট পেণ্টলুনের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা এত দূর সাহস না করিয়া তাঁহার উপরিস্থ সাহেবকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমত করিলে দোষ আছে কি? তিনি বলিলেন, "দোষ আর কি, তবে তোমাকে লাট সাহেব পদচ্যুত করিবেন, কি পাগলা গারদে পাঠাইবেন, আমি তাহাই ভাবিতেছি।"

স্বেচ্ছাচারমতে কার্য্য করিবার প্রসঙ্গে মিল বলিয়াছেন যে, ইহাতে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব যদি কাহারও ক্ষতি না হয়, তবে লোকে কেনই সেই সুখে বঞ্চিত হইবেক? বেকন্ বলিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ অবহেলা পূর্ব্বক বিবাহ করিলে কদাচ দুর্ব্বৃত্ত কি কাপুরুষ পতির নিন্দা করে না। কথাটী মিথ্যা নয়। অতএব যদি এমনই মনুষ্যের প্রকৃতি, তবে লোককে কেবল পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞান ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু যে স্থলে কোন ব্যক্তি উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করে, সেখানে এই বিবেচনা

করিতে হইবেক যে, উপদেশ-পাত্র উপদেশক অপেক্ষা দূরদর্শী, অথবা নিতান্ত অদূরদর্শী। দূরদর্শী হইলে কোন কথাই নাই। কিন্তু অদূরদর্শী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ না দেখিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানের অভাব থাকিলে পরের সাহায্যে কত দিন চলে? সুতরাং বল পূর্ব্বক মনুষ্যের দুরভিলাষ ক্ষান্ত রাখা অসম্ভব। যে জন পরামর্শ বুঝে না, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়াই ভাল। কারণ স্বকার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করিলে, পরিণামে তাহার জ্ঞান জন্মিবে।

অনন্তর মিল ইউরোপীয় পুরাবৃত্তের উদাহরণ দিয়া অকারণ আত্মসংযমের দোষ দেখাইয়াছেন।

এতদ্দেশেও কেহ কেহ এমত বিবেচনা করেন যে, আত্মসংযমই জীবনের সার কর্ম্ম। আমার অম্ল ভাল লাগে, তবে অম্লের অধীন থাকা ভাল নহে; পীড়াদায়ক না হইলেও আমার অম্লত্যাগ কর্ত্তব্য।– কেহ বলেন, গুরুসেবার ন্যায় ধর্ম্ম নাই; গুরু যাহা বলেন, তাহাতে দ্বিধা করা অকর্ত্তব্য। যদি কেহ গুরু অনুরোধে অধর্ম্মাচরণ করিতে অসম্মত হয়েন, তবে এরূপ লোকের নিকট তাঁহার অপযশের সীমা থাকে না।—কত সময়ে আত্মীয় অন্তরঙ্গের অনুরোধ ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বাক্যে "না" বলা অসাধ্য হইয়া উঠে। অনুরোধের স্থলে "আমার ক্ষতি হইবেক," একথা বলিলেও অব্যাহতি পাওয়া যায়—কিন্তু "অনভিপ্রেত" বলিলে আর রক্ষা থাকে না। যদি বাঙ্গালিরা কেবল কুপ্রবৃত্তি গুলি এইরূপে দমন করিতে পারিতেন, তবে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতাগুণের অভাব জন্য তাদৃশ দুঃখ থাকিত না। কিন্তু ভাল মন্দ কোন ইচ্ছাই আমরা সম্পন্ন করিতে পারি না। কত অসন্তোষ-জনক বস্তু মন্দ হইলেও আমরা তাহা সহ্য করি। এই জন্য রাজদ্বারেও আমরা হতাদর হইয়াছি।

ফলতঃ মিলের মতে মনুষ্যের মনোবৃত্তি গুলি স্বপ্নবৎ অসার নহে; তৎসমুদায়ের পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি সাধন করিলে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের মনে অসন্তোষ না জন্মিয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতে পারে।

মোক্ষ লাভের জন্য অসৎ কামনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি অসতের সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তি গুলিকেও নির্ব্বাণ করেন, তাঁহার প্রশংসা করা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে মায়াজালের অনেক নিন্দা আছে, কিন্তু সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভে-

চ্ছাকেও ভ্রম বলিতে হয়। তুমি যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও রিপু সংযম করিয়া পরিশেষে পরোপকার ধর্ম্মও পরিত্যাগ কর, তোমাতে আর থাকিবে কি? তুমি মুক্তিলাভ করিবে, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইবেক না। হে পরমহংস, যদি ইহা সত্যও হয়, তথাপি তুমি নিতান্ত স্বার্থপর। তোমার সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্পর্কই নাই। তুমি মহাপুরুষ; কিন্তু আমাদিগের পক্ষে তোমার জীবন মৃত্যু দুই তুল্য। আমরা দুর্ব্বহ জীবনভারে ক্লান্ত হইতেছি, কিন্তু তোমাকে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি কর না। তোমার অনুগামী হওয়া সামান্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। এবং আমি যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতেও পারি, তবে কেবল আমিই তোমার ন্যায় বেদনা শূন্য হইব; কিন্তু আমার পীড়িত ভ্রাতৃবর্গের কি হইবে? হে পরমহংস, তুমি ও তোমার উপদেশক উভয়েই অতি নিষ্ঠুর!

হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা ভার। যে ধর্ম্মে একটী পিপীলিকাকে দয়া করিতে উপদেশ দেয়, তাহাতেই বলে যে তোমার স্ত্রীপুত্র কেহই নহে; ইহাদিগের মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। কিন্তু যদি অক্রুবাণ সন্তানগণকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, অবলা স্ত্রীভগিনীকে আশ্রয় দেওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ হয় এবং বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করা মানবজাতির গৌরবের স্থল হয়, তবে আত্মাকে সর্ব্বত্যাগী করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আত্মাতে পদার্থ রাখিতে হইলে আত্ম-প্রকৃতির পরিশীলন করা অত্যাবশ্যক। এবং যাহাতে সংসারের মঙ্গল হয়, সর্ব্বদা সেই চিন্তাতে মগ্ন থাকা কর্ত্তব্য। ভূমণ্ডল মানবজাতির আবাস। যেমন গৃহসংস্কার না করিলে লোক বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যজাতির মঙ্গলার্থ পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক। উহা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিশিষ্ট কারণ বিনা আত্মসংযম করিলে, কোন পুণ্য হয় না।

প্রাগুক্ত বিষয়ে মিলের পরামর্শ এই যে, সকলকে স্ব২ মত প্রকাশ করিতে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। এতদ্দ্বারা তাবৎ লোকের জীবন সার্থক হইবেক।

অনন্তর এই আপত্তি হইতে পারে যে, এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের সীমা কোথায়? মিল্ ইহার প্রতি উত্তর এইভাবে দিয়াছেন।

লোকালয়ে থাকিলে সকলেই পরস্পরের নিকট অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। পৃথিবীতে জীবিকা নির্ব্বাহের তাবৎ পদার্থ বিনিময়ের দ্বারাই

সংগৃহীত হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু মূল্য ও পণ্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। যে দ্রব্য হইতে মনুষ্যের যত পরিমাণে সুখোৎপত্তি হয়, তাহাই ঐ দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য। টাকা যে কখনই ধান্যের তুল্য মূল্য হইতে পারে না, তাহা কেবল দুর্ভিক্ষের সময়েই জানা যায়। যে মহর্ষি লোকালয় ত্যাগ করিয়া একাকী গিরিগহ্বরে ফলমূলাহার করিয়া প্রাণধারণ করেন, তিনিও মনুষ্য জাতির নিকট অঋণী হইতে পারেন না। যতদিন দেহ মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তা কালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন, ততদিন তাঁহাকে অন্ততঃ ভাষাপ্রণেতা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক। শুকদেব গোস্বামী পৃথিবীর কিছুই জানিতেন না, কিন্তু পৈতৃক ভাষা পাইলেন কোথায় ? ভাষা এক জনের সৃষ্টি নহে, এবং পুরুষানুক্রমে সজীব না রাখিলে কেহই তাহা অভ্যাস করিতে পারেন না। অতএব যাঁহারা ভাষার সৃজন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা সকলেই জনসমাজের ঋণদাতা। যাঁহারা সমাজে থাকেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বহুতর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়েন। সেই ঋণ পরিশোধ জন্য তাবতের সমাজ রক্ষার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবং সমাজ রক্ষার্থ যে সকল ক্ষতি স্বীকার করা আবশ্যক, তাবৎ লোকেই তাহা সহ্য করিতে বাধ্য আছেন।

এইজন্য মিল বলেন যে, যাহাতে অন্য কাহার সুখের ব্যাঘাত হয়, অথবা সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের অসুখ জন্মে, অথবা যেখানে প্রত্যেকের কিছু কিছু কষ্ট বা ক্ষতি সহ্য না করিলে সমাজ রক্ষা হয় না, এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার এবং স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা নিবারণ জন্য বলপ্রয়োগ করা অন্যায় নহে।

মনে কর, যেন শত্রুজাতির হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষার্থ কোন রাজ্যে বিংশতি বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক তাবৎ অরোগী পুরুষের অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হইয়াছে—এমত স্থলে প্রাণের আশঙ্কা কিম্বা পতিপুত্রের প্রতি স্নেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য মান্য করা শুভজনক হইতে পারে না।

সর্ব্ব সাধারণ কর্তৃক ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচার প্রতিষেধ বিষয়ে মিল তিনটী স্থল দর্শাইয়াছেন—

১। যেখানে একজনের কার্য্যের দ্বারা অন্য এক কি অধিক লোকের ক্ষতি হয়।

এরূপ স্থলে মিলের মতে দণ্ডপ্রয়োগ নিষিদ্ধ নহে।

২। যেখানে এক জনের কার্য্য এরূপ হয় যে, তাহা দৃষ্টি করিলে অন্যের মনে বিরক্তি, ঘৃণা অথবা দয়াবশতঃ তন্নিবারণ ইচ্ছা উপস্থিত হয়।

এরূপ স্থলে সকলেই স্বেচ্ছামতে তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারেন এবং তদর্থে অন্যকে অনুরোধও করিতে পারেন অথবা দয়া করিয়া তাহাকে সংপরামর্শ দিতেও পারেন; কিন্তু যদ্দ্বারা তাহার গ্রাসাচ্ছাদন অথবা বসবাসের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এরূপ কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

৩। যেখানে কোন রূপ কার্য্যের সম্ভাবিত ফল, অপর ব্যক্তির পক্ষে অনর্থকর বলিয়া আশঙ্কার বিষয় হয়।

এরূপ স্থলে সেই সম্ভাবিত দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে পর তাহারই হেতু বলিয়া সেই ব্যক্তির যথাযোগ্য দণ্ডবিধান হইতে পারে। নতুবা অন্য কোন কার্য্যকে সেই ঘটনার মূল অনুমান পূর্ব্বক ঐ কার্য্যকে মুখ্য দোষ গণ্য করা এবং তজ্জন্য সেই ব্যক্তিকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহা অনিশ্চিত বলিয়াই গণ্য হইতে পারে।

এতৎ প্রসঙ্গে মিল জনসমাজের একটী দোষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে কোন অপরাধীই হউক, সে তরুণবয়সে অবশ্যই সর্ব্বতোভাবে সমাজের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে। তখন অন্যান্য লোকের স্বেচ্ছামত তাহার চরিত্র সংস্কারের চেষ্টা করা হয়; সেই চেষ্টা বিফল না হইলে সেই ব্যক্তি কখনই সমাজ বহির্ভূত আচরণ করে না। অতএব যদি সম্ভাবিত ফলের জন্য কোন প্রকার আচরণ দূষণীয় হয়, তবে সেই সমাজনিন্দিত আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দোষী।

সমাজ আত্মরক্ষার জন্য অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিয়া থাকেন। বৈরনির্য্যাতন করা দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য নহে; অতএব যাবৎ ক্ষতি দৃষ্ট না হয়, তাবৎ কাহারও প্রতি দণ্ডবিধান করা অন্যায়। কারণ ভাবী ক্ষতির বিষয় মনুষ্যের অনুমান নিতান্ত অনিশ্চিত। তুমি বল যে, কন্যাকালে বিবাহ না দিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিবেক; আমি বলি যে, তাহা নহে, বরং অপ্রাপ্তবয়সে পত্নীত্বপদ পাওয়াতে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতেছে এবং কুলোকের শঠতা না বুঝিতে পারিয়া সহসা কুপথগামিনী হইতেছে। অতএব ইহার মীমাংসার উপায় কি? প্রত্যক্ষ ফল? ফলের দ্বারা যখন কারণের গুণাগুণ নিরাকৃত হইবেক, তখন তোমাতে আমাতে মতভেদ থাকিবে না।

কিন্তু আপাততঃ বলপ্রয়োগ করিলে উভয় দিকেই দোষ। যদি আমি তোমার প্রতি এই জোর করি যে, যৌবনের পূর্ব্বে তোমার কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে না—তবে কন্যা কালে বিবাহ দিবার ফল প্রত্যক্ষ হইবেক না। আবার তোমার মতানুসারে কার্য্য হওয়াতে স্ত্রীজাতি চিরকাল অক্রুবাণ শিশুর ন্যায় থাকিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি পরিণত হইলে সমাজের কি কি মঙ্গল হইতে পারে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং এরূপস্থলে কোন প্রকার দণ্ডবিধি না থাকাই ভাল। কিন্তু যাবৎ এক পক্ষের ভ্রম দূরীকৃত না হইবেক, তাবৎ পরস্পরের দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে হইবেক।

পরিণামে একটী কথা বলা আবশ্যক যে, মিল স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা বিষয়ে যে কোন বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সভ্যতম জাতিগণেরই উপযোগী, এই কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য কি না, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ হইতে পারে। আর মিলের মতই যে সর্ব্ববাদী সম্মত, একথাও বলা যায় না; অন্য কি, লেখক নিজেই এই প্রবন্ধের সকল কথা আন্তরিক অবলম্বন করেন না। কিন্তু মিল অতি প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার মত সর্ব্বসাধারণের গোচর হইলে কোন প্রকার অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যে ভাবে এই বিষয়ের অনুধাবন করিয়াছেন, সেই ভাবেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিগে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্য শৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর এক দিগে স্ফটিক পাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত, এক জন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুক্কা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি! ছি! আগে আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষির নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারিকে "গুরু মহাশয়২" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন, এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কানে গিয়েছে ?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায়২ ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাব ?

সু। সেও একটা বাহাদুরি মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে২ ঢলাতে যাও ?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা! রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড়োনি ত ?

সু। আমি সে পোড়ার মুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবীযাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটা চটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে না কি ?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য ?"

দে। তা কি জান না ? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে ? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখ্‌তে গিয়াছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্ব্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মাল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ, দেবেন্দ্র, তুমি এত পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী, যে বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন, যে দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন ;—

"তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি

না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণায় রোগিকে দাহ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দাহ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী সজ্জায় সফল হইয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকেও যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র, একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, কিয়ৎকাল বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক! এ সংসারে কে কার! আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া, ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

আমার নাম হীরে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।

আর একজন কোথা হতে গায়িল ;—

আমার নাম হীরা মালিনী।
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা! তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন! ঝনাৎ! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে ঝুমকা; কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুরভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবাঃ, কোন্ গাছে থেকে?" আবার আর এক দিগে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেই রূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেতনী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পার্‌লেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁটা দিয়ে পূজো দেব—যাও বাপ! আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ আগতা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে ব্রাণ্ডির গেলাস ধরিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল, এবং মৃদুহাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্‌নী নাকি?" এই বলিয়া আবার আলো স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিগে আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে হীরাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—
"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি—কোথাও দেখেছি হে।"

হীরা কহিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা।" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস হস্তে তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল ;—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপ্‌ড়ি হস্তেন সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥
যাদেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নম॥
যাদেবী মমগৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ॥

তার পর—মালিনী মাসি—কি মনে কোরে?"

হীরা ইতি পূর্ব্বেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল, যে হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে২ অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। মনে২ হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে অপরিহীন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্মত্ত দেবেন্দ্রের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি? দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধর্‌তে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ধরে সিঁধ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেল খানাতে রাখ্‌বো তারে দিবা রাতি॥
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি।

ও, ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে থাকি, গিয়েছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দ কলি!—Three Cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দ্যতে মন্দজাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দি-নী! বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বসি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছে থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠ্য়েছে? মনে পড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরিত!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল;—

"এত দিনের পীরিত, তাহা জানিতেম না। প্রথম পীরিত হলো কেমন কোরে?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, সুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর।"

দে। তারপর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তারপর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! শিখে হো ছল ভেলা নট নাগর—তারপর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠ্য়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃপ্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া হীরা মৃদুহাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র তখন, ঝিমকিনি মারিয়া গায়িতে লাগিল;—

বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখ্‌তে শুনতে কালো কোলো,

পিলে অগ্র মাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।
যেতেছিল বলদ একটা,
তেঠেঙ্গো এক ঘোড়ায় চোড়ে।

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ী গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট, দেবেন্দ্রের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবী বেশে যাতায়াত করিতেছে।

শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে, শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন ;—

"কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর উপপতি। তুই যা, তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয্যা গৃহে লইয়া গেলেন। শয্যা গৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন, "বউ যাহা বলে, বলুক; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া, অনাথিনী সংসার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প২ মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথা যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর, কোথায়ই বা যাইবে?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়ন কক্ষের বাতায়ন পথের আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে২ তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সাসী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, কাঁচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধ লোচনে সেই গবাক্ষ পথপ্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতকগুলিন ঝাউ গাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চারিদিগ অন্ধকার, গাছে২ খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে২ ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাৎ আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখন মেঘে ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া, নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন২ পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে, গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কাল পেচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর, অন্য পশু দেখিয়া, সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুত বেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল, খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার, শিরোভাগ অন্ধকারে

মন্দ২ হেলিতেছে ; দূর হইতে তাল বৃক্ষের পত্রের তর২ মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে ; সর্ব্বোপরি সেই বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া২ আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

ধীরে২ একটী গবাক্ষের সাসী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র- নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষ পথে দেখিয়া, তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ দুপ! দুপ! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে- যদি জানিতে পারিতে, যে তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিগে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সমুখে করিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কাল পেচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যেন যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে২ পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দ-নন্দিনী মরে, মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর২ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর২ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথা যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষ শ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর

নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী, ফিরিয়া২ সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও!

কুন্দ চলিল, চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জাইল, মেঘ গর্জ্জাইল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জাইল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জাইল। কুন্দ! কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট পিট!———পট পট! - হু হু! বৃষ্টি আসিল, একবসনা কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথপার্শ্বে কুন্দ একটি সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুঃপার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর: মৃৎপ্রাচীরে ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকট বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল! দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কানে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। মন্দ আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক-মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কেরে মাগি!"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?" কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এসো ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।"

দ্বিতীয় সংখ্যা

পুরাণে কোন কোন হিন্দু নৃপতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণে শূদ্ররাজা নন্দবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী-স্বরূপ লিখিত আছে, "মহানন্দির ঔরসে ও শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্য্যবান্ কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্ম হইবে। তাহার সময় হইতে ক্ষত্রীয় ভূপালগণের অবনতি ও ক্রমে২ ভারত রাজ্য শূদ্র নৃপবর্গের কর কমলস্থ হইবেক। তিনি স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে একছত্র ধরণীমণ্ডলে অধীশ্বর হইয়া দ্বিতীয় ভার্গবের ন্যায় রাজ্য শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া এক শত বৎসর পৃথিবী শাসন করিবে। কৌটিল্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ক্রোধ-হুতাশন প্রদীপ্ত হইয়া এই নব নন্দবংশ ধ্বংস হইবে এবং তৎকর্ত্তৃক ময়ূরীয় নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে পাটলীপুত্রের ও যোগানন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১০৫৯ খ্রীঃ অঃ সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহীর মনোরঞ্জনার্থ রচনা করেন। বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে, চাণক্য পণ্ডিতের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ ও নন্দবংশের ধ্বংস এবং রাক্ষসের প্রভুপরায়ণতার অতি উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত মহানন্দের মুরা নাম্নী নীচজাতীয়া দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মগধদেশস্থ পাটলপুত্র নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। মুদ্রারাক্ষসে পাটলীপুত্রের অপর নাম কুসুমপুর লিখিত আছে। বায়ুপুরাণের মতানুসারে কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র, অজাত শত্রুর পৌত্র রাজা উদয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মহাবংশের বর্ণনানুসারে উদয়, অজাত শত্রুর

পুত্র ছিলেন। এই নগরী শোণ বা হিরণ্যবাহু নদীতীরে স্থাপিত ছিল,* সুতরাং আধুনিক পাটনা, প্রাচীন পাটলীপুত্র নামের অপভ্রংশ মাত্র। প্রথমাবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন, ও এই প্রদেশে তক্ষশিলা-নিবাসী চাণক্য পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত অগণ্য হিন্দু নৃপতিগণের সহযোগে আলেক্‌জণ্ডারের গ্রীক সৈন্যগণকে এককালে ভারতবর্ষের শেষ সীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু ভূপালবর্গের একতানিবন্ধন আলেকজণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষের কোন প্রধান নগরাধিকার করিতে পারেন নাই। কেবল পঞ্জাবের কিয়দংশ মাত্র জয় করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনারোহণ করিলে চাণক্যকে প্রধান অমাত্য পদাভিষিক্ত করেন। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মহাবীর আলেকজণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি সিল্যুকস্ সিরিয় হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে চন্দ্রগুপ্তকে দমন করণার্থ মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র গুপ্ত অসীম সাহস সহকারে তাঁহার গতি অবরোধ করায় তিনি সসৈন্য আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করেন—এবং অবশেষে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপিত হয়। তাঁহার একটী রূপলাবণ্যবতী দুহিতাকে চন্দ্র গুপ্তের সহিত বিবাহ দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করাতে হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু গ্রীক পুরাবৃত্ত লেখক স্ত্রাবো এ বিষয় প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস্ গ্রীক রাজদূত স্বরূপ, পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার দ্বারায় গ্রীকগণের সহিত চন্দ্র গুপ্তের বন্ধুত্ব ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বাবিলন নগরীতে সেল্যুকাসের সমীপে সর্ব্বদা বহু মূল্য উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। এ বিষয় সুবিখ্যাত যবন ইতিহাস লেখক জস্তিন, প্লুতার্ক, আরিয়ান প্রভৃতি স্ব২ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত তৎকালে ভারতবর্ষীয় সকল নৃপতির শিরোরত্নস্বরূপ ছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ২৯১ খ্রীঃ পূঃ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্য-কালে গ্রীকরাজদূত ডোনিসস্, নৃপতি টলমিফিলেদেলফস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৮০ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসার স্বীয় উপযুক্ত তনয় অশোকবর্দ্ধনকে

* শোণো হিরণ্য বাহুঃস্যৎ—ইত্যমরকোষঃ।

তক্ষশিলায় নিয়োজিত করেন। তিনি খশনামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পিতার আজ্ঞানুসারে উজ্জয়িনীর শাসন কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬৩ খ্রীঃ পূঃ বিন্দুসারের মৃত্যু হইল। এবং অশোক রাজ্য লোভে অন্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর তিষ্য ভিন্ন সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করত মগধাধিপতি হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্য করায় তাঁহাকে সকলে চণ্ডাশোক বলিত। মহাবংশে লিখিত আছে, ইনি তিন বৎসর কাল যাবৎ হিন্দুধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যহ ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অশোক বৌদ্ধ যতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করাতে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেন, এবং প্রত্যহ ৬০০০০ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে ৬৪০০০ বৌদ্ধ গুরুকে অতীব ভক্তিসহকারে ভোজন করাইতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে তিনি স্থানে স্থানে আচার্য্যবর্গকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকালের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমে তিরোহিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ সমুন্নতি হইতে লাগিল। কথিত আছে, তিনি ৮৪০০০ বিহার এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষের সকল স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা কাশী, প্রয়াগ এবং দিল্লীতে তাঁহার স্তম্ভগুলি দর্শন করিয়াছি। এক২ খণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের অঙ্গে, পালি ভাষায় পশুহিংসা নিবারণ, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, প্রভৃতি সৎকার্য্য করিতে প্রজাবর্গের প্রতি নৃপতি অশোকের আজ্ঞা, খোদিত রহিয়াছে। অশোককে প্রজাগণ অসীম ভক্তি করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। তিনি সমুদয় ভারত-বর্ষ এবং তাতার দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহার খোদিতা পালিভাষা লিপি কাবুলে কপর্দ্দিগিরি নামক অদ্রি অঙ্গ শোভিত করিয়াছিল। এই লিপি মধ্যে আন্তোকস্, টলেমি, অন্তিগোনস এবং মগাযবন নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। ও সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত উন্নতি হইয়াছিল যে, সৈবিরিয়া, চীন, গ্রীক, প্রভৃতি বিদেশীয়গণও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। গ্রীক যতিগণকে "যবনধর্ম্ম রক্ষিত" বলিত। ধর্ম্মপ্রচারকগণ অকুতোভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। এই রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হওয়াতে পাপকার্য্য এককালে ভারতভূমি হইতে তিরোহিত হইল। পাণ্ডবগণ কিম্বা অন্য কোন ভূপতির সময়ে

ভারত ভূমির এতাদৃশ উন্নতি কখনই হয় নাই। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, বিহার, চৈত্য সংস্থাপিত এবং জলাশয়, প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত রথ্যা সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে অশোক, পালিভাষায় "দেবানাম্ পিয় পিয়দশি" অর্থাৎ দেবতার প্রিয় প্রিয়দর্শী এবং ধর্ম্মাশোক নামে খ্যাত হইলেন। দ্বীপ বংশে এবং মহাবংশে লিখিত আছে, অশোকপুত্র মহামহেন্দ্র ঈত্তেয়, উত্তেয়, সম্বুল, ভাদ্র শাল নামক স্থবির সমভিব্যাহারে সিংহল দ্বীপে পোতারোহণে গমন করিয়া তাঁহার খুল্ল-তাত নৃপতি তিষ্য এবং সমুদয় প্রজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মগধদেশে বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তিনটি সভা হইয়াছিল। এই সভায় শাক্য সিংহের উপদেশ সূত্রনিচয় সটীক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সংগ্রহের নাম ত্রিপিটক। বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় সিংহলদ্বীপবাসীগণের জন্য প্রস্তুত করেন।

২২২ খ্রীঃ পূঃ নৃপতি অশোকের মৃত্যু হয়। ইনি ৪১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণে ইহাঁর বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়ূরীয় সপ্ত জন বৌদ্ধ নৃপতি সুখস্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনবল হইয়া আসিলে, সঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ পাটলীপুত্রের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। এই বংশীয় রাজা পুষ্পমিত্র ১৮৮ খ্রীঃ পূঃ একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধস্তূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেবাভূতি সঙ্গবংশের শেষ নৃপতি, ও তাঁহার মৃত্যুর পর কণ্ববংশীয় ভূপালগণ ৩১ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এ সময় হিন্দু ধর্ম্মের প্রবল জ্যোতিঃ দিন দিন বিকীর্ণ হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে মলিন করিয়াছিল। অশোকের পরে কেহই ভারতবর্ষের একেশ্বর হইতে পারেন নাই। মগধরাজ্য কিছুকাল গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ছিল। মহারাজ গুপ্ত, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে ৩১৯ খ্রীঃ অঃ গুপ্ত অব্দের প্রথম বর্ষ গণনা করা যায়। এলাহাবাদ ও ভিটারীর লাট প্রস্তরে প্রখোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, "মহারাজ অধিরাজ" সমুদ্র গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গুপ্ত বংশীয় চতুর্থ নৃপতি। সমুদ্রগুপ্ত শত্রুবর্গের কৃতান্তস্বরূপ এবং সজ্জনের সাক্ষাৎ জনিতা স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজ অসীম ভুজবলে সিংহল, সৌরাষ্ট্র, নেপাল, আসাম প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

এক্ষণ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্২ রাজ্য ভিন্ন২ নৃপতির শাসনাধীনে ছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে উৎকৃষ্ট২ কাব্য, নাটক, প্রচারিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়াছে; তিনি ৭৮ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসনে যে সকল হিন্দু নৃপতি আসীন ছিলেন, তাহার মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের নাম ভুবনবিখ্যাত। জনৈক বৌদ্ধপরিব্রাজক হিয়ান্থ সাঙ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর সুখে রাজ্য করিয়া ৬৫০ খ্রীঃ অঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থকার ধারানগরাধিপতি ভোজ রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভোজরাজ বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং স্বীয় অসীম কবিত্ব শক্তি প্রভাবে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লাল কৃত "ভোজপ্রবন্ধে" লিখিত আছে, "ধারানগরে কোন মূর্খ ছিল না। শ্রীমন ভোজরাজকে সতত বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, বামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র প্রভৃতি ৫০০ শত বিদ্বান ব্যক্তি বেষ্টন করিয়া থাকেন।" পাল বংশীয়, এবং গঙ্গা-বংশীয় ভূপালবর্গ গৌড় ও উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ সংস্কৃত কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন তাম্র শাসন, প্রস্তর ফলকে প্রখোদিত বংশাবলী বর্ণন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি হইতে এই সকল বংশের বিবরণ কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়ান্থ সাঙ ভারতবর্ষের সকল প্রসিদ্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে আমরা অনেক বিবরণ জানিতে পারিতেছি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাম্র শাসন পত্র হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, "সোম বংশীয়" গৌড় দেশস্থ সেনরাজাদিগের বংশাবলীর প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভ্রম নিরসন করিয়াছেন। এক্ষণে সেন রাজারা বৈদ্য বলিয়া কাহার ভ্রম হইবে না। কলীতিহাস ১০৭ পৃষ্ঠায় সেন বংশো-

পাখ্যানে, তাঁহাদিগকে গ্রন্থকার মহাশয় বৈদ্য স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাম্র শাসন মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, এ বিষয় স্পষ্ট সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস মধ্যে রাজতরঙ্গিণী অতীব প্রামাণিক। কাশ্মীর দেশের পুরাবৃত্ত ইহার প্রথমাংশ। ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরেতিহাস কহ্লণ পণ্ডিত বিরচিত। দ্বিতীয়াংশ রাজাবলী যোণরাজ কৃত। এই অংশ খণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয়াংশ যোণরাজছাত্র শ্রীধর পণ্ডিত বিরচিত, এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্য ভট্ট প্রণীত। শেষাংশে আকবর প্রেরিত কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর জয় ও শাহ আলমের রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাশ্মীর দেশীয় রাজকীয় ইতিহাস মৃত মুর্করাফক* সাহেব কাশ্মীর নিবাসী শিবস্বামীর নিকট হইতে বহু যত্নে সংগ্রহ করেন। পরে আসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চারি অংশ একত্রে মুদ্রিত হয়। পারিস নগরীতে ট্রয়র সাহেবও ইহার কিয়দংশ ফ্রেঞ্চ ভাষার অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছেন। কহ্লণ প্রণীত প্রথমাংশে বিখ্যাত হিন্দু নৃপতিগণের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ১১১৫ খ্রীঃ অব্দে কহ্লণ, চম্পক-তনয় সিংহদেব ভূপতির কাশ্মীর শাসন কালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নীলপুরাণ ও অপর একাদশ খানি প্রাচীন গ্রন্থ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, তাম্র শাসন পত্র প্রভৃতি হইতে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথমে পৌরাণিক বিবরণ, তৎপরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দ ভূপতির রাজ্যকাল হইতে ৯৯৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কাশ্মীর রাজ শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন। রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ললিতাদিত্য মধ্যআসিয়া পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, এবং গোপাদিত্য নরেন্দ্রাদিত্য রণাদিত্য প্রভৃতি হিন্দু ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক অতি সুনিয়মে কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের একখানি মাত্র সংস্কৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এখানি নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। কবিবর ভারতচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মান সিংহ রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালিগ্রন্থে তথা প্রস্তর-ফলক ও তাম্র শাসনে যে সকল প্রধান ভারতবর্ষীয় নৃপতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

---

* Moorcroft.

কোন মহামতি মানবসন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—
"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিব দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিব ভাসিছে কারণ জলে।

২

"দেখিব কারণ সলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া,
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিব কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল, দেখিব কিরূপ" -
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব" হলো দৈবধ্বনি,
বাজিল দুন্দুভি, ডাকিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয় দ্বার :
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ জগত ব্যাপিয়া
তরঙ্গ বহিল,—শ্রবণ ভরিল
অমর-সঙ্গীত সুধার ভার।

৪

মানবনন্দন, অমরভবনে,
আসিয়া তখন পুলকিত মনে,
দেখিল চাহিয়া অমরালয় ;
গগনমণ্ডলে নিয়ত কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরিকন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার,
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

৫

জ্বলিছে তপন গগন-প্রাঙ্গণে,
অনল-সমুদ্র যেন বা কিরণে,
শিখার তরঙ্গ ছুটে বেড়ায়।
দেখিল আনন্দে তাহাতে আসিয়া,
সুবর্ণ-কলস কিরণে পুরিয়া,
দৈত্যসুতাগণ করে পলায়ন,
কিরণরজ্জুতে করিয়া ধারণ,
আদিত্য বাঁধিছে গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়বিধুর, হৃদয় ব্যথাতে,
অসংখ্য অমর দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া হয়ে কুতূহলী,
ভুঞ্জিছে অমিয়া মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয়।—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি—শান্তি" শবদ হয়।

৮

দেব অট্টালিকা চন্দ্রাতপ তলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী বেড়ায়,
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘের পাঁতি।

৯

মহা তেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীটী ভূষা !
ধরিয়া কিরণ-বরণ সুষমা,
জলধনু তনু জিনিয়া উপমা,
শ্বেত, পীত, নীল, রক্তিমা সঙ্গেতে,
সুবর্ণ ঝরিয়া পড়িছে অঙ্গেতে—
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, উষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ভাসিছে কিরণ জালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
শত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

১১

শশীতনুছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু—চূড়ায় ;
কুসুম আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে বাদ্য যন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা পুষ্প পরে,
বিমল চন্দ্রমা কিরণে বিহরে,—
মন্দার কুসুমে সচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
সহসা মানব সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে, নয়ন ফিরিয়া
গগন উপান্তে, একত্রে মিশিয়া,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি ছাঁদ।

১৩

অধঃতলে তার, অনন্ত বিস্তার,
কারণ জলধি পরি বীচিহার,

উথলিছে রঙ্গে, ছড়ায়ে তরঙ্গে
অনন্ত প্রবাহ বহিছে তার।
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ছিঁড়িতে বন্ধন শৃঙ্খল ভার।

১৪

উপকূল ধারে, অনল কুণ্ডেতে,
শিখর প্রমাণ, শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
ছুটিয়া পবনে, গভীর গর্জ্জনে,
যেন ঐরাবত, কর আকর্ষনে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণসাগরে, পরমাণু করে,
অনাদি - পুরুষ বসি ধ্যান ভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—কম্পিত তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত্ত কত, অনন্ত মূরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারণ জলে ;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপ হারা,
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি নীরে এসেছে মিশিয়া,
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুল কায় ;
বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা পরে, মানব-আকারে,
কতই পরাণী ভাসিছে তায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুঃধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী, পুস্তক ছড়ান রয়।
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
সুধুই ইহারা জগতে জাগ্রত,
"মা ভৈ - মা ভৈ" গভীর উচ্ছ্বাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে,—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নরমণ্ডলে মানব কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি, সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হলো দৈববাণী,—
"দেখ রে মানব, এদিকে চেয়ে!"

২০

দেখিল চমকি কালনদীতারে,
গভীর চিন্তায় চলে ধীরে ধীরে
বাহিয়া দ্বিতীয় স্রোতের ধারা,
"মা ভৈ" নিনাদ শুনিতে শুনিতে,
মানব ক জন, পুলকিত চিতে,
দেবতনু-ছটা বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে পশ্চাতে করি জয়ধ্বনি,
চলেছে মানব, মানবনন্দিনী,
তূরি, শঙ্খনাদে পূরিছে অবনী,
সাগর কল্লোলে উঠিছে গীত ;

উঠিছে সঙ্গীত নিনাদ গভীর—
হৌক্ না কেন এ মাটীর শরীর,
মানবের জাতি হবে না ত লীন,
তারা, সূর্য্য, শশী আছে যত দিন—
তবে রে, মানব কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ আরবে—
"সময় বিজয়ী আয় জীব সবে,
"গাহিয়া আনন্দে অমর গীত।—

২২

"দেব অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
"কর মর্ত্তভূমি জগতে উজালা ;
"দনুজারি তেজে অবনী—অঙ্কেতে,
"কর সিংহনাদ বিজয় শঙ্খেতে,
"জাগুক জগতে মানব নাম ;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হয়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া, ভবিষ্য খুলিয়া
ত্রিলোক উজ্জ্বল মানব-ধাম ।"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নরকুমার—
শত শত দলে, মানব সকলে,
করে সিংহনাদ, মহা গর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে এ ধরা মণ্ডলে—
"স্বাধীনতা সম কি আছে আর।"

২৪

"স্বাধীনতা তরে দেবাসুর মরে
"কোরে ঘোর রণ, অমরা ভিতরে,
"দৈত্য কুলনাশ করে, মুণ্ড মালা
"পরে মহাকালী, দনুজারিবালা
"নিঃদৈত্য করিয়া অমর বাস।
"স্বাধীনতা গুণে, এ মর ভবনে,
"কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
"গেল স্বর্গে চলি, দিয়া নরবলি,
"অবনী-দানবে করিয়া নাশ।

২৫

"এ মর্ত্ত্য পৃথীতে সেই ধন্য জাতি,
"স্বাধীনতা—জ্যোতি বদনেতে ভাতি,
"তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
"হেরে পুত্র, দারা, প্রাণের হরষে,
"হাসিতে, কাঁদিতে করে না ভয়।
"করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ্য দান
"পর পদ-তলে, হয়ে ম্রিয়মাণ,
"কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
"বলে না কখন ঘাতকে জয়।

২৬

"কার তরে বল এ ধন সম্বল,
"অরে পরাধীন, পরেরি সকল,
"দারা, পুত্র, গৃহ কি হবে তোর।
"স্বাধীনতা বিনে, আলয় বিপিনে,
"জীবনের সুখ, পাবিনে পাবিনে—
"দিবস, শর্ব্বরী, সকলি ঘোর।"

২৭

কুসুমিত তনু, কদম্বের প্রায়,
মানবনন্দন দেখে পুনরায়,
সেই জ্যোতির্ম্ময় দেব-আকৃতি,
আবার ক জন, প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করেছে ধারণ
করেছে ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বসু, গ্রহ, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
কেহ বা ধরেছে পৃথিবী, জলধি,—
গাহিছে নিসর্গ নিয়ম-গীতি।

২৮

"তেজোপিণ্ডবৎ, ধূম, বাষ্প ময়, (১)
"ছিল এ ধরণী ধাতু, শঙ্খালয়,
"ক্রমে মৃণময়, মীন, কূর্ম্মবাস,
"তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
"সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব কায়।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
"চারি চন্দ্র শোভা ঘেরে বৃহস্পতি ;
"জ্যোতি-উপবীত পরে মনোহর,
"লয়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর ;
"ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
"অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া ;—
"তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।

২৯

"ধরিব গগনে পবনের গতি,
"তরল বায়ুতে শবদ-মূরতি,
"রাখিব বাঁধিয়া, দেখিব খুলিয়া
"রবির কিরণ গঠন-প্রথা ;
"আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি,
পৃথিবী উপরে,—বাসবশিঞ্জিনী
"ধরিব সুন্দর দামিনী-লতা।
"চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
"দিবাকর পাশে দেখিব গগনে,
"তারকা কুসুম ছড়ান তায়।"
গাহিতে গাহিতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে,—
নিয়তি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়।

(অসম্পূর্ণ।)

(১) এক্ষণকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল ; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও স্থির হয় নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সম্বাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। সে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লূকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ, রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটিচন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে,

তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্র', মারবেল, আলাবাষ্টার,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীন কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগা, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ কচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কাহার্ এত মঙ্গল? ঐ যে হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে, একহাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মা-বশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চসিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাসের সময়। সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা২ বড়২ ভাত, লুন লঙ্কা দিয়া আধ পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চসিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি, চষ্‌মা নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংস পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর

হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি, যে তোমা-হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে ?

আমি বলি, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার্ মঙ্গল ? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয় জন ? আর এই কৃষিজীবী কয় জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমাহইতে আমাহইতে কোন কার্য্য হইতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ? কি না হইবে ? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটী উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার্ দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌর ভীতি, বলবানকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তি হরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহলালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার প্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসার ধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত

হইবে, কেননা অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেননা যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোক মাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাস বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাসের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য-বৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা;" তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারতব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। কিন্তু সে টাকা, ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্তসামগ্রীর কোন অংশের মূল্য কি না, সন্দেহ। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য সকল পাঠাই —যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল, ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাসও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাই-বার জন্য বৎসর২ অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাস বাড়িতেছে।

চাস বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি—শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমী চাস করিয়া বার্ষিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাস করিলে, ন্যূনাধিক * ২০০ টাকা পাইব, ৩০০ শত বিঘা চাস করিলে, তিন

---

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠ্যে এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

শত টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দিন চাসের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহা দুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিন পাত করা ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উচ্ছন্ন গেল! ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মন চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে; যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল; সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা; মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার্ ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়! গত সন ১৮৭০।৭১ শালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ শালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন "পয়স্তি" ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিত রূপে হইতেছে। পূর্ব্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পাইতেছেন—সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টমহৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধি অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকেব সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভ স্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। "ইকনমিষ্ট" এই মতাবলম্বী। "ইকনমিষ্টের" ভ্রম "ইণ্ডিয়ান অবজরবরের" নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামিরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমিদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রামা কৈবর্ত্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ, সেই জমী চায়—সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত, দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত, অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এই রূপে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই—বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম্ম আছে। আইন —সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম্ম—তাহার আর একটি নাম স্বার্থপরতা। যত দূর স্ক্রু ফিরে, তত দূরে ফেরান। যখন আর ফিরে না, তখন দয়া ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। *

* আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম্ম আছে।

স্কু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত কার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলিনা যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ, কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থ বর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয় গান করিব না।

অনুষ্ঠান পত্র

"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।"

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যদ্দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান শাস্ত্র কহে।

২। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চ্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক্ উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অনেক গুলির প্রথম বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে ; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীনগ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটী গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটী আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।

অনুষ্ঠানপত্রের সাতটি ধারা ক্রমে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ধারা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিব।

১। "বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়।"

নিদাঘ ঋতুতে নিশানাথহীনা নিশাকালে উচ্চ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া—একবার গ্রহ নক্ষত্র তারকা বিকীরিত মন্দাকিনী মধ্য প্রবাহিত গগন-প্রাঙ্গণে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত কর। সেই অমল নীলিমা, সেই অনন্তবিস্তৃতি, সেই

অসংখ্য জ্বলন্ত বিন্দুপাতোজ্জ্বলীকৃতা শোভা, সেই অস্ফুট শ্বেত কলেবরা স্বর্গ মন্দাকিনী, এই সকল শোভা শোভিত দিগ্বলয় ব্যাপী সেই মহাগর্ভ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দেখিলে বিস্ময় পরিপূরিত মনে আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিবে, এ গুলি কি? কোথা হইতে আসিল? কি নিয়মে আকাশে বিচরণ করিতেছে?

আধুনিক বিখ্যাতনামা দার্শনিকেরা বলেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের অর্থ নাই। ঈশ্বরবাদীরা বলেন, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আস্তিকতার মূল সূত্র। তোমার শেষ প্রশ্ন যে বিজ্ঞান প্রবৃত্তিলতার প্রথমাঙ্কুর, তদ্বিষয়ে দুই মত নাই।

তুমি ভাবিতে লাগিলে, কি নিয়মে ইহারা আকাশে বিচরণ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে এক দিনে, দুই দিনে, এক মাসে, দুই মাসে দেখিতে দেখিতে জানিতে পারিলে যে, ঐ আকাশে সকল নক্ষত্রই ভ্রমণশীল, কেবল একটীই স্থির। ঐ স্থির তারাটি ধ্রুবনক্ষত্র। সেটি সর্ব্বদাই উত্তরে আছে। এত দিনে তুমি একটী সামান্য জ্যোতিষ নিয়ম পরিজ্ঞাত হইলে, সামান্য নিয়মপরিজ্ঞানেই কত মহৎ উপকার দর্শিতে পারে! দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের পক্ষে এই সামান্য সত্যটি অন্ধকার রাত্রিতে কত উপকার সাধন করে। এক্ষণে জটিল নিয়ম সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে কত ফল দর্শিতে পারে।

কত ফল ফলিতেছে, তাহা ত আমরা এক্ষণে অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তি বিজ্ঞানবেত্তার সহিত রাবণ রাজার তুলনা করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মহর্ষি বাল্মীকি দোর্দ্দণ্ড দশাননের অসীম প্রতাপ বর্ণনজন্য কবিকুশল কল্পনাবলে অমরগণকে তাঁহার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া লঙ্কাধিপতির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তার প্রভুত্ব এই কল্পনা-প্রসূত রাবণের প্রতাপ অপেক্ষা সমধিক শ্লাঘনীয়। সত্য বটে, দশানন কোন দেবকে মালাকর কার্য্যে, কাহাকেও বা অশ্বসেবক কর্ম্মে, কাহাকেও বা গৃহ পরিষ্কারক দাস্যে, নানা কার্য্যে নানা দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানবেত্তা কি করিতেছেন? তিনি বাষ্পরূপী ইন্দ্রদেবকে মহায়সশকটচালনে নিযুক্ত করিয়াছেন। দেবকন্যা ক্ষণপ্রভা তাঁহার প্রভা লুকাইয়া বিদ্বানের সম্বাদবাহিনীভাবে অবিরত সম্বাদ বহন করিতেছেন। অসীমতেজা প্রভাকর অন্তরালে থাকিয়া নিজকরে সহধর্ম্মিণী ছায়ার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সমক্ষে লিপিকর কার্য্যে ব্যাপৃত

আছেন। পৃথিবী দেবী, দিক্‌পাল বরুণ, পবনরাজ, সকলকেই তিনি দাসত্বে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহারা কখন বিদ্বানের ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য ময়দা ভাঙ্গিতেছেন, কখন শীত নিবারণ জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, কখন কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন, কখন ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। কভু বা বিজ্ঞানবিৎকে স্কন্ধে করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছেন। কখন পুস্তক মুদ্রিত করিয়া আনিয়া বিদ্বানকে উপঢৌকন দিতেছেন। কখন বা তাঁহার প্রমোদভবনে, রাজবর্ত্মে আলো জ্বালিতেছেন। কি বিদ্যালয়ে কি গৃহকার্য্যে কি বিচারালয়ে কি ধর্ম্ম মন্দিরে একাকী, সজন, অমরগণ, সকল কালেই সকল অবস্থাতেই বিজ্ঞানবিতের ক্রীতদাস। হরিদ্বারসাগর প্রবাহিতা ভাগীরথীকে ভগীরথ তাঁহার জন্যই অবনীতলে আনিয়াছিলেন। সেই ভাগীরথী তাঁহার জল পরিচারিকা, তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যাচলকে অবনত করিয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। হিমাচল বিদ্বানের জন্যই স্বকীয় আগারে তুষার ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন। বনস্পতিগণ তাঁহারি জন্য ফলভার বহন করে। খনি তাঁহারি জন্য উদরে করিয়া বহু মূল্য ধাতু ধারণ করে।

এখন "রত্নাকর হয়েছেন দাস, কুবের তাঁর আজ্ঞাকারী"—। দশানন সমরক্ষেত্রে দেবগণের সহায়তা পান নাই। বিদ্বানের সমরক্ষেত্রে স্বয়ং অগ্নিদেব লৌহগোলক বাহনে বিপক্ষদলে মহামার উৎপাদন করিতেছেন। তাহাতেই বলি কল্পিত বারণাপেক্ষা আধুনিক বিদ্বানের প্রভুত্ব অধিকতর শ্লাঘনীয়। কবিগুরু বাল্মীকি কলিকালে পুনঃপ্রাদুর্ভূত হইয়া স্বয়ং বিদ্বানের নিকটে রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। ভাষাবিজ্ঞান বলে বৈজ্ঞানিক মীনরূপী ভগবানের ন্যায় আবার বেদোদ্ধার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অবতার। রাবণগৌরবলোপী, প্রতাপশালী—শিবিকর্ণ সদৃশ পরোপকারী পরমযোগীর ন্যায় দৃঢ় নিবিষ্ট, সর্ব্বদাই হৃষ্ট ও সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট।

এই বিজ্ঞান বলেই আধুনিক ইউরোপীয়গণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। দেখুন, বিলাতে খাদ্য সামগ্রী অতি দুর্মূল্য, শ্রমোপ-জীবীগণ "আমার" বলিতে পারে, "আমার পূর্ব্বপুরুষের" বলিতে পারে, এমন বাসস্থান তাহাদের অনেকেরই নাই; বিলাতে কার্পাসতুলা এক ছটাক পরিমিত উৎপন্ন হয় না; হয় আমেরিকা নয় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতীয়েরা তুলা আমদানি করেন। অথচ যন্ত্র বিজ্ঞানের এমনি ক্ষমতা, মাঞ্চেষ্টরের

তন্তুবায়েরা লজ্জাহীনা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিতেছে। লাঙ্কাশায়েরে দুর্ভিক্ষ হইল, আর যে দেশে ঢাকা আছে, শান্তিপুর শিমলে কলমে আছে, বালুচর বাণারস আছে, মুঙ্গের পাটনা আছে, কালিকট কাশ্মীর আছে, মহীসুর অম্বরসহর আছে—সেই দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মন তুলা প্রতি বর্ষে উৎপন্ন হয়, যেখানে তন্তুবায়কে লিপিকর ভাস্কর বা সূত্রধার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করে, সেই দেশে, যে দেশের তন্তুজাত রোম সম্রাটের রাজ পরিচ্ছদ ছিল, যে দেশের সহিত বস্ত্রবাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া মধ্যকালে বিনিষনগর সমৃদ্ধিশালী হয়—সেই দেশে লাঙ্কাশায়েরে দুর্ভিক্ষ হইল বলিয়া হা বস্ত্র যো বস্ত্র শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল।

হা অদৃষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। মনে করুন, কোথাকার অন্নকষ্টে কোথায় পরিচ্ছদকষ্ট হইল। ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞান স্বীয় অবমাননা জন্য এইরূপে বৈরসাধন করিল। এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষা গ্রহণ কর।

অনেকে বলেন, ইউরোপীয়েরা কেবল বাহুবলে এই ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। বাহুবলেই বলুন, আর যাহা বলুন, সে কথা কতক দূর সত্য, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাটিও অত্যুক্তি দোষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান বলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন। বিজ্ঞানেই সতত চালনা করিয়াই বিদেশীয় বণিক্‌দিগকে ভারততীরে আনয়ন করেন, বিজ্ঞানই নানা যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন—এখনও বিজ্ঞান মহায়সশকট বাহনে, তড়িৎতার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবন-বাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারত-ভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।

দ্বিতীয় ধারার কথার প্রমাণার্থ তদুল্লিখিত শাস্ত্র সকলের কি প্রকার সমালোচন ছিল, দেখা যাউক।

জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বিজ্ঞান শাস্ত্র বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাঙ্গ। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ব্রহ্মদেশীয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ তালিকা পঞ্জিকার প্রাচীনত্ব বিষয়ে ফরাসী ও বিলাতি পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বাগ্ বিতণ্ডা হইয়াছে। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত, হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি স্বীকার করা, স্বজাতির গৌরব হানিকর বিবেচনা করেন।

হিন্দুজাতি অথবা আর্য্যেরাই যে জ্যোতিষ্কগণের প্রথম পর্য্যবেক্ষক, নিয়মানুসন্ধায়ক ও তত্ত্বোদ্ভাবক, তাহা ভাষাবিজ্ঞানবিৎগণের অবশ্য স্বীকার্য্য। যে সপ্তর্ষির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাকে ইয়ুরোপীয়গণ উর্সা মেজর বা বৃহৎ ভল্লূক বলেন। প্রাচীন বেদেও সপ্তর্ষি শব্দের স্থলে ঋক্ষ (ভল্লূক) শব্দ ব্যবহার আছে। কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় যে ঋচ্ ধাতুর অর্থ দ্যুতি। ঐ তারা কয়টি অতিশয় উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতা দেখিয়া দ্যুতিবাচক কোন নাম দিয়া পরে সেই নামের অর্থ ক্রমে ভল্লূক বোধ করা ও আকার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত সঙ্গত বোধ হয়। ও এইরূপ করা কেবল আর্য্যগণেরই সম্ভব হইতে পারে।

হিন্দুরা দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ আলোকবীক্ষণ প্রভৃতি কাচ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত জ্যোতিষ চালনা করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সামান্য নবদ্বীপপঞ্জিকা সেই বিজ্ঞানের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

দিবামান, রাত্রিমান, তিথিমান নির্ণয়, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত নির্দ্ধারণ—গ্রহ নক্ষত্র সঞ্চার ক্রিয়া স্থির করা, অয়ন গ্রহণ ও সংক্রমণ গণনা—সে সকল এখন অতি ভ্রম সঙ্কুল হউক না কেন, লুপ্তবিজ্ঞানের ধ্বংস চিহ্ন তাহার আর সন্দেহ নাই। এখন জীবিতবিজ্ঞান নাই, তাহার স্থানে কতকগুলি অকৃতজ্ঞ পিতৃমাতৃশূন্য দুর্ব্বল সঙ্কেত আছে মাত্র। বিজ্ঞান বলে আর্য্য ভট্ট পৃথিবীর অক্ষরেখার তির্য্যভাব অবধারণ করিয়াছিলেন ও তাহার পরিমাণ সার্দ্ধ তেইশ অংশ নির্দ্ধারণ করেন। আর এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানাভিমানীরা সামান্য সূর্য্য গ্রহণ গণনায় এক দণ্ড বা দুই দণ্ড ভ্রম করিয়া বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলেন। যদি বাপুদেবশাস্ত্রী না থাকিতেন, ত কি লজ্জার কথা হইত!

ইচ্ছা ছিল, পূর্ব্বোল্লিখিত বিজ্ঞান গুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া একে একে সকল গুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করি, প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যভয়ে তাহা করিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে দুই চারি কথা লেখা যাইতেছে।

বীজগণিত। কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া লোকে সচরাচর যে বলিয়া থাকে, "আমি অস্থিরপঞ্চে পড়িয়াছি।" সেই অস্থির পঞ্চ বীজ-গণিতান্তর্গত এক প্রকার অঙ্ক। সে অঙ্ক প্রাচীন বীজগণিতে অতি শীঘ্র সমাধা হইতে পারে। আর যে অঙ্ক যুনানী দেশে দ্যোফান্ত প্রথম উদ্ভাবন করেন, ও সেই জন্য যাহাকে দ্যোফান্তীন বলে, যাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম সিদ্ধ হয়, তাহাও হিন্দুবীজগণিত মধ্যে আমরা শুনিয়াছি। যে দেশে দ্যোফান্তের বহু পূর্ব্বে দ্যোফান্তীন কূট সাধ্য হইত, সেই দেশীয় শৌভঙ্করিক বীরগণ সামান্য ভগ্নাংশে "এক পর্ব্বতপ্রমাণ দেউল" দেখিয়া শ্লোকোক্ত বীর তাহা ভাঙ্গিতে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হয়েন। (*) তথাপি আশা করিবার অনেক স্থল আছে, কেননা আবার সেই দেশেই দেখিতেছি যে দিল্লী কলেজে সুবিখ্যাত অধ্যাপক রামচন্দ্র স্বীয় অপূর্ব্ব গ্রন্থ "গরিমা লঘিমা" প্রচার দ্বারা বিলাতীয় বিখ্যাতনামা ডিমরগণ বৈজ্ঞানিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। ও ভূয়ো প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভরসা এই, যদি মরুভূমি মধ্যে আমরা এরূপ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, তাহা হইলে কর্ষিত ক্ষেত্রে উৎসাহবারি সেচনে ভারতভূমি কল্পতরু বা কল্পলতাই উৎপাদন করিবে।

মিশ্রগণিত। মিশ্রগণিতে অজ্ঞতানিবন্ধন কত অনর্থ হইতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? আমরা উদাহরণ জন্য একটি সামান্য অনর্থের উল্লেখ করিতেছি। মানদণ্ডের (পোল্লার দাঁড়ির) উভয় সীমা মধ্যরজ্জু হইতে সমান ব্যবধানে স্থিত না থাকিলে মানদণ্ড জলতলের সহিত সমানান্তরাল হইবে না, অর্থাৎ এক দিক অন্য দিক অপেক্ষা কিছু ঝোক্তা হইবে। এই

(*) আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ।
ক্রোধ করি ভাঙ্গে তাহা পবন নন্দন॥
অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে।
দশম ভাগের ভাগ সেবালার দলে
উপরে বায়ান্ন গজ দেখ বিদ্যমান।
করহ সুবোধ সবে দেউল প্রমাণ॥

রূপ স্থলে যে দিক উচ্চ হইয়াছে, সেই দিকে পাত্রে কিছু ভার দেওয়া অর্থাৎ পাষাণ ভাঙ্গিয়া ওজন দেওয়ার প্রথা আছে, কখন ফেরে ফেরে অর্থাৎ দুই সের দ্রব্য দিতে হইলে এক সের ঝোক্তা দিকে ওজন করিয়া আর এক সের উচ্চ দিকে ওজন করিয়া দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ফেরে ফেরে মাপে সর্ব্বদাই বিক্রেতার ক্ষতি হইয়া থাকে! একথাটি মিশ্রগণিতের একটি সামান্য সত্য। মহাজনগণ যখন ঝরতি পড়্তি শুক্তি বলিয়া মান ন্যূনতার সমাধা করিবেন, তখন বিজ্ঞান অবহেলাকে কিছু অংশ দিলে সত্যবাদীর কার্য্য করেন।

রেখাগণিত। লীলাবতী গ্রন্থই রেখাগণিত চর্চ্চার প্রচুর প্রমাণ। লীলাবতী ভারতের গৌরবও বটে, ভারতের কলঙ্কও বটে। কোহিনূর হীরক মুসলমান সম্রাট্‌গণের গৌরব চিহ্নও বটে, কলঙ্কমণিও বটে। লীলাবতী নামোল্লেখে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়াছে, আমরা সেইটি এই স্থানে বলিয়া পাঠককে হাসিতে বা কাঁদিতে অনুরোধ করি না। এক দিন, দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটকের কথা হইতেছিল। বাঙ্গালি, যিনি পিরান গায়ে দেন, তিনিই সমালোচক। এক জন বিজ্ঞ সমালোচক এক জন আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই খনার স্ত্রী লীলাবতী বড় (Mathematician) ছিলেন ; দীনবন্ধু বাবু তাঁরি বিষয়ে নাটক লিখেছেন। এই পাঁচটা মিষ্ট কথা বার্ত্তা আর কি ?" আমরা উপস্থিত ছিলাম ; হাসি কাঁদি নাই। তাহাতেই কাহাকেও হাসিতে বা কাঁদিতে বলি না। হা দীনবন্ধো! ভাস্করাচার্য্য! লীলাবতী! নাটক! কাব্য! সত্য! সমালোচনা! তোমাদের এই দশা হইল! কলঙ্কিনী লীলাবতী যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই লজ্জাকর সমালোচন শুনিতে হইত না।

আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব। এগুলি মনুষ্যের কেবল শরীরধারণ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন ভারতে এগুলির বিশেষ সমাদর ছিল। অনুষ্ঠাতা বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের সাময়িক আয়ুর্ব্বেদ পত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এত যে অধঃপাতে গিয়াছে—ইয়ুরোপীয় অতি পারদর্শী চিকিৎসকেরা পুরাতন রোগ চিকিৎসায় বৈদ্যদিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না। তৈল চিকিৎসা যে অতি আশ্চর্য্য পদ্ধতি, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। সামান্য বণিকবিপণিতে এক পাত অষ্টাদশ মূল পাচনে দেখিবেন, কত বিভিন্ন ধর্ম্মের

বিভিন্ন প্রদেশের মূল একত্রিত থাকে। কোন বিশেষ রোগের প্রতীকার জন্য সেই গুলি একত্রিত করিতে প্রাচীন পণ্ডিতগণের কত অধ্যবসায় এবং কত সময় লাগিয়াছে। কিন্তু যেরূপ তাড়িত গতিতে সমস্ত লোপ পাইতেছে, বোধ হয়, এই রূপে চলিলে পরে আর কিছু দিন কপিরাজ ও কবিরাজ শব্দে কেবল বর্ণগতও নয়, অর্থগতও অনেক সাদৃশ্য হইবে।

সঙ্গীত। সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধের উৎকর্ষ দেখিয়া ও সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সময়ে অতি উন্নত সঙ্গীতবিজ্ঞান ছিল। সোমেশ্বর, কণামাঘ ও হনূমত প্রভৃতি মতভেদ দেখিলে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু শ্রীরাগে ও ভৈরবে কেহই সাদৃশ্য স্থাপন করেন নাই। করেন নাই কেন? বিজ্ঞান তৎ-সমুদায়কে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল, বিজ্ঞানবাক্য অলঙ্ঘনীয়। বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ঐ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারেন না। আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্র-জ্ঞানাভিমানিদিগের মধ্যে আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে কেন এগুলিকে বিশুদ্ধ ও অন্যগুলিকে জঙ্গলা বলেন? যাহাঁ সূক্ষ্ম জ্ঞানী তাহাদের উত্তরের তাৎপর্য্য এই যে এরূপ ভেদনির্দ্দেশ আপ্তোপদেশ মূলক মাত্র। ইহা বৈজ্ঞানিকের উত্তর নহে। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান ভিন্ন কাহাকেও ওস্তাদ স্বীকার করেন না। মানবীয় ওস্তাদের দোহাই দেখিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে পূর্ব্বতন অতি উন্নত সেই বিচিত্র সঙ্গীত বিজ্ঞান একবারে লুপ্ত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান। বেদান্তের সূক্ষ্ম গূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) ও মায়াবাদমূলক অপূর্ব্ব সংসারতত্ত্ব (Sensational) (Cosmology) কাপিল সাংখ্যের বেদান্ত বিরোধী প্রকৃতিবাদ (Materialism) অক্ষপাদ গোতমের আন্বীক্ষিকী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র (Inductive Philosophy and Logic) এবং কণাদের পদার্থ বিচার (Categorical analysis) এগুলি এক এক বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিনিধি ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব নবদ্বীপস্থ ন্যায়-শিষ্যগণের বিতণ্ডাস্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, "আহা, এই বিচারশক্তি কেবল ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অন্যান্যাভাব বিতণ্ডার পরিচারিকা না হইয়া যে দিন বস্তুবিচারের সহধর্ম্মিণী হইবে সে দিন কি শুভ দিন হইবে!" যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তাঁহাকে কে না নমস্কার করিবে? বিশেষতঃ উড্রো সাহেবকে

বাঙ্গালির শুভানুধ্যায়ী বলিয়া সকলেই জানিতেন। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

এতদ্ভিন্ন আরো কত বিজ্ঞান ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। সামান্য ভূতের ওঝারা যে এক স্থানে শব্দ করিয়া, সেই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানাগত শব্দের ন্যায় অনুভূত করাইতে পারে, এ কথা প্রায় সকলেই জানেন। কতক দূর শব্দ-বিজ্ঞান (Acoustics) জ্ঞান ব্যতীত এই শব্দানুকরণ বিদ্যার (Ventrilocution) আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। হয়ত শব্দবিজ্ঞানের কোন স্থূল সত্য উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এসকল ছিল, চর্চ্চা ছিল, মহা মহা পণ্ডিত সকল ছিলেন, এখন কি? এখন আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদের আলস্য দোষে, পরতন্ত্রতা দোষে, নানা দোষে, অনেক গুলিরই "প্রায় লোপ হইয়াছে, নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।" জিজ্ঞাসা করি, আর কত কাল এ ভাবে যাইবে?

৩। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান অবহেলা জন্য আমরা দিন২ বিদেশীয় জাতিগণের আয়ত্তাধীন হইতেছি; বস্তুবিচারে অক্ষম হইয়া কদন্ন ভোজনে, অপেয় পানে, অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনে দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি। চিকিৎসাশাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়ায় বৈদেশিক প্রথাগত চিকিৎসকগণের হস্তে পতিত হইয়া সর্ব্বদাই জ্বর জ্বালায় কাতর থাকিতে হয়। বিজ্ঞানের ক্রমেই লোপ সম্ভাবনা। "সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ও তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়-বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা সভা স্থাপিত হইবে।" আমরা এই প্রস্তাবের কায়মনোবাক্যে অনুমোদন করিতেছি। অনুষ্ঠাতার মঙ্গল হউক, অনুষ্ঠান সফল হউক।

৪। "ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।" উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তার আর সন্দেহ কি? "আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে" বা হইতেছে, "তাহা রক্ষা করা" ("যথা মনোরম ও জ্ঞান দায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা" ইত্যাদি) "সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।" কেবল পুস্তক মুদ্রন ব্যতীত লুপ্তপ্রায় বিষয়ের

অন্যবিধ রক্ষা করা আবশ্যক বোধে আমরা অনুষ্ঠান পত্রের অর্থাৎ শব্দের স্থানে যথা ও পরে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিলাম। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ; যেমন বারাণসীস্থ মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিক সংস্কার অথবা প্রাচীন যন্ত্র সকল বা যন্ত্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করা, প্রাচীন মুদ্রা, দানফলক বা আদেশ-ফলক সকল সংগ্রহ করা, লুপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য এগুলি সকলই আবশ্যক। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরো অনেক গুলি আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য হইতে পারে, ও হওয়া উচিতও বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে বিজ্ঞানে যত্নশীল করিতে হইবে, ও তাঁহারা যত্ন করিতেছেন কি না, তাহা সর্ব্বদা দেখিতে হইবে। আর (কথাটা বলিতে কিন্তু লজ্জা হয়) তাঁহারা বিজ্ঞানে যত্ন করিয়া কিছু আর্থিক উপকার পাইতেছেন কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। সে বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য সমাজ স্থাপিত হইলে বলিব।

৫। এই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী, ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, "যে তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করেন।"

৬। অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরকারিদিগের নাম সাদরে গ্রহণ করিতেছেন।

এই অনুষ্ঠান পত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ ৪০ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে এই তালিকা খানি একটি আশ্চর্য্য দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না থাকাতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।

আমরা উপসংহারে আর গোটা দুই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গ-ধনীগণ, আপনারা মহেন্দ্র বাবুর ঈষৎ বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলঙ্কভার শিরে কেন বহন করেন ? সকলেই অগ্রসর হউন। যিনি এক দিনে লক্ষ মুদ্রা দান করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন। পুত্র কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন ? উড্রোসাহেব ভয়ানক বিজ্ঞানগুণঅস্বীকারদোষ বঙ্গসমাজ-মস্তকে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একবার মুক্ত হস্তে দান

করিয়া সমাজ স্থাপন করিয়া স্বীয় ভ্রম দূর করুন। বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। মহাত্মা উড্রো সাহেবকে বলি, তিনি কাম্বেল সাহেবকে চিঠিতে যা বলিয়াছেন, তাহার কথায় আমাদের কাজ নাই, তিনি কেন একবার স্বজাতীয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্য্যের সাহায্য করিতে বলুন না। যদি তালিকাতে একটিও শ্বেতাঙ্গের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত আক্ষেপের বিষয় হইবে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার রাগ

হীরার বাড়ী পাচির আঁটা। তুইটি ঝর্ ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আল্‌পনা—পথ আঁকা—পাকি হাঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা কালো চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালির হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে!

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেই খানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি তুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। তুই প্রহর বেলা আয়ী যখন স্নানে যায়, তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ের শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির তুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজন মাত্র কখন২ রাত্রে শিকল নাড়ে।

সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নড়িলে, বলে, "কট কট কটাঃ, তোর মাথা মুণ্ড উঠা, কড়্ কড়্ কড়াং, খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তাত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটী, দেখি কেমন আমার হীরেটি, খিট খাট ছন্, উঠলো আমার হীরামন্। ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্—আয়রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল। বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও, গঙ্গাজল! একি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিক স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র পোড়া—মুখ ভাঙ্গা, নাক খাঁদা—কপালে উলকী। কসে তামাকু পোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য—তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি না কি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আবার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশ ভূষা করিয়া, মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেঁচে তুল্‌ব নাগর পতন করো্য কায়॥"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টনটনে। হীরার

সঙ্গে আজি অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তব স্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে ? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, কুন্দনন্দিনী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া যাও নাই। বোধ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে সকল কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।

হী। কুন্দনন্দিনী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।

দে। তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে ?

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম, কুন্দনন্দিনীর কথা ছল মাত্র। তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা, এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে, হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয় ! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গাহিলেন।

"এসেছিল বক্‌না গোরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে—"

বিংশতি পরিচ্ছেদ

হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাঁহাকে শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া কুন্দ, আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে২ পাড়ায়২ কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা দেবেন্দ্রের সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত প্রণয় হইলে কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না. দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামির বিরাগে আরও মর্ম্ম ব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ সারিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া,

কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখদুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানি ত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? কেন, বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোকে বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হলেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি! পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। এদিকে, যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দেবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তাহা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরাও যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হইলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন মিনে, ঘ্যান ঘেনে, প্যান পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্ম ফুল ফোটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর পীরিত হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠার্‌য়ে কি হবে! ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করেছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ; তোরে মজা

দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধর্‌তে গিয়া আপনার প্রাণটা চুরি গেল। কি মুখ খানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিনসের নাকে এক কিল। আহা, এমনই ভাল বাসিতে আরম্ভ করেছি যে, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক, ওসব কথা যাক্‌। ও পথেও ত ধর্ম্মের কাঁটা। ইহজন্মের সুখ দুঃখ অনেক কাল ঠাকুরদের দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেই গা জ্বালা করে। বরং কুন্দ যাহাতে কখন তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়! কুন্দ যেখানে ছিল—সেই খানে থাকিলেই তার হাত ছাড়া! সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসুদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না! তবে সেই খানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ী মুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মেলে বাপু বাছা বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি কর্‌বেন? সূর্য্যমুখীর থোতা মুখ ভোতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা! সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন বল্‌বো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট, সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খামখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্ত বাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে

করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্যে। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তাহলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির কর্‌বে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেইটা আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু ষোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করিবেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম শিয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরি মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে কর্‌লে কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে কর্‌বো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমনটা হয়, তাহলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দেব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে পড়িলেই বাবুর ভালবাসাটা পেকে আস্‌বে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। তত দিন আমি বসে২ কুন্দকে উঠ্‌বস্ করান মক্‌শ করাই। আগে আয়ীকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না!"

এই রূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেই রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া, আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়া দিল, এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমায় এত ভালবাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে। কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হইলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাঁহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মনিব বাড়ী আসিয়া গৃহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ

করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদ পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন২ করতেছে, তুই আমার কাজ গুল কর না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকার হইয়া বলিল, "তা করিব বই কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর,—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি—তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই? তুই গালি দিস্?" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মোলো! আবার বলে কখন গাল্ দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা? আমি কি মর্‌তে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বল্‌বে উনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন! তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বন্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন—যম ত আর তোকেও ভুল্‌বে না, আমাকেও ভুল্‌বে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতঃবাক্যে কখন না ভোলে! তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! তুমি শীগ্‌গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য কবিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল। "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ার মুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!" কোন্দল বিদ্যায় হীরার অপেক্ষায় কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটিখেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধ লক্ষণ—এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল, অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বড় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে? তুই আগে দিলি গাল্—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয়, যা। আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা চল্লেম," বলিয়া হীরা চক্ষুর জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিয়ানা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সেকি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাযের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি, বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন, ঠিকানা নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এই বার বলিল, "সে দিন কুন্দনন্দিনী ঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দ ঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেই রূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

নগেন্দ্র। সে কি কথা?

হীরা। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাটে অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ্ বাড়ী যা। কাল্ ডাকাব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবরিত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

নগেন্দ্র। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে আমি কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া, তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্র লোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে?

কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস করিলে কেন ?”

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন ?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে২ সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়ন জলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না ?”

নগেন্দ্র বলিলেন, “তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।”

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত কমল তুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া, বলিলেন, “কি বলিব তোমায় ? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি ? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে ; আমি যথার্থ, আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।”

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব ? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব ? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই ; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড় হাত করিয়া, কাতরস্বরে বলিলেন, “যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতিকথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা

ছিল তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্য্যমুখী! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেননা অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আমার সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিবনা। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না? এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেই রূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতীকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেকপরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামির পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—"এক ভিক্ষা।"

নগ। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করি না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর একমাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখী তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

পঞ্চম সংখ্যা

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধ সম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামানুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা, ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গ মধ্যে ছিলেন।

সীতা বিসর্জ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহ সমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবীকর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কার্য্যের কি মর্ম্ম?" নটদিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্ত্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত, জল মধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন! দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা, অরুন্ধতীকর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "উঠ, আর্য্য পুত্র!"

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোক সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীতা হয়েন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই "সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতাশপথ দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতোনৃপঃ
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালি রথকাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রোদীর্ঘতমা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥
পুলস্ত্যোপিতথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চদীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥
গর্গশ্চচ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চসুপ্রভঃ॥

নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতেচান্যেচবহবোমুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
কৌতূহল সমাবিষ্টাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চমহাবীর্য্যা বানরাশ্চমহাবলাঃ ॥
সর্ব্বএব সমাজগ্মুর্ম্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়াশ্চৈব শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈবসহস্রশঃ ॥
নানাদেশ গতাশ্চৈব ব্রহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথ বীক্ষার্থং সর্ব্বএব সমাগতাঃ ॥

তদাসমাগতং সর্ব্বং মশ্মভূতমিবাচলং।
শ্রুত্বামুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতং ॥
তাং দৃষ্টাশ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মাণামনুগামিনীং।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃসীতাং সাধুবাদোমহানভূৎ ॥
ততোহলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনা কুলিতাত্মনাং ॥

সাধুরামেতি কেচিত্তু সাধুসীতেতি চাপরে।
উভাবেবচত ত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুকুশুঃ ॥
ততোমধ্যেজনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনি পুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকি রিতিহোবাচ রাঘবং ॥
ইযং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রম সমীপতঃ ॥
লোকাপবাদ ভীতস্য তবরাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥

ইমৌতু জানকী পুত্রা বুভৌচযমজাতকৌ।
সুতৌতবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমিতে ॥
প্রচেতসোহং দশমঃ পুত্রোরাঘবনন্দন।
নস্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌতু তব পুত্রকৌ ॥
বহুবর্ষ সহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়াকৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যাদৃষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসাকর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং নকিল্বিষং।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥

অহং পঞ্চসু ভূতেষুমনঃ ষষ্ঠেসু রাঘব।
বিচিন্ত্যসীতাশুদ্ধেতি জগ্রাহ বন নির্ঝরে ॥
ইয়ং শুদ্ধ সমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদ ভীতস্য প্রত্যয়ন্ত বদাস্যতি ॥
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধ ভাবা।
দিব্যেনদৃষ্টি বিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা ॥
লোকাপবাদ কলুষীকৃতচেতসায়ৎ।
ত্যক্তাত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥

১১০ সর্গ

বাল্মীকেনৈব মুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বাতাং দেববর্ণিনীং ॥
এবমেতন্মহাভাগযথাবদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যযস্তমমব্রহ্মংস্তববাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরাদত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চকৃতস্তত্রতেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥
লোকাপবাদোবলবান্ যেন ত্যক্তাহিমৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ॥

পরিত্যক্তা ময়া সীতা তত্তবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামিচেমৌপুত্রৌ মেযমজাতৌকুশীলবৌ ॥
শুদ্ধায়াংজগতোমধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তমে।
অভিপ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ॥
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্বএব সমাগতাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চদেবাঃ সর্ব্বেতে সর্ব্বেচ পরমর্ষয়ঃ ॥

নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বেহৃষ্ট মানসাঃ।
দৃষ্ট্বাদেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥
প্রত্যযোমেমুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তমে ॥
সীতা শপথ সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
ততোবায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥
তংজনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠা হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ।
তদদ্ভুত মিবাচিন্তং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ ॥

মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা।
সর্ব্বান্ সমাগতা দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী॥
অব্রবীৎপ্রাঞ্জলি বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী।
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিন্তয়ে॥
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে॥
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মেবেদ্মি রামাৎপরং নচ॥
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
তথাশপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতং॥
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং।
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ॥
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ন বিভূষিতৈঃ।
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্যমৈথিলীং॥
স্বাগতে নাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ।
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং॥
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ।
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ॥
সাধুসাধ্বিতিবৈসীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং।
এবং বহুবিধাবাচোহ্যন্তরীক্ষ গতাঃ সুরাঃ॥
ব্যাজহ্রুহৃষ্ট্র মনসো দৃষ্ট্বা সীতা প্রবেশনং।
যজ্ঞবাট গতাশ্চাপি মনুষ্যঃ সর্ব্বএবতে॥
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে।
অন্তরীক্ষেচ ভূমৌচ সর্ব্বেস্থাবর জঙ্গমাঃ॥
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ।
কেচিদ্বিনে দুঃসংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যান পরায়ণাঃ॥
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ।
সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্বাতেষামাসীৎ সমাগমঃ॥
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই দুই সর্গের অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা মার্জ্জনা করিবেন। এই সংস্কৃত অতি সরল—যাঁহারা অত্যল্প সংস্কৃত জানেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন।

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে২ ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্২ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক২ খানি প্রস্তর পৃথক্২ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি২ বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর মাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে, সমুদায় অট্টালিকাটি এক কালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এক কালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেই রূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমত অপকৃষ্ট, যে তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যে এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, উৎকৃষ্ট বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেননা তদুভয় মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রেই প্রশংসনীয় নহে। রেনল্ড্‌স্ নামক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়। কেননা সেই সকল

সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই, কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয়গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধানপদে অভিষেক করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ মধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গতি গুণ বিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়পর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি?* কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্হো অপেক্ষা এক বাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়ার বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে,

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুস্পিন্' খেলার একই দর।

কাব্যে প্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে, "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেননা বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিনির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞা বিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেননা চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।"

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে তাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্তপ্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেননা লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে পৃথিবীর আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, ঈশা এবং বুদ্ধ ভিন্ন কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা, বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক, যে উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই মনুষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা

স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রাকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এই রূপ যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি প্রধান। তৎপরেই মহাভারতকারের নাম নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

মহাভারতের পর, বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিতে হয়। তৎ পরে শকুন্তলার প্রণেতা। ভারতবর্ষের আর কোন কবিকে এ সম্বন্ধে অত্যুচ্চশ্রেণী মধ্যে গণা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিন খানি নাটক পর্য্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্যও নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তর চরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টি চাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখ কাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানব রূপিণী। সেই রূপ গুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধ-কাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্র সৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তর চরিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনীশক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের, কেবল নিয়ম গুলিই অগ্রাহ্য এমত নহে, তাঁহাদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলিও পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটী ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী,—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ী-ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই;

কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ীভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোত্থিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননা সঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপবিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন, যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে—জলভরিদমেহ থণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণুএসো ভারদী নিগ্‌ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মাবেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎসংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটী মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রাম বিলাপের সহিত, আর কয় খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে

আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্যপ্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ, বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর২ কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডল রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটক খানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্লকুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরল স্বভাব কুরঙ্গ—সেই খানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী! তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা এক জন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

যেমন জ্যোতিষ্ক সকল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃথক অথচ সংযুক্ত-রূপে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিভিন্ন হইলেও কোন অদ্ভুত কারণে আকৃষ্ট হইয়া একত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকেই সময়ে সময়ে মনে করেন যে, "একাকী আসিয়াছি, একাকী মরিতে হইবেক," অতএব "পার্থিব সম্পর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর;" পরন্তু এতাদৃশ বৈরাগ্যভাব কেবল ভাবুকদিগের কল্পনা মাত্র। যদ্যপি পার্থিবসম্পর্ক বৃথাই হয়, এবং মৃত্যু কর্ত্তৃক তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কেন? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী আদি নিকৃষ্ট জন্তু এবং নদী বৃক্ষ গৃহ পুষ্করিণী আদি নির্জ্জীব পদার্থের উপরেও মায়া সংস্থাপিত হয়। বহু দিন হইল পিতৃ মাতৃ হীন হইয়াছি, তথাপি "মাতা এই স্থানে বসিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, পিতা এইখানে একবার ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং এইখানে বসিয়া তাঁহাদিগের অন্তিমকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি।" এইরূপ কথা মনে হইলে কত সময়ে চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। অতএব কি রূপে বলিব যে, তাঁহাদিগের সহিত এখন আর সম্পর্ক নাই। সদ্যো-প্রসূত সন্তানই হউক, অথবা অতি দীন দুঃখী কিম্বা নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারই হউক, কেহই মৃত্যুমাত্র সংসার হইতে সর্ব্বতোভাবে অপসারিত হইতে পারে না। দেহ পঞ্চত্ব পায়, জীবাত্মা কোথায় থাকেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মতি স্থির নাই; তথাপি কোন২ জীবিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যে কিছুকাল থাকিতে হইবেক, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। এমন মনুষ্য নাই,

যে কোন মৃত ব্যক্তিকেই স্মরণ করে না অথবা আপনি মরিলে স্মরণ করিবার লোক নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এই অদ্ভুত মায়াজাল কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কাহারও ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না— এবং পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমাদিগের বিবেচনায়—ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্যও নহে। অতএব ইহা হইতে যে প্রকারে সমাজের মঙ্গল হয়, সেইরূপ বিধান করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা ইহাকে ভাল মনে করেন, তাঁহা-দিগের দ্বারা এই মায়া জাল বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত এবং যাঁহারা ইহাকে মন্দ মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও অগত্যা ইহার আনুষঙ্গিক দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক লোকের হিত চেষ্টা করা নিতান্ত বিধেয়।

মনুষ্য জাতি যে পশুগণের ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ না করিয়া একত্র বসবাস করেন, তাহার আদি কারণ, বিবাহসংস্কার। শুদ্ধ নিজের আহারাচ্ছাদন লোকের উদ্দেশ্য হইলে, অতি অল্প আয়াসেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পরের চিন্তাতেই নিতান্ত ব্যস্ত। পরিবারের ভরণ পোষণ, এবং সন্ততিগণের ভাবি অবস্থা সকলের মনেই নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কেহ অন্যান্য আত্মীয়দিগের মঙ্গল, এবং কেহ বা স্বদেশবাসিদিগের হিত অথবা সমগ্র মনুষ্য সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যানে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। জনসমাজে বিবাহপ্রথা না থাকিলে ইহার কিছুই মনুষ্যের মনে উদয় হইত না। বিবাহ হইলেই স্ত্রীপুরুষের পূর্ব্বকালীন স্বাধীনভাব নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং উভয়ের মনেই আত্মচিন্তার পার্শ্বে পরচিন্তা আসিয়া আবির্ভূত হয়। তখন নিজের সম্বন্ধে যতই তাচ্ছল্য থাকুক, পতিপত্নীর মঙ্গলকামনা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন সংকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করে, তাহার জন্য 'মহা-মায়াকে' নিন্দা না করিয়া তাহার দারিদ্র্য নিবারণের উপায় চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

আবার বিবাহের পর সন্তান উৎপত্তি হইলে, পতি পত্নীর মধ্যে নূতন একটী শৃঙ্খল নিবদ্ধ হয়। যে দেশে বিবাহপ্রথা নাই, এবং স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই এতদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী, সেখানে কেহ সন্তানলাভের সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারে না। জন্মদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্ত্তে না, মাতাও তাহার জন্য আপনার ভিন্ন

অন্যের প্রতি নির্ভর করেন না; সুতরাং সন্তান স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-বৃদ্ধিকারী না হইয়া বরং বিচ্ছেদের হেতু হয়। বিবাহ সংস্কারকে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে চুক্তি বিশেষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে বটে, কিন্তু সন্তানের সহিত সম্পর্ক কখনই সেরূপ বোধ হয় না; অতএব ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বিবাহের নিগূঢ় মর্ম্মবোধ হইবেক। মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্বেতকেতু পিতৃ সমক্ষে আপন মাতাকে কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া, এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সেবা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটী বিবাহ প্রথা সংস্থাপনের রূপকমাত্র। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পুত্রই মাতার স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন এবং পিতাকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখেন। অতএব পতি পত্নী সম্বন্ধ শিথিল করা কর্ত্তব্য নহে বরং যত প্রগাঢ় হয়, ততই তদুভয় এবং পুত্রের পক্ষে মঙ্গল। আর এই মঙ্গলে সমস্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেরই মঙ্গল।

পতি পত্নীর চিরকাল একত্র থাকাই শ্রেয়। এ কথা স্বীকার করিলেও আর একটী পৃথক মীমাংসার প্রয়োজন হইতেছে যে, পুত্র কন্যারাও পিতৃসংসারে মাতার ন্যায় সংযুক্ত থাকিবেন কি না? কিন্তু যখন (নানাবিধ বিশিষ্ট কারণে) ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিবাহান্তে পুত্র কন্যা উভয়েই কখন পিতৃ আবাসে থাকিতে পারেন না; হয় কন্যাকে পতিগৃহে যাইতে হইবেক,—নতুবা পুত্র পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া আপন শ্বশুরালয়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমাদিগের দেশে কেবল কন্যাই পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পুত্র কন্যা উভয়েই বিবাহিত হইলে স্বাধীনভাবে কালযাপন করেন। এই নিয়মে সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গল বৃদ্ধি হয়, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইহাই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিষয়ক বিচারের মূল কথা।

বিবাহের সময়ে পৃথক-অন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন দোষ বোধ হয় না; কিন্তু বিবাহ করিবার পরে পিতৃভবনে বাস করিলে স্বভাবতঃ পিতা পুত্রে এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবার নিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনন্তর যাঁহারা পৃথক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ন্যায্যমতে গৃহবিচ্ছেদের নিমিত্তক বলিয়া গণ্য হয়েন। অতএব যদ্যপি পৃথগন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে বিবাহের সময়েই তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

১। একান্নে থাকার এক মহৎগুণ এই যে, গৃহস্বামির মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা, তদভাবে পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ না কেহ পরিবার রক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারেন। ইহাঁরা পৃথকালয়ে বাস করিলে, তাহার অনেক অসুবিধা জন্মে। বাঙ্গালির সংসারে পুরুষ অভিভাবক না থাকিলে, নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কারণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমাদিগের মহিলারা সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও ইচ্ছামত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন না।

একান্নে থাকিলে সকলেই সময়ান্তরে বা ঘটনা বিশেষে পরস্পরের সাহায্য করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাতে ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যগতিকে এক জনের দ্বারা অন্যের হিতসাধন হয়, এবং তাহা হইতে কখন কখন কার্য্য কারণের বিপর্য্যয় ঘটিয়া—স্নেহ হইতে যত্নের পরিবর্ত্তে, অগত্যা যত্ন করিতে২—লোকের মনে প্রকৃত ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে। পিতা মাতার ত কথাই নাই; একান্নবর্ত্তী পরিবারে অন্যের প্রতিও কখন২ এতাদৃশ মমতা জন্মে যে, পৃথকান্নে থাকিলে মনোমধ্যে তাহার উদয় হইতেই পারে না। এতদ্ভিন্ন, তৃণ-নির্ম্মিত রজ্জুর ন্যায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বল তুল্য সংখ্যক পৃথক সংসারের সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর হইবার সম্ভাবনা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনেক গুলি দোষও স্পষ্ট দেখা যায়। বহু পরিবারের অভিভাবকেরা কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবারদিগের পরস্পরের প্রতি মায়া যেমন বৃদ্ধি, তেমনি হ্রাস হইবার সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অধিক। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধ জন্মে। পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠেরা পিতৃতুল্য মান্য করিতেন, সুতরাং সকল কার্য্যেই পরস্পরের মধ্যে আনুগত্য এবং মঙ্গলানুষ্ঠানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, এবং কোন বিষয়ে কাহারও মনে দ্বিধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে সকল লোকের ইচ্ছাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা এতাদৃশ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে যে, জ্যেষ্ঠেরা কোন মতেই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে অথবা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। অধিকন্তু কনিষ্ঠেরা তাহা প্রকাশ করিলে জ্যেষ্ঠের মনে বিরক্তি জন্মে। পূর্ব্বে স্ত্রীকে তাচ্ছল্য করাই স্বামির সচ্চরিত্রতার

লক্ষণ ছিল ; এক্ষণে পতি-পত্নীর প্রণয় দেখিলে কেহই দোষ দিতে পারেন না ; অথচ এরূপ প্রণয় হইতে যে সকল কার্য্য উদ্ভাবিত হয়, তাহা প্রকাশ হইলে সামান্য লোকে পরিহাস করেন আর গৃহস্থের মনোবেদনা হয়। সকলেই জানেন, পুত্র কি কনিষ্ঠ সহোদর বিদেশ যাত্রা কালীন সস্ত্রীক গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্বামী কিঞ্চিৎ অসুখী হয়েন। ইহা অভিভাবকের পক্ষে উচিত ব্যবহার নহে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োধিক্যমতে প্রাধান্য জন্মে, কিন্তু সন্তানগণের পক্ষে পিতাই কর্ত্তা ; গৃহস্বামী কনিষ্ঠদিগের সেই কর্ত্তৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতে একটী গুরুতর হানি হয়। বালক বালিকারা একজনের দ্বারা শাসিত হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গৃহস্বামী আংশিক রূপে তাহাদিগের অভিভাবক হওয়াতে উভয়ের কেহই আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, এবং উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।

পূর্ব্বকালে বধূগণ কেবল গৃহস্বামিকেই সর্ব্বাচ্ছাদক বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দাম্পত্য প্রণয়ের আধিক্য বশতঃ তাঁহারাও পতি এবং শ্বশুর অথবা ভাসুর, দুইজন কর্ত্তার অধীন হইয়া অনেক স্থলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন।

ভ্রাতৃস্নেহ অতি অমূল্য পদার্থ; কিন্তু একবার ভ্রাতার যত্ন বাহ্য বলিয়া সন্দেহ হইলে সে ক্ষোভ কদাচ নিবৃত্ত হয় না। অপর ব্যক্তি মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করিলেও সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু আত্মীয়গণের বিন্দু মাত্র ত্রুটি হইলেই অসহ্য বোধ হয়। ফলতঃ মনুষ্যের মনে একটী প্রবৃত্তি বলপ্রাপ্ত হইলে অন্য গুলি সহজেই খর্ব্ব হইয়া যায় ; পতি পত্নীর মধ্যে প্রগাঢ় স্নেহ এবং গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি, উভয় রক্ষা করা অসাধ্য। অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিশৃঙ্খলা স্বভাবসিদ্ধ বলিতে হইবেক।

২। এতদ্দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে ; তৎকালে পুত্র বা পুত্রবধূ কেহই আশ্রম রক্ষার নিয়ম শিক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং তজ্জন্য কিছুকাল গুরুজনের আশ্রমে থাকা প্রয়োজন। আবার, পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, বিবাহের অব্যবহিত পরে পৃথক হইবার নিয়ম প্রচলিত হইলে, বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত ক্ষতি সমস্তই যুগপৎ নিবারিত হইতে পারে।

৩। পৃথগন্ন হইলে সম্পাত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয়, এবং তৎকারণে ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠে। একান্নে থাকিলে তাহা উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃ ইহাই পৃথগন্ন হইবার মূলীভূত প্রতিবন্ধক। এতদ্দেশীয় লোকের প্রধান সম্পত্তি ভূমি। কৃষকদিগের পক্ষে ভূমি বিভাগে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারা তাহাদিগের নিকট কর গ্রহণ পূর্ব্বক ভূমি অধিকার করেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিভাগের পরে কর সংগ্রহের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহাতে কাজে কাজেই অধিক খরচ পড়ে। ভূমির পরিবর্ত্তে কেবল ভূমি-স্বত্ব বিভাগ করিলে ভূমি কিম্বা প্রজার উপরে মালিকের তাদৃশ ক্ষমতা থাকে না। কোন কার্য্যে এক জন শরিক বক্র হইলেই অপর সকলকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। ওদিকে ভূমি বিভাগ করিলে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু একবার বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার পরে ভূমি বিভাগ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য। কারণ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের সকল প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধির বিচার করিলে ভূমি বিভাগ কখনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশের ভূমি "বেঁধা ফোঁড়া" (পিতল গোলা) বলিয়া এই সঙ্কট শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জন্য ভূমি সম্পত্তি বিশিষ্ট লোকেরা নিতান্ত অসহ্য না হইলে একান্নে থাকিবার ক্লেশ মোচনের চেষ্টা করেন না।

ভদ্রাসন বিভাগের নিয়ম আরো ভয়ানক। কত সময়ে ভ্রাতৃগণ পৃথক কুঠরী গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া এক একটী কুঠরীকে দ্বিভাগ করতঃ উভয়াংশই অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলেন। বিবাদের এতই দৌড় যে, কেহ কেহ বিভাগের সময়ে পুষ্করিণীর মধ্য স্থলে বাঁধ দিয়া থাকেন।

ইংরাজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র একাকী সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করেন। সুতরাং এরূপ কোন গোলযোগই নাই। কিন্তু অভিনব সমাজ শাস্ত্রবেত্তাদিগের মতানুসারে এই নিয়ম দূষণীয়। অন্যান্য দেশে বিভাগ বিষয়ে শরিকদিগের মতভেদ হইলে ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক মূল্য ভাগ করিয়া লয়। এতদ্দেশে এই প্রণালীতে সচরাচর ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না, এবং অস্থায়ী বলিয়া, ভূমির পরিবর্ত্তে, অর্থ গ্রহণ করিতে সকলেই আপত্তি করেন।

৪। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কলহের বিষয় বাঙ্গালি মাত্রেই অবগত আছেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহা অনিবার্য্য।

কলহ হইবেক না, এরূপ প্রত্যাশা লুব্ধ আশ্বাস মাত্র। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহার উপায় করা যুক্তিসিদ্ধ।

কোন২ মহৎ পরিবারে পৃথক হইবার প্রতি এতই আপত্তি আছে যে, সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না। এরূপ স্থলে শরিকের অংশ অপহরণ করাই অনেকের মানস থাকে। কিন্তু তাদৃশ অসৎ অভিসন্ধি না থাকিলেও কেহ২ মনে করেন যে, অন্যায়কারী ব্যক্তি মোকদ্দমার ক্লেশ জানিতে পারিলে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া একান্নে থাকিতে সম্মত হইবেন, এবং উভয়েই লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, আন্তরিক মনোবাদ জন্মিলে লোকের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। পৃথক হইবার যত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, পরিণামে সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কেবল উভয় পক্ষের অর্থ নাশ, মান হানি, মনের গ্লানি, এবং লোকাপবাদের সীমা থাকে না।

পরিবারের মধ্যে এক জন অন্য শরিকের অর্থাপহরণ করিলে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে উৎপীড়ন করিলে, অথবা অপব্যয়ী হইলে সংসার সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। অতি বড় ধনী পরিবারেও অপব্যয়ী ব্যক্তির ব্যয় সংকুলান হওয়া দুঃসাধ্য। সুতরাং এরূপ স্থলে যাঁহারা আত্মরক্ষা এবং স্ত্রী পুত্রের মঙ্গলার্থ ভ্রাতৃত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করা অন্যায়।

মধ্যবর্ত্তী পরিবারে অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন নানা প্রকারে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয়। স্বার্থসাধনের জন্যই হউক বা পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই হউক, গৃহস্বামী সকল ব্যক্তিকে ন্যায্য অংশ না দিয়া যদি কোন প্রকারে নিজের আধিক্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার প্রতি কুপিত হয়েন। মনে কর, কোন পরিবারের এক খানি গাড়ি আছে; না রাখিলে সম্ভ্রমের ব্যাঘাত, আবার রাখিলে প্রধানতঃ গৃহস্বামির নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতেও বিরোধ ঘটে; কর্ত্তা মনে করেন, আমি সকলেরই মান রক্ষা করিতেছি; অধীনেরা মনে করেন, তিনি ন্যায্যাংশের অতিরিক্ত লইতেছেন; এরূপ ঘটনা কেবল গাড়ির বিষয়ে নহে, পোষাক, চাকর প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রম সূচক ব্যয়ের স্থলেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠগণের নিকট আপনার কোন প্রাধান্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদিগের মনে ক্রোধ উপস্থিত হয়। আবার যেখানে কনিষ্ঠ কৃতী হইয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত

হয়েন, সেখানে তাঁহার দ্বারা এরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ নিতান্ত অসহনীয়। কিন্তু অর্থ বা বিদ্যা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা জন্য যে প্রাধান্য জন্মে, তাহাতে কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে গর্ব্বহীন হইতে পারেন না ;—এবং মনে যাহা থাকে, তাহা কালসহকারে অতি মূর্খের নিকটেও প্রকাশ হয়। ফলতঃ নিতান্ত দরিদ্র অথবা মহাধনী না হইলে সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব। গৃহস্বামী সর্ব্বদা সকলের সুখ দুঃখের তত্ত্বাবধান, সামান্য বিষয়েও আত্মসংযম এবং সর্ব্বোপরি বাক্‌সংযম—না করিলে, কখনই ভ্রাতৃগণকে একান্নে রাখিতে পারেন না। এতাদৃশ বৈরাগ্য, সংসারী ব্যক্তির মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ।

সহোদরগণের সন্তান সন্ততি লইয়া আর এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা অধিক এবং কাহার অল্প হইলে খরচপত্র বিষয়ে ভ্রাতা এবং সন্তান উভয় শ্রেণীতেই প্রত্যেকের তুল্যতারক্ষা করা অসম্ভাবিত। সুতরাং ইহার অব্যর্থ ফল—পরদ্বেষ, অভিমান এবং যন্ত্রণা প্রভৃতি সহস্র বিপদ—নিবারণ করা অসাধ্য ; পরিশেষে নিশ্চয়ই সংসার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মধ্যে কেহ ভর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহ পাত্রী হইলে সর্ব্বনাশ হয়। পিতৃদত্ত আনুকুল্যের প্রতি কেহ আপত্তি করিতে পারে না ; কিন্তু যে বধূ পিতার নিকট সর্ব্বদা উপকার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার স্বাভাবিক গর্ব্ব অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে কনিষ্ঠেরা পদে২ কেবল জ্যেষ্ঠের দোষই দেখেন, কিন্তু গুণের বিষয় কেহই মনে করেন না—সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কি জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে কেহই ব্যগ্র নহেন। কিন্তু গৃহস্বামীর সহস্র দোষ থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবেক যে, তাঁহাকে পরিবারের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কেবল আত্মবিষয়ক চিন্তাতেই নিপুণ, সুতরাং গৃহস্বামী স্বভাবতঃ কনিষ্ঠদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন। পরন্তু মনুষ্য প্রাত্যহিক উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু। অতএব গৃহস্বামীর সেই প্রত্যাশা অসম্পূর্ণ থাকাতে প্রথমতঃ অসন্তোষ, পরে তাচ্ছল্য, এবং পক্ষান্তরে অভিমান, পরিণামে বিরোধ অবশ্যই ঘটিবেক। এই প্রকার ঘটনা দুই একটীতে কিছুই হয় না ; পুনঃ২ হইতে থাকিলে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিলেও মনের মালিন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে।

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ মধ্যে এই রূপ; আবার কনিষ্ঠ পরম্পরার মধ্যে বিরোধ আরো সহজে উৎপন্ন হয়। সামান্য বিষয়ে তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রকাশ পাইলে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। গৃহস্বামী তজ্জন্য কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিলে কনিষ্ঠদিগের আক্রোশে পতিত হয়েন। তাচ্ছল্য করিলে বিরোধী ব্যক্তিগণের উভয় পক্ষই ক্ষুণ্ণ হয়েন, এবং মীমাংসার চেষ্টা করিলে উভয়েই পক্ষপাতের দোষ দেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহদ্দোষ এই যে, কনিষ্ঠেরা কখনই সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে পারেন না।

পুরুষদিগের তুলনায় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের বিরোধ চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর। বধূগণ সকলেই শ্বশ্রূ অথবা জ্যেষ্ঠ যাতাকে ভয় করেন; তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকেন; তৎকৃত উপকার ভুলিয়া যান; তাঁহার নিকট মনের কথা গোপন করেন এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ সঞ্চয় করিতে থাকেন। অন্দরে আছেন বলিয়া লোক লজ্জা অল্প হয়, এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বশত কথার কোন আটক থাকে না। অধিকন্তু বধূগণের মধ্যে কেহ সম্পর্কে ছোট, কিন্তু বয়সে বড় অথবা তদ্বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইলে বিরোধের আর একটী সূত্র বৃদ্ধি হয়। বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মান পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তিনি আপন পদের প্রাধান্য ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ স্বামির নিকট বিশেষরূপ আদর পাইলে (দ্বিতীয় সংসার স্থলে ইহা সর্ব্বদাই ঘটে) তখন আর তাঁহার বুদ্ধি স্থির থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি ভর্ত্তার উপর কর্ত্রী, অতএব এই স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য বয়সে-জ্যেষ্ঠ-সম্পর্কে-কনিষ্ঠ বধূগণ ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট স্থান কোথায় পাইবেন?

পৃথিবীতে যত বিরোধ উপস্থিত হয়, সূত্রপাত কালীন বিবদমানদিগের মধ্যে প্রায় কেহই তাহা জানিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষেরা লোকচরিত্র বিষয়ে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এই জন্য অবিলম্বে বিরোধের লক্ষণ ও পরিণাম বুঝিতে পারিয়া অনেক কৌশলের দ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান। স্ত্রীজাতি চিরকাল অন্তঃপুরে বাস করাতে সেরূপ কৌশলও শিক্ষা করেন নাই, এবং পুরুষের ন্যায় হঠাৎ বিপদও টের পান না। অনন্তর অন্নত্যাগ, রোদন, কপালে আঘাত, স্বামির নিকট নালিশ ইত্যাদি গৃহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনে কর, একটী বধূ অনবধানতা বশতঃ কোন কার্য্যের দ্বারা আর এক জনের কিঞ্চিৎ ক্লেশ জন্মাইলেন। ইনি

ইহার হেতু অনুসন্ধানে কাল হরণ বা বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রথমার দুরভিসন্ধি অনুমান করিয়া লইলেন। এবং প্রতিফল না দিলে আধিক্য বা তুল্যতা রক্ষা হয় না; অতএব সুযোগ বুঝিয়া একটী জ্ঞানকৃত অন্যায় করিলেন। প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ, বিশেষতঃ স্পষ্ট অন্যায় দেখিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকেন; অতএব একটী শ্রেষ্ঠতর অন্যায় করিলেন। একবার কল চলিলে আর থামান কাহার্ সাধ্য? ওদিগে ইহাঁদিগের প্রভুগণ প্রত্যহ রাত্রিতে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ভ্রাতাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধীয় আলাপ নিষিদ্ধ, সুতরাং অনেক স্থলে "এক তরফা" বিচারেই একান্নবর্ত্তী পরিবার নিঃশেষিত হয়। যদি ভ্রাতৃগণ "ওয়াইফের" বিষয়ে আলাপ করেন, তবে কথা চালা চালিতে আর কিছু দিন অতিবাহিত হয়। মীমাংসার জন্য চারি জনের সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অভব্যতার লক্ষণ। অতএব পরিশেষে মূল কথা অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাল্পনিক কথার প্রসঙ্গে সংসার ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সকল কারণে আমরা বিবেচনা করি যে, মনে২ বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বেই অন্ন পৃথক করা ভাল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্যান্য দোষের মধ্যে পরভাগ্যোপজীবিতা অতি প্রধান। যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা স্বভাবত পরভাগ্যোপজীবী, সুতারাং একান্ন পৃথগন্ন উভয় অবস্থাতেই সমান। কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়ী হইতে পারেন না। অথবা স্বাধীন হইবার ক্ষমতা জন্মিলে সামান্য কষ্টও অসহ্য বোধ হয়, সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই পৃথগন্ন হয়েন। আর যাঁহারা একান্নে থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই উপার্জ্জনে অক্ষম অথবা প্রধান ভ্রাতার তুল্য না হইতে পারিলে, অভিমান বশতঃ তাঁহার অন্ন ধ্বংস করাই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই। অথচ উপার্জ্জনকারী আশ্রয় না দিলে তাঁহাদিগের যে দিন পাতের ব্যাঘাত হয়, এমত নহে; বরং কেহ২ অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারেন। পরিবারগণের মধ্যে উপার্জ্জনের ন্যূনাতিরেক থাকিলে, এক জনের গর্ব্ব, অন্যের অভিমান, কাহারো ঈর্ষা এবং কখন কখন কোন ব্যক্তির দ্বারা ভ্রাতৃধনাপহরণ পর্য্যন্তও ঘটনা হয়।

অনন্তর এই বিপত্তি নিবারণ জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের পরামর্শ অত্যাবশ্যক।

উপায়। গৃহস্বামী পুত্রকে উপার্জ্জনে সক্ষম দেখিলে বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূকে সংসার কার্য্য শিখাইবার জন্য কিছু দিন তাঁহার শ্বশ্রূর অধীনে রাখিবেন, অনন্তর সঙ্গতি অনুসারে তাঁহাদিগের জন্য পৃথক আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। নতুবা, বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিবেন। এই রূপে এক জনের বাসস্থান পৃথক না করিয়া অন্য পুত্রের বিবাহ দিবেন না। যাঁহারা উপার্জ্জনে অক্ষম, তাঁহাদিগের বিবাহ না দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে কিঞ্চিৎ অর্থ দানান্তে তাঁহাদিগকে পৃথক করিবেন। পরিণামে কনিষ্ঠ পুত্র পিতৃআবাস অধিকার করিয়া মাতা, বিমাতা ও বৃদ্ধ পিতার প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিবেন। পিতার অবর্ত্তমানে মাতা এবং তদভাবে ভ্রাতা কি অন্য অভিভাবক এই নিয়মে পিতৃ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ভূমি সম্পত্তি যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তবেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃগণ স্বয়ং বিভাগের উপায় করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মাত্র আপত্তি প্রকাশ করিলেই শালিশ নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ অগত্যা আদালতের সাহায্য লইতে হইবেক। কিন্তু দুটীনিয়ম অভিন্ন রূপে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যথা ;—

১। বিরোধ হইবার অগ্রে অন্ন পৃথক করা বিধেয়।

২। পৃথগন্ন হইয়া এত দূরবর্ত্তী স্থানে আবাস নির্দ্দিষ্ট করা উচিত যে ইচ্ছার বহির্ভূত সাক্ষাৎ না ঘটে। সর্ব্বদা একত্র থাকিলে বিরোধ নিবারণ করা অসাধ্য, অতএব যাহাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বিনা সাক্ষাতে কাল যাপন করা যায়, এরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

আচার্য্যের মৃত্যু ঘটনায় আমরা দুঃখিত আছি, সেই দুঃখ সহকারে আজি এই কয়েক পংক্তি স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

"পাণিনি বিচার" অতি আশ্চর্য্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যাঁহার মনে গ্রন্থকারের প্রতি ভক্তি রসের উদয় না হয়, তিনি অতি অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন। দৃঢ় অধ্যবসায়সহ অনন্যসাধারণ পরিশ্রম, সত্যোদ্ভাবনে ও সত্য প্রকাশে অকুতোভয়ভাব, অতি পরিপাটি বিচার শক্তি, অল্পদর্শী পণ্ডিতাভিমানিদিগের প্রগল্ভ বচন শ্রবণে প্রগাঢ়শ্রমী ও অগাধগামী ভট্টাচার্য্য স্বভাব সুলভ কোপ প্রকাশ, প্রাচীন আর্য্যগণে আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আর্য্যগণের মহত্ত্ব স্থাপন জন্য ও লুপ্তপ্রায় আর্য্যগৌরব উদ্ধার জন্য একাত্মমনে ও ব্রতপালনে চেষ্টা, এ গুলি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শারদীয়া প্রতিমার প্রধান পঞ্চ পুত্তলিকার ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আর্য্য গৌরবোদ্ধার চেষ্টামূর্ত্তি মধ্যস্থলে দশহাতে বিরাজ করিতেছে। সকল গুলিই দেবমূর্ত্তি, প্রত্যেকটি দেখিলেই হিন্দুর মনে ভক্তির আবির্ভাব হয়, কিন্তু এই পুত্তলি সমষ্টি অতি আশ্চর্য্য দর্শন। ইহার মহত্ত্ব আমরা আমাদের ক্ষুদ্রায়ত চিত্তে আয়ত্ত করিতে পারি না। সকল গুলিকেই প্রণাম করি, মধ্য মূর্ত্তিই মনে চিরঅঙ্কিত থাকে। "পাণিনি বিচার" অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তৎপাঠে বিচিত্র শিক্ষা জন্মে। পাণিনি ব্যাকরণ কোন্ সময়ে হয়, এই বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে অতি সুন্দর বিচার আছে।

পাণিনি ব্যাকরণের কাত্যায়ন কৃত "বার্ত্তিক" আছে; সবার্ত্তিক সূত্রসমস্তের পতঞ্জলিকৃত "মহাভাষ্য" আছে; এই মহাভাষ্যের কৈয়ট (*)

(*) কৈয্যট।

কৃত টীকা আছে; সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি আরো অনেক টীকা গ্রন্থ আছে; কিন্তু আধুনিক বলিয়া আচার্য্য বিচার কালে সে গুলির বড় প্রসঙ্গ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পদ্যময়ী রচনা আছে; সেগুলিকে "কারিকা" বলে। সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র থাকে; সংজ্ঞাসূত্র ও পরিভাষা সূত্র। সংজ্ঞাসূত্র গুলি প্রকৃত সূত্র; ঐ সকল সূত্র কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, তাহাই পরিভাষায় লিখিত থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাত্যায়নই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কেহই লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। তাঁহার কৃত যেমন "বার্ত্তিক" আছে, তেমনি গুটিকত কারিকাও আছে। আর মহাভাষ্যের অধিকাংশ বার্ত্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত। মহাভাষ্যের আর কতকগুলি রচনাকে "ইষ্টি" বলে। পাণিনির অসম্পূর্ণতা ও অস্পষ্টতা কাত্যায়ন প্রদর্শন করেন। মহাভাষ্যকার সেই সমালোচন কতদূর সঙ্গত, তাহার বিচার করিয়াছেন ও পাণিনি সূত্র সম্বন্ধে যাহা নিজ বক্তব্য, তাহা "ইষ্টি" রচনায় গ্রন্থন করিয়াছেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পাণিনির সকল সূত্রের কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিক নাই। কাত্যায়ন বার্ত্তিকের সকল গুলিই পতঞ্জলি পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু পতঞ্জলিও সকল পাণিনি সূত্রের উল্লেখ করেন নাই; আবশ্যক হয় নাই। সুতরাং কাত্যায়ন বা পতঞ্জলি কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া সে গুলি যে প্রকৃত পাণিনি সূত্র নহে, পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সচরাচর প্রকৃতি প্রত্যয়ে, উভয়ের অর্থসঙ্গতি জন্য শব্দের অর্থ হইয়া থাকে; কতকগুলি প্রত্যয় আছে, তাহাদের এরূপ অর্থ সঙ্গতি হয় না। তাহাদিগকে "উণাদি" বলে। সেই সকল প্রত্যয় যোগনিষ্পন্ন শব্দকেও উণাদি বলে। গোল্ডষ্টুকর দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি ব্যাকরণে যে উণাদি গুলি আছে, তাহা পাণিনির নিজের; কিন্তু উণাদি সূত্রগুলি সম্ভবতঃ কাত্যায়ন বররুচির। এবং ধাতু পাঠও পাণিনির নিজকৃত।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর কয় জন বৈয়াকরণিক মধ্যে কাহার্ পরে কে, তাহা অতি সুন্দর যুক্তি সহকারে স্থির করিয়াছেন। যাস্ক এক জন বৈয়াকরণিক। পাণিনি বলেন, নিপাত তিন প্রকার; উপসর্গ, গতি ও কর্ম্ম প্রবণ্য। যাস্ক এরূপ কিছু বিভেদ করেন নাই। যাস্কের পাণিনির

পরে না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যখন পাণিনির "যাস্কাদিভ্যো গোত্রে" একটি সূত্রই রহিয়াছে, তখন যাস্ক যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহাতে আর কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

ব্যাড়ি বা ব্যালি নামে আর এক জন সংগ্রহকার আছেন। কথিত আছে, তদীয় গ্রন্থ লক্ষ শ্লোকময়। পতঞ্জলির একটি সূত্র এই, যদি ভিন্ন সময়বর্ত্তী অনেক ব্যক্তির নাম একত্রে এক পদভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে কাল গণনায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে। আমরা একটি উদাহরণ দি। যেমন মৎস্যকূর্ম্মবরাহ; পৌরাণিক মতে মৎস্যাবতারই কাল গণনায় অগ্রবর্ত্তী, সুতরাং সমস্ত পদেও মৎস্য সর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেন। পতঞ্জলির উদাহরণ;—

"আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়া।" সুতরাং ব্যাড়ি পাণিনির পরে হইলেন। ইহার আরো প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি ব্যাড়িকে দাক্ষায়ণ বলিয়াছেন। দক্ষপুত্র দাক্ষি; সেই গোত্রজ দাক্ষায়ণ। পাণিনি যুবন্ শব্দের "অপত্যং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রং" এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদিকে যুবন্ বলা যায়। উদাহরণে ভাষ্যকারেরা যেমন দাক্ষির দাক্ষায়ণ ইত্যাদি লিখিয়াছেন। সুতরাং দাক্ষায়ণ দাক্ষির তিন চারি পুরুষ পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। পতঞ্জলি বলেন, পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী। দাক্ষী, দাক্ষির জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সুতরাং পাণিনি ও ব্যাড়ি (দাক্ষায়ণ) দুই পুরুষ ব্যবহিত।

বার্ত্তিককার বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন যে ব্যাকরণকার পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহাতেও অনেকে সন্দেহ করিতেন। অনেকে বলিতেন, তাঁহারা সমকালবর্ত্তী; আচার্য্য নানা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। আমরা তাহার সকল গুলি এ প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিতে পারি না। একটি অতি সামান্য তর্ক উল্লেখ করিলাম। পাণিনির ৩৯৯২ বা ৩৯৯৩ সূত্র আছে। তন্মধ্যে ১৫০০র অধিক সূত্রে কাত্যায়ন অঙ্গুলি ক্ষেপ করিয়া দোষ দেখাইয়াছেন। সেই জন্য ৪০০০ বার্ত্তিক লিখিয়াছেন; সেই চারি সহস্র বার্ত্তিকে ন্যূনত দশ সহস্র বিশেষ স্থল আছে। যদি সূত্রকার ও বার্ত্তিককার সমকালিক হইতেন, তাহা হইলে লোকে কাহার গৌরব করিত? পাণিনির কখনই নহে। কিন্তু হিন্দু বিশ্বাসে পাণিনি কেবল পূজ্যপাদ মহর্ষি নহেন; ঈশ্বরাবতার। কাত্যায়ন পাণিনির অনেক পরে হইবেন, তাহার

আর সন্দেহ নাই। পতঞ্জলি যে সকলের পরে, তাহা নিজেই স্বীকার করেন। পাণিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি বৈয়াকরণিকের নাম করিয়াছেন; যথা,—আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন। তাহার পর ক্রমে আমরা আর কয়েকটি নাম পাইতেছি; যাস্ক, পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন (বররুচি) ও পতঞ্জলি। ইহাতে বৈয়াকরণিকদিগের মধ্যে পাণিনির স্থূলাবধারণ হইল; কিন্তু পাণিনিব্যাকরণের বয়ক্রম কত? এই প্রশ্নের আচার্য্য কিরূপ উত্তর দিয়াছেন, পাঠক মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখুন।

শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রাচীন ভারতে কিরূপ সামাজিক বিপ্লব উৎপাদন করেন, তাহা বঙ্গদর্শনের ২য় সংখ্যায় উদ্দীপনা প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। শাক্যসিংহ ধর্ম্মবিশ্বাসেও বিষম বিপর্য্যয় উৎপাদন করেন। আর্য্যেরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন। শাক্যসিংহ বলিলেন, ওরূপ আশা করিলে হইবে না; একবারে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতে হইবে। তিনি এই নির্ব্বাণ মত প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণপদ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আর্য্যমতে সেরূপ হয় না। পাণিনি বলেন "নির্ব্বাণোঽবাতে।" নির্ব্বাণ শব্দের বৌদ্ধ অর্থ থাকা দূরে থাকুক, নির্ব্বাণ শব্দ "প্রদীপ নির্ব্বাণ" স্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাও পাণিনি লেখেন নাই। "নিভে যাওয়া" অর্থ আর "বায়ুহীন" অর্থ অনেক বিভিন্ন; পাণিনির সময়ে দুই অর্থ প্রচারিত থাকিলে তাঁহার মত বৈয়াকরণিকের তাহা না লেখা অসম্ভব। সুতরাং পাণিনি কেবল বৌদ্ধ মত প্রচারের পূর্ব্বে নহে, যে অর্থ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ শব্দের সংজ্ঞাবাচক অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ জন্মিবারও পূর্ব্বে, ব্যাকরণ লিখেন। সিংহলীয় বৌদ্ধ গণনায় খ্রীষ্টজন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহের মৃত্যু হয়। সুতরাং পাণিনি তৎপূর্ব্ব কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গান্ধার (কান্দাহার) দেশবাসী ছিলেন, সুতরাং তিনি প্রতীচী বৈয়াকরণিক কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচী বৈয়াকরণিক।

পাতঞ্জল মহাভাষ্যের বয়ক্রম অতি সুন্দর রূপে নির্ণীত হইয়াছে। পাণিনি লিখিয়াছেন, "জীবিকার্থে চাপণ্যে।" যে সকল বস্তু জীবিকার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথচ বিক্রীত হয় না, তৎসমুদায়ের এইরূপ হইবে।

পতঞ্জলি স্বীয় ভাষ্যে বলেন, মৌর্য্যেরা হিরণ্যার্থী হইয়াই অর্চ্চনা পদ্ধতি স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বেলা বিক্রয় নহে, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না ইত্যাদি। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, পতঞ্জলি মৌর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার ভাষ্যের উপহাস ভঙ্গি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সেই বংশের শেষ রাজার পরবর্ত্তী বলিয়াও বোধ হয়। যুনানী পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিলে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা হয়েন ও খ্রীষ্টের ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্য রাজ বংশের লোপ হয়। সুতরাং পতঞ্জলি খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ও সম্ভবত ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভাষ্য লেখেন। আরো প্রমাণ আছে ;—

পাণিনি সূত্র। অনদ্যতনে লঙ্।

কাত্যায়ন বার্ত্তিক। পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তু র্দর্শন বিষয়ে।

পাতঞ্জল ভাষ্য। পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তু র্দর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ।

অরুণদ্যবনঃ সাকেতং। অরুণদ্যবনো মাধ্যমিকান্। ইত্যাদি

যখন কার্য্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত, এবং যখন তাহা ক্রিয়া প্রয়োগ কর্ত্তার দর্শন বিষয় ছিল, অর্থাৎ যাহা তিনি দেখিতে পাইতেন, তখন লঙ্ হইবে, যেমন, যবন অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল; মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিয়াছিল ; এরূপ স্থলে অরুণৎ হইবে।

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রবর্ত্তক ; বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পরে নাগার্জ্জুন এই প্রস্থ সংস্থাপন করেন। সুতরাং নাগার্জ্জুন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪৩ বৎসরে জীবিত ছিলেন ; পতঞ্জলিও সেই সময়ে ছিলেন। তা নহিলে তিনি যবনাবরোধ দেখিবেন কি প্রকারে ? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে (in Bactria) অনার্য্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন (Grœco-Bactrian Kingdom) করিয়াছিল, তাহাদিগকেই তৎকালে আর্য্যেরা যবন বলিতেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৬০ হইতে ৮৫ পর্য্যন্ত এই জাতীয় নয় জন রাজা হয়েন। তন্মধ্যে একজনের নাম মেনান্দ্র। স্ত্রাবো বলেন, তিনি যমুনাতীর পর্য্যন্ত যবন রাজ্য বিস্তার করেন। মথুরায় তাঁহার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ইনিই অযোধ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। লাসেন সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৪৪ বৎসর হইতে বিংশতি বৎসরের অধিককাল ইনি রাজত্ব করেন।

অতএব খ্রীষ্ট পূর্ব্বে প্রায় ১৩০ বৎসরের অথবা আজি হইতে প্রায় ঠিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর কহিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় কালনির্ণয় কল্পে বোধ হয়, কেবল এই গণনাটি শুদ্ধ কল্পনা প্রসূতা নহে। যথার্থ। তিনি এ স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। আমরা এই তর্কের সকল কথা লিখিতে পারি নাই। এ পর্য্যন্ত বাঙ্নিষ্পত্তিও করি নাই। তাঁহার সঙ্গে নীরবে এত দূর আসিয়াছি। যাঁহারা আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর রচিত পাণিনি বিচার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, যাঁহারা পাঠ করেন নাই, অনুরোধ করি, একবার নির্জ্জনে পাঠ করিবেন।

কোন বিশেষ গ্রন্থ সমালোচন করা বড় কষ্টকর। যাহা ভাল পারিলে, তাহাতে হস্তার্পন করিলে কিছু কষ্ট অবশ্যই হইবে; যদি কেবল সেই জন্যই কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহা আর কোন্ মুখে বলিয়া বেড়াইতাম। শুধু মূর্খতা প্রকাশ ভয়ের কষ্ট নহে, নানা কষ্ট আছে। অনেক সময়ে গ্রন্থকার সমালোচককে শত্রু বোধ করেন, স্বীয় গৌরবদ্বেষী মনে করেন, এসব ভাবিলে মনে একটু কষ্ট হয় না? অবশ্যই হয়। উকিল, কন্সলি মধ্যে দেখিবেন, পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ বক্রোক্তিতে বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উভয়ে প্রশান্ত মনে বিচরণ করিতেছেন। কোন কোন দেশে লেখক ও প্রতিলেখকেও এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে। এরূপ হওয়া যে ভাল, তাহা আমরা বলিতেছি না। গণ্ডার স্থূল চর্ম্মধারী বলিয়া জীব সৃষ্টি মধ্যে তাহাকে সর্ব্বপ্রধান বলি না! বরং আমরা ইহা বলি, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ ব্যথিত হয়, সেই পরের ব্যথার ব্যথা বুঝিতে পারে। তবে আমরা একথাও বলিতেছি যে, বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ আর একটু ঘাত-সহিষ্ণু হইলে ভাল হয়। মৃৎকলস ঘা সহিতে পারে না; ধাতু কলস চারিদিকে টোল পড়িলেও আপন কার্য্য করিতে থাকে। সমল স্বর্ণ ঘা সহিতে পারে না, চটিয়া ফাটিয়া যায়, খাঁটি সোণা যত পিটিবে, ফাটিবে না, চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে না।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচন সমেত প্রথমভাগ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। হুগলী।

প্রস্তাব লেখক ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের সুপরিচিত ও মাননীয়। এত কথা কিছু তাঁহাকে বলিলাম এমত নহে ; তাঁহাকে গুটি কত কথা বলিতেছি। আমরা কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন জন্য তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিব, অকুতোভয়ে বলিব। ভাষার দোষেই হউক বা মিষ্ট লেখা লিখিতে অভ্যাস করি নাই বলিয়া আমাদের অভ্যাস দোষেই হউক, আমাদের ভাষাটা সব সময় মিষ্ট হইবে না। যদি কোন কথা বিদ্বেষ ভাবে বলি, তবে যেন ধর্ম্মে পতিত হই। আর আমরা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলাম, তথাপি যদি তিনি আমাদিগকে বিদ্বেষী মনে করেন, তাহা হইলে আমরা যথার্থই দুঃখিত হইব।

আমরা খণ্ড সমালোচন করিব না। সাধারণতঃ ভাষা বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, বলিয়া যাইব। পাঠকগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতের সহিত আমাদের মতের তুলনা করিয়া দেখিবেন ; চিন্তা করিবেন, আপাততঃ আর কিছু করিতে অনুরোধ করি না। তবে তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন। তাহা না করিলে গ্রন্থকার ও সমালোচক, উভয়েরই শ্রম বিফল হইবে।

কোন বিশেষ ভাষা এক সময়ে হয় না, একবারে যায়ও না। নানা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন২ রূপ ধারণ করে। কোন সময়ের প্রচলিত শব্দ যে রূপই কেন ধারণ করুক না, সেই শব্দ গুলির সমষ্টির নামকে তখনকার ভাষা বলে। "তখনকার" শব্দটিই আমরা উদাহরণ স্বরূপ লই-লাম। সকলেই তখনকার লেখেন, "তক্ষণকার" বা "তৎক্ষণকার" লিখিতে কাহাকেও দেখিনা। কিন্তু "এখনকার" "এক্ষণকার" দুই রূপ পদই দেখিতে পাওয়া যায়। একজন দুই মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন ; অন্যের এক বই দুই মূর্ত্তি এখন আর নাই। কালে বোধ করুন "এক্ষণকার" এরূপ মূর্ত্তিটিও লোপ পাইল, কেবল "এখনকার" রহিল। ভবিষ্যৎ ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ লিখিবেন", পূর্ব্বে 'এক্ষণকার' 'তক্ষণকার' বা 'তৎক্ষণকার' এই-রূপ ছিল, এত দিন হইল 'এখনকার' 'তখনকার' এই প্রকার লেখা চলিতেছে।" আমরা তাঁহার ভুল দেখিতে পাইতেছি। একটি শব্দের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইল, ঠিক অনুরূপ শব্দের পূর্ব্বরূপ রূপভেদ হইতে আর সহস্র বর্ষ লাগিল। হুগলি, কৃষ্ণনগর জেলায় এইরূপ হইল ; বাঁকুড়াতে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে আর তিন শত বৎসর লাগিল। সুতরাং ভাষা

পরিবর্ত্তন বিষয়ে কোন কথা হঠাৎ বলা বড় দায়। একটি কথায় যখন এইরূপ হইতে পারে ও হইতেছে—তখন ৫০০০ কি ৬০০০ কথা পরিবর্ত্তন কল্পে কি রূপ হইতেছে, তাহা সুন্দর বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু একথাও আমরা স্বীকার করি যে, বালকেরা যেমন এক বার মাথা কাড়া দিয়া উঠে, বালিকারা যেমন একবার বিবাহের জল পেয়ে আজ কাল পাতা কচান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়, একটু বেশী সুন্দরও হয়, সেইরূপ ভাষাও সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক ভাগে পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে। অনেক শব্দের এককালে একই রূপ পরিবর্ত্তন হয়। রাজবিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই রূপ হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে রোমান, ডেনিশ, নর্ম্মাণ রাজগণ সকলেই সাক্ষণ ভাষার অঙ্গে খেলাত দিয়া গিয়াছেন, ভাষা রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন। বাইবেল অনুবাদকগণ সেই ভাষার সর্ব্ব অঙ্গে খ্রীষ্টীয় তিলক চিহ্ন দিয়া গিয়াছেন, ভাষা তাহাও ধারণ করিতেছেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে বেকন প্রভৃতি যে রসের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, ভাষা সেই রসে স্নান করিয়া সেই জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে ঢল ঢল কান্তিতে বিরাজ করিতেছেন; জর্ম্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই এইরূপ রাজ চিহ্ন, ধর্ম্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। বঙ্গভাষাও সেইরূপ আছেন।

বঙ্গদেশে এক সহস্র বৎসর মধ্যে বোধ হয়, চারিটি কি পাঁচটি বিপ্লব ঘটিয়াছে। দুই তিনটি রাজবিপ্লব, দুই তিনটি ধর্ম্মবিপ্লব। রাজবিপ্লব দুইটির ফল ভারতব্যাপী। বখ্‌তিয়ার খিলজি ও রবর্ট ক্লাইবের নাম দশমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত জানে। খিলজি, শেখজি, সৈয়দজি সকলেই ভাষার অঙ্গে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্লাইবের জাতীয় ভ্রাতৃগণের চেষ্টায় ও উৎসাহ দানে বঙ্গ ভাষা জগৎ বিখ্যাত হইতে চলিল। এই ভাষার এখন যত কেন গৌরব করি না, ইংরাজ-উৎসাহ গুণে যে ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা দুইটি মাত্র রাজবিপ্লবের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু দুই তিনটির কথা বলিতেছিলাম। তাহার কারণ আছে। বঙ্গদেশীয় সেন রাজগণের আগমন বার্ত্তা আমরা বিশেষ

জানি না, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, যে সুন্দরবন মধ্যে যে সনন্দ-পত্রফলক পাওয়া গিয়াছিল, ও তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রমও প্রায় সহস্র বৎসর হইবে ; এবং তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষরের সেই সময় যে রূপান্তর হইতেছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহাই হউক, অন্য অন্য নানা কারণে আমাদিগেরও প্রতীতি আছে, যে সেন রাজ্য স্থাপন জন্য বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

দুই তিনটি ধর্ম্মবিপ্লব হইয়াছে। প্রথম দুইটি, তন্ত্র মত বিস্তার ও ভাগবত মত বিস্তার। এ দুইটি সমুদায় আর্য্যবর্ত্তব্যাপী। তন্ত্র বা ভাগবতের সময় স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। তন্ত্র শাস্ত্রে বাঙ্গালা বর্ণ মালার বিশেষ বর্ণন আছে ও অনেকে বলেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ এই দেশজাত ও ইহাতে যে সকল আচার ব্যবহারের বর্ণনা আছে, তাহার অনেক গুলি বাঙ্গালি সম্বন্ধে বিশেষ খাটিতে পারে। সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্রের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস কিছু স্থির হইতে পারে বলিয়া আমরা এবিষয়ের আলোড়ন করিতেছি। তন্ত্র শাস্ত্র খাটি বাঙ্গালি জিনিষ, এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। মহারাষ্ট্রে, রাজবারাদেশে তান্ত্রিক মত প্রচলিত ছিল ; এখনও আছে, বলা যাইতে পারে' তবে এতটুকু বলা যায় যে আর্য্য নাটকের প্রথমাঙ্ক যে সকল রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল ; সেই ব্রহ্মর্ষি বা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে, কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশে, তাঁহারা সেই নাটকের প্রহসন অথচ লোমহর্ষণ ভাগ গুলি অভিনীত করেন নাই। করেন নাই—তাই বা ভরসা করিয়া বলিতে পারি কই ? পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে তাঁহারা "শ্যামারহস্য" মতের মুক্তি পথে বিচরণ জন্য, "উত্থাপিত্বা" "পিত্বাউত্থা" করিয়াছিলেন কি না, কেমন করিয়া বলিব ? যাহাই হউক, তন্ত্র শাস্ত্র কেবল বাঙ্গালায় আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গালির মেয়েরা, বোধ হয়, পূর্ব্বে কখনই কাঁচলি পরে নাই ! যদি পরিত, ত ছাড়িত না। যদি তন্ত্রাভিনয় কেবল বাঙ্গালাতেই হইত তাহা হইলে, "কাঞ্চুলিক" মত কখনই তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। তন্ত্রশাস্ত্র বাঙ্গালায় আবদ্ধ থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে ভাষার কি করিয়াছে ? যিনি উগ্রভাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি একটু শান্ত হইয়া আরো কয়েকটি প্রশ্ন মনে মনে চিন্তা করিবেন। তন্ত্র শাস্ত্রে বাঙ্গালির আচার ব্যবহারের কত দূর পরিবর্ত্তন

হইয়াছে? যাহাতে আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করে, তাহাতে ভাষার ব্যত্যয় করে কি না? যখন কালীকিঙ্কর কবি রামপ্রসাদ সেন গান করিয়াছিলেন।

সুরাপান করিনে আমি সুধা খাইরে কুতূহলে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ মদমাতালে মাতাল বলে।

তখন তন্ত্র মতে বাঙ্গালির বা বাঙ্গালা ভাষার কি করিয়াছিল, তাহা তিনি না বুঝিতে পারুন, আমরা এখন কতক বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নীলচন্দ্র, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতির রচনায়, ও তদ্ব্যতীত সহস্র জনের লক্ষ শ্যামা বিষয়িণী গীতিতে যে বাঙ্গালা ভাষার কতক পরিবর্ত্তন হয় নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না; আর তন্ত্র শাস্ত্র না থাকিলে এ সকল কোথায় থাকিত?

তন্ত্রশাস্ত্রকে আমরা যোগ শাস্ত্রের ও সাংখ্যদর্শনের একত্র নিষ্পন্ন অতি বিকৃত কীট পরিপূর্ণ কলমের চারা বলিয়া সময়ে সময়ে বিবেচনা করি। যোগ শাস্ত্রের পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ লইয়া তন্ত্র প্রণেতাগণ সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিবাদে কলম লাগাইয়াছিলেন। সেই কলম তখনকার কুৎসিৎ প্রবৃত্তি লালসা মশলার গুণে শীঘ্রই সতেজ হয়, ও অচিরাৎ এক নূতন বৃক্ষে পরিণত হয়। সেই বৃক্ষে কালে যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া এই সকল ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির আদিকারণকে প্রকৃতি বা শক্তি উপাধি দিয়া উপনিষদে, দর্শন শাস্ত্রে সেই কারণকে যে ক্লীবলিঙ্গ "ব্রহ্মবাক্যে" নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, জগৎ কারণের সেই ব্রহ্ম উপাধি ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়া, জগদীশ্বরী, জগদম্বা পদের ব্যবহার আরম্ভ করিল। আবার যোগশাস্ত্রতত্ত্বে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া এই জগদীশ্বরীর সহিত তাহাদের যোগ কি প্রকার, তাহার অনুধ্যান করিতে লাগিল। সৃষ্টিকর্ত্রীর সহিত সৃষ্ট জীবের যোগ কেবল এক প্রকারেরই হইতে পারে। তিনি প্রসূতি, আমরা প্রসূত। বিশ্বাসের সহধর্ম্মিণী ভক্তি আসিয়া এই বিশ্বাসকে এক রূপ জীবন্ত করিল। নূতন তান্ত্রিক ভক্তি সহকারে দৃঢ় বিশ্বাসে সৃষ্টিস্থিতি কারণকে "জগদম্বে মা" বলিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল। সৃষ্টি কারণ এখন আর অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ নহেন, তিনি জননী; জননী অচিন্তনীয়া নহেন; উপনিষদ সময়ের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় "নমস্তে সতেতে জগৎ কারণায়,

নমস্তে সতেতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়," বলিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ভক্তিবান্ কি ক্ষান্ত থাকিতে পারে, বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? মাতার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জ্ঞানসম্বন্ধ নহে; ক্ষুধা পাইলে মায়ের কাছে কেঁদে বলিব, তৃষার সময় বলিব "মা জল দেও!" মায়ের উপর অভিমান করিব, আবদার করিব, স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিব;—তন্ত্রোপাসক এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন। এরূপ স্থির করিয়া আর কেহ অধ্যাত্ম পদার্থবাচক শব্দ লইয়া, দীর্ঘ সমাস রচনা করিয়া কৃত্রিম ব্যাকরণের জটিলতা রক্ষা করিয়া, দাঁতভাঙ্গা বর্ণ বিন্যাস করিয়া,—রচনা করিতে পারে? তা পারে না।

বাঙ্গালি তন্ত্রোপাসকের পক্ষে সৃষ্টি কারণ কেবল মা নহেন, তিনি বাঙ্গালি মা; স্নেহময়ী, কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞা নহেন। উপাসকের জ্ঞান বলিল, ঈশ্বর সর্ব্ববিৎ, তুমি যে ভাষায় ডাকিবে, তিনি তাহাতেই শুনিবেন; বাঙ্গালি উপাসকের ভক্তি বলিতে লাগিল, তোমার ঘরে যিনি তোমার ব্যারামের সময় তোমার গায়ে হাত বুলাইয়া "বাবা কেমন আছিস্ রে?" বলিয়া অতি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই ঈশ্বররূপিণী। মায়ের স্নেহই ঈশ্বরের শক্তি। যদি তুমি জগদীশ্বরীকে, তোমার ঐ মায়ের সহিত যেরূপ কথা কহিতেছ, ঐরূপ শাদা কথায় মন খুলে ডাক, তাঁহার কাছে কাঁদ, তবেই তোমার প্রাণ ভরিবে। সাধক ভক্তির উপদেশ গ্রহণ করিল; প্রাণভরে গায়িল "আমায় দেও মা তবিল দারি" ইত্যাদি "আমি বিনা মাইনায় চাকর" ইত্যাদি। "ধনাধ্যক্ষত্ব পদ প্রদান কর," "আমি অবৈতনিক সম্পাদক," এরূপ বাক্য তাহার জিহ্বায় আসিল না। বাঙ্গালা ভাষা কাজে কাজেই এই পণ্ডিত পরিত্যক্তপথে, (আমরা বলি) অথচ সহজ, সোজা, ঠিক পথে চলিতে লাগিল।

ভাগবত। ভাগবত গ্রন্থ কত দিনের? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। ভাগবতের ১২ স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে "চতুর্দ্দশং ভবিষ্যংস্যাৎ।" ভাগবত ভবিষ্যের পরে হইল। তাহা হইলে বড় আধুনিক বিবেচনা করিতে হয়। পাদ্মে ও মাৎস্যে ভাগবত পুরাণের উল্লেখ আছে। কতক পুরাতন মনে করিতে হইল। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, "যবনাত্যজ গ্রীকোবাকৃট্রিয়ানেরা খাতান্ত; এ কোন যবন? গ্রীকো-বাক্-ট্রিয়ানেরা? না মুসলমানেরা? আবার পদ্মপুরাণ বলেন, পুরাণ মধ্যে সময়

গণনায় পাদ্ম প্রথম, ভাগবত শেষ। এবার কিছুই বোঝা গেল না। পাদ্ম যদি প্রথম, তবে ভাগবতের নাম জানিল কি প্রকারে ? আবার ভাগবতে সকল পুরাণেরই নাম আছে, সুতরাং ভাগবত শেষ পুরাণ হওয়াই সম্ভব। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে বাঙ্গালিরা যে ভাবটি মনে করিয়া এঁটো বা সগড়ি বলে, সেই ভাবটির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে কেমন একটু বাঙ্গালি বাঙ্গালি বোধ হয়। ভাগবত এই বাঙ্গালি গন্ধী পুরাণেরও পরে ? ভবিষ্যেরও পরে ? তবে বড় আধুনিক। এমনও হইতে পারে যে, ভবিষ্যের বা ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত্যের যে শ্লোকগুলি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া থাকি, সেই গুলি পরে বসান। হউক বা না হউক, ভাগবত পুরাণ বড় আধুনিক নহে। ইয়ুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ভাগবত, পুরাণ খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিখিত ও বোপদেব গোস্বামী ইহার প্রণেতা। ইহার বয়ক্রম যে এত অল্প ও মুসলমানের রাজ্যাধিকারের পর ইহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। ভাগবতের প্রগাঢ় অথচ কূট রচনাভঙ্গি দেখিলে, অন্যান্য পুরাণ যে সময় মধ্যে লিখিত, সে সময়ের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না, সকলের পরের লেখাই বোধ হয়। ভাগবতে অনার্য্য জাতি মধ্যে হূন (Huns) জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিখিত না হইয়া আরো প্রায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়।

পাঠক বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতে পারেন, মনে করুন, ভাগবত না হয় দশম শতাব্দীর রচনাই হইল ; তাহাতে ভাষার কি হইয়াছে ? গোপনে চিন্তা না করিয়া মহাশয়ের সমক্ষে কাগজে কলমে চিন্তা করিতেছি—অত ক্রুদ্ধ হইবেন না। আর শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে ভাবিতেছিলাম, সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে পারি না। ভাগবতের সূত্র এই বঙ্গ ভূমিতেও ওত প্রোতভাবে রহিয়াছে। ভাষায়ও সেইরূপ। জয়দেবের "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে" সেই ভাগবতেরই মধুর গন্ধ বহন করিতেছে ; বিদ্যাপতি, "রসধাম" চণ্ডীদাস "রসশেখর", কোন্ রসে ? এই ভাগবতের রসে। চৈতন্যদেব যে প্রেমে মাতিয়াছিলেন, ভাগবতই তাহার নিদান। চৈতন্য দেবের বিষয় বিশেষ সমালোচন করিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি চৈতন্যের পূর্ব্বগামী ভাবুকদিগের রচনায় ভাষার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাই দেখা

যাউক। প্রথমতঃ জয়দেবের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কি সম্বন্ধ আছে? অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্য-বর্ত্তিনী ভাষা। তবে কি আমরা বলি যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে? না, তাহা বলি না। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার জননী, মাতামহী বা পিতামহী নহে! তবে জয়দেবের সংস্কৃত এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী কি রূপ? সজীব প্রাণী হইতে উদ্ভিদ তরুলতাদির জন্ম নয় নাই অথবা উদ্ভিদ হইতে জন্তু সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু পুরুভুজ বা প্রবাল এক জাতি, ও জীবজাতির মধ্যবর্ত্তী। জয়দেবের ভাষাও সেই রূপ। সে ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত; অথচ "চলসখি কুঞ্জং" বলিলে নায়িকাকে আধঘোমটা টানা, পেড়ে শাড়ী পরিহিতা বলিয়াই বোধ হয়। যেন বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালা কথাই কহিল। কোন গ্রন্থোক্তা নায়িকা সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তিনী। যদিও এ প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি জয়দেব, বিদ্যাপতিকে প্রণাম করিবার জন্য একটু দাঁড়াইতে হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমী; রামচন্দ্র, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা রাজা; শাক্যসিংহ, শুদ্ধ বুদ্ধ; ঈশা, নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানব; গৌরাঙ্গ, ভগবান ভক্ত; মহম্মদ—তাঁহার পরগম্বর; কোমৎ—মহাজ্ঞানী। ইহাঁরা মনুষ্য হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বীর ধর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা পশ্চিম দেশীয়েরা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বুঝিতে পারিল; তাঁহাকে চিনিতে পারিল; সাদরে গ্রহণ করিল। কোমল স্বভাব বাঙ্গালি কোমল প্রেমে মজিল; আবার গৌরাঙ্গ আসিয়া যখন ভক্তি বাতাসে সেই প্রেম নদীতে নদীর কিনারায় নদীয়ায় ঢেউ উঠাইলেন, তখন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিল। গৌরাঙ্গের পূর্ব্বেই এই প্রেমের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। যে প্রেমাবতারকে ঈশ্বর বলিয়াছে, সে প্রেম হইতে ব্যভিচার সম্ভব, একথা কখনই মনে করিতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ, তা কি কখন কলুষিত হয়? রামোপাসক কি সীতা নির্ব্বাসনে পাপ মনে করিতে পারে? ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম পালনে পাপ কখনই হইতে পারে না। প্রকৃত গৌরাঙ্গোপাসক বৈষ্ণবকে যদি বলা যায়, "কেবল ভক্তিতে কোন ফল হইতে পারে না; জ্ঞান দ্বারা ভক্তির সংযম করা উচিত; ভক্তির

আধিক্যে বাতুলতা জন্মিতে পারে; ঈশ্বরদত্ত এই মহৎ জ্ঞান ইচ্ছাপূর্ব্বক হারান কখনই উচিত নহে, তুমি ভক্তি একটু সংযত কর।" এ কথা কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারিবে? সে বলিবে, "আপনি তাই বলুন, আমি যেন ভক্তির আধিক্যে বাতুলই হই; আমি যেন সেই 'দশা প্রাপ্ত' হইয়া চিরকাল যাপন করি! আহা! তাহইলে ত প্রভুর কৃপা হইয়াছে।"

জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সেই রূপ, প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেম রূপ যে কোন পদার্থ আছে, তাহা অনুভবও করিতে পারেন নাই। প্রেম হইলেই হইল, সে প্রেম যখনই পাইয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া, তারি লোফালুফি, তারি ছড়াছড়ি, তারি ঢলা ঢলি করিয়াছেন। যে আপনা ভুলে পরের জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা তাঁহারি জন্য ব্যস্ত ছিলেন। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা যখন ঘোরতিমিরা রজনীতে, চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, সেই রূপ, সেই তিমির পুঞ্জ কুঞ্জ বনে, একাকিনী,—লম্বিতাবেণী, চুম্বিতাধরণী একাকিনী শ্যাম গুণমণির জন্য ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহারা সেই একগতা প্রাণার পশ্চাতে২ ধাবমান হইতেন। তাঁহারা পবিত্র হৃদয়ে রাধা শ্যামের মিলন দেখিতে পারিতেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি এই প্রেম পথের পথিক। পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রথম ভাগ এই প্রেমের পাথার, এই গ্রন্থে প্রেম পরিচ্ছেদের কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। নায়কের বিচ্ছেদকে প্রেমবিচ্ছেদ বলি না। বরং বিচ্ছেদে কত প্রেম দেখুন।

পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে।
আছইতে আছলা কাঞ্চন পুতলা।
ভুবনে অনুপম রূপ গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বাম করে কপোল লুলিত কেশ ভার।
কর নখে লিখু মহী আঁখি জল ধার॥
বিদ্যাপতি ভণ——

* * *

নব প্রেমে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছে; ছায়ার এই চিত্র কি মনোহর ভাবেই দেখা যাইতেছে! আমরা বিদ্যাপতির এই পদটি তুলিয়াই অগত্যা

ক্ষান্ত রহিলাম। ইহাঁদের সুন্দর পদাবলীর বিশেষ সমালোচনের ইচ্ছা রহিল।

প্রধান কয়টী বিপ্লবে ভাষার কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ভাগবতে ভাষার অনেক রূপান্তর করিয়াছে। ইহার প্রেমভাগে ভাষার কত দূর সুন্দরতা, কোমলতা, সরসতা, লালিত্য সম্পাদন করিয়াছে, ভাষাকে কত দূর সংস্কৃতাপসারিণী করিয়াছে, সকলে বিবেচনা করুন। ইহার প্রগাঢ় রচনা প্রণালীতে বঙ্গভাষাকে কতক সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছিল। তাহাই এখন বক্তব্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই স্বীকার করেন, সভ্যতাবৃদ্ধিসহকারে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সভ্যতার তারতম্যানুসারে নীতিরও তারতম্য লক্ষিত হয়। এরূপ হইবার কারণ কি, সভ্যতার প্রকৃতি বিবেচনা করিলেই সহজে বুঝা যায়। মনুষ্য যত পশুভাব পরিত্যাগ করিতেছে, যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইয়া বাহ্য জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছে, যত নিজের প্রবৃত্তি দমন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে শিখিতেছে, ততই ক্রমে ক্রমে সভ্য হইতেছে। "সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বাকল্ সাহেবও ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি মানসিক উন্নতিকেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার মতে "এই উন্নতি দুই প্রকার, নৈতিক ও বৌদ্ধিক; প্রথমটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিষয়ে, দ্বিতীয়টী জ্ঞান বিষয়ে।" (১) তিনি আরও বলেন, "যদি, এক পক্ষে, কোন জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি সহকারে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, অথবা, অপর পক্ষে, যদি ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা বাড়িতে থাকে, নিঃসন্দেহ সে জাতি উন্নত হইতেছে না। এই দুই প্রকার গতি, নৈতিক ও বৌদ্ধিক, সভ্যতা রূপ ভাবের অঙ্গ স্বরূপ, এবং মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ মর্ম্ম নির্দ্দেশক।" (২)

কিন্তু বাকল্ যদিও নৈতিক উন্নতিকে সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহার মতে মনুষ্যের নীতি কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নত হয় নাই; উহা চিরকালই স্থিরভাবাপন্ন আছে; পূর্ব্বকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই

---

(১) Buckle's *History of Civilization.* Vol. I. p. 174.

(২) Buckle's *History of Civilization.* Vol. I. p. 174-75.

আছে। লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছে কি না, বাক্‌ল্ বোধ করেন, ইহা নির্ণয় করিবার একটী মাত্র উপায় আছে। দেখ, নীতি বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। লোকের কার্য্য বিশ্বাসের অনুগত; যদি অভিনব নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তবে নীতিসম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বাক্‌ল্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নীতির উন্নতি নাই। তিনি বলেন, "আমাদিগের নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে, সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের জ্ঞাত এমন একটী নিয়ম নাই, যাহা প্রাচীনেরা জানিতেন না।" (৩) "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশীগণকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে; এই গুলি এবং আরো গোটা কতক নীতি শাস্ত্রের সার কথা। কিন্তু এগুলি কত সহস্র বৎসর পরিজ্ঞাত রহিয়াছে, এবং কি উপদেশ, কি বক্তৃতা, কি গ্রন্থ দ্বারা কোন নীতিবেত্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা একটী বিন্দু বিসর্গও বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।" (৪) "যে বলে পূর্ব্বাজ্ঞাত কোন নীতিতত্ত্ব মানবজাতি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয় ত মহামূর্খ, অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক বঞ্চনাকারী।" (৫)

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর আইসে, তাহাতে বোধ হয়, বাক্‌ল্ সাহেব মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা স্বীকার করি না যে, যদি নীতি বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈতিক উন্নতি হয় নাই। কোন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকাল যোগ্য নীতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের অযোগ্যতা নিবন্ধন এই তত্ত্ব সমুদ্র-তলস্থিত রত্নের ন্যায় অব্যবহৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহা পুনরুদ্ধৃত বা জন সমাজে পরিগৃহীত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা; এবং পরিগৃহীত হইলেও তদ্দ্বারা লোকের কার্য্য নিয়মিত হইতে বহুকাল গত হইবে। কর্ত্তব্য জানিলেও অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করা

(৩) Ibid p. 181.

(৪) Buckle's *History of Civilization.* Vol. I. p. 180.

(৫) Note to page 180 Vol. I. B. H. C.

সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, "আমাদিগের উপদেশানুসারে চল, আমাদিগের আচরণের অনুকরণ করিও না।" তাঁহারা জানেন, তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন না। এইরূপ বিবেক ও বাসনার সমর কত লোকের অন্তঃকরণে চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রায় সহস্র বর্ষ ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে; কিন্তু সেখানকার কত অংশ লোকে তাহার সারনীতিতত্ত্ব গুলি জানে, এবং যাহারা জানে তন্মধ্যে কত ভাগ লোকে তদনুরূপ কার্য্য করে। ঈশার শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়া সম্যক্ প্রকারে তদনুসারে চলিলে ইউরোপীয়দিগের নূতন দেবতুল্য ভাব হইত। তাহা হইলে আর তাঁহারা পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন না, অর্থ এবং ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিতেন না। তাহা হইলে আর ভূমণ্ডলের সভ্যতম বিভাগে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইত না, নরশোণিত পাত হইত না, দেশ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইত না। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম বহুকাল পরিগৃহীত হইয়াও নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ব্যাপ্ত ইউরোপ মণ্ডলের কার্য্য নিয়মিত করিতে পারিতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া কার্য্যকারী হইতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং যে সময়ে কোন অভিনব নৈতিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে না, সে সময়ে পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব জনিত নৈতিক-উন্নতি বহুল পরিমাণে আস্তে আস্তে হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নীতিশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা জটিল; সুতরাং অন্য শাস্ত্রে যে কাল মধ্যে যে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, নীতি শাস্ত্রে সে কাল মধ্যে সে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত না হইবারই কথা। অগোস্ত্ কোম্ত্ দেখাইয়াছেন, যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহার তত শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে। নীতিবিজ্ঞান, মনুষ্য সমাজ ও মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া জটিলতম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কি প্রকারে ত্বরায় উন্নত হইবে? কি রূপ কার্য্য মনুষ্যের মঙ্গলকর, কি রূপ কার্য্য অমঙ্গলকর, বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে নির্ণীত হইবার নহে। অগোস্ত কোম্ত্ বিজ্ঞান শাখা নিচয়কে জটিলতার তারতম্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সরলতম গণিতকে সর্ব্ব-প্রথমে স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অপেক্ষাকৃত জটিলতর জ্যোতিষকে, তদনন্তর জটিলতা বৃদ্ধির ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন তত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে যথাক্রমে রাখিয়া সর্ব্বশেষে জটিলতাশ্রেষ্ঠ নীতি শাস্ত্রকে

সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা নীতিশাস্ত্রকে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন-তত্ত্বের ন্যায় উন্নতিশীল না দেখিয়া তাহার একবারে উন্নতি নাই, স্থির করিয়া বসেন, তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। জ্যোতিষের অনুন্নতি সন্দর্শনে প্রাচীন-পণ্ডিতকুলচূড় সক্রেটিস্ও এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, গগনচর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয়ে মানবজাতি কখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতিদ্বারা এক্ষণে সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, নীতিবিষয়কজ্ঞানসম্বন্ধে যে মানবজাতি চিরকাল স্থিরভাবাপন্ন রহিয়াছে, এ কথা অপ্রামাণ্য। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের ন্যায়ান্যায় বোধ একরূপই হইত। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসপাঠ ও দেশভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, দেশভেদে ও কালভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানের কত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক সময়ে বা এক প্রদেশে যাহা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, অন্য সময়ে বা অপর প্রদেশে তাহা নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। স্পার্টাবাসি-দিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি এবং আমাদিগের দেশে সহমরণ প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে কে এবম্বিধ ব্যাপারের অনুমোদন করে? যদি পুরাবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে না চাও, বর্ত্তমান কালের অসভ্য জাতিগণের প্রতি দৃষ্টি কর; জানিতে পারিবে, তাহারা নীতিতত্ত্বসম্বন্ধে সভ্যজাতিগণাপেক্ষা কত অনভিজ্ঞ। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন, "অষ্ট্রেলীয় ভাষায় ন্যায়পরতা, পাপ, দোষ, বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। অধিকাংশ নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে পরোপকারিতা ও ক্ষমাশীলতাসূচক কার্য্যের অর্থ বোধ হয় না, অর্থাৎ, সমাজ সম্পর্কে মনুষ্য কার্য্যের জটিলতর সম্বন্ধ সকল বোধগম্য হয় না।" (৬) গ্যাল্‌ব্রেথ্ সাহেব আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অনেক কাল বাস করিয়া তাহাদিগের নীতি বিষয়ে এই বলিয়াছেন যে, "তাহারা অধিকাংশ পাপ কর্ম্মকে পুণ্য জ্ঞান করে। চুরি, ঘর জ্বালানি, বলাৎকার এবং হত্যা, তাহাদিগের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন হইবার উপায় বলিয়া গণ্য হয়, এবং অল্প বয়স্ক আমেরিক বাল্যকাল হইতে হত্যাকে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে শিক্ষিত হয়।" (৭) পলিনেসীয় পর্য্যালোচনায় উক্ত

---

(৬) Herbert Spencer's *Principles of Psychology* Vol. I. p. 369.

(৭) Ethnological Journal 1869. p. 304.

হইয়াছে, "সন্তানগণের মধ্যে তিনভাগের দুইভাগ পিতামাতায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মারিয়া ফেলে।" (৮) বার্টন সাহেব কহিয়াছেন, "পূর্ব্ব আফ্রিকায় বিবেক নাই, এবং আত্মগ্লানি বলিতে মারাত্মক দুষ্কর্ম্ম করিবার সুযোগ হারানজন্য দুঃখ বুঝায়। ডাকাতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ; হত্যা—যত নিষ্ঠুর ও নিশীথকাল কালীন, তত ভাল—শূরের চিহ্ন।" (৯) মধ্য আফ্রিকা পর্য্যটক পিথারিক সাহেব বলেন, "আমি রাক্ষসনাম-গর্ব্বিত নিম্‌নাম্‌দিগের নিকটে শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ বা মৃত্যু সমীপবর্ত্তী হয়, তাহারা বিনষ্ট এবং ভক্ষিত হইয়া থাকে"। (১০) পাল্‌বিডুসেলু আফ্রিকাস্থ নরমাংসাশী ফান্ এবং ওশিবা জাতির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, তাহারা মনুষ্যভোজী বলিয়া অহঙ্কার করে। (১১) ফিজি দ্বীপপুঞ্জবাসীরা ভয়ঙ্কর রাক্ষস। (১২) অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নবজিলণ্ড-নিবাসিরা অল্পদিন মনুষ্যভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। (১৩) ভাষা এবং চিত্তের দরিদ্রতা নিবন্ধন ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল ভ্যান্‌ডিমেন্ দ্বীপবাসিদিগের বোধগম্য করান যায় না, বলিয়া টাসমেনিয়ার ইংরাজ বিশপ নিক্সন তাহাদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। ভন্ রকাস্ বলেন যে, নবকালিডনিয়া নিবাসিরা নির্লজ্জ, পশুবৎ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নীতিবোধবিবর্জ্জিত, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, নরমাংসাশী। (১৪) মরিজ উয়াগ্নর নামক বিখ্যাত পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার কাহিবিরা মানবাহারী; এমন কি, নিজের সন্তান পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। (১৫) ব্রেজিলের অরণ্যস্থ আদিমবাসিদিগের সম্বন্ধে ডাক্তর রবার্ট আভিলালিমণ্ট কহেন, তাহারা উলঙ্গ,

---

(৮) Polynesian Researches Vol. I. p. 334.

(৯) Burton's *First Footsteps in East Africa* p. 176.

(১০) *Egypt, the Soudan and Central Africa* by Johon Petherick.

(১১) *Explorations and Adventures in Equatorial Africa* by Paul B. Duchaillu.

(১২) *Chamber's Encyclopedia* Vol. II. p. 564.

(১৩) Ibid Vol. IV. p. 332.

(১৪) *Man in the Past, Present and Future* by L. Buchner p. 315.

(১৫) Ibid p. 321.

ব্রীড়াহীন, মনুষ্যভক্ষক, নীতিভাবশূন্য ; যে জন তাহাদিগের বন্ধু সেই ভাল, যে মিত্র নয়, সে মন্দ। (১৬) আমেরিকার দক্ষিণাংশস্থিত টিরাডেল্ ফিউগো দ্বীপবাসিদিগের বিষয়ে আমাদিগের বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারী ডিউক অব্ আর্গিল "আদিমমনুষ্য" নামক গ্রন্থে (১৭) লিখিয়াছেন যে, তাহারা, বোধ হয়, সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা বিবস্ত্র ও নরমাংসাহারী ; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগুলিকে কুকুরাদির ন্যায় মারিয়া ভক্ষণ করে। ডারউইন্ বলেন, "যখন আমরা ঈদৃশ মনুষ্যগণকে দেখি, তখন তাহারা যে আমাদিগের সদৃশজীব এবং এই ভূমণ্ডলনিবাসী, এরূপ জ্ঞান করিতে কষ্ট হয়।" (১৮)

চতুর্থতঃ, প্রাচীনদিগের অজ্ঞাত একটী নৈতিক নিয়মও যে বর্ত্তমানকালের সভ্যতম ইউরোপীয়েরা জানেন না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," এই নীতিতত্ত্বটী এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানীমাত্রেরই নিকটে সমাদৃত হইতেছে ! যদি "প্রাচীন" বলিতে ঐতিহাসিক, গ্রীক, রোমক, যিহুদী, হিন্দু, মৈসর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণই বুঝায়, তাহা হইলেও দেখান যায় যে, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াও তাঁহারা এতত্ত্বটী অবগত হইতে পারেন নাই। রাজনীতিগ্রন্থে আরিষ্টট্ল্ দাসদিগকে সমাজের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। (১৯) রোমের ব্যবস্থাকারেরা দাসত্ব সংক্রান্ত কতকথা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং রোম ও গ্রীসে কৃষি প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। মূসার ব্যবস্থা এবং বাইবলের অন্যান্য স্থল হইতে জানিতে পারা যায় যে, যিহুদিদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রচলিত ছিল। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে মনু বলেন, দাসত্বই শূদ্রোচিত কর্ম্ম ; এবং হিরোডোটস্ মিসর দেশে দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কোন সভ্য জাতির এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, যাহাতে দাসত্ব ন্যায়-বিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বরং তদ্বিপরীত প্রমাণই ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়।

---

(১৬) *Journey through North Brazil 1859* by Dr. Robert Ave Lallemont.

(১৭) *Primeval Man* by the Duke of Argyll p. 167.

(১৮) Darwin's *Voyage of the Beagle*.

(১৯) See Aristotle's *Politics*.

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে যে, যে গ্রীক্‌জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়তা গুণে অসংখ্য শত্রুদলন পূর্ব্বক জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া মানবমণ্ডলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যে জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে স্বতন্ত্রতা ও শৌর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি সকল উন্নত ও নব-স্ফূর্ত্তি সম্পন্ন হয়, সে জাতিও দাসত্ব কলঙ্কে দূষিত ছিল এবং সে কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ করিতে কখনও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে, স্বশ্রেণী বা স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে যে সময় লাগে, সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে তদপেক্ষা কত অধিক সময় আবশ্যক, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, স্বশ্রেণী বা স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানস্বত্বেও সমুদায় মনুষ্যসম্পর্কীয় কর্ত্তব্যবোধ উদিত না হইবার কারণ কি? বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের সাদৃশ্য নির্ণয় দ্বারাই তাহাদিগকে এক নিয়মের অধীন বলিয়া জানা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাহ্য বৈলক্ষণ্য সমুদায়ের অভ্যন্তরে মূল-প্রকৃতিস্থ সমতা যত লক্ষিত হইতেছে, দিন দিন যত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বজাতির ন্যায় সমস্ত নরজাতির সুখদুঃখের সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ দুঃখ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ততই সাধারণনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, যদি "প্রাচীনেরা" বলিতে অতি পূর্ব্বকালীয় অনৈতিহাসিক সময়ের লোক বুঝায়, তাহা হইলে প্রমাণ করা যায় যে, তাঁহারা নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালীয় সভ্যজাতিগণাপেক্ষা অনেক দূর অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহই সমাজের পত্তনভূমি। বিবাহ হইতেই পরিবার—পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতাস্বসা, জামাতা, বধূ, মধুরতাময় পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। বিবাহ হইতেই দম্পতি প্রেম, মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয় প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে বিবাহ ছিল না, সকলেই পশুবৎ যদৃচ্ছা বিহার করিত। ইহার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, মহাভারত পাঠে জানা যায়, "পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ, স্বাধীন ও সচ্ছন্দবিহারিণী ছিল।" ভারতবর্ষে ইহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মালাবারের নায়র-দিগের মধ্যে মহিলাগণ স্ববর্ণে বিহার করিয়া থাকেন। কে কাহার পুত্র, কেহই বলিতে পারে না; সুতরাং ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়াধিকারী।

অযোধ্যায় তিহুরদিগের মধ্যে এইরূপ সচ্ছন্দবিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে আরও লিখিত আছে যে, "উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে।" (২০) উত্তর কুরু বলিতে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমির উত্তর কোন পুণ্যময় দেশ বুঝিতেন। বোধ হয়, ইহা আদিম আর্য্যদিগের বাসস্থল হইবে। তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অতি পূর্ব্বকালের আর্য্য-পিতৃগণ যথেচ্ছবিহারী ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকজাতির ইতিহাস-দ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়। গ্রীক্ পুরাবৃত্তলেখকগণ পুরাতনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সিক্রপ্‌স গ্রীস্ দেশে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত করেন। প্লুটার্ক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রী প্রদান করা রীতি ছিল।

অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য সামগ্রী ছিল, বর্ণিত আচার ব্যবহারে তাহার কোন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহপ্রণালী বদ্ধমূল হইলেও স্বামী সহবাস সুখলাভ করিবার পূর্ব্বে কোন কোন দেশে এক দিনের জন্য মহিলাগণ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। হেরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, ব্যাবিলনীয়াতে কোন স্ত্রীলোক একবার রতিমন্দিরে না থাকিয়া বিবাহ করিবার অনুমতি পাইত না। (২১) ষ্ট্রাবো বলেন, আর্মি-নিয়াতেও এই নিয়ম ছিল। (২২) ডিলরি সাহেবের মতে কার্থেজে এবং গ্রীসের কোন কোন অংশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সাইপ্রস দ্বীপে, ইথিওপিয়ায়, লিডিয়ায় ঈদৃশ রীতির চিহ্ন লক্ষিত হয়। (২৩) ডাওডোরস্ সিকুলস্ কহেন, মেজর্কা, মাইনকা, আইভিকা দ্বীপে বিবাহ রাত্রে পাত্রী উপস্থিত অতিথিবর্গের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। (২৪)

চীনেরা বলে, তাহাদিগের দেশে ফোহির সময়ে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। হেরোডোটস্ কহেন যে, মেসাজেটি এবং ইথিওপীয় অশেস্ জাতি বিবাহ কাহাকে বলে, জানিত না। মেসাজেটিদিগের বিষয়ে বিখ্যাত ইতিবৃত্ত ও

---

(২০) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

(২১) Herodotus, Clio, 199.

(২২) Strabo. Lib. 2.

(২৩) Lubbock's *Origin of Civilization*. p. 100.

(২৪) Ibid p. 101.

ভূগোলবিৎ ষ্ট্রাবোও এই কথা লিখিয়াছেন, (২৫) মিশরদেশেও উদ্বাহপদ্ধতি প্রারম্ভের জনশ্রুতি ছিল। (২৬)

এপর্য্যন্ত যাহা প্রকটিত হইল, তদ্দারা প্রমাণ হইতেছে, সভ্যতম জাতিগণও এক সময়ে বিবাহপ্রথাশূন্য ছিলেন। কি আর্য্যবংশোদ্ভূত হিন্দু, গ্রীক্ ও রোমকগণ, কি সৈমকুলকেশরী ব্যাবিলনীয় এবং কার্থেজীয় বা ফিনিসীয় জাতি, কি আফ্রিকাশিরোরত্ন মৈসরনিকর, কি তুরাণবংশচূড় চীনজাতি, কেহই অতি পূর্ব্বকালে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতেন না। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক অসভ্য-জাতির মধ্যে গ্রীস্ এবং রোমের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে বিবাহপ্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে। বোর্ণিও দ্বীপের অরণ্যবাসী ও আফ্রিকার মধ্যস্থ ডোকো প্রভৃতি অসভ্যতম জাতি আদিমাবস্থা অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে শিখে নাই, পরিবার কাহাকে বলে জানে না, পশুবৎ সচ্ছন্দ বিহার করে। (২৭) অপেক্ষাকৃত উন্নত আমেরিকার আপাচীরাও বিবাহ বুঝে না; কিছু দিনের জন্য স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকে, সন্তানগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলেই স্বদেশীয়দিগের দলে মিশিয়া যায় এবং জনক জননীর অপরিচিত হইয়া পড়ে। (২৮) নারীগণ যে পূর্ব্বকালে সর্ব্ব সাধারণের ভোগ্য বস্তু বলিয়া গণ্য হইত, অসভ্যদিগের কোন২ আচার দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইতে পারে। গ্রিণ্‌লণ্ডের ইতিবৃত্তনামক গ্রন্থে ইজিডি সাহেব লিখিয়াছেন, এস্কিমোদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে বন্ধুদিগকে স্ত্রীদান করিতে পারে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অমায়িকস্বভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। (২৯) এস্কিমো, আদিম আমেরিকগণ, পলিনেসীয়েরা, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা, নিগ্রোনিচয়, আরবেরা, আবিসিনীয়, কাফ্রি এবং মোগলেরা, যে কেহ তাহাদিগের নিকটে অতিথি হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্ত্রী দিয়া থাকে; এবং ইহা না করিলে তাহাদিগের বিবেচনায় আতিথ্য ভঙ্গ হয়। (৩০)

---

(২৫) Lubbock's *Origin of Civilization.*

(২৬) Buchner's *Man in the Past, Present and Future* p. 326.

(২৭) Buchner's *Man in the Past, Present and Future* p. 326.

(২৮) Ibid 323.

(২৯) Egede's *History of Greenland* p. 142.

(৩০) Lubbock's *Origin of Civilization*. p. 102.

অতিপূর্ব্বকালে যে লোকে কেবল বিবাহশূন্য ছিল, এমত নহে; মনুষ্য মারিয়াও ভক্ষণ করিত। যে নর আহারসামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত, সেই নর ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতেছে। একি অল্প নৈতিক উন্নতির চিহ্ন? আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, সকল দেশেই নরবলি প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ আছে; এবং যেখানে নরবলি প্রদত্ত হইত, সেই খানেই কোন না কোন সময়ে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল; কারণ লোকে যাহা সুখাদ্য জ্ঞান করে, আহারার্থে তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। আদিম কালের মানবজাতির অবস্থা যিনি মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই তাৎকালিক রাক্ষসত্ব লক্ষণ স্বীকার করিবেন। কোম্‌তের মতে আদৌ মনুষ্য নরমাংসাশী ছিল। (৩১) বুকনর বলেন, "ভগ্ন ও দগ্ধ মনুজাস্থির যে বহুসংখ্যক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐতিহাসিক সময়ের অধিকাংশ অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় অনৈতিহাসিক ইউরোপবাসিগণ মানবভোজী ছিল।" (৩২) অদ্যাপি যে কোন কোন অসভ্য-জাতির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ চলিতেছে, ইহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। আফ্রিকাস্থ নিম্‌নাম্, ফান্ এবং ওসিবাজাতি, আমেরিকার কাহিবি, ব্রেজিলবাসী ও টেরাডেল্‌ফিওগো নিবাসীগণ, ফিজি, নবকলিডনিয়া প্রভৃতি দ্বীপাধিবাসি সকল, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে রাক্ষস ছিল, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির বর্ণনাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পুরাবৃত্তবিদ্ হেরোডোটস্ মাসাজিটি নামক মধ্য আসিয়াস্থ জাতিবিষয়ে বলেন যে, যখন কেহ তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ হইত, তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে মারিয়া আহার করিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেণ্ট জেরোম লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বাল্যকালে গল্ প্রদেশে ছিলেন, ব্রিটেন নিবাসী স্কটদিগকে নরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। (৩৩)

অসভ্যজাতিগণের অবস্থা হইতে সভ্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা অনেক দূর অনুমিত হইতে পারে; কারণ সভ্যজাতিগণ যে সকল সামাজিক

---

(৩১) See Miss Martineau's *Translation of Positive Philosophy* Vol. II. p. 186.

(৩২) Buchner's *Man in the Past, Present and Future* p. 261.

(৩৩) *Chamber's Encyclopedia* Vol. II. p. 563.

সোপান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, অসভ্যজাতিগণ তাহার কোন না কোনটায় পড়িয়া আছে। এই জন্যই আমরা মনুষ্যের আদিমাবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত অসভ্য জাতিদিগের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিলাম।

ষষ্ঠতঃ, "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশীগণকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে;" এই সকল উপদেশ হিন্দু, গ্রীক, রোমক, যিহুদী প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধের মধ্যে যাহা২ লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অদ্যাপি এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এই সকল নীতিতত্ত্ব অবগত নহে এবং পূর্ব্বে এমন এক কাল ছিল, যখন এসমুদায় সত্য কি হিন্দু, কি গ্রীক্, কি রোমক, কি যিহুদী, কাহারও চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয় নাই। যখন মনুষ্য মনুষ্যের আহার ছিল, যখন নরগণ ছলে বলে কৌশলে কোন নারীকে নিজায়ত্ত করিয়া পশুবৎ বাসনা পরিতৃপ্ত করিত, যখন পতি পত্নী, পিতা মাতা, এ সকল সুধাময় শব্দ শ্রুত হইত না, তখন কাহার মনে এই সমস্ত নৈতিক উপদেশ প্রকাশিত বা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিত? বাস্তবিক অনেক দূর সভ্য না হইলে কেহ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারে না, এবং প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক্, রোমক এবং যিহুদি-দিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান কালীয় ইউরোপীয়গণ সভ্যতাবর্ত্মে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলিয়াই নীতিতেও অধিক উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। তথাপি আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না" অর্থাৎ "সকল মনুষ্যকেই স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে" এই নীতিতত্ত্বটী প্রাচীনেরা জানিতেন না, নব্যেরা আবিষ্কার করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, মহামূর্খ বা বঞ্চক বলিয়া অভিহিত হইবার ভয় থাকিলেও, আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম কোন নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশ করে নাই। ঈশার মতে প্রীতি ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বরপ্রেমে এবং মানবপ্রেমে অভিষিক্ত হও, সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে অভিষিক্ত হও, তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। যে পিতা মাতাকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভাল বাস, তাঁহাদিগের আজ্ঞা যেমন উৎসাহচিত্তে যত্নের সহিত পালন কর, তেমনি ভাবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চল। স্নেহময়ী ভগিনী বা প্রাণোপম ভ্রাতার মঙ্গল সাধন জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও ব্যগ্রতাসহকারে

আপনি অনেক কষ্ট সহিয়াও চেষ্টা করিয়া থাক, প্রত্যেক মনুষ্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ করিবে ; সে তোমার যত কেন অপকার করুক না, সে তোমার যত কেন শত্রু হউক না, সে যত কেন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হউক না, কেবল বাহ্য কার্য্যে নয়, অন্তরের প্রতিতন্তুতে, এই সর্ব্বতঃপ্রসারী প্রেম ব্যাপ্ত থাকিবে, তাহা হইলে তুমি ধার্ম্মিক হইবে, নতুবা নয়। এইরূপে মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য একমাত্র প্রীতিতে পরিণত করিয়া ঈশা আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বোচ্চতম নৈতিক নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন। এই সামান্য নিয়মেই পূর্ব্বাবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ নৈতিক নিয়ম পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ইহাতেই উত্তরকাল সমুদ্ভাবিত নীতিতত্ত্বসকলের মূল নিহিত রহিয়াছে। "পর দ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা হরণ করিবে না, মিথ্যা কথা কহিবে না, শত্রুকে ক্ষমা করিবে, প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিবে," প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন কালের নিয়ম ভিন্ন, ভিন্ন নদীর ন্যায়, একমাত্র সার্ব্বভৌম প্রেম সাগরে লীন হইয়াছে ; এবং "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," "সকলেই সুখভোগে সমান স্বত্ববান্ বোধ করিবে," ইত্যাদি বর্ত্তমান সময়ের নীতিতত্ত্ব সকলও সুধাকর ও কমলার ন্যায় সেই প্রীতিসিন্ধুর মন্থনে উত্থিত হইয়াছে ; কেননা যে তোমার ভ্রাতা, সে কি তোমার দাস হইতে পারে ? সে যে সমান স্বত্বাধিকারী।

এই প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অসভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা সভ্যজাতিগণ, এবং প্রাচীন-দিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়গণ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সভ্যতা বৃদ্ধিসহকারে নীতির উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরি গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে-বাড়ীর সম্বাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যেদিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসী মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এই রূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন২ যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্ট নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে২ ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, উপপতি। কিন্তু কে কার্ উপপতি, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষ তাহার মনে২ সন্দেহ

হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল।

হীরা বাবুদিগের বাড়ী হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড়. চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতে-ছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিয়া, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ২ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে, মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওমা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে২ কুন্দের ঘরে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—"কুন্দ ঠাকুরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হইয়াছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া ঘর খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি২ করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগভিমুখ-গামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগ বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এ দিগে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোতঃ আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল,

"আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম ? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল। আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে এক বারও দেখিতে পাই না! তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব ? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয় ?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কিনা, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাহাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে ? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তাহলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত, নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণ পক্ষাবশেষ, ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি২ অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্র শৈবালাদি সমাচ্ছন্ন জলে, বীচিবিক্ষেপ হইতে-ছিল না। অস্পষ্ট লক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর অতি নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুকুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে, সন্দেহমন্দ পদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতি মধ্যে একদিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি ? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন্ ? কি প্রকারে ? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিগে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে

উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই কুন্দ অমনি ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রগৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথ পানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদ পানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরব মধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষিরা পাকা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবানগণ কৃত দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল। শেষে উষাসমাগম সূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউ গাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ যে দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুর সংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয় ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পাদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কির দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কির দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুল বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘনবৃক্ষ লতাগুল্মরাজি পরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে প্রস্তর রচিত সুন্দর পথ, স্থানে২ শ্বেত রক্ত নীলপীতবর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমিতেছে—বসিতেছে—উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের

অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে২ ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছেনা, কেননা তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলাবাজিতে সকলকে জিতিতেছে।

উদ্যান মধ্যস্থলে, একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত লতা মণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যান মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, যে তাহার প্রস্তর নির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে২ বৃক্ষের অন্তরালে২ থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে, অগ্রসরও হইতে পারিল না—পশ্চাদপসৃতাও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "কুন্দ? এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত, একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া, কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানা তল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা২ জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে২ বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাব গতি বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কানা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর একপদ নামিতে হয়। কিন্তু তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপা বাঁধা হুক্কা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পূরিয়া মিটাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল কটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃহু হাসিল, দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুণ২ করিয়া গান করিতে২ সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ধাঁকর ধোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলন সই করিয়া লইলেন, এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ, মধুর ভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী, আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন।

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র?

হীরা রাগিল—বলিল "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই—পরের ভাল

মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কোমলতরস্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভো, আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা, স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান্।"

দেবেন্দ্র আর এক গ্লাস পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে একদিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষ-কাতরস্বরে কহিল, আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া রহস্য করা কর্ত্তব্য নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—এবং ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে২ প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কখন কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে এতটুকও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ত্যাগ করেন না, এ জন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন

আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।”

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এইরূপ তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে২ ভাবিলেন, “আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যে দিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।” এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

পুণ্য কিসে হয়? সৎকর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় অথবা সৎকামনাতেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে? অথবা উভয় একত্রিত না হইলে পুণ্যকর্ম্ম হয় না?—লোকে সৎপ্রবৃত্তি বিনাও সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং কখন২ প্রকৃত অসৎ প্রবৃত্তি হইতেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। যশোবাসনাই অনেক পুণ্য কর্ম্মের মূলীভূত। উহাতে সাত্বিকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ কর্ম্মকে অসৎ প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না। যখন কেহ পরের ক্ষতি করিবার মানসে তাহার বিশ্বাস পাত্র হইবার জন্য কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহাই প্রকৃত রূপে অসৎ প্রবৃত্তিমূলক। তথাচ কখন কখন ঘটনা ক্রমে এতাদৃশ পাপিষ্ঠের ইচ্ছা সম্পূর্ণ না হইয়া, কৃত্রিম সৎকর্ম্মটী করিয়াই তাহার কুক্রিয়ার অন্ত হইয়া থাকে।

মনে কর, কোন ব্যক্তি রাজমুকুট অপহরণ মানসে লোকরঞ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া পরিশেষে ঘটনাক্রমে আপন মুখ্য উদ্দেশ্যে বঞ্চিত হইল। এরূপ স্থলে তাহার লোকরঞ্জন ক্রিয়া কদাচ পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবেক না। কিন্তু যাহারা এই প্রকারে তাহাকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেও সেই উপকার এক কালীন বিস্মরণ করা কি কর্ত্তব্য?

থেমিষ্টক্লিস্ যে স্বীয় বুদ্ধিবলে নানা উপায়ের দ্বারা এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি কি ছিল, তাহা কেহই জানে না, বরং তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতার অকৃত্রিমতার প্রতি অনেক সন্দেহই আছে। তথাপি তিনি না থাকিলে সালামিসের যুদ্ধে গ্রীকেরা কদাচ জয় লাভ করিতে পারিতেন না। আর যদি ঐ যুদ্ধের দ্বারা পারস্য সম্রাট্ দূরীকৃত না হইতেন, তবে বুঝি গ্রীসের সৌভাগ্যসূর্য্য আর উদয় হইত না এবং ইউরোপ অদ্যাবধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। অতএব থেমিষ্টক্লিস্‌কে

অতি পাষণ্ড মনে করিলেও তৎকৃত উপকার বিস্মরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

ফলতঃ সৎকর্ম্ম এবং সৎকামনা, বিভিন্ন পদার্থ, এবং উভয়ের প্রতি পৃথক রূপে দৃষ্টিপাত করিলেই এতদ্বিষয়ক দ্বিধা দূরীকৃত হইবেক। অমুক ব্যক্তির কামনা সৎ এবং স্বার্থপর নহে,—লোকের মনে এতাদৃশ সংস্কার না হইলে তাঁহার প্রতি প্রীতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু কামনা যেরূপ হউক, কর্ম্মটি সৎ এবং অন্যের উপকারজনক হইলেই কর্ত্তা কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েন। তদ্রূপ দুরভিসন্ধি না থাকিলে অপরাধী দণ্ডনীয় হয় না; তথাচ অজ্ঞানকৃত পাপ যে, পৃথিবীর ক্ষতিজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য যে পৃথক প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহার নিগূঢ় কারণ এই। আমার আশয় ভাল, অতএব আমাকর্ত্তৃক লোকের ক্ষতি হইলেও আমি জন-সমাজে এবং জগদীশ্বরের সমীপে সর্ব্বতোভাবে দোষহীন, এরূপ বিশ্বাস মঙ্গলকর নহে।

আমার সৎকামনার জন্য আমি পুণ্যবান বলিয়া গণ্য হইতে পারি, কিন্তু আমার কার্য্য মন্দ হইলে, তাহার দোষ আমাকেই বহন করিতে হইবেক। সদভিপ্রায় হইতে কুকর্ম্ম উৎপন্ন হইলে কেবল বুদ্ধির দোষ থাকাই জ্ঞান করিতে হইবেক; কিন্তু বুদ্ধির দোষ বড় তুচ্ছ পদার্থ নহে। তবে বুদ্ধিমত্তার সীমা নাই, সুতরাং বুদ্ধির ইতর বিশেষে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণে সকল লোকেই পৃথিবীর ক্ষতি বা মঙ্গল সাধন করেন। এই জন্য কেহ পুণ্যবান কি না, এপ্রকার বিচার স্থলে কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করেন না। কিন্তু বুদ্ধি সৎকামনার সহকারী না হইলে কিছুতেই ফল দর্শে না; অতএব যাঁহারা স্বীয় কার্য্য ফলের দোষ গুণ বিচার না করিয়া, কার্য্যটী সদভিপ্রায় মূলক, কেবল এই বলিয়া তাহার ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। এবং কামনা, ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য হইলেও কর্ম্মফলের দোষ গুণের প্রতি অনাস্থা করা অন্যায়।

কোন২ নীতিশাস্ত্রবেত্তা বলেন, সৎকর্ম্ম করিলে মনে এক প্রকার সুখোদয় হয়, এবং তাহাই কর্ম্মের সততার প্রমাণ। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সৎকর্ম্ম উপর্য্যুপরি করিলে এই রূপ তৃপ্তির হ্রাস হইয়া থাকে। তবে ইহাতে কি সততারও লাঘব স্বীকার করিতে হইবেক?—কদাচ নহে।

স্পৃহা সৎই হউক আর অসৎই হউক, চরিতার্থ হইলেই সুখ হয়, এবং অবরুদ্ধ হইলেই ক্লেশ জন্মে; ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মনোমধ্যে বিভিন্ন স্পৃহা উদিত হইলে যেটী চরিতার্থ হয়, তাহা হইতে সুখ, এবং অপর গুলি পরিতৃপ্ত না হওয়াতে, তন্নিমিত্ত কষ্ট অবশ্যই অনুভূত হইবেক। ধরাতলে সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্য এতই কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে যে, সভ্যসমাজে যখন কেহ কুকর্ম্ম করিতে সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ করে, তখন তাহার মনোমধ্যে উহা হইতে ক্ষান্ত থাকিবার বাসনা এক কালে অনুপস্থিত থাকে না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত কুকর্ম্মের অভ্যাস না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সদসৎ প্রবৃত্তির বিরোধজনিত অসুখ অবশ্যই হইতে থাকে। কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানস্থলে সকল সময়ে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না; এতাদৃশ অবস্থায় ইহার সুখ অবিচ্ছিন্নভাবে মনোমধ্যে বিকশিত হয়। কিন্তু যে স্থলে কোন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেস্থলে যে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হয় না, একথা কখনই বলিতে পারি না।

আবার অভ্যাস হইলে কামনার দোষগুণজনিত সুখ দুঃখ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া উঠে। এমন কি, কোন২ বিষয়ে স্পৃহাগুলি স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায় না। এক জনকে কটূক্তি করিবার সময়ে কোন সদাশয় ব্যক্তির যে চিত্ত বিকার প্রকাশ হয়, এক জন ঠগীর (ফেঁসেড়ার) মনে নরহত্যা কালে তাহার চতুর্থাংশ উদয় হয় কি না, সন্দেহ স্থল। সাংসারিক দুরবস্থা নিবন্ধন যে ব্যক্তি কখন অনাহারীকে অন্নদান করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই ক্ষমতা উপস্থিত হইলে মনে যে অপূর্ব্ব করুণার উদয় হয়, কিছু কাল পরে বহু লোককে অন্নদান করিলেও আর সেরূপ ভাব থাকে না।

এস্থলে ঠগীর পাপাধিক্য এবং অন্নদাতার পুণ্যবৃদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহাদিগের তীব্র স্পৃহার অভাব স্বাভাবিক নহে। প্রথম উদ্যমে অবশ্যই অন্নদানেচ্ছা এবং নরহত্যা বাসনা উভয়েরই যথেষ্ট তীব্রতা ছিল, কিন্তু অভ্যাস সহকারে তাহার অবস্থান্তর হইয়াছে। অতএব অভ্যস্ত পুণ্য স্বাভাবিক পুণ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, বরং উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবেক।

হিন্দু শাস্ত্রের এক প্রধান লক্ষণ এই যে, শাস্ত্রকারেরা পুণ্য কর্ম্ম অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"আসনাশন শয্যাভিরম্ভির্মূল ফলেন বা।

"নাস্য কশ্চিদ্বসেদ্গেহে শক্তিতোঽনর্চ্চিতোঽতিথিঃ॥

"অর্থ। শক্ত্যনুসারে ভোজন শয়ন পানীয় ফল মূলাদি দ্বারা অর্চ্চিত না হইয়া যেন কোন অতিথি তাঁহার বাটীতে বাস না করেন।

"তাৎপর্য্য ; শক্ত্যনুসারে অতিথিকে পূজা করিবেক।" ভরত শিরোমণির মনু ১৯৯ পৃঃ ৪ অঃ ২৯।

মনুর প্রভুত্ব সহকারে এতদ্দেশে অতিথি সৎকার ধর্ম্ম এত প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতিপালনে পুণ্য নাই, অবহেলনে পাপ হয় ; লোকের মনে প্রায় এইরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অতিথির পরিতোষ জন্য আপনি অনাহারে থাকিতে প্রস্তুত, হয় ত দেশহিতৈষিতার কোন অনুষ্ঠান হইলে তিনি আদৌ তাহাতে যত্ন করিবেন না।

মিল্ প্রভৃতি কোন২ মহৎ ব্যক্তি অভ্যস্ত পুণ্যের নিন্দা করিয়াছেন। (আমরা স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা * বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছি।) তাঁহাদিগের মতে প্রবল বাসনা হইতে সৎকর্ম্মের উদয় না হইলে সেই সৎ-কর্ম্মের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়া যায়। কিন্তু একথা বলিলে, কাহারো পাপ কর্ম্ম অভ্যাসসহকারে যখন এতাদৃশ সহজ হইয়া উঠে যে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাহার মনে সতেজঃ স্পৃহার আবশ্যকতা থাকে না, তখন তাহার সেই পাপ কর্ম্মটীও কি গুরুতর নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক ? ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

পরন্তু এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সৎ কি অসৎ কর্ম্মের অভ্যাস, দুই প্রকার হইয়া থাকে। উভয়েই, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে বাসনার প্রবলতা জানা যায় না। কিন্তু এক প্রকার অভ্যাসের প্রতিষেধ হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; দ্বিতীয় প্রকার অভ্যাসের লক্ষণ এই যে অভ্যস্ত সৎ বা অসৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আয়াসের প্রয়োজন থাকে না, এবং কার্য্যটী না করিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। ইহার প্রথম দৃষ্টান্তে বাসনার বিলক্ষণ তেজ আছে, কিন্তু তাহার অনুভব করা গেল না—এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বাসনার তেজ প্রকৃতপক্ষে খর্ব্বই হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু জনসমাজে উভয়বিধ কুকার্য্যই তুল্যরূপে ক্ষতিজনক এবং যখন কোন ব্যক্তি অনায়াসে একটী কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহা হইতে ক্ষান্ত থাকা তাহার পক্ষে অসাধ্য নহে বলিয়া, তাহার পাপের ন্যূনতা স্বীকার করা যায় না।

* এই প্রবন্ধে স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা শব্দের পরিবর্ত্তে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দ প্রয়োগ করা যাইবেক।

মিল্ চীন ও ভারতবর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই দুই দেশে সকল বিষয়ের নিয়ম নিবদ্ধ থাকাতেই এক্ষণে শ্রীহীন হইয়াছে। পরন্তু নিয়ম না করিলে সৎকর্ম্ম কখনই অভ্যস্ত হয় না। মনুষ্য সৎ অসৎ উভয় গুণেরই আধার। যত্নসহকারে সচ্চরিত্রতার উত্তেজনা এবং কুক্রিয়াসক্তির দমন না করিলে মনুষ্যপ্রকৃতি এবং জনসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। অতএব নিয়ম নির্দ্ধারণকে দোষ দেওয়া অন্যায়। মিল বলেন, নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে অচিরাৎ কর্ত্তার মন নিতান্ত অসার হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যের ফল কেবল কর্ত্তাতেই ক্ষান্ত হয় না। তুমি সৎকর্ম্মই কর বা কুকর্ম্মই কর, মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সহিত তোমার কি সম্বন্ধ থাকিবেক, তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু চিন্তারূপ ক্রিয়াই বল কি বাহ্য ক্রিয়াই বল, তোমার কার্য্য মাত্রেই অবিনশ্বর। যত দিন মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে থাকিবেক, ততদিন তোমার কার্য্যের ফল জগতে বিস্তার হইবেক। এক একটি কার্য্য কর্ত্তার মন হইতে উদিত হয় ;—অনন্তর তাহা হইতে এক দিকে কর্ত্তার মানসিক অবস্থার ইতর বিশেষ, অন্য দিকে তাহা প্রকাশ হইলে অপর ব্যক্তির অবস্থান্তর হয়। মানসিক ক্রিয়াটি প্রকাশ না হইলেও কর্ত্তার মনে যে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করে তাহার দ্বারা উহা কর্ম্মান্তরে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং স্বয়ং হউক অথবা তাহার ফলের দ্বারাতেই হউক, কোন কার্য্যই কেবল কর্ত্তাতে নিবৃত্ত থাকে না। প্রত্যেক কার্য্য তৎপরবর্ত্তী অন্য কার্য্যের কারণ। এবং তাহা কর্ত্তা ও ফলপ্রাপ্তব্যক্তি হইতে কালসহকারে সহস্রদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে। যেমন ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কদ্বয়ের পরস্পর আঘাত দ্বারা ভয়ানক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া উভয়েই অপার পদার্থ রাশিতে বিলীন হইতে পারে ; তথাচ উহাদিগের পরমাণুভাগ বাষ্পাকারে, এবং গতি, উত্তাপরূপে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হয়, কিন্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ মনুষ্যের কার্য্য, কর্ত্তার সহিত বিযুক্ত হইলে আর লোকালয় হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না।

চীন ও ভারতবর্ষনিবাসিদিগের অবনতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অবনতি কোন্ বিষয়ে, তাহার অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সৎকর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি, তাহাতে সৎকর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে স্থল বিশেষে ভ্রম হইয়া থাকে ; এইরূপ ভ্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সৎকর্ম্মের সহিত অনেক অসৎকর্ম্ম মিশ্রিত হইতেছে, এবং মর্ম্ম বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ নূতন২ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। অতএব সৎকর্ম্মের মর্ম্ম বিষয়ে

অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন কুকর্ম্মের বৃদ্ধি এবং নূতন সৎকর্ম্মের অভাব ও তাহার আনুষঙ্গিক অবনতি হইয়াছে। এই ক্ষতি সামান্য নহে। কিন্তু আমাদিগের সৎকর্ম্মের মধ্যে অনেকগুলি, কেবল শাস্ত্রীয় বিধি ছিল বলিয়াই এখনও প্রচলিত আছে। উহা বিন্দুবৎ, এবং উহার মর্ম্ম অজ্ঞাত, একথা সত্য হইলেও ঐ সকল কর্ম্মকে তুচ্ছজ্ঞান করা অন্যায়।

উল্লিখিত অতিথিসৎকার বিষয়ক মনুবচন এবং দরিদ্রকে অন্নদানবিষয়ক অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা হিন্দুজাতির অন্নদান ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে; আবার পাত্র বিচার বিষয়ে উহার নিগূঢ় মর্ম্মানুসারে কার্য্য না হওয়াতে, এতদ্দেশে পরভাগ্যোপজীবী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই জন্য মনু কিম্বা অন্নদান বিষয়ক নিয়মকে কি দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য? এক জনের দ্বারা কোন সৎকর্ম্মবিষয়ক একটী নিয়ম প্রচলিত হইল, কিন্তু তাঁহার বংশাবলী স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনাকে আবৃত রাখিয়া, ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তি এবং নিয়ম, উভয়েরই ক্ষয় করিতে থাকিল, তাহাতে নিয়ম প্রণেতাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অধুনা ইংরাজদিগের আধিপত্যে সকল বিষয়েরই অতি সুচারু বন্দোবস্ত স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু যদি ভবিষ্যৎকালে বাঙ্গালিরা এখনকার মত, বিচার প্রণালী, কর সংগ্রহ নিয়ম, রেল রোড, টেলিগ্রাফ, এবং পানীয় জল সংগ্রহের উপায়, ইত্যাদি বিষয় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহাতে কেবল এইমাত্র দোষ দেওয়া যাইতে পারিবে যে, আমরা এই সকল বস্তুর উপকারভোগী হইলেও উহাতে আমাদিগের পূর্ণ অধিকার জন্মিতেছে না। সেইরূপ চীন ভারতবর্ষের নিয়মাবলির দোষ এই যে, লোকে তাহা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, এবং ইহাতে কেবল এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, কোন ব্যবস্থার মর্ম্ম এক জনের বুদ্ধির অগম্য হইলে তাহা কর্ত্তৃক উহা সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হওয়া দুষ্কর; কিন্তু অনুকরণ প্রবৃত্তির দ্বারাই হউক অথবা দণ্ডভয় প্রযুক্ত হউক, লোকে কোন সৎকর্ম্ম করিলে এবং কালসহকারে তদ্বিষয়ক অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গেলে, যে পরিমাণ সৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তাহা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

কামনা হইতে কর্ম্মের উদয়। কর্ম্ম, কামনা চরিতার্থ করিবার অনুপযোগী হইলে বুদ্ধির দোষ প্রকাশ হয়। এবং একটি সৎকামনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেকগুলি অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা আবশ্যক। ঐ সৎকর্ম্মটী উপর্য্যুপরি নিষ্পাদিত হইলে অভ্যাস হইয়া যায়; অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তির

উত্তেজনা, অসৎপ্রবৃত্তি নিবারণ এবং কামনা ও কর্ম্মের উপযোগিতা বিষয়ক চিন্তা, অভ্যাসের দ্বারা এই তিন প্রকার পরিশ্রমের সাহায্য হয়। কিন্তু তাহাতে কার্য্যটির কোন ব্যত্যয় হয় না। অনন্তর পরিশ্রম লঘু হইয়াছে বলিয়া, যিনি নিশ্চিন্ত থাকেন এবং কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ না করেন, তাঁহার শ্রমপটুতা অবশ্যই খর্ব্ব হইবেক। পরিশ্রমে অপটু হইলে সহস্র অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম্ম অভ্যাস করণান্তর অন্য বিষয়ে আপনার শক্তি নিবিষ্ট না করেন, তিনি জনসমাজের ক্ষতিকারক। আলস্যের দোষ কেবল বাল্যকালেই ঘটে, এমত নহে। সময় অদৃশ্য এবং ইহাকে কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া ভাবনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সময় নষ্ট করা সামান্য পাপ নহে। বিশ্রাম, পরিশ্রমের অঙ্গ। কিন্তু যে পরিমাণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক সম্ভোগ করিলে, আলস্য বলিয়া গণ্য হয়। পরিশ্রমের লাঘব হইলে বিশ্রাম বৃদ্ধি করা মহদ্দোষ।

ঋষিনির্দ্দিষ্ট নিয়মাশ্রয়ে এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের সদানুষ্ঠানের অনুসরণ দ্বারা মনুষ্যজাতির শ্রমের অনেক সাহায্য হইয়াছে—কিন্তু সেই জন্য বুদ্ধি চালনা ক্ষান্ত করিলে সামান্য ক্ষতি হয় না। অতএব নিয়ম নিষেধ করা কর্ত্তব্য নহে; বিবেচনা এবং সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করাই যুক্তিসঙ্গত। স্বভাবতঃ যে পুণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অনেক গুণ। কিন্তু নিয়মের দ্বারা তাহার অভ্যাস হইলে কর্ম্মের কোন হীনতা জন্মে না, পরন্তু সেই অভ্যাস জনিত অবকাশ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত না হইলে ক্ষতি উৎপাদন করে। অভ্যস্ত পুণ্যে আর কোন দোষ নাই।

যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম নির্দ্ধারণ বিষয়ের দোষ দেন, তাঁহাদিগের এক ভ্রম এই যে, উক্ত শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি সম্যক্‌রূপ অনুধাবন করেন না। হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান নিয়ম এই, সৎকর্ম্ম অভ্যাস করণান্তর তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়। সেই জ্ঞান জন্মিলে উক্ত কর্ম্মবিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এই জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াও অন্য উপায়ের দ্বারা ঐ নিয়মের মর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন। সামান্য লোক এরূপ স্থলে স্বানুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিলে সকল দিক রক্ষা করিতে পারে না; এতাদৃশ বিধানের দুই মহৎগুণ দৃষ্ট হইবেক। সভ্যতার আদিম অবস্থায় সামান্য লোকদিগকে নিয়মের মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা,

এবং প্রয়োগের দ্বারা নিয়মগুলির লক্ষণ ও ফল পরীক্ষিত না হইলে তাহার মর্ম্মানুভব করা অধিক আয়াস সাধ্য। অতএব সামান্য ব্যক্তির পক্ষে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধান দূষণীয় নহে। তবে আমাদিগের মহর্ষিগণ স্ব২ প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকটন করেন নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে গুরূপদেশের দ্বারা পুরুষানুক্রমে এই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইত, এবং কোন ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কিছুকাল শিক্ষাকার্য্য স্থগিদ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর নব্যশাস্ত্রাধ্যায়িগণ গুরূপদেশ অভাবে কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাই অধ্যয়ন সমাধা করাতে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম বিষয়ে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কালে কেবল অনুমানের দ্বারাই শাস্ত্রের মর্ম্ম নিরাকরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব ঋষিগণ শাস্ত্রীয় বিধির উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ না করাতে এই ক্ষতি হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবেক। কিন্তু যে সকল অধ্যাপক মহাশয়েরা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা স্ব২ কর্ম্মফল অব-লোকন করিলে শাস্ত্রীয় বিধির মর্ম্ম অনেক স্থির করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অমনোযোগিতা মার্জ্জনা করা যায় না।

ফরাসি দেশের দর্শনকার কোম্‌ৎ সকল সৎকর্ম্মের নিয়ম নিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। মিল্ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া স্বানুবর্ত্তিতার প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই মিলের শিষ্য এবং চরিত্র বিষয়ে নিয়ম সংস্থাপন করিতে তাঁহার ন্যায় অনিচ্ছু।

মিল্ বলেন, কোম্‌তের মহাভ্রম এই যে, তিনি সকল বিষয়ে এবং সকল লোকের মধ্যে একতা সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সকল লোকের প্রকৃতি সমান নহে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের মনে ভিন্ন২ প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব জনসমাজ এবং মানব মনের একীকরণ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। আর বিভিন্নতা বর্দ্ধনে স্বানুবর্ত্তিতার উন্নতি হয়, অতএব মিলের মতে তাহাই ভাল।

কিন্তু একই বিষয়ে সকলের স্বানুবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। এক জন স্বানুবর্ত্তী হইয়া অনাহারিকে অন্নদানে প্রবৃত্ত হইল বলিয়া আর একজনের স্বানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিবার জন্য যে অন্নদান নিষিদ্ধ এবং তাঁহার কেবল বস্ত্রই দান করিতে হইবেক এমত নহে। বরং তিনি অন্নদান বিষয়ে প্রথম ব্যক্তির অনুসারী হইয়া বস্ত্রদান বিষয়ে স্বানুবর্ত্তী হইলেই মঙ্গল হইবেক। স্বানুবর্ত্তী

হইবার জন্য যে নিয়মত্যাগ করা আবশ্যক, এমত নহে। কোন বিষয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাহারো কর্ম্মের প্রণালী স্বয়ং স্থির করিতে হইলে, অনেক পরিশ্রম আবশ্যক করে, কিন্তু নির্দ্ধারিত নিয়মের অনুসরণ অল্পায়াসেই হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা যে অবকাশ লাভ হয়, তাহাতে পৃথক বিষয়ের চিন্তা করা এবং তদুপলক্ষে স্বানুবর্ত্তী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এখনও মনুষ্যের চরিত্রসংস্কার বিষয়ে অনেক কর্ম্ম বাকি আছে। যখন জনসমাজে তদুপলক্ষে কোন নূতন কার্য্যপ্রণালী আবিষ্কার করা অসম্ভব হইবেক, তখনই স্বানুবর্ত্তিতার স্থলাভাব বশতঃ চিত্তোৎকর্ষের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

কোম্‌ৎ যে একতার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই একতা নিতান্ত অবিভাজ্য পদার্থ নহে, এবং স্বানুবর্ত্তিতাকেও তাহার এক অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কোম্‌তের ব্যবস্থা এই যে, নিশ্চিত বিষয়ে একতা, অন্যত্র স্বাধীনতা আর সর্ব্বত্র সদাকাঙ্ক্ষা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অতএব যে বিধানের অন্যথা করিলে, কর্ত্তার নিজের হউক বা অন্যের হউক, নিঃসন্দেহ ক্ষতি হইবেক, তাহাতে সকলেরই স্বেচ্ছাচার নিষিদ্ধ। কারণ এমন কোন কর্ম্মই নাই যে তাহা কেবল কর্ত্তার নিজের ক্ষতি করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। তবে এরূপ কার্য্য, কি উপায় দ্বারা নিবারণ করিতে হইবেক, তাহার বিচার স্বতন্ত্র।

স্বানুবর্ত্তিতা হইতে সদসৎ উভয় ক্রিয়াই সম্পাদিত হওয়া সম্ভব। অতএব যে স্থলে স্বানুবর্ত্তিতা লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন করে, সেই স্বানুবর্ত্তিতাই কোম্‌তের একতার অন্তর্গত। কোম্‌ত একতা এবং সামঞ্জস্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে, তদ্দ্বারা মানবজাতির উন্নতি পক্ষে সুবিধা জন্মে। কোম্‌তের মতে উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য; বন্দোবস্তই তাহার মূলাধার এবং স্নেহ এতদুভয়ের গ্রন্থিস্বরূপ ও সারপদার্থ। যেখানে স্বানুবর্ত্তিতা স্নেহে পরিপ্লুত এবং উন্নতি মুখে ধাবিত, কেবল সেই খানেই উহা সংপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য; কিন্তু এতাদৃশ স্বানুবর্ত্তিতার জন্য বন্দোবস্ত অত্যাবশ্যক।

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা নিদাঘ কালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান মরীচিমালীর প্রখর করনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়, ফরাসি-প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যাকুশল শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেববিনির্ম্মিত ঘুঘু ঘড়ি, কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় একদিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরাজি দশঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর; বোধ হয়, অমরাবতীপ্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালাললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তিমান দেখা যাইতেছে। নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতিহস্ত পরিমাণ আশীবিষ সদৃশ বক্র নল সঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত তামাক নিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন, অদ্য পি ও কোম্পানির ষ্টীমারে ভীয়া ব্রিণ্ডিসি একখানি সরকারি চিটি এবং

সমীরণ যানে এক খানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি ; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই, জরুরি, শব্দাঙ্কিত।

রাজার অনুমতি অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারি লিপিখানি অগ্রে পাঠ করিলেন ; যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীলশ্রীযুক্ত সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ যমরাজ মহোদয় অপ্রতিহত প্রতাপেষু।

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদ পদ্ম হইতে বিদায় হইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণ পূর্ব্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ, ধনী, দীন, শিশু স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান, আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেন্ট আমার অমিততেজে অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন ; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্যে দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্টইণ্ডিয়া এবং ইষ্টারণবেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিত ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিত গুলিন কাহাদের অধিকার ?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন, ইংরাজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা'—রণজিতের এতদ্ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্‌বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রয়োক্তব্য।

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ

শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা ;—

"দুষ্ট দমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ মহোদয়।

অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু।

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা, দেসোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেক গুলি লোক হত হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নাএব নব চাটুর্য্যে এক জন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাথাটি দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নাএব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিল যে, আপনকার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইনিস্পেক্‌টারের লোকেরা তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নাএব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারিবাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কাম্‌রায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি এক পাটায় ঢাকা

আছে। যদি পত্রপাঠ দূত প্রেরণ করেন, নাএব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।”

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপরনাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য ধূর্ত্ত জমিদারকর্ম্মচারীরা দিবসদ্বয় পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন? এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই রজনীমধ্যে নাএব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।” আজ্ঞা-প্রাপ্তিমাত্র চিত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নাএব রক্ষিত হওনের পর পতন বাবুর কর্ম্মকারকেরা জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিসের সবইনিস্পেক্টার জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাস্‌টি স্থানান্তরিত করিল, চারপায়া খানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর, মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক। তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়্‌কা রোগ সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয়, রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু জ্যোতির্হীন নহে, নাসিকাটি লম্বা, অল্প মঙ্গোলীয়ানকট্ বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর, গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণ তারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচি সদৃশাক্ষ মালা, বাহুতে ইষ্টকবচ মধ্যভাগে রক্তচন্দনের ফোটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়, পরণে ময়ুরকণ্ঠ চেলির যোড়, পায়ে

ফুলপুকুরে চটি। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান, সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতাহেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটওয়ারি গিরি কর্ম্ম করিয়া একবারমাত্র নিকেশী দেনায় জমিদারদিগের চুনের গুদামে এবং বারত্রয়মাত্র সরকারি জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নাএবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি দূর মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটি বিষম বকেয়া, ডালার উপর আদ ইঞ্চি পরিমাণে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; বাম পার্শ্বে একটি ছিদ্র হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আরসুল্লা গমন করিয়া একখান কান কোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলে, ভবিষ্যদাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য ছিদ্রটি গালাদ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জন্মাবধি কোন অংশে পেতলের সাজ নাই। পুরাকালে একখানি পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহুকাল হইল অপসৃত হইয়াছে; বাক্সের মুখপ্রান্তে একটি শ্বেত চন্দনের, একটি রক্ত চন্দনের, একটি হরিদ্রার অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য—এক দিস্তা শাদা কাগচ, একটি কলমরাখা বাঁশের চোঙ্গা, তাহার মধ্যে তিনটি কন্‌চির কলম, একটি খাঁকের কলম, একটি শজারুর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের ছুরি আর আদখানি কাঁচি; সাতখান কান কোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া মোড়া খাতা; একটি চুনের পুটলি; একখানি খাপ খোলা আর একখানি খাপ সংযুক্ত চসমা; একটি গলাসি দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকাল মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, তাললয়-বিশুদ্ধ ফরর্‌-ফরর্‌-ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজ প্রেরিত

বাহকগণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চারপায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনান্তর পুনর্ব্বার চার পায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সৌধ সমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আট জন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন—"ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চার পায়ার নিকট আর আসিস না. আমি পত্তন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এই দণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডব দাহন করিয়া যাইব, আমার প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী নদী গর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, একজন উর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খট্টাঙ্গ সমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন. "একি ভীষণ ব্যাপার, কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল, "মশাই গো, এটা চৌধুরীদের কাছারি বাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্তি গিয়েলাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিচি, মারামারি করবেন না, আর মোরে ঝা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগচ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল। বেহারা যে আজ্ঞা বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত কার্য্য সম্পাদন করণানন্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল চিত্তে বাহকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "কর্ত্তামশাই, পেল্‌য়ে যাও, পেল্‌য়ে যাও, আর অক্ষে নেই, মাল্যে মালো, বৈতণীর ধারে এক জন বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত করবে, এক চড়ে আট্টা কাহার ঘাল করেছে।" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাস আনিয়াছিস কি না?" বেহারা কহিল, "নব ঠাকুরকে কনে লুকয়েচে তার অন্দি সন্দি পালাম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।" যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন যমকে পাঠালে কে?" বেহারা বলিল, "সে আপনি এয়েছে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাক্স বাহক সমভিব্যাহারে যম রাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন, যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন, যথা ;—

ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি কৃতান্ত মালম করিবা।

শ্রীসাক্ষর

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ, রণ্ডামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েক জন অল্প বেতন ভোগী আমলা

তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃত দেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।”

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দত্তজ মহাশয় কখন্ চার্য্য লইবেন?” দত্তজ উত্তর দিলেন, “এই দণ্ডে।” চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগচ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পারিশদ বর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তি বিস্ফারিত বদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমাওয়াশীল বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজ্বালানির দাম বাকি আছে, সে গুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহা খরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “আমি এবিষয় ভগবান্ ভবানীপতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।” পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারি আর একটি আমার নিজ খরিদ, যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “তুমি দুটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।” পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নূতন যম সভা ভঙ্গ করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ, আফিসজান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জ্জিত হইবে, অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্র গুপ্ত কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড় মানুষের

বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এক জন ডেপুটি-কালেক্‌টারের প্রয়োজন, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্‌ভেয়িং জানেন না।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি সর্‌ভেয়িংপারদর্শী এক জন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।" যমালয়ের বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যারপরনাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কারণ ছাত্রেরা জমাওয়াসিলবাকী লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিদ্যাদ্বয়োন্নতিসাধক দুইটি নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁসপাতাল, পাগলা গারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ হয় না, শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, বৈতরণী তীরে ঋত্বিক মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ রাজমহিষী কালিন্দীও সেই রূপ, তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যে যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়; কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদর পরিধি চতুর্দশ গজ দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং টিবি যুগলে বিভক্ত, সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত উর্দ্ধ সিন্দূর রেখা, ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত; নাসিকা নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ, তাহাতে একটি নত দুলিতেছে, নতটি কুম্ভকারচক্র পরিমাণ মোটা, লোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়া বিশেষ; দাঁত গুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর কর করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে; কালিন্দীর ত্বক মসৃণ নহে, হাতির গায়ের মত খস খসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বেশ বিন্যাশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশী খান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে এক খান চুমুরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আদমন সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল; প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মুখামৃত

সহযোগে অভ্র খণ্ড সমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদ যুগলে বাইশ গাছা মল। ঘু ঘু ঘড়িতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণ পূর্ব্বক ঝম্ ঝম্ করিয়া অপরিচিত স্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়ন মন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণ সংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্‌লারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে! শয্যার নিকটে কয়েক খানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁত গুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, "কল্যাণি, তুমি কে?" কালিন্দী বলিল, "আমি যমরাজরাজমহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।" কুড়রাম ভাবিলেন, "এই বারে গেলেম, যদিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না, মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, কি কৌশলে ও রক্ত বীজ বিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল, স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল। কালিন্দী কুড়রামকে ঘূর্ণায়মান দেখিয়া কহিলেন, "প্রাণ বল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই,
তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ি,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ি,
তুমি বোল্‌তা আমি চাক্,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,

তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ঢুলি,
তুমি ডালা আমি ডালি
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজ্ঞীর মুখ ভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন “শোভনে! তোমার বচন পীযূষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু হরিশে বিষাদ, আমার গণিভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারু হাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটি পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিত মনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটি চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন রাজমহিষীর প্রিয় পানের মসলা, স্বামিবশীভূত করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাপ্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদচ্যুত যম বিষণ্ণ বদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ জননী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, “বাবা যম, এ দুর্ভিক্ষ সময়ে তোমার কর্ম্মটি গেল, এ রাবণের পুরী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ

করাইব। আজ কাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব প্রবল।" যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন। কহিলেন, "ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত কালের কর্ম্ম কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ লক্ষ্মী ঠাকুরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না, আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিল্প কার্য্য জানি, জুতা টুপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।" জননীর সাহস বাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া উড়ানি খানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠন ঠনের জুতা যোড়াটি পায় দিলেন, তার পরে এক গাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরক বলয়, পায়ে চারগাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোনার গোট, কণ্ঠে দুনর মুক্তামালা, মস্তকে সজল জলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরেঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা তুলতুল্য দোদুল্য নীল পান্না। ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুক টুক করিতেছে। এক খানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদাস্ত ফিনফিনে ধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী **দুর্গেশ নন্দিনী** অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েসার বিষাদ আলোচনা করিতেছেন। এমত সময় যমরাজ জননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজজননী আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোক প্রতি-পালিনী; আমার যমের প্রতি একটু দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদ খানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা যমের কর্ম্ম গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না, তা বাছা, তুমি আর

রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজ জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক, মা আপনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে কদিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমায় অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজজননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে এক বার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, এক বার ওহো বেটা ওহো ও বেটা বলিয়া গাত্রে হস্ত বিক্ষেপ করিতেছেন, এক বার কোঁচার অগ্রভাগদ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, এক বার তাহাদের বক্রগ্রীবা অবলোকন করিতেছেন, এমত সময়ে বিন্দি আসিয়া উপরআদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দির অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, "আসামি হাজির, দণ্ড বিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ রোষকসায়িত লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছ।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল, আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক যখন তুমি তাহার ওকালত নামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" লক্ষ্মীর অলক কুন্তলে একটি দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিস্মার্ক ব্রাউন ভারর্ণর ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ি যোজনা করিলে নারায়ণ আরোহণ পূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্তসরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুত পরোয়ানা খানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্‌সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়িও সপ্তসরোবরোদ্যানে পৌঁছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকর সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থা

দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময় ?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি ? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সে কি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন ; অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে নাকি ?" বিষ্ণু কহিলেন, "যমরাজ মনঃ পীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই পরোয়ানা খানি পাঠ করুন।" ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া বলিলেন, "যমের এ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম! কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে পর-শ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুর স্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্য শৈথিল্য, সদাশিবের তো দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।" বিষ্ণু কহিলেন, যম আপনার সন্তান ; সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানুগত, বহুকালের চাকর, উহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচার সংগত হয় না।" যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "ভগবন্ চতুর্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজির অভিপ্রায় কি ?" দয়া পয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, "মার্জ্জনা করা।" ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর ভবনে যাইবার জন্য

বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, "ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচমিনিটে আসিবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বাবাজি, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে, বিশেষ সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার তো অবিদিত কিছুই নাই, অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আটটা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।" যম ব্রহ্মাবিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টড্‌হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।" ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূল চর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিতা, শিরীশকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠ দেশের ঘামাচি মারিতেছেন। গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভৎসনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জ্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ ব্রেভো নন্দী বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যাভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত করিয়া অভিনব শয্যা রচনাপূর্ব্বক স্পন্দহীন পিনাক-পাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়্‌কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি আপাদ মস্তক গস্‌নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত,

নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাচের ঝোল দিয়া চারটি ভাত দেয়।" ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনত মুখী হইলেন, শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি রস্ত অ আ হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর, দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।" ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন, "ঠাকুর ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্ট প্রহর আমার সহিত ঐ রূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?" মহাদেব কহিলেন, "না হে চতুর্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।" ভগবতী কহিলেন, "তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।" বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভগবতি, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা, তাহার কাছে যাও।" ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যম এমন ম্রিয়মান কেন?" ব্রহ্মা কহিলেন, "আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন ? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে, আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী ; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎ সাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছু মাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মদাদির নিকটে অখণ্ড্য বলিয়া পরিগণিত ; আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মারুন্নিভ চিরপ্রবাহিত ; অতএব হে বদান্যতাবারাংনিধি বগলাবল্লভ ! অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।” ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন দিন বলিবেন, আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।” ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ “সদাসিব” স্বাক্ষরিত পরোয়ানা খানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানা খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, “এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।” যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছ ?” যম উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।” মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর নিকেতনে গমন করিতে হইবে।” বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল যম, কুড়রামের

সমভিব্যাহারে সৈন্যসামন্ত কত আসিয়াছে ?" যম উত্তর দিলেন, "জনপ্রাণী না, কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংশালয়ে হাতে মাথা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চাপেটাঘাতে কয়েকজন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।" বিষ্ণুর মতে বহ্বারম্ভ অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিশদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগার গুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দীগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্দ্বারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।" চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিত চিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে সে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসানুজ্ঞা আপীলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপরে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুকুম দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। কুড়রাম কম্পিত হস্তে রায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে ?" কুড়রাম উত্তর দিলেন "প্রভো, আমি লোচনপুর

কাছারির আট চালায় শয়ন করিয়াছিলাম, যমপ্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায় সম্পত্তিহীন, কি করি, অবশেষে কাগজ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামটী জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে, বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতং সং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখরনীলকণ্ঠ! দক্ষযজ্ঞবিনাশনমার্জ্জনীয়মহেশ্বর! অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর স্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারি বাড়ীতে পৌছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে তো? নাকে কানে খত দাও আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না।" যমকে ভৎর্সনা করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রা ভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমীদার

জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমিদারকর্ত্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃৎগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালি জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয় ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্য মধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজ-মধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহা পাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত, সমাজশ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব—অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভৎর্সিত, উপহসিত, অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতিবিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্ত কণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা জমীদার সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজা বৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অত্র প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতক গুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিয়াছি, বা বলিব, সেই খানে ঐ অত্যাচারী জমীদার গুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় জমীদার সম্প্রদায় বুঝিবেন না।

বাঙ্গালি কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাসের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা

প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী শুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিলেক। পরে যাহা বাকি রহিল, অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি। তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজনা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয়ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত, তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিক টাকায় চারিআনা। তিন বৎসরেও চারিআনা, এক মাসেও চারিআনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸৹ আনা। পরাণ তিন টাকা বারআনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায়

হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার্ দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক২ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাসের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী-সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাসা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাসা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলা বাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া

পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকাল বৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেননা মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ" কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্প সংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল, বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারিতে রহিল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইনস্পেক্‌টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনেষ্টবল পাঠাইলেন। কনেষ্টবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কনেষ্টবল সাহেব একটু ধুম ধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কয়েদ খালাসের"

কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্র-মূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টি মাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দ রসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজনা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি, গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐ রূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে"—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক, বা জামিন লইয়াই হউক, বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক, বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশয়েই হউক, পুনর্ব্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহু-কাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাস আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাঙ্গল চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ।০ আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায়

হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড়২ কালো২ পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড়২ জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড়২ কালো২ বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাই সুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমনী," "নজর" বা "সেলামী" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৵০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজনা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হেঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধান গুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা।"

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং

বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য ; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্টাম্পের মূল্য চাই ; উকীলের ফিস চাই ; আসামী সাক্ষির তলবানা চাই ; সাক্ষির খোরাকি চাই ; সাক্ষিদের পারিতোষিক আছে ; হয় ত আমীন খরচা লাগিবে ; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলা বর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অতুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষিরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত ; স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্য মন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অতুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল ; নচেৎ জেলে গেল ; অথবা দেশ-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচার গুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এ রূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর এক রূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদার বিশেষে, প্রদেশ বিশেষে, সময় বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে ; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে ; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া এক খানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের এক খানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের অবজর্ব্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রাম খানি সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য, অর্থদানে, খাদ্য দানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজনা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময় পাইক পিয়াদা সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৶০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই ;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	৬৲
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের ঐ	৫৲
গোমস্তাদিগের ... ঐ	২৲
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবানা	১৲
গোপাল নগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	১৲
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	৸০
ভাদ্রের ... ঐ	১।০
নৌকা ভাড়া	১॥০
সদর আমলার পূজার পার্ব্বণী	৬॥০
কাছারির জমাদার	১৲
ঐ হালশাহানা	১৲
পাঁচ শরিকের পার্ব্বণী	৫৲
শ্রীরাম সেন, হেডমুহুরী	১৲

জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	...	...	২৲
গোমস্তাদের ... ঐ	...	...	১২৲
মুহুরিদের ... ঐ	...	...	৩৲
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ব্বণী	...	...	১৲
ডাকটেক্স ...	...	...	৩৲
			৫৪৶০

এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগের উপর তিনআনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা অসাধ্য; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে বেচে কিনে হাওলাত বরাত করিয়া, ঐ টাকা দিল। কিন্তু লোকে মনে করিবে, মনুষ্য দেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪৶০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪।৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠীতে গিয়া কর্জ্জ চাহিল। কর্জ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল— মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, "প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম।" সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর হইতে উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায় মধ্যেই আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম্ম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরের লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। "ডাকটেক্স।" গবর্ণমেণ্ট নানা বিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? ঐ "ডাকটেক্স" কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, "ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনফা থাকে।" তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল —জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন. কাহার্ ঘাড়ে পড়ে।

ইন্‌কমটেক্সও ঐ রূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কমটেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতেও কিছু মুনফা রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে "রোড ফণ্ড" দিতে হয়। ঐ রোড ফণ্ড আমরা ভূস্বামির জমাওয়াশীল বাকি ভুক্ত দেখিয়াছি।

রোডসেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ২ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিল, এবার আসামী "আইন অনুসারে" খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত "হাস্পাতালির" বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সবডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট স্বীয় সবডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু২ মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, "আমাকে মাসে২ এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /০ আনা

হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।” গোমস্তারা তদ্রূপ আদায় করিতে লাগিল। এ দিগে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ জমীদারকে কখনও এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের খাজানার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, “আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছি—কখন হার বাড়ে কমে নাই—সুতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়িতে পারে না।” জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া /০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন২ অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামিদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমত বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐ রূপ। বড়২ জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড়২ ঘরে অত্যাচার একবারে নাই। সামান্য২ ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহাঁরা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন,

সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমত বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোন রূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ। অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে২ যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন২ গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন—জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না, বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন২ লোকের দ্বারা যে প্রজা পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জন সমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের

মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসিদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য, আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিক চিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই, আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

জন্ম মম সূর্য্য তেজে,
অনন্ত আকাশ মণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘ রাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি জ্বলে ॥

কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এমুখ অবনীতলে

২

পর্ব্বত কন্দরে নাচি,
নাচি মহারণ্য শিরসে।
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে করি বহি ঘনে,
তারা বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর উরসে ॥

মথিয়া অনন্ত জলে
সফেণ তরঙ্গ দলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে ॥
শীকরে আঁধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে।

৩

বসন্তে নবীন লতা,
প্রফুল্ল ফুল দোলে তায়।
যেন বায়ু সে বা নহি,
অতি মৃদু২ বহি,
যাই তথায় ॥
হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি মাখি নিজ গায়।
সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম্ম হরি,
অঞ্চল চঞ্চল করি,
স্নিগ্ধ করি কায় ॥
আমার সমান কেবা যুবতী মন ভুলায় ?

৪

বেণু খণ্ড মধ্যে থাকি,
বাজাই মধুর বাঁশরী।
রন্ধ্রে২ যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
স্বর লহরী ॥
আর কার গুণে হরি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ?

চল চল চল চল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফুলে উজল,
কানন বল্লরী,
তার মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি ॥

৫

জীব কণ্ঠে যাই আসি,
আমিই এ সংসারে স্বর।
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহী ভিতর ॥
সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার,
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার,
গায়ক কণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্ব মনোহর ॥
আমিই রাগিণী আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর ॥
গুণ২ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতর,
আমারি কিঙ্কর ॥
আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নর

৬

কে বাঁচিত এ সংসারে,
আমি না থাকিলে ভুবনে?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
শ্বাস বহনে।

উড়াই খগে গগনে। *
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহি যত ঘনে।
আনিয়া সাগর নীরে
ঢালে তারা গিরি শিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছে কি কোন জনে ?

৭

মহাবীর দেব অগ্নি,
আমিই জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যাঁরে, আমিই নিবাই তাঁরে,
আপন বলে।
মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগর।
রসে সুরসিক আমি, কুসুম কুল নাগর ॥
শিহরে পরশে মম, কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে গোপের গোপিনী ॥
বাক্য রূপে জ্ঞান আমি স্বর রূপে গীত।
আমারই কৃপায় ব্যক্ত ভক্তি দম্ভ প্রীত।
প্রাণ বায়ু রূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হুহু হুহু ! মম সম গুণবান আছে কোন জন ?

---

* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll Chap. VII of Birds.

দ্বিতীয় সংখ্যা

ভাষা পরিবর্ত্তন বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন "যে কঠিন ও দুশ্রব ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, এই জন্য সেই ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতা সম্পাদন করায় ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে। ঐ শিথিলতা করণ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয় —এক প্রকার সম্প্রাসরণ, দ্বিতীয় প্রকার বিপ্রকর্ষণ—নদ্যাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রাসরণ এবং ধর্ম্ম শব্দের সংযুক্ত বর্ণের 'র' বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে।" যেমন শব্দের সন্ধি— ও সন্ধিচ্ছেদ আছে ; সংযুক্ত বর্ণ যেমন প্রথমে সংযোগে উৎপত্তি হইয়া পরে বিপ্রকর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাক্য (Sentence) ও রচনাও [Style] ঠিক ঐ রূপ কারণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। ইহারাও এক প্রকার স্থিতি স্থাপক গুণযুক্ত, আবশ্যক মতে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করা যায়। কোন ভাষার জমাট গাঁথনি, কোন ভাষার শিথিল গাঁথনি। এক ভাষায় একটি ভাব দশটি অক্ষরে প্রকাশ পায়, আর একটী ভাষায় সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে পঞ্চাশটি অক্ষর লাগে। প্রথম ভাষায় এক অক্ষরের শব্দ অধিক আছে বলিয়া বা শেষ ভাষাটিতে অনেক বর্ণযুক্ত শব্দ অনেক বলিয়াই যে এরূপ হয়, তাহা নহে। 'ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাং' ইহার সহজ বাঙ্গালা করিতে হইলে 'যাহারা গঙ্গাতীরে (আশ্রয় লইয়াছে) বাস করিতেছে তাহাদের, * এই রূপ কিছু করিতে হইবে। তবেই দেখা

* "গঙ্গাতীর বাসিদিগের" এই রূপ বলিলেই যে মন্দ বাঙ্গালা হইবে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না।

যাইতেছে, কোন ভাষায় অল্পে হয়, কোন ভাষায় অনেক কথা লাগে। কোন বিশেষ ভাব, সংস্কৃত ভাষায় যেমন অতি অল্পের মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে, এমন পৃথিবীর আর কোন ভাষাতেই হইতে পারে না। আবার ভাগবত প্রভৃতি কতক গুলি গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃতের সংস্কৃত। বাছা বুনান; জলবায়ু গলিবার ছিদ্রও নাই, সময়ে সময়ে মনুষ্য বুদ্ধিও তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

যেমন আরবী বা পারসী অক্ষরের ও অক্ষর সমষ্টির স্বল্পস্থান সমাবেশন গুণ বটে দোষও বটে, সেই রূপ সংস্কৃত ভাষার এই জমাট ভাব গুণও বটে, (সংস্কৃতজ্ঞ মার্জ্জনা করিবেন!) দোষও বটে। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য মনোভাব প্রকাশ করা;—যাহাতে মনোভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তাই করিতে হইবে। বৃহৎ আয়ত বাটী প্রস্তুত করাইতে হইলে, অধিক সময় লাগে, অধিক শ্রম লাগে, অধিক ব্যয় হয়; তাই বলিয়া যাহাতে স্বাস্থ্যের হানি করে, এমন বাটী নির্ম্মাণ করান কর্ত্তব্য নয়; স্বাস্থ্যরক্ষা জন্যই ত বাটী, তা যদি না হইল, তবে বাটী প্রস্তুত করণের প্রয়োজন কি? সেই রূপ ভাষাতেও। অল্প অক্ষরে প্রহেলিকা বলিতে পারিলেই ভাষার গৌরব নহে। তাহা হইলে মুগ্ধবোধ সূত্রের ভাষার ন্যায় আর ভাষা নাই। কিন্তু 'বৃত্তি' আবার সেই বৃত্তির ব্যাখ্যা নহিলে সূত্র বোঝা যায় না, তবে উপায় কি? মুগ্ধবোধের ন্যায় সাঙ্কেতিক ভাষায় কোন উপকার নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সাঙ্কেতিক ভাষা ত ভাষা নহে; সাঙ্কেতিক ভাষা যখন সকলে বুঝিবে, তখন আর কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু যত আকুঞ্চিত করিবেন, ততই সুবিধা হইবে, এমন কখনই হইতে পারে না। লোকে যাহাতে সুবিধা না বোঝে, তাহা চলিবে কেন? যে ভাষা চলিল না, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না। সকল বিষয়েরই সীমা আছে, প্রথমে যেটি গুণ থাকে, সেটি বাড়িতে বাড়িতে দোষ হইয়া উঠে; ইহাকেই বলে 'গুণের আতিশয্যে দোষের উৎপত্তি।' সংস্কৃতের গুণ হতেই দোষ হয়। তাহাতেই নানা বিধ প্রাকৃত ভাষার প্রাদুর্ভাব হয়। প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয় বা জন্ম হয়, এমন কথা আমরা বলি না। অতি গুরু পাক পলান্ন উপর্য্যুপরি কিছু দিন খাইলেই শাদা ভাত খাইবার ইচ্ছা হয়, অনেকে খাইয়াও থাকেন, কিন্তু তাহা বলিয়া পলান্নের পরিপাক কষ্টকর বলিয়া, ক্রমে একটি একটি করিয়া মশলা বাদ দিয়া সকলে শাদা

ভাত খাইতে শিক্ষা করিয়াছে, ও এই রূপে শাদা ভাতের সৃষ্টি, এমন কথা আমরা বলি না। সংস্কৃত ভাষা দুরূহ, দুরুচ্চার্য্য, শ্রুতিকটু, কঠিন বলিয়া ক্রমে সম্প্রাসরণ বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা প্রাকৃতের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কথা আমরা বলি না। সংস্কৃতের জটিলতা, ঘনসন্নিবেশন, আকুঞ্চিতীকৃতভাব, সমাস বহুলতা প্রভৃতি জন্য প্রাকৃতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এইমাত্র বলিতে পারি।

এই আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া জীবন্ত ভাষা মাত্রেই চিরকাল চলিতে থাকে। এই দুই ক্রিয়াই ইহার জীবনী শক্তি। বাঙ্গালা ভাষা কখন কমিতে কমিতে সংস্কৃতের ন্যায় নীরেট হইতে থাকে, কখন বা আবার একটি বাঁধনের পর আর একটি বাঁধন খুলিয়া গিয়া ভাষা বিস্তৃতি ও শিথিলতা লাভ করে, কখন সংস্কৃতাভিসারিণী হয়, কখন সংস্কৃতাপসারিণী হয়। ভাগবত বিস্তারে ভাষাকে কতক দূর সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছিল। ভাগবত বিস্তারের নানা ফল মধ্যে কথকতা একটি। এ কথা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং অনর্থক প্রমাণ প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। কথকতা সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথকদিগের হইতেও বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃত শব্দ সকল চলিত ভাষায় যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা গীত স্বর সহকৃত হওয়ায় সাধারণের মনে অঙ্কিত হইয়া যায়, সুতরাং সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থাকিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ * ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বোধ হয় আমরা কখনই প্রাপ্ত হইতাম না।

কথকতার ব্যবসায়ও আমাদের দেশে নূতন নহে—কবিকঙ্কণের পূর্ব্বেও উহার প্রাদুর্ভাব ছিল।

---

* এই কথা প্রতিপন্ন করণার্থ ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কতক এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"কৃত্তিবাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, আমি পুরাণ শুনিয়া গ্রন্থ রচনা করিলাম এবং তিনি ভাষাকবি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।" তাঁহার "স্বমুখে পরিচয় দান ব্যতিরিক্ত তাঁহার অসংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে এই এক প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায় যে,

পূর্ব্বকালীন লোকেরা কথকদিগের বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন।” সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভাষার পরিবর্ত্তন সহজেই ঘটিতে পারে। কিন্তু পুরাণ হইতে সংস্কৃত শব্দ কথকতায় ব্যবহার করাতেই যে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নহে; অনেক গুলি কারণের মধ্যে উহা ভাষা পরিবর্ত্তনের একটি কারণ বটে।

তাঁহার গ্রন্থের সহিত বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণের অনেক অনৈক্য। অথচ তিনি যে, বাল্মীকিকে অবলম্বন না করিয়া অন্য কোন রামায়ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় না, যেহেতু তিনি কথায় কথায় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছিলেন; ‘বাল্মীকির মত লিখিতে আরম্ভ করিলাম’, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি বাল্মীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সংস্কৃতানভিজ্ঞতা বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। ভাষা রামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে এই বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়।”

“১মতঃ। কৃত্তিবাস. বাল্মীকির মত বলিয়া ভূয়ো ভূয়ঃ লিখিয়াছেন;—

“রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥ ইত্যাদি।”

“কিন্তু বাল্মীকি, স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থলে এমন কথা লেখেন নাই; বরং মূল রামায়ণে এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত আছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন।” “কবির সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকিলে বোধ হয়, এরূপ ভ্রম হইত না।”

২য়তঃ। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বধ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, ব্রহ্মা রাবণকে অন্যান্য বর দিয়া শেষে কহিতেছেন;—

“অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজন করেছি আমি সেই ব্রহ্মবাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন॥ ইত্যাদি

ঐ প্রসঙ্গেই আবার;—

পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকের মতে॥
বিভীষণ কহিলেন শ্রীরাম গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥

কথকতার চারিটি প্রধান অঙ্গ। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী ও গান। এই চারিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। মূল গ্রন্থের বিশেষ তাৎপর্য্য বোধ করাইতে পারিলেই প্রথমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এই ভাগের ভাষা কাজে কাজেই কিছু শিথিল-বন্ধনা হইবে। সংস্কৃত হইতে

ইত্যাদি উক্তির পর বিভীষণের উপদেশে ছলনা পূর্ব্বক মন্দোদরীর নিকট হইতে হনুমান কর্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শরদ্বারা রাবণ বধ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূল রামায়ণে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।"

"৩য়তঃ। হতাহত বানর সৈন্যের সঞ্জীবতা সম্পাদনার্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে হনুমানদ্বারা ঔষধ আনয়ন করাইবার প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন ;—

নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অদ্ভুত রামায়ণের কোন স্থলে এই ঔষধ আনয়নের বিন্দু বিসর্গের উল্লেখ নাই! এদিকে বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৪৩ তমসর্গে ইহার সবিস্তার বর্ণন আছে।" ইত্যাদি। 'অতএব বোধ হয়, কথকের মুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়া কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন।'

'পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।' তাঁহার নিজের এই লেখাদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।" কাশীরামের মহাভারত সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক লিখিয়াছেন,— "মহাভারত মূল সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেক স্থানেই তিনি (কাশীরাম) ভূরি ভূরি বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও ভূরি২ বিষয়ের নূতন যোজন করিয়াছেন।" "তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একবারে নূতন সঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান নামে যে একটি বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল সংস্কৃতে একেবারে নাই।" "অনুমান হয় যে, ঐ উপাখ্যান কোন পৌরাণিক মূল হইতেই হউক, বা অন্য রূপেই হউক দেশ মধ্যে প্রথিত ছিল, কবি তাহাকেই হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া নিজ গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হয়, কৃত্তিবাসের ন্যায় কাশীরাম দাসও কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। যেহেতু তিনি নিজেই কয়েক স্থলে লিখিয়াছেন ;—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার ॥

যাহা হউক কাশীরামের সংস্কৃত জানা না থাকিলেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধ হয় না। ঐ রচনাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দসকল প্রযুক্ত আছে যে, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সহজ কথা নহে।"

সংস্কৃত ব্যাখ্যাতেই অতি সামান্য শব্দের প্রসারণ করা হয় ; 'গত্বা' কি না 'গমনংকৃত্বা' ইত্যাদি। এই প্রথার প্রচারের জন্যই বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত ক্রিয়া 'করিয়া' ও 'হইয়া' যোগে সাধিত হইতেছিল। পড়িতে 'গিয়াছিল' বলিতে লজ্জা বোধ করিতেন, 'গমন করিয়াছিল' বলিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে 'ব্যাখ্যার ব্যাখ্যার' ভাষা মনে করিতেন। ভাষাকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। সুতরাং কথকদিগের ব্যাখ্যায় ভাষা শিথিলবন্ধনা হইতেছিল। দ্বিতীয় ভাগ বর্ণনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার প্রকরণও বিভিন্ন, বর্ণনার উদ্দেশ্য রসোদ্দীপন। কথায় বলে 'রসের সার চুটকি' (Brevity is the soul of wit) সকল সময় না হউক, অনেক সময়ে বটে। কথকেরা ভাষার রচনার বর্ণনা সময়ে এই প্রকার চুটকি প্রথার অনুগমন করেন। ছেবলা ভাষা ব্যবহার করেন, এমন কথা বলিতেছি না ; তাঁহাদের বর্ণনার ভাষার গাঁথনি চুটকি রীতির। বড় ইটে ছোট বাড়ী গাঁথা যায় ; সেই রূপ সংস্কৃত শব্দে চুটকি ভাষা হয়। ইহার বাক্য (Sentence) গুলি ক্ষুদ্রাবয়বের হয়, অনেক ক্রিয়াপদ অনুক্ত থাকে, অনেক ক্রিয়াবিশেষণও অনুক্ত থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের পর দীর্ঘচ্ছেদ থাকে, কখন কখন কোন বিশেষ কথায় শ্রোতার (বা পাঠকের) মনঃসংযোগ করান জন্য পুনরুক্তি থাকে, আর কথকদের স্থানে এই ভাষার সহায়কারী নানা ভঙ্গী থাকে। এই ভাষা হৃদয়চ্ছেদ করিয়া পাটে পাটে বসিতে থাকে। ইহা উদ্দীপনার ভাষা। এই ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় অতি-দীর্ঘপদ-বাক্য বিশিষ্ট নহে, অথচ আধুনিক স্ত্রীলোকদের ভাষার মত অত্যন্ত

আমরা বলি, দেশে কথকতার প্রচলন না থাকিলে, এরূপ হওয়া সম্ভবই হইত না। গ্রন্থকারও তাহাই বলিয়াছেন।

আমরা প্রস্তাব হইতে অনেক খানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে প্রদান করিলাম। সকলে দেখিবেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন বলিয়াই প্রশংসাভাজন নহেন। তিনি কোন কোন স্থলে, একটি বিষয় লইয়া ধীরে ধীরে তন্ন তন্ন করিয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, তাহার বিচার করিয়াছেন ; একটি কথার জন্য যদি চারি খানি পুরাণ পাঠ করিতে হয়, তাহাও করিয়াছেন ; তিনি পরিশ্রমে কখনও কাতর নহেন। এরূপ গবেষণ ক্রিয়ার প্রশংসা সকলকেই করিতে হয়। এরূপ অধ্যবসায় পরিশ্রম দৃঢ়ব্রত পালন, সার্থক হইলে আমাদের এই যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রমও সার্থক হইবে।

এলো নহে ; ইহাতে ছোট ছোট জমাট বাক্যের গাঁথনি থাকে। জমাট পদগুলি পৃথক্ করিয়া লইলে সংস্কৃত পদ বলিয়া, বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত গাঁথনি ভাগবতের ন্যায় জটিল রীতি যুক্ত নহে।

ভাগবতের দুইটি সহজ শ্লোক লইয়া আমরা আমাদের কথার উদাহরণ প্রদান করিতেছি :—

"এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতো ভূত পর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্॥
শ্মশান চক্রানিল ধূলি ধূম্রবিকীর্ণ বিদ্যোত জটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠা মলরুক্ম দেহো দেব স্ত্রিভি পশ্যতি দেবর স্তে॥"

প্রথম শ্লোকার্দ্ধ ত্যাগ করিয়া শেষ ভাগের ব্যাখ্যা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় করিতে হইলে এইরূপ করিতে হইবে।—

'ভূতের রাজা মহাদেবের চারিদিকে ভূতেরা বেড়িয়া থাকে আর তিনি ষাঁড়ে চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়ান আর শ্মশানে যে ঘূর্ণী বাতাস হয় তাহাতে ধূলা উড়িয়া তাঁহার জটাতে লাগাতে তাঁর জটা ধূঙার মত রঙের, কিন্তু তবু যেন জ্বল্‌ছে, আর সেই সকল জটা চারিদিকে ছড়ান ; মহাদেবের শরীর খাঁটি রূপার মত শাদা তাতে ছাই মাখান, আর তিনি তিনটি চক্ষুতে দেখেন' ইত্যাদি।

এইরূপ করিয়া ভাঙ্গিয়া না বলিলে বা লিখিলে অনেকের বোধগম্য হয় না ; ইহাকেই ব্যাখ্যার ভাষা, সংস্কৃতাপসারিণী ভাষা বলিতেছিলাম। বাঙ্গালার সাধারণ লোক ও সমস্ত স্ত্রীলোক নিতান্ত মূর্খ থাকায় বাঙ্গালা ভাষা কাজে কাজেই এই রূপ শিথিলবন্ধনা হইতেছিল। নানা কারণে ভাষাকে আবার কিছু জমাট করিতেছে। কথকদের বর্ণনার ভাষা সেই নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ ; ইহাতে ভাষাকে পূর্ব্বোক্ত মেয়ে-বুঝান ভাষা আর সংস্কৃত অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষার মাঝামাঝি করিয়াছে। এই মাঝামাঝি ভাষায় ঐ সার্দ্ধ শ্লোকের এই রূপ অনুবাদ হইতে পারে।

'ভূতপতি ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া বৃষবাহনে ভ্রমণ করেন, শ্মশান-চক্রানিল-তাড়িত-ধূলাতে তাঁহার জটাকলাপ ধূম্রবর্ণ, অথচ দ্যুতিমান্ এবং বিক্ষিপ্ত, তদীয় অমল রজত দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ; তিনি ত্রিলোচন' ইত্যাদি।

এই ভাষাকেই সংস্কৃতাভিসারিণী বলিতেছিলাম ; কথকদের বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভাষাকে অনেকটা সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছে।

তৃতীয়ত, কথকদের পদাবলী। পদাবলীর সার শব্দালঙ্কার ও ছন্দ, লালিত্য ও মধুরতা। জয়দেব কবির গানসকল এই পদাবলী লক্ষণাক্রান্ত। পদাবলী ভাষা শ্রবণ মনোহর; কূট সংস্কৃতাপেক্ষা সহজ নয়; ভাব গূঢ় নহে, প্রায় রূপ বর্ণন প্রভৃতিতেই পর্য্যাপ্ত থাকে এবং নানাবিধ ছন্দো যুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃত পদাবলী রীতির অনুকরণ বাঙ্গালা ভাষায় অনেক আছে; প্রাচীন সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহার অনুকরণ চলিতেছে। পূর্ব্বতন বৈষ্ণবদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনে, পদরচনে, পদাবলীর রীতি, পদাবলীর ভাষা, পদাবলীর ছন্দ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এত কথা কি? কাশীদাসে, কৃত্তিবাসে, ভারত, রামপ্রসাদে, শ্রীশচন্দ্র ও দেওয়ান মহাশয়ের গানে, কবিওয়ালাদিগের ঠাকুরণ বিষয়, সখীসম্বাদে, রাধামোহন সেন ও ঈশ্বর গুপ্তে, দাশরথি রায়ের ও আশুতোষ দেবের গানে বাঙ্গালাভাষার যেখানে সেখানে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদনের ব্রজাঙ্গণা এই ভাষায় কথা কহেন, আবার আধুনিক রামায়ণ অনুকারী কবিগণ অনেক সময় এই ভাষায় বঙ্গ সমাজে পরিচিত হইতেছেন। ইহা ভক্তির ভাষা নহে, খাঁটি ভক্তির ভাষা নহে।

"সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥"

ইহা যদি ভক্তির ভাষা হয়; তাহা হইলে,

"ভ্রূকুটি ভঙ্গে, সঙ্গিনী সঙ্গে,
বামা কত রঙ্গে নেচে যায়;—"

কখন সেই ভক্তির ভাষা বলা যাইতে পারে না। যে ভক্তি,

"কি স্বদেশে কি বিদেশে
যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমায় হেরিয়া ডাকি।"

বলিয়া বিদেশে অর্ণব পোতে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, সেই ভক্তিই যে আবার,

"জগত কারণ, জগত ধারণ, জগত চারণ,
জগত তারণ, কেবল তুমি,

জগতের পিতা, জগতের পাতা,
জগত বিধাতা এই বসু মাতা, তব ক্রীড়া ভূমি।"

ইত্যাদি স্তোত্রে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে, তাহা বোধ হয় না।

পদাবলীর ভাষা ঠিক প্রেমের ভাষাও নহে। যে কমলিনী কৃষ্ণ প্রেমের পাগলিনী, কৃষ্ণ ধনের কাঙ্গালিনী, যে কৈতে কৈতে কৃষ্ণ কথা, আলু থালু স্বর্ণলতা, কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অচেতন হয়, সেকি আবার সেই প্রেমে, তাহার হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ, পীত বসনের দরশন না পাইয়া, নিদ্রাকর্ষণকে বিচ্ছেদ হুতাশন জ্বালিয়া দিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করে? তাহাতেই বলি সংস্কৃত পদাবলীর অনুকরণের ভাষা খাঁটি ভক্তির ভাষা নহে, ঠিক প্রেমের ভাষা নহে। এই ভাষার অনেক গুণ আছে। কিন্তু গুণ অপেক্ষা দোষ অধিক। শব্দ চাতুর্য্যে শব্দ লালিত্যে শব্দ মাধুর্য্যে রচকের বিশেষ লক্ষ্য থাকে বলিয়া এই ভাষায় অনেক দোষের সংঘটন হয়। শব্দ ঘোর ঘটা ঘটিত আধুনিক সংস্কৃত ইহাতে বিকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালির সকল বিষয়েই পুঁজি কথা, কার্য্যে কথার প্রভু কথার দাস, সাহিত্যেও শব্দালঙ্কারের ক্রীত দাস। শব্দালঙ্কারে মনোযোগী হইলে অর্থ সঙ্গতির অকুলান হয়, এই স্থূল কথা আমরা যে দিন বুঝিতে পারিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিব, সেই দিন বাঙ্গালা ভাষা যথার্থ স্বাধীনা হইবে। শব্দালঙ্কার প্রিয়তা যে কেবল কথকদিগের দ্বারা পদাবলী পাঠেই বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। কতকগুলি কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ। কথকতার গীতি ভাগে হয়, বর্ণনার ভাষা, নয় পদাবলীর ভাষা, নয় প্রেম ভক্তির ভাষা থাকে, সুতরাং এই ভাগের পৃথক সমালোচন আবশ্যক নাই।

দুইটি ধর্ম্ম বিপ্লবের মধ্যে আমরা বলিয়াছি যে ভক্তি প্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার হওয়ায় ভাষা পণ্ডিত পরিত্যক্ত সহজ পথে চলিতে থাকে। ভাগবতের রসবিস্তারেও ভাষাকে সহজ ও কোমল করিয়াছিল। ভাগবত প্রচার জন্য কথকতার সৃষ্টি হয়। কথকতার চারি ভাগ। প্রথম ব্যাখ্যা-ভাগে, ভাষাকে শিথিল করে। বর্ণনাভাগে, ভাষাকে ক্ষুদ্রাবয়বযুক্ত অথচ জমাট করে। পদাবলী রীতির অনুকরণে ভাষায় শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য হয়। শেষ-ভাগ গান কৌশলে যে বিশেষ কিছু অন্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, বোধ হয় না।

———

আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এই রূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এই গুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থ বিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশে আমাদিগকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদিগের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

১। **ধ্রুবচরিত্র।** শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত। নিমাই বাবু অনেক নাটক লিখিয়াছেন, এই খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

২। **নটনন্দিনী।** শ্রীহরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, "সদনুষ্ঠান বলিয়াই হাস্যাস্পদের ভয় করিলাম না। এইটি আমার প্রথম চেষ্টা।" অতএব আমরাও সবিস্তারে কিছু বলিতে পারিলাম না। হরিশ বাবুর উদ্যম প্রশংসনীয়, এবং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়।

৩। **বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ।** শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।

বিষয়টি নিতান্ত আদরণীয়, এবং তারকনাথ বাবুর তৎপ্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

৪। **মেঘদূতম্।** শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র।

মেঘদূতের এই সংস্করণ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহা মল্লিনাথের টীকা, নানা প্রকার পাঠান্তর, এবং সদৃশ বাক্য সংকলন, এবং পরিশেষে, বাঙ্গালা পদ্যে একটি সুন্দর অনুবাদের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। সকল দিক দেখিতে গেলে, বলা যাইতে পারে, যে মেঘদূতের এরূপ সংস্করণ দুর্লভ, এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্যের এই রূপ সংস্করণ প্রচারিত হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। প্রাণনাথ বাবু, কালিদাসের অভ্যুদয় কাল নিরূপণ সময়ে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক বাচস্পতির মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। তৎপ্রতিবাদার্থ আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, অবকাশ হয়, সময়ান্তরে বলিব। বাঙ্গালা অনুবাদটী আর একটু সরল এবং সাধারণের বোধগম্য হইলে ভাল হইত।

৫। **প্রথমশিক্ষা বীজগণিত।** শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্, সঙ্কলিত। ইংরাজি হইতে নূতন একটি শাস্ত্র বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা যাঁহারা এমন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বীজগণিত সঙ্কলন, বোধ হয়, অন্যান্য বিষয়াপেক্ষাও কঠিন। এই দুরূহ ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ বাবু যে রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এমত বিষয়ে এতাদৃশ কার্য্য সিদ্ধি

রাজকৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধি প্রখরতার বিশেষ পরিচয়। রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি, উত্তম আখ্যায়িকার প্রণেতা, সুযোগ্য দার্শনিক, রাজব্যবস্থার অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত—এ সকল বিষয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা গণিত শাস্ত্রেও তাঁহার যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি অতি বিরল। এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইবার বিশেষ উপযোগী।

৬। **ইউরোপে তিন বৎসর**। এই নামে যে একখানি মনোহর ইংরাজি গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা করি, এজন্য এখানে আর কিছু বলিলাম না।

৭। **মুখুর্য্যার মাগেজিন**। কলিকাতা রেরিনি কোং। দশ বৎসর পরে ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। ইহা যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা এক্ষণে বলা বাহুল্য, কেননা উহা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে। শম্ভু বাবু স্বয়ং একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক; এবং যে সকল ব্যক্তি এ বিষয়ে তাঁহার সহকারী, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের চূড়া। আমরা ইহার দুই সংখ্যা পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষাও দ্বিতীয় সংখ্যা উৎকৃষ্ট। ক্রমে যে ইহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া, বঙ্গদেশের উন্নতির একটি বিশেষ কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮। **বেঙ্গাল মাগেজিন**। কলিকাতা, বিক্টোরিয়া প্রেস। উপরোক্ত পত্রখানি, এবং এখানি উভয়ই ইংরাজি। শ্রীযুক্ত রেবেরেণ্ড লালবেহারী দে কর্ত্তৃক এখানি সম্পাদিত। ইহাও অতি উৎকৃষ্ট পত্র। মুখুর্য্যার পত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। সম্পাদক সুলেখক এবং কৃতবিদ্য, এবং অন্যান্য লেখকেরাও তদ্রূপ সকল গুণবিশিষ্ট। সাধারণতঃ প্রবন্ধ গুলি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, Man defined এবং A Threat এই প্রকার প্রবন্ধ গুলিন সন্নিবেশিত না করিলে পত্রের আরও গৌরব হইত।

৯। **সঙ্গীতলহরী**। কুমার মহেন্দ্র লাল খাঁন প্রণীত। এখানি গীত পুস্তক। গীত গুলি ভাল নহে।

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ও গুলি কি? ও গুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সব সূর্য্য! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণ মালার আকর; তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে এ গুলি সূর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা অদ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগ্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যগ্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটী কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। অদ্য সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের

উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দু গুলিন সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোক বিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই অদ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশিতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য ! বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না ?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারা গুলিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তারা সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহার অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ কর্ত্তৃক পুনঃ২ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐ রূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬ টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোটের মতে তাহা ৪১৪৬ টি মাত্র। গেলামির **আকাশ মণ্ডল** নামক গ্রন্থে চক্ষুদৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার ;

১ম শ্রেণী	...	...	২০
২য় শ্রেণী	...	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	...	২০০
৫ম শ্রেণী	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	৩২০০
			৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়। কিন্তু এদেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এক কালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে। সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামী এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারও সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দূরবীক্ষণসমীপাগত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এই রূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ডমাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র তিনি ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। স্ত্রূব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, এই রূপে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে আশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর জন হর্শেল ঐ রূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা ; অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে মন্দাকিনী বলি। ঐ মন্দাকিনী কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতা বশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে মন্দাকিনী শ্বেতবর্ণা দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল মন্দাকিনী মধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ মণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

মস্যূর শাকোর্ণাক্ বলেন, "সর উইলিয়ম হর্শেলের আকাশ সন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যে রূপ গড় পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।"

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতক গুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্র পুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটিমাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময়ী মন্দাকিনী এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারা পুঞ্জময়ী নীহারিকা

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্র রাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়! কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময় বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গমনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য! আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা **বঙ্গদর্শনের** দ্বিতীয় সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, প্রজাপতি নামক নক্ষত্র (Sirius) এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন২ নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনার দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহা ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে! এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণু-মাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

তৃতীয় সংখ্যা

এক্ষণে রাজ্য বিপ্লব। সেন বংশ আগমনবার্ত্তা ভাল জানি না। তার পর মুসলমান বিজয়। মুসলমান বিজয়ে ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না? এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে বিশেষ কিছু সমালোচন নাই। গ্রন্থকারের এরূপ সমালোচন উদ্দেশ্য নহে। ছন্দো-সৃষ্টি আলোচনায় তিনি এ বিষয়ের প্রসঙ্গতঃ যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"কেহ কেহ কহেন, বাঙ্গালার বর্ত্তমান পয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর বয়েৎ নামক ছন্দের অনুকারক। একটি বয়েৎ উদ্ধৃত হইল—

করীমা ববখ্‌সায় বর্‌হালমা।
কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া॥ [পন্দেনামা।]

দেখ, এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত ; ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর ; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টি অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির পর ৬টি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধ হয় না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য আছে বটে—কিন্তু তথা প্রদর্শনেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতে যাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত হয়। সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যার তার অধমর্ণ হওয়া অপেক্ষা, যাহার নিকট সম্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল।"

এই সমালোচন সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

১। এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষর মিত নহে। ইহার প্রত্যেকার্দ্ধ একাদশ অক্ষর (Syllable) যুক্ত। "ববখ্সায়" শব্দে খয়ের নীচে স দিয়া লিখিত হয় নাই ও "বর্হালমা" শব্দে হকারে রেফ যোগ করিয়া লিখিত হয় নাই বলিয়া প্রথমার্দ্ধে তের অক্ষর আছে, বলা যাইতে পারে না। সেই রূপ শেষার্দ্ধেও খণ্ডনকার পূর্ণাক্ষর রূপে গণনা করা অন্যায়; এবং "হাওয়া" শব্দের ওয়া অন্তঃস্থ বকারে আকার মাত্র। সুতরাং এই শ্লোক এগার এগার করিয়া বাইশ অক্ষরময়।

২। ইহাতে যতি ভঙ্গ হয় নাই।

৩। পয়ারের সহিত ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য নাই, উপরে এক ছত্র, নীচে এক ছত্র, ইহাতেই যে কিছু সাদৃশ্য হউক। ছন্দোগত কোন সাদৃশ্য নাই। পূর্ব্বোক্ত বয়েৎ লঘুগুরু ভেদাত্মক ছন্দ। পয়ার আধুনিক ছন্দ; না মাত্রাবৃত্তি, না অক্ষর বৃত্তি। পারসী বয়েৎ সংস্কৃত ভুজঙ্গ প্রয়াতের প্রায় অনুরূপ, শেষের একটি বর্ণ নাই বলিয়া বোধ হয়। গুরু বর্ণ গুলির উপর (।) শলাকা চিহ্ন দিয়া আমরা একটি ভুজঙ্গ প্রয়াতের শ্লোক ও বয়েৎটি দিলাম। উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। শলাকা চিহ্ন যে গুলির উপর আছে সে গুলি গুরু, আর যে গুলিতে কোন চিহ্ন নাই, সে গুলি লঘু বর্ণ;—

। । । । । । । ।
ভ ভ ম্ভম্ ভ ভ ম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

। । । । । । । ।
দি নে শ প্রতাপে নিশা নাথ সাজে॥

। । । । । । । ।
ক রী মা ব ব খ্সা য় ব র্হা ল মা (০)।

। । । । । । । ।
ক হা স্তেম্ অ সী রে ক ম ন্দে হ বা (০)॥

কেবল শেষের গুরু বর্ণটি পারসী শ্লোকে নাই। সেই স্থানে শূন্য দিয়া উপরে শলাকা চিহ্ন দেওয়া গেল। সংস্কৃত যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত, এমন কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। সাদৃশ্য উপলব্ধিতে সহোদরতা কখন কখন অনুমেয় হইতে পারে। কিন্তু একটি বস্তু তাহার সদৃশ বস্তুর প্রসূতি বা প্রসূত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তর্ক বহুলতার প্রয়োজন নাই।

৫। উদ্ধৃত ভাগের পরামর্শটি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যখন ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে, তখন গ্রন্থকারের পরামর্শ একবার স্মরণ করিয়া চিন্তা করিব। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, যে পূর্ব্বে এই বিষয়টি তোমরা ঋণ করিয়াছ কাহার্ নিকটে ? তখন একবার মান সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া সত্যের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিতে প্রস্তুত হইব। যদি দূরস্থ শত্রু বধ্য যবনের নিকট হইতে ঋণ লইয়া থাকি, স্বীকার করিব; প্রতিবেশী আঢ্য কুলীন ব্রাহ্মণ মহাজনের দোহাই দিয়া মিথ্যা বাক্যে সম্ভ্রম রক্ষা করিব না। বয়েতের অনুকরণে পয়ারের সৃজন নহে, এ কথা যেমন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিলাম, সেরূপ যদি সকল বিষয়ে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম। কিন্তু তা আমরা বলিতে পারি না। বলিলে কে বিশ্বাস করিবে ?

মুসলমানেরা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন। বঙ্গ ভাষার বহু দিন পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা যখন চৈতন্য-দেবের ভক্তি বাহিনীতে নিজ তরণী সাজাইয়া এক দিকে স্রোতোমুখে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়েই পারসী ভাষা আসিয়া সেই তরণিতে আপনার কতকগুলি কায়দা, কতকগুলি রীতি, শত শত শব্দ আনিয়া তুলিয়া দিল, ভাষা এই বৈদেশিক গুরুভারে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। নৌকা যত চলিতে লাগিল, পারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এই রূপ ক্রমাগত দেড় শত কি দুই শত বৎসর যায়। পারসীর বোঝাই বাড়িতে থাকে, নৌকা আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতে সেই নৌকার যাবনিক দ্রব্য অব্যবহার্য্য ও পরিহার্য্য বোধে, দেশীয় বস্তুজাতের সওদা করিতেন; সাধারণ্যে নিত্যকর্ম্মে, ব্যবসায়ে, শিল্প বিপণিতে, হিসাব পত্রে, জমীদারী সেরেস্তায় এই যাবনিক সওদারই কেনা বেচা অধিক পরিমাণে হইত।

১২০৩ অব্দ হইতে আকবর শাহের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাতে পারসীকের যোগে কোন পরিবর্ত্তন হওয়া বোধ হয় না। ১৫৫৬ অব্দে আকবর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সাড়ে তিন শ বৎসর পারসী-ভাষা কেবল রাজদরবারের ভাষামাত্র ছিল। আকবর শাহ নিজ মহচ্চিত্তে হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার কল্পনা করেন। এই চেষ্টার অনেক গুলি ফলের মধ্যে উর্দ্দু ভাষা একটি ফল। কিন্তু উর্দ্দু ভাষা সৃষ্টির সমালোচনে প্রয়োজনাভাব। বিখ্যাত হিন্দুরাজা তোড়র মল্ল আকবর শাহের রাজস্ব

সচিব ছিলেন। আকবর শাহ হিন্দুদিগকে রাজ্যের উচ্চপদ প্রদান করেন; তিনি জাতি বা বর্ণ-বিচার দোষে লিপ্ত থাকিয়া পক্ষপাত করেন নাই। মান-সিংহ, বীরবল, তোড়র মল্ল প্রভৃতি আমীরগণ রাজ্য সংক্রান্ত এক২ বিষয়ে কর্ত্তা ছিলেন। হিন্দুজাতির পদোন্নতিসাধনে সম্রাটের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও হিন্দুরা উচ্চপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পারসী জানিতেন না, পারসী জানা আবশ্যকও বোধ করিতেন না। রাজ-সভায় পারসীই প্রচলিত ভাষা ছিল, পারসী না জানা থাকাতে তাঁহারা রাজ-সভায় সম্রাটের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে বা পরিচিত হইতে পারেন নাই। রাজা তোড়র মল্ল হিন্দু জাতির অনুন্নতির এই কারণ জানিতে পারিয়া, কিসে সকলে পারসী শিখেন, তাহারই চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজস্ব-সচিব; তিনি তদীয় বিভাগে এই নিয়ম করিলেন যে, সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই হিসাব ও বন্দোবস্তী কাগজপত্র এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়ের নিরূপণ পত্র পারসীতে রাখিতে হইবে। সেই নিয়ম চলিল; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সরকারী সকল কাগজ পারসীতে থাকিলেই সকলকে পারসী শিখিতে হইবে; পারসী শেখা থাকিলে রাজ সভায় পরিচিত ও রাজকার্য্যক্ষম হইতে পারিবে। সকলেই পারসী শিখিতে লাগিল; গ্রামে গ্রামে আখনজিরা লম্বা শ্মশ্রুরাজি-মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে দেহার্দ্ধদণ্ড দোলাইতে লাগিলেন। উত্তর ভারতবর্ষের সকল ভাষাই রূপান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। বঙ্গভাষা নূতন বৈষ্ণবী ভক্তিবাহিনীতে তরি ছাড়িয়াছে মাত্র, আখনজি তাহারই উপর বোঝাই চাপাইতে আরম্ভ করিলেন।

(১) ১৪৮৬ অব্দে চৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন; ১৫২০ অব্দে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; ১৫২২ অব্দে নীলাচলে প্রস্থান করেন; ১৫৩৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (২) রূপ, সনাতন, জীব, মুরারি, দামোদর প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থকর্ত্তা। (৩) চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ বোধ হয়, ১৫৪৮ অব্দে লিখিত হইয়া থাকিবে, (৪) এবং চৈতন্য চরিতামৃত বোধ হয়, ১৫৭৩ অব্দে লিখিত হইয়া থাকিবে। (৫) কৃত্তিবাসের রামায়ণ কোন্ সময়ে লিখিত হইয়া-ছিল, তাহা স্থির করা অসাধ্য। যখন ভূতত্ত্ববিদ্যা নদীগর্ভ পরিবর্ত্তন গণনা করিয়া, বলিতে পারিবে যে, এত দিন পূর্ব্বে ভাগীরথী সপ্তগ্রামের নীচে দিয়া আকনা মাহেশের পাশ দিয়া গমন করিত, তখন এই কথার কতক পরিস্ফুর্ত্তি হইবে। (৬) কবিকঙ্কণের চণ্ডী সম্ভবতঃ ১৫৯০ অব্দের পরে এবং ১৬০৩

অব্দের পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। (৭) এ দিকে লোদী বংশের প্রথম রাজা বেলোলি ১৪৫০ হইতে ১৪৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত, ও সেকেন্দর লোদী ১৪৮৮ হইতে ১৫১৭ অব্দ পর্য্যন্ত, ইব্রাহিম ১৫১৭ হইতে ১৫২৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। লোদিবংশ লুপ্ত হইল। তখন চৈতন্য নীলাচলে প্রস্থান করিয়াছেন। মোগল পাঠানে সমর আরম্ভ হইল। মোগল সম্রাট বাবর শাহ ১৫২৬ অব্দে দিল্লীর রাজাসনে উপবিষ্ট হয়েন, ১৫৩০ অব্দে, তাঁহার মৃত্যুর পর হুমায়ুন শাহ রাজা হয়েন; ১৫৪০ অব্দে পাঠান বংশীয় শের আফ্‌গান তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন; তখন চৈতন্যদেব নীলাচলে সাগরের নীল জলে লীলা সংবরণ করিয়াছেন। ১৫৪২ অব্দে আকবরশাহ জন্ম গ্রহণ করেন; ১৫৫৪ অব্দে হুমায়ুন রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন; ১৫৫৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; আকবরশাহ সম্রাট হয়েন; ১৫৭০ অব্দের পর রাজা তোড়র মল্ল পারসী প্রচলিত করেন। ১৬০৫ অব্দে আকবর শাহের মৃত্যু ও জাঁহাগীরের সিংহাসন প্রাপ্তি। উপরে যে বৈষ্ণব-পঞ্জী ও মুসলমান পঞ্জী দেওয়া গেল, তাহাতে দেখা যায় যে, যখন মোগল পাঠানে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদে নিযুক্ত, তখন বৈষ্ণবেরাও "পাষণ্ড-দলনে" প্রবৃত্ত ছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা একটু সুস্থির হইয়া বৃহদ্‌গ্রন্থ ভাগবত প্রণয়ন করিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরেই হুমায়ুন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় বৃহদ্‌গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নের পূর্ব্বেই রাজস্ব সচিব পারসী প্রচলিত করিয়াছিলেন। যখন কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমাপ্ত করেন, তখন আকবরের রাজ্যকালের শেষ হইয়া আসিয়াছে ও তখন পারসী বিলক্ষণ চলিতেছে। কবিকঙ্কণের সময়ে পারসী ভাষার সংশ্রবে বাঙ্গালা ভাষা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য চণ্ডী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল;—

"শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হইল যে মতে;
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়রদেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ;
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাস চসি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।

ধর্ম্মরাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে,
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে।

উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হলো অরি ;
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি।

সরকার হৈল কাল, খিল ভূমি লেখ লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি,
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।

ডিহিদার আরোজ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ,
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে,
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।

কোতালিয়া বড় পাপ, সজ্জনের কাল সাপ
কড়ির কারণে বহু মারে,
আথালিপাথালি কড়ি, লেখাজোখা নাহি দেড়ি
যত দিয়া যে বা নিতে পারে।

জমাদার বসায় কাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার যুড়িয়া দেয় থানা,
প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা।

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীগড় যাঁর গাঁ,
যুক্তি করি গম্ভীর খাঁর সনে,
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
পথে দেখা হৈল তার সনে।"

এই নয়টি শ্লোকে নয় দ্বিগুণে আঠারর অধিক পারসী কথা আছে। শুধু তাই নয়, বঙ্গদেশ তালুকে বিভক্ত হইয়াছে, হিন্দু গ্রাম নগর গিয়া মুসলমান নামে সহর স্থাপিত হইয়াছে ; উজীর, কোটাল, সরকার, ডিহীদার,

জমাদার, পোদ্দার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিরা কার্য্য করিতেছেন; লোকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে খিলাৎ পাইতেছেন; শ্রীমন্ত গম্ভীর, ইহাদিগের উপাধি খাঁ হইয়াছে; যাবনিকরীতি সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং বঙ্গভাষাও অতি অল্প দিনের মধ্যে যাবনিক মিশালে এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন বটে, কিন্তু পারসী মিশালে বঙ্গ ভাষার যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ আকবর শাহের সময়ে হয়। এই রূপ বেগ গতিতে পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নহে। সকল ভাষাতেই ইহা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। ইহাকেই বিবাহের জল পেয়ে মেয়েরা যে রূপ বাড়ে, তাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের বাল্য হইতে কৈশোরে পরিবর্ত্তন, বড় অল্প পরিবর্ত্তন নহে। তখন চরণের চঞ্চলতা নয়ন হরণ করিয়া লয়; উদরের স্থূলতা বক্ষঃ ও জঘন দুই দিগ হইতে ভাগ করিয়া লয়; শাখাঙ্গ সকলের কৃশতা চারি দিগ হইতে একত্র করিয়া কটিদেশ নিজ কক্ষ মধ্যে রাখিয়া দেয়। "কুমুদিনী" দশ বৎসর বয়সে ঘর করিতে গেল, তিন বৎসর পরে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিল, কুমুদিনীকে কি এখন চিনিতে পারা যায়? সেই রূপ মোগল সম্রাটগণের রাজ্যকালের প্রথম অবস্থার ভাষা ও আকবরের শেষ সময়ে রচিত চণ্ডীর ভাষা যে সেই একই কুমুদিনী, তাহা এক দৃষ্টি মাত্রেই উপলব্ধি না হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একই ভাষা। নারী শরীরের প্রবাহিণী পুঞ্জের ন্যায় ভাষার প্রবাহিনী গুলিও এক সময়ে পুষ্টিলাভের জন্য উন্মুখিনী হইয়া থাকে, কোন বিশেষ কারণে সেই ব্যস্ততার নিবারণ হয়, সেই অভাবের মোচন হয় ও অচিরাৎ ভাষার বিশেষ পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

আকবর শাহের সময়ে যেরূপ বৈষ্ণব স্রোতে পারসী স্রোত আসিয়া ভাষাকে এক নূতন পথে লইয়া যায়, এ রূপ স্রোতে স্রোতোপাতও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। আকবর শাহের মৃত্যুর পর হইতে ভাষা এক গতি চলিতেছিল; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সংস্কৃত চর্চ্চার প্রাবল্য নিবন্ধন কবিরঞ্জন ও তাঁহার হস্ত হইতে রায় গুণাকর যেমন গ্রহণ করিলেন ও কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত কবিগণে একত্র মিলিয়া ভাষাকে এক নূতন স্রোতে ছাড়িয়া দিলেন, কোথা হইতে এক ভয়ানক রাজ্য বিপ্লব রূপ স্রোতঃ আসিয়া, এমন কি, পঞ্চাশৎ বৎসরের মত সকল স্রোত বন্ধ করিয়া রাখিল। ১৭৫২ অব্দে

অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ শেষ হয় ; ১৭৫৭ অব্দে পলাশীর বিপর্য্যয় ; তারপর পঞ্চাশ বৎসর ভাষাতে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল বিরাজ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা মুখবদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থির ভাবে ছিল। উপপ্লব কর্ত্তা মহাত্মা রামমোহন রায় আসিয়া তাহার মুখ খুলিয়া দিলেন। ভাষা এক দিগে যাইতেছিল ; কিন্তু আকবর শাহের তোড়র মল্লের ন্যায় আমাদিগের শাহন শাহের তোলপাড়-মল্লগণ এই ১৮৭২ অব্দে এক বৎসরেই কি করেন, দেখুন।

ক। স্বয়ং বাঙ্গালার কর্ত্তা বলিতেছেন, সংস্কৃত মিশ্রণে আমার বাঙ্গালা ভাষার পবিত্র শোণিত দূষিত করিও না ; যত পারসী ইংরাজী মিশাও, তাহাতে লাভ বই নোকশান নাই।

খ। আক্কৌণ্টাণ্ট্ জেনারেল হিসাব নবীশ বাহাদুর বলিতেছেন, তুমি ইংরাজি জান আর নাই জান, আমি ইংরাজিতে হিসাব বুঝি, সকলে ইংরাজীতে হিসাব রাখিবে।

গ। ওদিগ হইতে বীম্‌স সাহেব বলিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষাটা বড় গোল মেলে গতিতে বেগে যাইতেছে—এসো আমরা জন কয়েকে মিলিয়া, বালেশ্বর ক্যানাল কোম্পানির ন্যায় খাল কাটিয়া, বাঙ্গালা ভাষার জল পল্‌তার ঘাটের ফিল্‌টরের ন্যায় ছাঁকনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া বেশ আস্তে আস্তে খালের ভিতর দিয়া এক দিকে লইয়া যাই। (জিজ্ঞাসা করি, কোন দিকে ?)

ঘ। কোন২ পরিণামদর্শনাভিমানী ইংরাজ ভ্রূকুটি ভঙ্গী করিয়া মৃদুহাস্যে বলিতেছেন, অস্ট্রেলিয়া দেখ, আমেরিকা দেখ ; আর ঐ দেখ, হিমালয় প্রদেশে সাক্ষণ উপনিবেশ সংস্থাপন হইতেছে, কাহাকেও কিছু কষ্ট পাইতে হইবে না। আপনা আপনি চসরের ভাষা ভারতের অষ্টাদশ ভাষার লোপ করিবে।

এই সকল বিষয়ের বিশেষ সমালোচন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেরূপ বিশেষ কারণে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়, সেই রূপ অনেকগুলির সূত্রপাত এ বৎসর হইয়াছে ; ইহাতে কি হইবে, বলিতে পারি না। আকবর শাহের সময়ে এইরূপ কারণে চণ্ডীর ভাষার ন্যায় ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর শাহের পরও ক্রমে নূতন নূতন কায়দা বাঙ্গালা অবয়বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একটি নামে দেখুন ;—

"শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অলি জানবে শ্রীমত্যা রাইকিশোরী দেব্যা নাবালিগা জওজে ৺ ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাকিন তকিপপুর জেলা হুগলী পরগণে আরশা।

বকলম শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার, আমমোক্তার

সাং বেলডিহী জেলা চব্বিশ পরগণা"

ইহার সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা করিতে হইলে এইরূপ কিছু করিতে হইবে;—

"আরশা পরগণার অন্তর্গত ও হুগলী জেলার মধ্যে তকিপপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে মৃত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অপ্রাপ্ত-ব্যবহারা বিধবা বনিতা শ্রীমতি রাইকিশোরী দেবীর রক্ষক ও কার্য্যকারক আছেন, তাঁহার সেই কার্য্যকারকত্ব রূপে ও স্বকীয় সাধারণ প্রতিনিধি কর্ম্মচারী জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বেলডিহী গ্রামনিবাসী আমি শ্রীভৈরবচন্দ্র তরফদার ঐ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁহার স্বীয় পক্ষে ও ঐ কার্য্যকারকত্ব পক্ষে লিখিয়া দিলাম।" এরূপ করিলেও কেবল সংস্কৃতে বাঙ্গালি পণ্ডিতের বোধগম্য হইবে না। অন্য উদাহরণের প্রয়োজন নাই। পারসী ভাষায় বাঙ্গালার যে বিশেষ রূপান্তর হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমরা গুটিকত পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ করিয়া **বাঙ্গালা ভাষা** প্রবন্ধের এই ভাগের উপসংহার করিব।

১। বিশেষণ পদ অনেক সময় বিশেষ্যের পরে বসিতেছে; যথা শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী নাবালিগা। কানুম চাহরম।

২। সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধ্যের পরে বসিতেছে; যথা অলিজানবে অমুক—অমুকের পক্ষে কার্য্যকারক।

৩। নূতন পদ্ধতির বহু বচন; যথা, নদীয়াজেলায় বলে, মাগীন, ছোঁড়ান।

৪। সাকিন, মোকান, বকলম, বনাম, মারফত, দরুণ, বাবতে প্রভৃতি বহুবিধ ও বহু সংখ্যক যোজক অব্যয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া একটি বিস্তীর্ণ ভাব ক্ষুদ্র একটি কথায় প্রকাশ করিতেছে।

৫। তাহাতে ভাষা কিছু দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে।

৬। আক্কেল সেলামী, বেগারের দৌলৎ, হাকিম ফেরে হুকুম ফেরে না, প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য প্রবিষ্ট হইয়া ভাষার চুটকি বিভাগের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

৭। আধুনিক রাজধর্ম্ম সম্পর্কীয় নানা পারসী শব্দ ভাষায় সংযুক্ত হইয়া বঙ্গ ভাষাকে অর্থকরী মূর্ত্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত করিয়াছে। বিষয় কার্য্যের উপযুক্ত করিয়াছে।

৮। রূপাদি বর্ণনে ধারাবাহিক অত্যুক্তি কথন প্রথা প্রচারিত হইয়াছে; ঈশপ জেলেখা আদি গ্রন্থের রূপবর্ণনের সহিত বিদ্যার রূপ বর্ণন তুলনা করিবেন। আর কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা পারসীজ্ঞ পাঠক বিলক্ষণ জানেন।

যে মুসলমানেরা পাঁচ শত পঞ্চাশত বৎসর এই বঙ্গে একাধিপত্য করিয়াছেন; ধর্ম্মে মাণিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বনবিবি চালাইয়াছেন; ধর্ম্ম সংস্কারে দশ সংস্কারের উপর সমাধিসংস্কার চালাইয়াছেন; কৃষিবিশ্বাসে মাম্‌দোভূতকে প্রত্যেক কবর স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; যে যবন সাধারণ বাঙ্গালির নয়নপথে পরীকে জিনীকে, আকাশ মার্গে উড়াইতেছিলেন; যে যবন বাঙ্গালিদেহের উপরার্দ্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন; আহার পদ্ধতির উন্নতি শিক্ষা দিয়াছেন; সমস্ত ভূভাগের বন্দোবস্ত নিজমতে করিয়াছেন; আয় ব্যয় নিরূপণ পদ্ধতি নিজ মতে প্রচার করিয়াছেন, সেই যবন যে বাঙ্গালা ভাষার রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? বাঙ্গালা ভাষার রীতি যবন শাসনে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খোস্‌খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোক জন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ— একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোষের উপর, পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাক খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচি হস্তে কারপেট তুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আলু থালু— কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উল গুলিন অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃণ্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ড লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর ; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্য-শূন্য। বোধ হয়, বিড়াল ভাবিতেছিল, "মনুষ্যের দশা অতি ভয়ানক ; সর্ব্বদা কার্পেট তোলা, পুতুল খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মনঃ নিবিষ্ট, ধর্ম্মকর্ম্মে মতি নাই ; বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে ?" অন্যত্র একটা টিক্‌টিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকা জাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই।

একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল ; সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল— পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিকৃটিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কারপেট রাখিলেন। এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, সতুবাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন, বলিতে পার?"

সতুবাবু বলিলেন, "ইলি—লি—ল্লিঃ!"

ক। সতুবাবু, তুমি কখন আফিসে যেও না।

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমাকে হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপুর বেলা বসে বসে কাঁদিবে!"

সতুবাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন, কেননা কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে, বৌ আসিয়া মারিবে। সতুবাবু এবার উত্তর করিলেন।

"বো—মাবে!"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না, কেননা এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া এক খানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া, আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ন মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ :—

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ— নহিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সম্বাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামির বিবাহ হইবে। এ

বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও, কেননা তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে, একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ্ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি সতুবাবু?" সতুবাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমল-মণির নাসিকা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতুবাবুর নাসিকা ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতুবাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নইলে হইবে না। মন্ত্রির আপিস কি ফুরায় না? সতুবাবু, আজ এস, আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথা সময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস্ হইতে আসিয়া ধড়া চূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁকে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া বসিয়া দশ ছিলিম তামাক্ পোড়াব!" শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপল তুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি!" এই বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাকু ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন, এবং বলিলেন, "ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

ক। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্রখানা?"

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রীমশাইকে ডিশ্‌চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধি টুকুও নাই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা কোরে পারে না, তা কি সত্য২ পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য?

শ্রীশ। সে কি! সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন;—

"আচ্ছা, মিথ্যা বলি, কমলমণির সতিনের মাথা খাই।"

শ্রীশ। তাহলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলেম—এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর কোরে বিয়ে কর্‌তেছে।

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকিও নাই।

"এ কথা বলার পর, আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয়, ইহার পর আর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত; তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে?

আর যদি বল, শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহা সমাজ সম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব ; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে, কার্ সাধ্য ? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজ-চ্যুতি কি ? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাতত কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ ? তুমি এ কথা ইংরাজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে একথা ছিল না। কিন্তু ইংরাজেরা কি অভ্রান্ত ? মূসার বিধি আছে বলিয়া ইংরাজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি মূসার বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব ?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন ? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা ; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃ নিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃ-কুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি ?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নী কণ্টক করি কেন ? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার্ আপত্তি ?

"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয় ?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কাহার্ আপত্তি?

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন! কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হৌক, মন্ত্রিবর, আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামির নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, অস্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সূর্য্যমুখী কোথায়? মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে, সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়ন কক্ষে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়ন কক্ষে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, কক্ষ প্রান্তে, এক রুদ্ধগবাক্ষ সন্নিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু চিনিলেন যে সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী

তাঁহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি,—বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে—সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কাহাকে কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার রুক্ষ কেশের উপর পড়িতে লাগিল!

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক২ বারমাত্র মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার্ আপত্তি?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ-বৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন;—

"এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগে আপনি মরিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"—মৃদু, ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস। তখন

জানিবে, তোমার দাদা আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভো, তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।' "

কমল। আর, তুমি কি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখন স্বামির পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমন ঘটে।"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার্ কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামির? আমার কপাল জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামির আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া, সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ।

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন;—

"তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধ খানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায়—সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে২ কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে২ কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী, অন্তরে২ সূর্য্যমুখী বুঝিতেছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া, সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, এবং সতীশ চন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় কালীন সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠ-স্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বলনা?"

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন সচ্ছন্দ চিত্তে শয়ন মন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন; পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ পত্র

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্র খানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ:—

"যে দিন স্বামির মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাহার হাতে স্বামিকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব। কেননা, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামিদান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামির যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ হই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর এক বার দেখিয়া যাইব, সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি

প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব —ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি লইলে সঙ্গে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোনা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম, আবার লিখিলাম —কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সম্বাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও, যে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল; যত দিন না মাটীতে এমাটী মিশায়, ততদিন থাকিবে। কেননা তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে

বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমারও কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, যে তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষপিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতার নির্ম্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয় কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি একবার কালিদাসের মধু মাখা অমূল্য কবিতা কলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতি ভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে ক্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্য সমূহ অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ, দেন এবং ইতালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র২ ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষা-তত্ত্ববিৎ জোন্স্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, ঈএটস্, ফসি, ফোকক্স্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হম্‌বোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়া ইউরোপ খণ্ডে তাঁহার

মেঘদূতম মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মল্লিনাথ সুরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা॥

কুমার সম্ভবম্। সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ সুরিবিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া গবর্ণমেণ্টসংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্ক-বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কৃত তট্টীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোদ্ভাসিতয়ান্বিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম। কলিকাতা॥

খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক চূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে সেক্ষপিয়রের "হাম্‌লেট্‌" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট" একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন; সুতরাং গেটে একজন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম জোন্‌স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* একজন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্বরস পানে এক কালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।" † তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাস কৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টী" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাদৃগ্‌ আদর করেন না—এমন কি, এক ব্যক্তি মেঘদূত অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপালচম্পূ" নামক আধুনিক অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজী কালিদাসের শুদ্ধ কবিতা পাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসন পত্র হইতে তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্‌।
নৈষধে পদ লালিত্যং মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ।

আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন ; ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই এ সকল উদ্ভট শ্লোক অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী গ্রহণ করেন। ফলে এ সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবিরচিত। "প্রফুল্ল জ্ঞান নেত্র" নামক এক খানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবনচরিত্র মধ্যে প্রচলিত রসিকতা জনক কাল্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে একখানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে ;—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমরসিংহ শংকুঃ
বেতালভট্টঘটখর্প্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানিবৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ সূরি কালিদাসের কাব্য সমূহের টীকা রচনা করেন ; তাঁহার টীকা দক্ষিণাবর নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু

কাব্যপ্রিয়” প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

বেন্‌ট্লি, মস্যূর পাড়ির জর্নেল “এসিয়াটীক” নামক পত্রিকায় “ভোজ-প্রবন্ধের” ফরাশিস্ অনুবাদ ও “আইন আকবরী” দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজরাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেন্‌ট্লি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা হয়। কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভোজ প্রবন্ধের প্রমাণানুসারে গুজরাট মালয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনী নিবাসী ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্য কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং “ভোজ প্রবন্ধ” পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জ্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয় কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করত ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে লোহিতবর্ণ অসি মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ বণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—“মান্ধাতা, যিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।” ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণান্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা ভোজ প্রবন্ধে কালিদাসের নাম সহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি ;——

কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপালদেব, জয়দেব, তারেন্দ্র, দামোদর, সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি শঙ্কর, সম্বদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন, ভোজ প্রবন্ধ ১২০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। ভোজ চরিতে এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ভোজ প্রবন্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ চম্পু, রামায়ণ, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, অমরটীকা, রাজ বার্ত্তিক, পাতঞ্জলিটীকা, এবং চারুচার্য্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

বিশ্বগুণাদর্শ গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা ;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মূররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ।

কিন্তু ইহাতে তিনিও ভোজপ্রবন্ধ প্রণেতা বল্লালের ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এক কালে বর্ত্তমান ছিলেন না; এবিষয়ের ভূরি২ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পূঃ শকদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ

স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হমবোল্ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন; এ কথা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দু সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রবর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা দুরূহ। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬৩১। ৭২১ এবং ১১০০, এই তিন পৃথক২ কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। মেরু তুঙ্গকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামণি" এবং রাজ শেখরকৃত "চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, জনৈক সিদ্ধসেন সূরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কত দূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈন গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এসকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূর ভট্টের সমকালীন জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণ কৃত হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতিহর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহার নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ, হিয়াঙ সিয়াঙ কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনেব সহিত চৈনিকাচার্য্যের সাক্ষাৎ "যবন প্রোক্ত পুরাণ" হইতে হর্ষচরিতে সংগৃহীত হইয়াছে।

"কথা সরিৎসাগরের" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কম্ব নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন।

নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, কথা সরিৎসাগর ও মৎস্য পুরাণের মতানুসারে শতানিকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাঁকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কি রূপ গোলযোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্যরত্ন কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে; সেটি বড় সহজ ব্যাপার নহে, কাজে২ ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তম রূপ সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

শ্রীদেবকৃত বিক্রমচরিতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দা স্থাপন করেন। এ গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, "জ্যোতিবিদাভরণ" নামক কাল জ্ঞান শাস্ত্র মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এবিষয়টি মেঘদূত প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদাভরণ যে রঘুকার কালিদাস প্রণীত, এ বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের মত পরিপোষক, জ্যোতির্বিদাভরণের কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি;—

"আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরী-সমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি। ৭।

শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি, ঘটকর্পর, অমর সিংহ, এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সত্য, বরাহ, মিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিত্থ, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কএক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী। ১০।

বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬ জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

তাঁহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজন ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল; এবং ২৪৩০০ হস্তি এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তি দান করিয়া ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুজ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরদ্রু, সর, এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া দুর্গ পুনঃ প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী নগরী, তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

তিনি মহাসমরে রুমাধিপতি শকনৃপতিকে পরাজয় করণান্তর বন্দী রূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

এই রূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা করিয়া, বৈদিক "শ্রুতি কর্ম্মবাদ" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করত, এই "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

আমি ৩০৬৮ কলিগতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্বিবরণ উত্তম রূপে পরিদর্শনান্তর আমি এই গ্রন্থ জ্যোতির্ব্বিদগণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম। ২১।

পুনরায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন "এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মানব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের যে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৪২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্ক বাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তৎদৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য, ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা যে ১০ সংখ্যক শ্লোক জ্যোতির্ব্বিদাভরণ হইতে অবিকল কালিদাসের লেখনীনিস্থত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকে জানেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাস প্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাস প্রণীত!—কখনই নহে। কেহ২ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য করি—এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্ক বাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার রঘু কুমার রচনার সহিত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা-প্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন—মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকৃত।

তিনি আপন গুণ গরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের" অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। পুনশ্চ, জিষ্ণু, (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রম ক্রমে সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন এবং ঘটকর্পর যে এক জন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর নামে, কোন কবি ছিলেন না। এবং ঘটকপর নামে যে ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাস কৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থকার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শক প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য এবং কাল নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের আলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শত্রু পরাভব" নামক জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণেতা। ইহাঁর গণক উপাধি ছিল।

কর্ণেল উইল ফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য" হইতে কএকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সূরি বল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যানুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্ম বিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধ সেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করত, পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থকিত হইয়া, নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইল ফোর্ড ও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীর বা বীর বিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। শত্রুঞ্জয়

মহাত্মের মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্র হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনগ্র্হণ করত জৈন মন্দির সমূহ সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃ গুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসন কর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য এক বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হয়েন

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আশীয়াটিক রিসার্চেস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে এই নামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ২ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

কহ্লণ পণ্ডিত রাজ তরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণ মণ্ডিত বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতাল মেন্থ এবং ভর্ত্তৃমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থ" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দ বাচক, তাহা হইলে বেতাল মেন্থ এবং ভর্ত্তৃমেন্থ, বেতাল ভট্ট ও ভর্ত্তৃভট্ট। কোন২ জৈন গ্রন্থে "মেন্থ শব্দ" মেন্ধ্র লিখিত আছে। বিশ্বকোষ অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় মেন্ধ্র অর্থ প্রধান। বেতাল ভট্ট বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী এবং ভর্ত্তৃহরি নীতি বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার শতক গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? রাজ তরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃ-গুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসন-কর্ত্তা। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃত ত্রিকাণ্ড শেষ মধ্যে কালিদাসের—রঘুকার, কালিদাস, মেধারুদ্র এবং কোটিজিৎ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্ত কৃত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘব ভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত

করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী নিস্থৃত হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবর সেনের আজ্ঞানুসারে কালিদাস সেতু কাব্য নামক প্রাকৃত কাব্য সংস্কৃত টীকা সহ রচনা করেন। সুন্দরকৃত বারাণসী দর্পণ টীকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে সেতু কাব্য রচক বলিয়াছেন; বৈদ্যনাথকৃত প্রতাপরুদ্র, দণ্ডীপ্রণীত কাব্যাদর্শ এবং সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে সেতু কাব্যের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সেতুকাব্য বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠ সেন রাজ-তরঙ্গিণীর মতে, "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। প্রিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্যের সভাসদ্ কবি বাণ হর্ষচরিতে প্রবরসেনের ও সেতুকাব্য প্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা ;—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কোপিসেনেবসেতুনা।
নির্গতাসুন বাকস্য কালিদাসস্য সুক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রা সুমঞ্জরীম্বিবজায়তে ॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং মহাকবি কালিদাসও— একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমাদিগের মহাসংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহাপ্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মূলতানের নিকটস্থ কারার নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা

পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজ তরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করত যতি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন। এবং প্রবর সেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেতু কাব্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর হইয়াছিলেন, এটী মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রাম গিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবত তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ কাশ্মীরের ও হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কখনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এইমাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্ত "রাজ তরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ সূরি মেঘদূতের চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্‌নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্‌নাগাচার্য্য কালিদাসের সহধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়সূত্র বৃত্তিকার। কালিদাস রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, মেঘদূত, ঋতু সংহার, অভিজ্ঞান শকুন্তলনাটক,

বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটক, মালবিকাগ্নি মিত্র নাটক, নলোদয়, শৃঙ্গার তিলক, শ্রুতবোধ এবং সেতু কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, মেঘদূত, ঋতু সংহার, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নি মিত্র এবং শ্রুতবোধ, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী,
নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌচ রামঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ।"

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১ ॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদযুক্ত ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২ ॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের ; তুমি কর্ত্তা—আইনাদির ; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির । অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী—শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্‌চে ধারী ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর ; আর এক রূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর ; আর এক রূপে কাছাড়ে চার চাস কর ; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৫ ॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্রাদিতে প্রকাশ ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ ! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিত ; এবং তুমি উমেদার বর্গের আনন্দ ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ ! তোমাকে আমি প্রণাম করি । ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা, কেননা তুমি প্রজাপতি ; তুমি বিষ্ণু, কেননা কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন ; এবং তুমি মহেশ্বর, কেননা তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র ; তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌শ তোমার কলঙ্ক ; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন ; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে ; তুমিই অগ্নি, কেননা সব খাও ; তুমিই যম, বিশেষ আমলা বর্গের। ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুষাদি মানি না ; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি ; তুমি দর্শন—ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে প্রণাম করি। ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত ! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদ-শুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১২ ॥

তোমার হরিতকপিষ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি নানা বর্ণ শোভিত, অতি যত্ন রঞ্জিত, ভল্লুক মেদ মার্জ্জিত, কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া ; পেণ্টুলন সেই ধড়া,—আর হুইপ সেই মোহন মুরালী—অতএব হে গোপীবল্লভ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪ ॥

হে বরদ ! আমাকে বর দাও। আমি শাম্‌লা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু২ বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ ॥

হে শুভঙ্কর ! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব। তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬ ॥

হে মানদ !—আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও ;— আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭ ॥

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোক মণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্ত লিখিত দুই এক খানা পত্র বাক্স মধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি লেখা পড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১॥

হে মিষ্টভাষিণ! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব; জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেননা তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড়২ কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬ ॥

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়. আমায় বাহ্বা দাও,—আমি তাহা হইলে সমস্ত হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭ ॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি২ প্রণাম করি। ২৮ ॥

তমিস্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামির দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ॥

২

কে শুনেছে হেথা মানবের রব?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও টানে পতি দেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায়॥

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর শঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে,
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।
সে ছায়া পশিল কাননে, –অমনি,
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহা গদা প্রভা, যেন বা বিজলি,
দেখিলা সাবিত্রী, যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নির্ঝরে আলোকে তার।
মহা গদা দেখি প্রণমিলা সতী,
জানিলা কৃতান্ত পরলোক পতি,
এ ভীষণা ছায়া তাঁহারই মূরতি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার॥

৫

গভীর নিস্বনে কহিলা শমন,
থর২ করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বত গহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনী,
শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে; তুমি ত অধিনী,
মম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে?

৬

"এ সংসারে কাল বিরাম বিহীন,
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।
সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই॥"

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা,
অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি।
তখন কৃতান্ত কহে আর বার,
"অনিত্য জানিও এছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি॥

৮

"রত্নছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গ্রাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে শুধু মম আগারে॥

৯

"অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম্ম নিরত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করম ফল।
যত দিন সতি তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল॥

১০

"অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতী আছয়ে নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ আছে, নহে রিপু দুরন্ত।

১১

"রবি তথা আলো করে, না করে দাহন
নিশি স্নিগ্ধকরী নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে,
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক॥

১২

"নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রম লেশ, নাহি অলস।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ॥

১৩

"জগতে জগতে দেখে পরমাণু রাশি,
মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কাল তরঙ্গে।
দেখে লক্ষ কোটি ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটি কোটি ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীত তরঙ্গে॥

১৪

"দেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে,
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীর মণ্ডলে,
নির্দ্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নারে।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া,
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলিছে আসিয়া
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসারে॥

১৫

"তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মায়া,
ত্যজ বৃথা ক্ষোভ; ত্যজ পতি কায়া,
ধর্ম্ম আচরণে হও তার জায়া,
গিয়া পুণ্যধাম।
গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম॥"

১৬

শুনি যম বাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখ খানি,
ডাকিছে সাবিত্রী;—"কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল।
দেখা দিয়ে রাখ এ দাসীর প্রাণ,
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ শঙ্কটে ত্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল॥

১৭

"স্বামী পদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্যামী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যদ্যপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে, দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা॥"

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন,
সাবিত্রী সুন্দরী।
মহা গদা তবে চমকে তিমিরে,
শব পদ রেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে,
পতি কোলে করি॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরী যুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে॥

আজি কালি ধর্ম্মনীতির প্রতি সাধারণতঃ লোকের যেরূপ অনাস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেশের আরও কি দশা ঘটিবেক, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। ধর্ম্মই ধর্ম্মনীতির মূল। কিন্তু সে ধর্ম্মের প্রতিও আর লোকের তাদৃশী শ্রদ্ধা নাই। ধর্ম্ম যে ভক্তির সামগ্রী, তাহা এক প্রকার সকলে ভুলিয়া যাইতেছেন। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ মাত্রেই অনেকে চম্‌কিয়া উঠেন। এবং মনে মনে "ধূর্ত্ত, কপটাচারী, প্রতারক" ইত্যাদির আন্দোলন করিতে করিতে শীঘ্রই যাহাতে প্রসঙ্গকারকের সহিত আলাপ বন্ধ অথবা তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বহুকাল হইতে এদেশে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকাতে, তৎপ্রতি লোকের অচলা ভক্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; সকলেই নির্ব্বিরোধে তদনুযায়ী আচার ব্যবহার পরিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দেশ মধ্যে বিদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাগম, এবং তন্নিবন্ধন তাহাদের ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার উত্তম সুযোগ হওয়াতে অনেকে তাঁহাদের প্রত্যেকের অবলম্বিত ধর্ম্মের সহিত আপন আপন ধর্ম্মের তুলনা করিতে সক্ষম হইয়া যাহার যে দোষ ও যে গুণ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এবং কেহ২ অন্য ধর্ম্মের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কেহ বা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। প্রথমোক্ত দলের কোন কথাই নাই; তাঁহারা ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া অকুতোভয়ে সমাজ বন্ধন এক বারেই ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের তদ্রূপ ঘটিতে পারে নাই। সম্প্রতি যদিও অধিকাংশ লোকে এই সম্প্রদায়ের

অনুগামী, তথাপি তন্মধ্যে অনেকেই হিন্দু সমাজের সহিত একবারে সম্পর্ক অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রকৃত মত যাহাই হউক, প্রকাশ্যে হিন্দুর ন্যায় সকল আচার ব্যবহার মান্য করিয়া চলিতে হইতেছে। দৃঢ়তা নাই, এই মাত্র বিশেষ। অনেকে আবার নানা ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া, কোন্ ধর্ম্মে যে মতি স্থির করিবেন, অদ্যাপি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেশের আধুনিক অবস্থা এই রূপ। কিন্তু কোন ধর্ম্ম বিশেষের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, ধর্ম্মনীতির প্রতি সকলেরই সমান শ্রদ্ধা থাকা উচিত। ধর্ম্মনীতি ধর্ম্মের সাধারণ পদার্থ, সকল ধর্ম্মেই ইহার উপদেশ দিয়া থাকে। ধর্ম্মে মতভেদ অপরিহার্য্য, কিন্তু ধর্ম্মনীতিতে তদ্রূপ হইবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কোন ধর্ম্ম মনোনীত করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হইলে, তৎপ্রতি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তি থাকিলে যে ধর্ম্মই অবলম্বন করা যাউক না, তাহাতে ধর্ম্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ভক্তি না থাকিলে ধর্ম্মনীতির প্রতিও শৈথিল্য হয়। এবং এরূপ শৈথিল্য প্রযুক্ত সমাজের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সংপ্রতি বঙ্গীয়সমাজ এই দোষে দূষিত হইতেছে। সকলেরই ইহা মনোযোগ করিয়া দেখা উচিত। এই সময়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা না হইলে পরে কঠিন হইবেক।

আজিকালি সাধারণতঃ নীতির প্রতি লোকের এত দূর উপেক্ষা যে তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে অথবা কেহ কোন প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রায়ই শ্রবণ বা পাঠ যোগ্য হয় না। অনেকে বক্তা বা লেখককে বাতুল বলিয়া উপহাসও করেন। তাঁহাদের মত এই যে, নীতিসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তাহা বহু দিন জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। আর তাহাতে নূতন কিছুই নাই। যদি কেহ কিছু এক্ষণে নূতন লিখিতে পারেন, তাহা হইলে পাঠ করিতে কিম্বা তাহা আলোচনা করিতে কাহারও অনিচ্ছা নাই। এক্ষণে যে নীতিসম্বন্ধে নূতন কিছু উপস্থিত নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি। এক্ষণকার কথার কাজ কি, যে দিন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" এই নীতি সূত্রের মর্ম্ম প্রথম উদ্ভাবিত হয়, সেই দিনে তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, সংক্ষেপে তৎসমুদায় প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে কি আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই? ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের যে ভাগ

আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, যাহা এতদিন দেখিলাম; যদি সেই দেখাতেই তাহার পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, আর জানিবার প্রয়োজন না হয়, তবে নীতিজ্ঞানেরও যে আর প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যখন কোন ক্রমে সঙ্গত কথা হইতে পারে না, তখন নীতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবেক। আর যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, নীতি বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইবার, হইয়া গিয়াছে, কস্মিন্‌কালেও আর কিছু নূতন বাহির হইবেক না, তাহাতেই বা কি? নীতি শুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় নহে, প্রত্যুত সর্ব্বদা আলোচনার বিষয়। তদ্ব্যতীত নীতিশাস্ত্রে যে যে বিষয় উদ্ভাবিত হইয়া রহিয়াছে, সে সকলেরও বিস্তর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে। আমরা যে এই প্রস্তাবে তদ্রূপ কোন প্রয়োজন সাধন করিতে পারিব, এমত বোধ করি না। কিন্তু দোষ ও ভুল ধরিবার ক্ষমতা সাধারণ; আমরা যদি সমাজের কোন দোষ অথবা ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয়, সেটি আমাদের অনর্থক কার্য্য নহে। বিশেষতঃ সমাজের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল; যাহাতে আমাদের মঙ্গল, তাহাতে আমাদের স্বার্থ আছে। বঙ্গীয় সমাজে আমাদের স্বার্থ আছে। যাহাতে আমাদের স্বার্থ আছে, যাহাতে আমাদের কোন প্রকার ইষ্ট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, জানিতে পারিলেই তাহার দোষ আমরা অবশ্যই প্রকাশ করিব। দোষ প্রকাশে দোষের তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়াই প্রকাশ করিব।

যতদিন মানব স্বভাব আছে, তত দিন তাহার দোষও আছে। যিনি যত কেন নীতির উন্নতি করুন না, কেহই কখন এমন প্রত্যাশা করিতে পারে না যে, এ জীবনে তিনি সেই উন্নতির সীমা দেখাইতে পারিবেন। পারিলে তিনি ত দেবতার মধ্যে গণ্য; তখন তাঁহাকে আর মানুষ কে বলে? কিন্তু মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ; উন্নতিশীল, অথচ কোন কালেও একবারে দোষ শূন্য নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলচূড়ামণিরও দোষ আছে, আর সাধারণতঃ 'বড়লোক' এই উপাধিধারী ব্যক্তিরও দোষ আছে; অধিকন্তু সে সকল আবার এমত প্রকারের দোষ যে তদুভয়ের নিকৃষ্টেরাই স্পষ্ট চক্ষুতে তাহা দেখিতে পায়।

মনুষ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যিনি যত ইচ্ছা সাবধান হইয়া চলুন না, কস্মিন্‌কালে তদীয় উত্তর পুরুষের মধ্যে কাহারও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতরণ করিবার সম্ভাবনা আছে,

এমত কিছুতেই বোধ হয় না। আমাদের প্রকৃতির দুই অংশ শরীর ও মনঃ। এ দুইএর কোন না কোন দোষ লইয়াই প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ ইহাতে বিস্ময় জ্ঞান করিবেন না। মানবস্বভাব যে কোনকালেই একবারে নির্দ্দোষ ছিল না, তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে দুর্লক্ষ্য সূত্রেই হউক, দোষ একবার আমাদের প্রকৃতিগত হইলে তাহার ফল যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা এককালীন সাধ্যাতীত বলিয়াই অগত্যা এরূপ বলিতে হইল। ফলতঃ দোষ যে এক প্রকার স্বভাবের ক্ষতি, এক্ষণে আর তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এই ক্ষতি পূরণ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়, কিন্তু কোন অংশেই সহজ ব্যাপার নহে। এমন কি, তদুদ্দেশ্যে সমুদায় জীবন যাপন করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় কি না, সন্দেহ। যাহা হউক, ইহাতে হতাশ্বাস হইবার বিষয় কিছুই নাই। মানব স্বভাবের যেমন দোষ আছে, তেমনি গুণও আছে। আমরা স্বভাবতঃ দোষের বিরোধী, এবং গুণের অভিলাষী। দোষ পরিজ্ঞানমাত্রেই তৎপ্রতি আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়া থাকে; এবং যাহাতে উহা একবারে দূর হয়, সেই ইচ্ছা বলবতী হয়। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে কোনমতেই অলস হওয়া উচিত নহে। আলস্যেই সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। স্বভাবের দোষ যদিও একবারে যায় না, কিন্তু উহার সমূলোৎপাটন সঙ্কল্প করিয়া অনবরত চেষ্টা করিলে, এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলে, কালে উহা আর আছে, এমন বোধও করা যায় না। উহার অনিষ্টপ্রসবিনী শক্তি ধ্বংস করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। তাহা হইলেই এ জীবনে যথেষ্ট করা হইল। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও স্বভাবের কোন দোষ পরিহার করিতে না পারিলে, তজ্জন্য হতাশ বা অসুখী হওয়া উচিত নহে। বরং তখন সন্তুষ্ট চিত্তে গুণ বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা ভাল। গুণ বাহুল্যে দোষ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখা যায়।

মানব স্বভাবের একটি ভয়ানক বিপদ আছে। দোষ প্রবণতাই সেই বিপদ। আমরা সহসা এবং অতি সহজে দোষ করিতে পারি। ফলতঃ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন এ সংসারে দোষ করা এবং দোষ না করা ভিন্ন আমাদের আর কার্য্যই নাই। চিরকাল দোষ সংশোধন করিতে থাকিব, এই উদ্দেশ্যেই যেন আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এ জীবনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া আমাদের আরও একপ্রকার অস্তিত্ব

আছে, এরূপ বিশ্বাস করা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নহে। সে যাহা হউক, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কোন দোষ সংশোধন করিতে পারিলে তাহাতে প্রকৃত সুখ আছে। বোধ হয়, যে দিন আমরা আমাদের সমুদায় দোষ সংশোধন, অর্থাৎ দোষ প্রবণতাকে এককালীন ধ্বংস করিতে পারিব, সে দিন আমাদের স্রষ্টা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী থাকিব না।

আমাদের আরও এক বিপদ আছে। আমরা সম্যক্ প্রকারে আপনি আপনার দোষ দেখিতে পাই না। দোষ সংশোধন করিবার এই এক প্রধান প্রতিবন্ধক। আমাদের স্ব স্ব অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তথাপি আমরা সে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারি না। যিনি যতই কেন আত্ম-পরীক্ষায় তৎপর হউন না, আপনার সকল দোষ আপনি দেখিতে পাইবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয়, আত্ম-বিশ্বাসের যথার্থ সীমা এবং পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই স্বদোষের প্রতি অন্ধতা দূর হয় না। এই জন্য বাহিরের সাহায্য প্রয়োজনীয়, আর এই জন্যই বোধ হয় কোন কবি এই মর্ম্মে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"আপনাতে কি বিশ্বাস, জানিতে বিশেষ
নিজের যতেক দোষ, ত্যজি অভিমান রোষ,
শত্রু মিত্র উভয়ের ধর উপদেশ।"

বস্তুতঃ নিঃসম্বন্ধ এবং শত্রুবৎ ব্যক্তিরাই আমাদের দোষ সর্ব্বাঙ্গীন সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পায়। এবং এরূপ স্থলে তাহারা আমাদের আত্মীয়বন্ধু অপেক্ষাও অধিক হিতকারী।

স্বকীয় চরিত্র সংশোধন এবং স্বভাবের উন্নতি সাধনই আত্ম পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অগ্রে আপনার দোষ সমূহের পরিজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নতুবা যাহার অস্তিত্বই সন্দেহজনক, তাহার সহিত কে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? কিন্তু দোষ পরিজ্ঞান মাত্রেই যে আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল, এরূপ বোধ করা সম্পূর্ণ ভ্রমের কার্য্য। উহার ফললাভ আরও কিছুর সাপেক্ষ ; সেই কিছু অভ্যাস। যখন নিঃসন্দেহে আপনার কোন দোষ বুঝিতে পারা যায়, তখন তৎপ্রতিবিধানার্থ অভ্যাসের শরণ লওয়া আবশ্যক। অনেকদিন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তৎপ্রতি আমাদের এক প্রকার আসক্তি জন্মিয়া যায় ; এই

আসক্তি দৃঢ়, বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইলে অভ্যাস রূপে পরিণত হয়। কোন দোষ পরিহার করিতে হইলে অগ্রে তৎপ্রতি পূর্ব্বের আসক্তি ত্যাগ, এবং তৎপরে অভ্যাস দ্বারা তাহার বিরোধী গুণের আয়ত্ত করা আবশ্যক। অভ্যাস আমাদের সাধারণ শক্তি নহে। যাহা কিছু স্বভাবে ন্যূন, অভ্যাস তাহাও অনেকাংশে পূরণ করিতে পারে। বস্তুতঃ অভ্যাস আমাদের স্বভাবের সহায়, কার্য্যসূত্রের গ্রন্থি। এই গ্রন্থির শিথিলতায় সকল কার্য্যই শিথিল হইয়া যায়। এই গ্রন্থির অবিদ্যমানে নিয়মাবলী কৌতুক মাত্র; কার্য্যকলাপ বিশৃঙ্খলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার শক্তি কিরূপ গুরুতর, এবং প্রকৃতি কিরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, যিনি কখন স্বকীয় বহুকাল ধৃত কোন ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছেন। জড় পদার্থে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলে যেমন সে প্রতিনিয়তই সেই বলের অধীন হইয়া চলিতে থাকে; এবং যথেষ্ট প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এক ভাবে চলে, একবার অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়িলে মানব প্রকৃতিরও সেই রূপ অবস্থা ঘটে। তখন ইহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও সহজে পারিবার সাধ্য কি! তজ্জন্য মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অধিক কি, বহুকালের অভ্যাস হইলে চরমকাল ভিন্ন প্রায়ই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

এই শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মনোমধ্যে এই এক প্রবোধের উদয় হয়, এবং তজ্জনিত এক চমৎকার আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায় যে, যে জ্ঞান পথাতীত মহাপুরুষ, যে অনাদি অনন্ত সময় ও স্থান ব্যাপী এই বিশ্বের নিয়ন্তা মানবরূপ আশ্চর্য্য জীবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্ব-স্বভাব প্রদান করিয়াছেন, তিনি সেই স্বভাব দোষ শূন্য নহে জানিয়া তাহাকে বাধ্যতার নিতান্ত অনধীন করিয়া দেন নাই। এই বাধ্যতাই অভ্যাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। সচরাচর আমরা যে সকল সদ্‌গুণের কামনা করিয়া থাকি, তাহা প্রায়ই অভ্যাস দ্বারা লব্ধ হইতে পারে। অধিক কি, সংসারের মধ্যে অদ্বিতীয় প্রার্থনা মনের সুখ; মনের সুখ না থাকিলে কেহ কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারেন না; কিন্তু সে সুখও অভ্যাসের অধীন। তদ্ব্যতীত বিদ্যা, ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি যে সকল প্রার্থনীয় বস্তু আছে, সে সকল ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি পরিচালন এবং আপন কর্ত্তব্য

সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি পরিচালন এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনেও আমাদিগকে কতদূর অভ্যাসের অধীন হইয়া চলিতে হয়। অভ্যাস ব্যতীত আর কিসে কার্য্যের স্থিরতা ও সুধারা সম্পাদন করিতে পারে? ফলতঃ আমাদের প্রকৃতির সমুদায় উৎকৃষ্ট শক্তির মধ্যে অভ্যাস একটী সাধারণ নহে। সকলেরই ইহা অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত, এবং শৈশবাবধি যাহাতে নীতি ও সদ্গুণের অভ্যাস জন্মে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। স্বভাবের দোষ গুণ তাদৃশ তিরস্কারের যোগ্য নহে। যাহা স্বভাবের দোষ, তাহা কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয়; কেননা তাহা আমাদের ইচ্ছা পূর্ব্বক হয় নাই। যাহা অভ্যাসের দোষ, তাহা মার্জ্জনীয় নহে, কারণ আমরা স্বয়ংই সে দোষের কর্ত্তা। যাঁহার স্বভাব সিদ্ধ কোন মহদ্গুণ থাকে, আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি বহু যত্নে ও বহু কষ্টে কুঅভ্যাস রূপ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছেদন করিয়া সদ্গুণ ভূষিত হন, তাঁহারই যথার্থ পৌরুষ। তিনিই আমাদের অধিকতর এবং প্রকৃত প্রশংসার পাত্র।

সদিচ্ছা এবং সৎপ্রবৃত্তি মানব জাতির স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লোকে সাধারণতঃ সত্যপ্রিয়, সদ্গুণাকাংক্ষী, হিতৈষী, রীতি নীতির উৎকর্ষ-সাধনে ইচ্ছুক, ধর্ম্মভীত এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুণ থাকাতে মনুষ্য নামের এত গৌরব, সে সকলেরই অভিলাষী। ইহার বিরুদ্ধে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, বলিতে পারেন; কিন্তু ইহা সাধারণের ব্যবহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। স্বশ্রেণীস্থ প্রাণীবর্গের পীড়ন ভয়ে অভিভূত না হইলে, যে দস্যু, সে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে স্বীকার করে, তাহার কার্য্য অতি গর্হিত; পরের সম্পত্তি অপহরণ করা অনুচিত; যে গুপ্ত ঘাতক, সে স্বীকার করে, তাহার মত নরাধম পৃথিবীতে আর নাই। অন্য দিকে প্রতারক, প্রতারণা; এবং বিশ্বনিন্দুক, পরনিন্দা; দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ফলতঃ এই রূপ সকল দোষী ব্যক্তিই আপন আপন দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। ইহাতে কেহ বিস্মিত হইবেন না। এরূপ সহজে দোষ স্বীকার অযৌক্তিক নহে। যাবৎ অন্যের নিকট হইতে আপন ব্যবহারের তুল্য প্রতিদান না পাওয়া যায়, অথবা অন্যের ব্যবহার দ্বারা আপন স্বার্থের কোন প্রকার হানি না হয়, তাবৎ কেহ ব্যবহারের দোষাদোষ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এক্ষণে আর কোন সামাজিক ব্যক্তির সে বোধ জন্মিতে বাকি আছে? দোষী

ব্যক্তি আপনার গূঢ় স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে আপনাকে দোষী ভাবিতে চাহে না, কিন্তু আপনার ব্যবহার যে দূষণীয়, অভিপ্রায় কোন গতিকে ব্যক্ত হইলে এবং অত্যাচারের ভয় না থাকিলে, তাহা অনায়াসে স্বীকার করে। অধিকন্তু দুষ্ক্রিয়া জনিত অন্তরের অসুখ নিতান্ত অপরিহার্য্য। দোষী ব্যক্তি যতই কপট ভাবাবলম্বন করুক না, সে অসুখ তাহার অন্তর ভেদ করিয়া বাহ্য অবয়বে প্রকাশ পায়! অনেক সময়ে তাহার স্বার্থপরতাতেও তাহার দোষ গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মত এই যে, অভ্যাস প্রভাবে অসৎকার্য্য জনিত আত্মগ্লানিও কাল ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একবারে বিলুপ্ত হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অভ্যাসের গুণে কখন কখন বিস্মৃত প্রায় হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কি? সময়ে সময়ে সে আত্ম-গ্লানি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় কন্দর দাহন করে, কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না।

অন্যের মনের কথা জানিতে হইলে আমাদের স্ব স্ব মনই আলোচনার বিষয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন সদুপায় নাই। আমি স্বয়ং যখন জানিতে পারিতেছি যে, আমার এমন অনেক দোষ আছে, যাহা অভ্যাস সিদ্ধ, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও অদ্যাপি তাহা পরিহার করিতে পারি নাই, এবং তজ্জনিত অপ্রসন্নতা মধ্যে মধ্যে আমার চিত্তের শান্তি হরণ করে, নিবারণ করিতে পারি না; তখন কেননা বিশ্বাস করিব যে, যত বড় রকমের অথবা যত ভিন্ন প্রকারের দোষই হউক না, অন্যের সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে?

যাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দোষ হইতে চিত্তের যে অপ্রসন্নতা জন্মে, তাহা হইতে কি উপলব্ধি হইতেছে না যে, মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ সত্য, ধর্ম্ম ইত্যাদির বিদ্বেষী নহে? অজ্ঞতা, অভ্যাস, কুসংসর্গ ও ইত্যাকার অন্যান্য প্রতিকূল কারণেই তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যাহারা অজ্ঞতা প্রযুক্ত দোষী, তাহারা কোন মতেই নিন্দাভাজন নহে; প্রত্যুত দয়ার পাত্র। যে কার্য্য দূষ্য, তাহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিলে কাহারও আর তৎপ্রতি শ্রদ্ধা থাকে না, সুতরাং শীঘ্রই তাহা পরিত্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু কে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? আমরা ইহাই বলিতে চাহি যে, অনুকূল কারণ বশতঃ যে যে ব্যক্তি প্রচুর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এবং স্ব স্ব নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সদয়

হইলে অসৎকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারেন। উপচিকীর্ষাবৃত্তি পরিচালনের যদি কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে, তবে এই কার্য্যতেই আছে। কিন্তু অনেকে তাহা না করিয়া আবার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করেন; তাঁহারা দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগকে অন্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করেন। এই ঘৃণাই তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল হয়। তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত পরিত্যক্ত জানিয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দিন দিন দুঃখ স্রোতঃ বৃদ্ধি করিতে থাকে।

পাপীকে সাধু করা বড় সহজ কথা নয়। ইহাতে অনেক যত্ন, অনেক সতর্কতা, মানব প্রকৃতির অনেক জ্ঞান থাকা চাই। এমন কি, কিছু ক্ষণের নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। এসংসারে প্রেমই হৃদয় রাজ্যের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কি শিশু, কি যুবা; কি প্রবীণ, কি বৃদ্ধ; কি ধনী, কি নির্ধন; কি পাপী, কি সাধু; কি বিদ্বান্, কি মূর্খ; কি শত্রু, কি মিত্র; সকলেই এক বাক্যে ভালবাসার দাস। অন্যের অন্তঃকরণে প্রভুত্ব করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভালবাসা দ্বারাই তাহার পথ করিতে হয়, নতুবা উপায়ান্তর নাই। অসাধু ব্যক্তিকে ভাল না বাসিয়া উপদেশ বা সৎপরামর্শ দান করিলে কি হইবে? হয়ত সে উপদেশ দাতাকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, এবং তিনি যে প্রকারান্তরে তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। সুতরাং তাঁহার উপদেশ বাণীতে তাহার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয়, এই নিমিত্তেই ইংলণ্ডীয় কোন প্রসিদ্ধ নীতিবেত্তা লিখিয়াছেন যে, কাহাকে উপদেশ দিতে হইলে এরূপ ভাবে দেওয়া আবশ্যক, যেন সে বুঝিতে পারে, সেই উপদেশে সে নিজেই নিজের উপদেষ্টা হইতেছে, তজ্জন্য অন্য কেহ তাহাকে প্রবৃত্তি দিতেছে না। এই রূপ পরোক্ষ শিক্ষাদানেরও উদ্দেশ্য ভালবাসা দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে। ব্যক্তি মাত্রেরই নৈসর্গিক ইচ্ছা এই যে, অন্য ব্যক্তি তাহার সম সুখ দুঃখ ভাগী হয়। উপদেশগৃহীতা যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার সহিত উপদেশ দাতার সহৃদয়তা আছে, তাহা হইলে উপদেশ গ্রহণে তাহার আর আপত্তি থাকে না। সে তাঁহাকে আপনার সহিত সাধারণ অবস্থাপন্ন বোধ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, এবং প্রকৃতই যে তিনি তাহার হিতাকাংক্ষী, বুঝিতে পারে। তখন আর তদীয় ব্যবহার তাহার অসহনীয় নহে। কিন্তু এই সহৃদয়তার উৎপত্তি

কোথায় ? ভালবাসা ব্যতীত আর কিসে অন্যের অন্তঃকরণের দ্বার উন্মোচন করিতে পারে ? বস্তুতঃ সহৃদয়তা না থাকিলে যে পরের প্রকৃত উপকার করা যায় না, এবং সর্ব্বময় স্নেহের অভাবে যে সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণও থাকা না থাকা সমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর গুণে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব কিসে হয়, এদেশীয় নব্যগণ ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেছেন। বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে তাঁহাদের মহৎ হইবার ইচ্ছা কত বলবতী দেখা যায়। তখন বোধ হয়, যেন অতি সামান্য সদ্‌গুণেরও প্রশংসা তাঁহারা এক মুখে করিয়া উঠিতে পারেন না, ধর্ম্মনীতি সকল মূর্ত্তিমতী হইয়াই যেন তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতে থাকে। সদ্‌গুণের প্রতি তাঁহাদের তাৎকালিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখিলে কাহার না মনে হয় যে, ইহারাই দুর্লভ মানব নাম সার্থক করিতে পারিবেন ; ইহারা কার্য্যের রঙ্গ ভূমি স্বরূপ সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে না জানি লোকের মনে সুখ স্রোতঃ কত বেগেই উচ্ছলিত হইয়া উঠিবেক ; না জানি তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ সদ্ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত স্বদেশবাসিরা তাঁহাদিগকে প্রশংসা গীত ধ্বনিতে সন্তুষ্ট করিতে কতই প্রতিযোগিতা দেখাইবেক ! কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! লোকে অনতিবিলম্বেই বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এসকল প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। কৃতবিদ্য মহাশয়েরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতেই স্বতন্ত্র প্রাণী হইয়া বসেন। তখন তাঁহারা হয় পূর্ব্বাদৃত ধর্ম্মনীতি সকল সে কালের চিন্তাশীল বায়ান্তরা পণ্ডিতদিগের বুঝিবার ভুল, না হয় বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিষয়, স্থির করিয়া সে সকল বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জন দিতে চেষ্টা পান ; এবং কখন ইচ্ছান্ধতা দ্বারা, কখন বা অজ্ঞাতসারে দিন দিন পাপের পথ প্রশস্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের এতদ্রূপ অসঙ্গত এবং অদ্ভুত ব্যবহার দর্শনে জন সাধারণের মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে ; কেহ কেহ তাঁহাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে কি হইবে ? কি কারণে তাঁহারা এরূপ হইতেছেন, তাহাই অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক।

চিন্তাশীলতা এবং কার্য্যপরতা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু এ দুইএর মধ্যে প্রকারগত বিভিন্নতা এত যে কখন কখন একটি অপরটির

বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি অধিক চিন্তাশীল, সে কার্য্যপরতায় ন্যূন; যে অধিক কার্য্যপর, সে চিন্তাশীলতায় ন্যূন। কিন্তু এ দুইএর তুল্য সম্মিলন ব্যতীত প্রকৃত মহত্ত্ব লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। ইউরোপীয় জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভূয়সী উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিন্তা ও কার্য্য উভয়ই মানব প্রকৃতির সাধারণ কার্য্য; একটি অন্তরের আর একটি বাহিরের। উভয়ই স্বতঃ পরিচালিত হয়। কিন্তু বিবেচনার সাহায্য ব্যতীত আমরা ইহাদের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারি না। আমরা বিচারশক্তির সহায়তায় স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া ভাল মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করি। মনে ধারণা জন্মিলে তখন মন্দ এবং অকর্ত্তব্য পরিত্যাগ, এবং ভাল ও কর্ত্তব্য, কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছা সফল করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা অনায়াসে ভাবা যায়, কাজে তাহা করা বড় কঠিন। আমাদের সদিচ্ছার কার্য্যে অনেক বিঘ্ন আছে,—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। সদিচ্ছা এবং তদনুযায়ী কার্য্যের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান না থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের সে বাঞ্ছা পূরণ করেন নাই। তিনি যে সদভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ কি? আর যখন আমাদের আত্ম-শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন, তখন সে বাঞ্ছা পূরণের প্রয়োজনও নাই। শ্রেয়ঃ কার্য্য সম্পাদনার্থ সঙ্কল্প ও চেষ্টার অসাধারণ দৃঢ়তা থাকা চাই; আর যদি পূর্ব্বের কোন মন্দ অভ্যাস বিরোধী হয়, কিংবা কোন বহির্বিষয়ে বাধা জন্মায়, সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। নতুবা সফলমনোরথ হইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ দৃঢ় যত্নসহকারে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারিলেও সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক আবশ্যক মতে পুনঃ পুনঃ সদিচ্ছার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাবৎ উহা সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হয়, তাবৎ আপন ক্ষমতাতে বিশ্বাস করা অনুচিত। অভ্যাস জন্মিলে আর ভাবনা নাই; তখন আর সৎকার্য্য সমূহ আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সে গুলি যেন আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায়। প্রতিবন্ধক তখন হয়, একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়, না হয় পূর্ব্বের মত তত দুরাক্রমণীয় বোধ হয় না।

এদেশের লোক কিরূপ চিন্তাশীল, এবং কিরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাঠ্যাবস্থাতেই পাওয়া গিয়া থাকে। সে সময়ে

উত্তম অভ্যাসটি জন্মিলে আর কোন আপদ থাকে না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কি ? বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃতই বিদ্যার অনুরোধে কি না, বলিতে চাহি না, কিন্তু সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়া থাকে। কিন্তু তৎকালীন বৈষয়িক ব্যাপারে সম্বন্ধ-বিহীন থাকাতে জ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক হয় না ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্তই থাকি। পরে সময় ক্রমে যখন বিষয় বর্ত্মে উপস্থিত হইতে হয়, তখনই আমরা পূর্ব্বৌদাস্যের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে যে সুনীতির শিক্ষা পাওয়া যায়, পূর্ব্ব হইতে মনোমধ্যে সে সমুদায়ের উচিত ধারণা হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা শৈথিল্য প্রযুক্ত তৎপরিচালনে বিরত থাকার কারণেই হউক, এক্ষণে শীঘ্রই সে সমস্ত আমাদের স্মৃতি অতিক্রম করিয়া যায়। স্ব স্ব আলয় নীতি অভ্যাসের উচিত স্থান ; কিন্তু আজিও আমাদের দেশে সে সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, ইহাই কৃত্যবিদ্যদিগের ব্যবহারগত দোষের একমাত্র কারণ হইলে তত দুঃখের বিষয় হইত না। কিন্তু অধুনা আর একটি গুরুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে। জটিল মনোবিজ্ঞান এবং অস্থির নীতিশাস্ত্রই এই কারণের প্রসূতি। এই দুই শাস্ত্রের অযথা ব্যবহারেই নব্যদিগের মহা-প্রমাদ ঘটিতেছে। সে কালে লোকের এত বিদ্যার দৌড় ছিল না, কে কাহাকে শিখাইবে ? সুতরাং স্বভাবকে গুরু মানিয়া বিনীতভাবে ও সরলচিত্তে সকলে তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত। কিন্তু এক্ষণে ত আর সে দিন নাই, সে জ্ঞানের অভাবও নাই, যে লোকে সে প্রাচীন গুরুকে মান্য করিয়া চলিবে। অভিনব শিক্ষাপ্রণালী এবং অভিনব গ্রন্থকারদিগের কৃপায় আজিকালি জ্ঞানের ভাণ্ডার সদ্যপ্রসূত শিশুর করস্থ। সুতরাং এমন সুবিধা থাকিতে কে আর স্বভাবকে কষ্ট দিতে যায় ? পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা স্বভাবের উপদেশ বাণী গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রত্যুত উহাতে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতেন। বিশ্বাস করা তাঁহাদের এক রোগ ছিল। কিন্তু অধুনা যে দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কি আর তদ্রূপ সহজ আচরণ সম্ভবে ? এক্ষণে তর্কদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে কিছুই বিশ্বাস যোগ্য নহে। এমন কি, কেহ এতদূর কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন যে, স্বকীয় স্রষ্টাতে, স্বকীয় আবাস ভূমি জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তার অস্তিত্বেও সন্দেহ করিতেছেন। আরও কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে

আপনার অস্তিত্বও ভুলিবেন। সেও বরং ভাল, কিন্তু অন্য কাহারও অস্তিত্বে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হইবেক।

আমাদের জ্ঞান অনন্ত বা অসীম নহে। ইহার নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমায় উত্তীর্ণ হইলে আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা বৃথা। যিনি জ্ঞান-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া এবং মানুষিক অবস্থা ভুলিয়া সেই সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হন, তাঁহাকে ত্বরায় তাহার প্রতিফল পাইতে হয়। তিনি একপদেই পূর্ব্বার্জ্জিত সর্ব্বস্ব হারান। এমত বলিতে চাহি না যে, পরমেশ্বরকে অমান্য করিলে তিনি কুপিত হইয়া তাহার উচিত দণ্ডবিধান করিবেন। বরং যদি পরমেশ্বর থাকেন, তাহা হইলে আমাদের এই বিবেচনা করা উচিত, তাঁহার প্রকৃতি কোন অংশেই মানবপ্রকৃতির তুল্য নহে। তিনি রোষ পরবশ অথবা প্রত্যক্ষ শাসনাভিলাষী হইবেন, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। অসীম আধিপত্য; ইচ্ছা করিলে সৃষ্টকে অসৃষ্ট করিতে পারেন। তবে সামান্য মানবের অবমাননায় তাঁহার ভয় কি? তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, যাহা তাহার ভাল লাগে, করুক। সহস্র চেষ্টা করিলেও সে যে তাঁহার অব্যর্থ অভিপ্রায়ের এক তিলও অন্যথা করিতে পারিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব যদি কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে তুচ্ছ করেন, করুন। কিন্তু পরমেশ্বরকে অমান্য করিতে গিয়া যদি সাধারণের কোন অহিত করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ছাড়িব না। আমরা যদি বুঝিতে পারি, যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে যত লাভ, অস্বীকার করাতে তাহার কিছুই নাই, প্রত্যুত বিস্তর ক্ষতি, তাহা হইলে কেননা আমরা তাহা স্বীকার করিব? আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, ভক্তিবৃত্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটি অতিরিক্ত সুখের আকর, তবে কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিব? সাধারণ জন-সমাজের এইমত। আমাদের সুখের বিষয় এই যে, যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্পমাত্র; সমুদায় মানব সমাজের কোটি অংশের একাংশ হইবে কি না, সন্দেহ। কিন্তু যদি, কখন তাঁহাদের দল পুষ্ট দেখা যায়, তবে আশঙ্কার বিষয় বটে। কিন্তু তাহা যে মহাপ্রলয়ের অধিক পূর্ব্বে হইবেক, এমত বিশ্বাস হয় না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকের কুতর্ক হেতু যদি ধর্ম্মনীতির ক্ষতি হয়, তাহা লোকে সহ্য করিবে না। কারণ ধর্ম্মনীতির ক্ষতিতে সাধারণের ক্ষতি

অপরিহার্য্য। অতএব ঈশ্বরের প্রতি যিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করুন, ধর্ম্মনীতির প্রতি তদ্রূপ করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকে পারিবে না। অধিকন্তু কোনটি ধর্ম্মনীতি, কোন্‌টি নহে, একথা লইয়াও তিনি অধিককাল তর্কবিতর্ক করিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ লোকে যাহাকে ধর্ম্মনীতি বলিয়া মান্য করে, তাহাকেও তাহাই করিতে হইবেক। সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে চলিলে পদে২ পদস্খলনের সম্ভাবনা। আমাদের পদ সর্ব্বদা মৃত্তিকাসংলগ্ন, আমরা পৃথিবীর পদার্থ, একথা স্মরণ রাখিয়া নতশিরে চলা ভাল। আর ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এসংসার আমাদের কার্য্যভবন, বিশ্রামভবন নহে। আমরা স্ব স্ব মত স্থির করিবার নিমিত্ত অধিক সময় পাইতেছি না। আজি কালি নব্য সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাবে ধর্ম্মনীতি লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, সে ভাবে এজীবন থাকিতে তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এতকাল পর্য্যন্ত যদি ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মনীতির যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া থাকে, তবে যে আর মানব শরীরে মনুষ্যের যুক্তির উহা সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আর যখন ইহাও দেখা যাই-তেছে যে, সম্পূর্ণ সারবান্ গণিত শাস্ত্রের মধ্যে কোন প্রতিজ্ঞাই আদ্যন্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না, প্রথমতঃ কয়েকটি স্বভাবের আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তখন নীতিশাস্ত্রে অন্যরূপ করিবার প্রয়োজন কি? গণিতের সত্য কি আমরা বিশ্বাস করি না? তবে ধর্ম্মনীতির সত্য বিশ্বাস করিতে আপত্তি কেন? স্বীকারের উপরেই যুক্তির কার্য্য, যুক্তির উপরে স্বীকার নহে। বিশ্বাসে সান্ত্বনা আছে, অবিশ্বাসে শান্তিও নাই।

যাহা হউক, সর্ব্বশেষে নিরীশ্বরবাদীর মতপ্রিয় দেশীয় কৃতবিদ্যগণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা আপন আপন অবস্থার বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। আজি কালি তাঁহারাই সমাজের গরিমা, তাঁহারাই সমাজের বিশিষ্ট লোক; সাধারণের চক্ষু নিয়ত তাঁহাদের উপরেই রহিয়াছে। তাঁহাদের দোষ গুণ লোকে যত লক্ষ্য করিয়া দেখে, এত আর কাহারই নহে। তাঁহারা এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন যে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত যাহাই হউক, লোকে তাহা বুঝিতে না পারিলে কোন সাধারণ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; কিন্তু এ তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। লোকে তাঁহাদের অতি গোপনীয় কার্য্যেরও সংবাদ লইয়া থাকে। তাঁহারা আপন

আপন গৃহে যেরূপ আচরণ করেন, তাহারা সে সকলও জানিতে পায়। এবং অতি মনোযোগ সহকারে তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। ধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহাদের কোন আস্থা নাই, ইহা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেতেই প্রকাশ পায়। ইহাতে তাঁহারা কি মনে করেন, লোকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছে? সন্তুষ্ট ত কোন ক্রমেই নহে, প্রত্যুত তাঁহাদের প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধারও হ্রাস হইতেছে। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসও থাকিবে না। অতএব আর যেন তাঁহারা ধর্ম্মে এরূপ উদাসীন না থাকেন। ঐশিক বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের নিগূঢ় সন্ধান বুঝিবার সাধ্য কাহারও হইবেক না। তজ্জন্য পরলোক পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেক। ইহলোকে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহাতেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তৎসম্পাদনার্থে যত্ন করা আবশ্যক। আর আমাদের এমতও বোধ হয় যে, যিনি যত সন্দিহান হউন, সত্য সত্যই কেহ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি সন্দেহই করেন, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, তাহা অপেক্ষা বিশ্বাস কি সর্ব্বাংশে ভাল নয়? সে যাহা হউক, যাবৎ মানব সমাজে থাকিতে হইবেক, তাবৎ কেহই ধর্ম্মনীতি অবহেলন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে ধর্ম্মনীতির প্রতি দৃঢ়তা থাকে না। সুতরাং সকলকেই ধর্ম্মে মতি স্থির করিতে হইবেক। অন্যথা কেহই মনের সুখে থাকিতে পারিবেন না।

কাব্যমালা। কলিকাতা। বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানী।

কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় আশু মধুর। এই মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখন যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তায় বাসি। তিনি নাম পত্রে বররুচি হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

——————চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতা গুলিন সকলই আদিরস ঘটিত। তাহা হইলেই দোষের হইল না। যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতক গুলিন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতী প্রেম—যাহা সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরস ঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন, এই রূপ কথা কহিলেই, লোকে ইংরাজিওয়ালা এবং সুসভ্য বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ড মূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিত্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চক্ষে সকলই সমল। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কুক্রিয়ার অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে।

আমরা অনেক বার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণী মধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্ম্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থখানি সেই মহাদোষে দূষিত। "কোন প্রৌঢ়া নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি।" "পয়োধর।" ইত্যাদি কবিতাগুলি এই কথার প্রতিপোষক।

একে ত রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন। কাব্য মধ্যে এ রসেরও নূতন কথা কিছু দেখিলাম না। সকলই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। গ্রন্থকার নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন ;—

"যদিও এ ফুলচয়, সমুদয় নব নয়
রসপূর্ণ বটে কি না তোমারে বুঝাই"।

২ পৃষ্ঠা।

তবে গ্রন্থকার এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতাগুলি না লিখিয়া, পূর্ব্ব কবিদিগের উপর বরাত দিলেই গোল মিটিত।

———

প্রথম বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষ কি ?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। এমন কোনই মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষ কামক্রোধাদির অস্পর্শ। জ্ঞানিব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে, সেই সকল রিপু কর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে২ প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন, এবং সংযত করিয়া থাকেন; সেই ব্যক্তি মহাত্মা। কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহা তেজস্বী; এক বার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব, ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম, দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্র বিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগ শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্ত সংযম পক্ষে, প্রথমতঃ চিত্তসংযমের প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের সক্ষমতা আবশ্যক। ইহার মধ্যে ক্ষমতা প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্ত-সংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখন হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এসকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ম্বদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরকল্প। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান; অনুগতের প্রতিপালক, শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান; বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখন এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধ লোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখন লোভে পড়েন নাই, কেননা কখন কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্য তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; অথচ পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সম্বাদ গৃহ মধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল।

নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। বড়২ দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তুলাভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌২ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খানসামারা গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে মাঠাকুরাণীকে ফিরাইতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, কোথাও বা গাছ তলায় কমিটি করিয়া তামাকু পুড়াইতে লাগিল। ভদ্র লোকেরাও বারোইয়ারি আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায় কচকচি ঠাকুরের টোলে, এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাট গুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালক মহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাঁধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র, এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখন পথ হাটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোওয়া আধক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষন রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া২ বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সম্বাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপে দিনমান গেল।

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখন পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাটী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্র বাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে২ সেই খানে আসিয়া তাহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল;—

"আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্য্যমুখী তখন ক্রোধ ভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে

দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সম্বাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্য-মুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে তল্লাস করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না, বাছা।"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মা ঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোনা দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ী ভাবিল, "সত্যি ত বটে।"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে২ অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফল লাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্য সিদ্ধ হইল না—অথচ অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারিরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরিব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমক হালাল হিন্দুস্থানীরা "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পালকী বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।" আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিলে, যেমন ছিল, তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন, কিন্তু—নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে

অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ কহিলেন, "না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভাল বাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। 'বাসি বই কি?' এ যে বালক ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না। আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভাল বাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে২ উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিলনা যে, তাহার কাছে রোদন করেন। কমলমণির আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া, স্নেহময়ী, কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। যে দিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি, কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে," অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিষবৃক্ষের ফল

হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা, সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটী খোঁড়ে, কহিনূর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কহিনূর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণিত করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন আমি সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভাল বাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখন ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজি আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি

হরদেব ঘোষালের উত্তর

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোকের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমত গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না—কেননা তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেক গুলিন ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদন শরজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার, বসন্ত সহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্ম মৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা, ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি ;—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গ লিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মায়। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম বিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয় ; সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, মাদাম্ দেস্তাল্ ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভাল বাসারও মূল এইরূপ ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন কখন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিত পরিতৃপ্তি নাই। কেননা

রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ ; গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন২ হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে,—কেননা উভয়ের দ্বারা আসঙ্গ লিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্রই জন্মে ; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গফল বদ্ধমূল হইলে রূপ থাকা না থাকা সমান, রূপবান ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ সমান হয়। কুরূপ স্বামী বা কুরূপ স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয়, যে অন্য সকল বৃত্তি তদ্দারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্ত কাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ীপ্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করি না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন ? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দ-নন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজমোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভাল বাসেন। ভাল বাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা ভালবাসাতেই মানুষের এক মাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্য জাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্য মাত্রে পরস্পরে ভাল বাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না। ইতি।

নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে

সৎপরামর্শ, তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সম্বাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার কল্পনা করিয়াছি। আমিও গৃহ ত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব ; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃ-শূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব ? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।

নগেন্দ্র নাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেই রূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্ত-দিগের অন্তঃপুরে রহিলেন আর হীরা দাসী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপ সমুজ্জ্বল, বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয় ; এই মহাপুরী সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া এক দিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটী পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে ; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বন দাহ কালীন শাবক সহিত পক্ষীনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই ; তখন বিহঙ্গিনী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে২ সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেই রূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমত অনন্ত সাগরে অতল জলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপনীয়া হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইন

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করা, বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই, রাজত্ব। রাজা বলবান হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যক। যদি কোন রাজ্যে দুর্ব্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্ত্তব্য সাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ। যদি এদেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত; কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্য বিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্দারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দু রাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত; কেননা সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র।

প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার গৌরব। য়ূনানী রাজগণের নামই ছিল "Tyrant" সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজা কর্ত্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স, প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার কর সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারির সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কণ্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের সেই অবস্থা। তাহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ক্রটি ছিল না; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস মহা ভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই, জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না

হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্‌টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামির নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী, কেননা এ বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী"।

কর্ণওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরেল যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।" *

"বিধিবদ্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ শালে কোর্ট অব ডিরেক্‌টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ শালে কাম্বেল নামক এক জন বিচক্ষণ রাজ কর্ম্মচারী লিখিলেন, "এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্য ভূস্বামী (প্রজা) দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কর্ম্ম করেন নাই।"

* ১৭৯৩ শালের ১ আইনের ৮ ধারা।

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরো দুর্ব্বল করিলেন, বলবানকে আরও বলবান করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্‌টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন, * সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ব্ব কালের বিখ্যাত "পঞ্জম।" যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্জম" করিত, এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। "কোরোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেম, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।* জমীদার চির-কালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্‌টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। †

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে, বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ শালে কর্ণওয়ালিস যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড কানিঙ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই

---

* Revenue Letter to Bengal 9th May, 1821 para 54.

* সন ১৭৯৩ শালের ১৮ আইনের দুই ধারা।

† Revenue Letter 9th May, 1821 para 54.

পূরণও শেষ। তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৫৯ শালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপি মাত্র। ✻

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা, হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন!

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে২ প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত, কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে২ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আশিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার রাজ্য লোপ

✻ এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয়প্রজা" (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের এ অংশের কতক২ সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।

হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ২ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্ব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালি কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্দ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে লইয়া উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাস প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে

গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয়, আর এক জন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমী খানি দখল করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্য পরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্য্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহারা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন একজন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না, যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচার কার্য্য থাকায়, দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি বড় কপাল জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্য গুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদির কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প—যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে এক জন বৈ নাই। সুতরাং

মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপি বাহুল্যের, এবং অত্যন্ত কার্য্য বাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল; সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্পন্নযোগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘুণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন২ যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে চোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে২ কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলা গিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন২ পণ্য দ্রব্যের প্রশংসা করিতে২ অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। গোমস্তা সেশ্যনের বিচারে অর্পিত হইল। সেশ্যনের বিচারে প্রতিবাদী সাক্ষিদিগের সত্য কথায় অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষির জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে২ নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ

ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কি রূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্য্য" দিতে-ছিলেন, তখন তাঁহারা মনে২ জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুল গুলিন গণিতে-ছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, "সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে," তাহাই কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ—কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই ; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয়ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটী লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম—কেননা জুরির বিচার হইয়াছে—বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান আইনের এই রূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এ দেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচার কার্য্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেননা তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশের ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। বিচার কার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ২ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দামাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,—তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচারকের দ্বারা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্প সংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই ; যাঁহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপার্জ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক,

বিচারকের পদের প্রার্থী হয়েন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সে অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট অনেক সময়ে বিশেষ অনিষ্ট-কর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচারপদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;—বলেন, এই রূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এই রূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক—কখন২ হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। হাই-কোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞ-দিগের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর, **"সমাজ-দর্পণ"** নামে এক খানি অভিনব সম্বাদ-পত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে **"বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ"** এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি, কেননা লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেই রূপ বিবেচনা করেন, বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

"একেই ত দশ শালা বন্দোবস্তের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালির অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?"

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি, যে দশ শালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে, বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলের মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন

হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই নাই। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্ট-জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোন রূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনুকূলে এ রূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে তদ্দারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ত্ববান করিয়াছেন, এবং কর বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দূষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায় সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন ;—

"আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। ** সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এতদিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে

বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। **"বঙ্গদেশের কৃষকের"** প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন২ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিকদিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এ দেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরের দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয়, সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মন চাউল কিনিয়া, বিলাতে পাঁচ টাকা মন বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে, যে এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের

টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রীগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতি সূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদ পূর্ব্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কব্‌ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্‌সে তাহা বিশেষ রূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখনও ইউরোপে অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্লের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দুরূহতত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ ভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটা কত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতী থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্ত্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতিই নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক বিদেশে পলায়ন

করিল ? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই, কেননা উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি ? যে খানে কাহারও ক্ষতি নাই, সে খানে দেশের অনিষ্ট কি ?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তি-কারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই ? সে যদি থান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐ রূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেননা বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজ নীতির আর একটি দুর্ব্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জ্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না ; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না ; সুতরাং লাভে নোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এ জন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাঁতির তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন ? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন।

যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কই?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে, কেননা অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশের টাকা কমিল বই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতক গুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই২ সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেই রূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতক গুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই২ সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতক গুলি তাঁতির ব্যবসায় হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, বেশী লোকের চাস করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাসীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ব্ব ব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার্ ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি

নাই ; কেননা ধানের পরিবর্ত্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এই রূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এ রূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থ হানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা জাত করিল। তাহার আর নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব হইল ?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এদেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অর্থ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধন হানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধন হানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেননা যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা

মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেলওয়ে গুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার্ ?

বিদেশীয় বণিকদিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু২ বর্ত্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজ কর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র। বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর২ বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, "যদি মহাত্মা কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায় ?"

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন ? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত ?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার এক মাত্র কারণ যে তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ২ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন ; কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে, বিবেচনা করেন না। লক্ষ২ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায় ; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে২

ছড়ান ভাল ? পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, একস্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বরতা-জনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই রূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে এই দুই চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশ শুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না, সকলেই সুখ সচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এদেশে প্রায় তাঁহার গর্দ্দভ জন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জন সাধারণের সচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মৃদু২ কথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র গর্জ্জন গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকাদির উন্নতি হইয়া থাকে। এথেন্স (Athens), স্পেন ও ইংলণ্ডের নাটকাদি তাহার প্রমাণ স্থান। এবং কথিত আছে যে, ভারতবর্ষেও হিন্দু রাজগণের সময়ে নাটকাদি বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমাজের আরম্ভ মাত্রেই কাব্যরসানুভব শক্তি জন্মায় না ; তাহা প্রথমে অতি রূঢ় অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে মার্জ্জিতা হয়। প্রথম অবস্থায় রচনার অর্থ বা ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দ মিল থাকিলেই হইল, যথা ;—

শান্তিপুরের খাসা খই,
বর্দ্ধমানের বসা দই,
বঁধু আমি তোমা বই,
আর কারো নই।

এইরূপ রচনা এক সময়ে সমাজে অদ্ভুত বলিয়া গৃহীত হয়। পরে ক্রমে রচনার ভাবের প্রতি দৃষ্টি হইতে থাকে এবং একবার সাধারণের রস বোধ হইলে রসহীন রচনায় সহস্র শব্দ মিল বা অনুপ্রাস থাকিলেও তাহা আর সমাদৃত হয় না।

কিন্তু এক সময়ে যেটি কাব্যের গুণ বা রস বলিয়া গৃহীত হয়, সময়ান্তরে হয়ত তাহা দূষণীয় বা অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। সেইরূপ এক সময়ে যেটি রসহীন বলিয়া সমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সময়ান্তরে তাহা আবার রসপূর্ণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে। অবশ্য, যে রচনায় স্বভাব বর্ণন আছে, এবং যাহা বাস্তবিক রসপূর্ণ, তাহা যুগযুগান্তরে ও দেশ দেশান্তরে সমাদৃত হইয়া

থাকে। হয়ত প্রণয়ন কালে তাহা সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে সমাজের রসগ্রাহিণী শক্তি বিশেষ পরিমার্জ্জিতা ছিল না, পরে সুমার্জ্জিতা হইলে তাহার যত্ন আরম্ভ হইল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। যে গুণগ্রাহী নহে, সে ঐ রচনার গুণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, এই মাত্র। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আমাদিগের রসগ্রাহিণী শক্তির কোন্ অবস্থা? এক্ষণে আমরা রসপূর্ণ রচনার গুণ গ্রহণ করিতে পারি, কি তাহা ত্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট রচনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদর করি?

যে রচনা সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়, সেই রচনা সমাজের তাৎকালিক রসগ্রাহিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপ। রসহীন রচনা যদি সমাদৃত হইয়া থাকে, তবে সে সমাজের রসাস্বাদন শক্তি সুমার্জ্জিত হয় নাই। আর রসপূর্ণ রচনা যদি কোন সমাজে সম্মান পাইয়া থাকে, তবে অবশ্য সে সমাজকে রসজ্ঞ বলিতে হইবে। সেইরূপ যে নাটক বা যাত্রা জনসমাজের প্রিয়, সে নাটক বা যাত্রার দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অনুভব করা যাইতে পারে। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের রসগ্রাহিণী শক্তি কতদূর পরিমার্জ্জিতা হইয়াছে, তাহা এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রাদি দ্বারা অনুভব হইতে পারে।

এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে গ্রামে একবার এই যাত্রা হইয়াছে, সে গ্রামনিবাসীগণ সময় পাইলে কখন কখন তদ্বিষয় স্পর্দ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না। অন্য যাত্রাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার রসজ্ঞতা বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

নায়ক নায়িকাদিগের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। কাব্য কি নাটক কি নাটকাভিনয়, এ সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্য হৃদয়ের চিত্র। মনুষ্য চিত্তবৃত্তি মধ্যে বিশেষ বেগবতী এবং সুখকরী যে বৃত্তি, তাহা স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয় ইত্যাদি নামে পরিচিতা। একজনের প্রতি অন্যের আত্মাপেক্ষা আন্তরিক সমাদরকে এই নাম দেওয়া যায়। এই বৃত্তির পাত্র ভেদে, বৈষ্ণবেরা সখ্য বাৎসল্যাদি নানা প্রকার নাম দিয়াছেন। এবং সে সকল নাম সাধারণ্যেও চলিত। যে কারণেই হউক, ইহার মধ্যে দম্পতী প্রণয়ই

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল কবি কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং সকল নাটকে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রণয় কি পদার্থ, তাহার শক্তি কি প্রকার, যাহাকে একবার স্পর্শ করে, তাহাকে সাধারণ অপেক্ষা কিরূপ উন্নত করে, তাহার হর্ষ কিরূপ, বিষাদ কিরূপ, আকাঙ্ক্ষা কিরূপ, চাঞ্চল্য কিরূপ, ধর্ম্ম কিরূপ, জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত তাহার সহৃদয়তা কিরূপ, তদ্বিষয় বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কিছুই দেখা যায় না। এবং তাহা দেখাইবার স্থানও এ যাত্রায় নাই। বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাটীতে তাঁহার বাস এবং দৌত্যকর্ম্মে মালিনীর প্রবৃত্তি, এই কয়েকটী অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ অংশে রসোদ্ভাবনের সম্ভাবনা? ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইবে? যাত্রায় এই অংশের শেষভাগে কখন২ বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে। ইহা রস সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সূর্য্যকিরণ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। মা মা করিয়া দুইটা ঠাকুরাণী বিষয়ক গীত গাইয়া যাত্রাকরেরা শেষ করিয়া দেয়। অতএব বিদ্যাসুন্দরের প্রথম আলাপ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যার সহিত মিলন হইলে পর সুন্দর সন্ন্যাসির বেশ ধরিয়া রাজসভায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এই অংশকে সন্ন্যাসির পালা বলে। ইহার যাত্রা সর্ব্বদা না হউক, মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। বিদ্যাকে সন্ন্যাসী বিবাহ করিবেন বলিয়া যাতায়াত করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া বিদ্যা কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য সুন্দর স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। রাত্রে যখন সুন্দর বলিলেন যে, সন্ন্যাসির যাতায়াতে তাঁহার বড় চিন্তা হইয়াছে, তখন বিদ্যা কেবল বলিলেন,

"জান মনে মনে উভয়ের মিলন ;
তবে চিন্তা কর কেন?"

যে রস সুন্দর প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না ; ভাসিয়া গেল।

আদিরসের তীব্রতা নাই। রস মধ্যে করুণ রসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণ রসে যাদৃশ মনুষ্য চিত্তকে আলোড়িত করা যায়, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জন সাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করুণ রস মিশ্রিত

করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন। যে কৌশলের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয়, সচরাচর তাহাকে বিরহ বা বিচ্ছেদ বলে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কত সরস দেখা গেল—বিচ্ছেদ কিরূপ দেখা যাউক।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অতি অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকু বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। বিলম্ব দেখিলে বিদ্যা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন; নাচিয়া তদ্বিষয় দুই একটি গীত গাহিয়া থাকেন; অথবা অধীরা হইলে হীরা মালিনীর সহিত দুটা রহস্য করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। বিদ্যার বিচ্ছেদ এইরূপ। এতদ্ভিন্ন যদি অন্যরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাও সামান্য। সে বিচ্ছেদে কেহ তাপিত হয় না, কাহারও নয়নাশ্রু পতিত হয় না, বিদ্যাও কাঁদে না, শ্রোতৃগণও কাঁদে না। "আমার উড়ু২ কচ্চে প্রাণ" এই কথায় বা তদনুরূপ কথায় যতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ হয়, বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ততটুকু হইয়াছিল, তাহার বেশী নহে।

সামান্য বিচ্ছেদ সম্বন্ধে এইরূপ। আবার যখন যাবজ্জীবনের মত বিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন মস্তকচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত সুন্দরকে মসানে লইয়া চলিল, বিদ্যা তখন উঠিয়া কঙ্কাল দোলাইয়া, নয়ন ঠারিয়া নাচিতে নাচিতে আড়খেমটায় শোক করিতে থাকে। নৃত্য দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীতে রসের স্রোতঃ বহিতে থাকে, অমনি বাহবার ঘটা পড়িয়া যায়। বিদ্যা আরো ঘুরিয়া২ নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে! বেশ্যাস্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন, হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিষাদ শ্রোতারা একবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণ বিষয় কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন? কেহ উত্তর করিতেছেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মার্থে কালিয় দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থ নহে। এরূপ শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা, তথাপি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার এক স্থানের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু কৃষ্ণ যাত্রারও উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হই। কেননা কৃষ্ণযাত্রা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। তবে ইহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এতদংশেও কিছু ভাল, এই জন্যই আমরা সে প্রসঙ্গ করিতে সাহস পাইতেছি। বিশেষ যে দেশে কৃষ্ণ প্রধান দেবতা, কৃষ্ণলীলার কথা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, যেখানে গুরু কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে২ কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছেন, কথক গ্রামে২ কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে আবাল বৃদ্ধ, আপামর সাধারণ, দোকানি গোসাঞি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে২ কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে,—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ,—যে দেশে মাঠে ঘাটে, বনে বাজারে, মন্দিরে, নাট্যশালায়, বৈঠকখানায়, বেশ্যালয়ে চাসা চুয়াড় নট নটী বাবু বেশ্যা ইতর সাধারণ সকলেই অহরহ কৃষ্ণগীত গায়িতেছে,—যেখানে গৃহচিত্রে কৃষ্ণ, গাত্র বস্ত্রে কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্য্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বধিয়া কি ফল ?

নাটকগুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বাবুদিগের মুখ চাহিয়া বিদ্যাসুন্দরের দুই একটি গীত উদ্ধৃত করিয়াছি—বৃদ্ধ ও বৈষ্ণবদিগের মুখ চাহিয়া কৃষ্ণযাত্রার একটি গীত উল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণ মথুরাধিপতি; গোপকন্যা বৃন্দা দূতী তাঁহার আনয়নে যাইতেছে। তাহার কথায় রাজার গোচারণে পুনরাগমন করিবার সম্ভাবনা নাই—এজন্য দূতী দর্প করিয়া বলিল যে, যদি না আসে, তবে বাঁধিয়া আনিব। কৃষ্ণকে বাঁধিবে! রাধার একথা অসহ্য হইল—

> "আমি মরি মরিব, তারে বেঁধ না,
> হে দূতি তোর পায়ে ধরি, তারে বেঁধ না,
> সে আমারি প্রিয়।
> সে যেখানে সেখানে থাকুক,
> তাহারে রাধানাথ বই তো বলিবে না"।

ইত্যাদি গীত সকলেরই অভ্যস্ত আছে, এ জন্য সমুদয়াংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই।

রাধার এই কথায় অনেককে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়। কৃষ্ণকে বাঁধিবে, এইটি কেবল কথায় মাত্র বলা হইয়াছিল; রাধা তাহাতে ব্যথা পাইলেক।

কিন্তু সুন্দরকে কেবল কথায় নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে রজ্জুসংযুক্ত করিয়া বাঁধিল, মসানে কাটিতে পর্য্যন্ত লইয়া গেল, তথাপি বিদ্যার কণামাত্রও দুঃখ হইল না, শ্রোতাদিগেরও দুঃখ হইল না ; অশ্রুপাতের ত কথাই নাই। বিদ্যাসুন্দর-ভক্তগণ, বোধ হয়, এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যার প্রণয় অতি প্রগাঢ় বলিয়া যাত্রায় বর্ণিত হয় নাই। এই তুলনায় আরো বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্ব্বে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরাণী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।

সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখসৌরভ মাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। কিন্তু সে পরিচয় কবি ভিন্ন আর কাহারো দিবার সাধ্য নাই। তাহাতে কবির কল্পনা শক্তি আবশ্যক। যদি অপরে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই যাত্রায় যেরূপ বিদ্যাসুন্দরের পরিচয় আছে, সেইরূপ হইয়া পড়ে—অর্থাৎ মাহাত্ম্যের পরিবর্ত্তে রহস্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক এই যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক। মালিনী সুন্দরের কথা-বার্ত্তা কি বিদ্যাসুন্দরের কথাবার্ত্তা, উভয়ই সমভাবে রহস্য পরিপূরিত। কখন কখন প্রণয়ীদিগের মধ্যে রহস্য কি কৌতুকালাপ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা অতি সাধারণ। যে স্থলে প্রণয় গভীর, সে স্থলে উপহাস রহস্যাদি স্থান পায় না। কিন্তু এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাগ ত্যাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাক্‌রোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। বিদ্যার কথা বার্ত্তা সহজেই অল্প ; রহস্যের উত্তর না দিতে হইলে, তাঁহার গীতের ভাগ অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা। তাহার রঙ্গরস লইয়াই এই যাত্রা। কাযেই ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। নায়ক নায়িকা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপলক্ষ মাত্র। মালিনীর যৎকিঞ্চিৎ ছায়া আছে, কিন্তু বিদ্যা কিছুই নহে ; না প্রণয়িনী না উন্মাদিনী না জড়, না অন্য।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় করুণরস প্রবল ছিল। এই যাত্রাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এ দেশে হাস্যরসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে। নতুবা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কোন ক্রমেই সাধারণপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই যাত্রা সাধারণপ্রিয় হইবার আর দুই একটি কারণ আছে। যে ভাষায় ইহার গীত গুলিন রচিত হইয়াছে, তাহা সরল; অনায়াসেই অপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তদ্ভিন্ন সঙ্গীতেরও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। আর অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, এই যাত্রায় যতটুকু সামান্য কাব্যরস আছে, তাহাই এক্ষণকার শ্রোতাদিগের বোধোপযোগী। তদতিরিক্ত হইলে তাঁহাদিগের বোধাতীত হইত। যে রচনার রসগ্রহ হয়, তাহাই ভাল লাগে।

আমরা এ পর্য্যন্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রার কবিত্ব এবং শ্রোতাদিগের রসজ্ঞতার আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে এই যাত্রার নীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহার অধিক প্রয়োজন নাই; আমরা যাহা বলিব, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। মালিনী, সুন্দর ও বিদ্যা এই তিনটি লইয়া যাত্রা হইয়া থাকে। এই তিন জনের মধ্যে কোন্‌টি অনুকরণীয়? কে প্রার্থনা করে যে, বিদ্যার ন্যায় তাহার কন্যার চরিত্র হউক, অথবা সুন্দরের ন্যায় তাহার পুত্রের স্বভাব হউক। কেহ বা প্রার্থনা করে যে, মালিনীর ন্যায় তাহার গৃহিণী হউক অথবা দাসী হউক। লোকে এরূপ প্রার্থনা করা দূরে থাকুক বরং তাহাতে অবমাননা বোধ করে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই তিনটির মধ্যে কোনটিও আদর্শ যোগ্য নহে বরং সচরাচর লোক অপেক্ষা অপকৃষ্ট। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে অপকৃষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে অপকর্ষ ব্যতীত আর কি শিক্ষা হইতে পারে? কখন কখন কবিরা অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে এমত ভয়ানক করিয়া চিত্রিত করেন যে, তদ্দ্বারা অপকৃষ্টতার প্রতি ঘৃণা এবং ভয় উভয়ই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সে স্থলে অপকৃষ্ট হইতে উৎকর্ষ শিক্ষা হইল, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে অপকর্ষ সেরূপ চিত্রিত হয় নাই। কাযেই বিদ্যাসুন্দর হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা অপকৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইবে?

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, যাত্রা কি নাটক উভয়ের কোনটিই শিক্ষার নিমিত্ত নহে, ইহা হইতে সৎশিক্ষা প্রত্যাশা করা অসংগত। বিশেষতঃ যে নায়ক নায়িকা বর্ণন করা ইহার উদ্দেশ্য, সে স্থলে অন্য আর

কি শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এটি তাঁহাদের ভুল। যাত্রার বর্ণিত বিষয়, ধর্ম্ম বিষয়ক হউক বা নীতি বিষয়ক হউক বা যাহাই হউক, আরো অধিক হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতের ছন্দে বিশেষতঃ সুরে তদ্বিষয়ে কতক সাহায্য করে। আর "আদিরস" বর্ণন থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমত নহে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নায়ক নায়িকা হইলেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব।

মহাকবি সেক্ষপীয়রের প্রণীত ওথেলো নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম আদ্যোপান্ত বর্ণিত আছে। বিদ্যা যেরূপ পিতার অজ্ঞাতে সকলকে লুকাইয়া সুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ওথেলোর নায়িকা ডেসিডিমোনা আপন পিতার অজ্ঞাতে এক জন অতি কুরূপ কাফ্রির প্রেমে বদ্ধ হইয়া তৎসমিভ্যারে পিত্রালয় হইতে পলায়ন করেন। বিদ্যা এবং ডেসিডিমোনা, এই উভয় নায়িকার প্রেমারম্ভ প্রায় একই প্রকার দোষাবহ। কিন্তু ডেসিডিমোনার কার্য্যে, ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, চিন্তায় এত সরলতা, এত নির্ম্মলতা, এত পবিত্রতা প্রকাশ আছে যে, তাহা দেবদুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। এবং যদিও তিনি "কুলত্যাগ" করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ তাঁহার সতীত্ব সতীদিগের আদর্শস্বরূপ থাকিবে। যিনি ডেসিডিমোনাকে ভাল বাসেন, তিনি সতীত্ব ভাল বাসেন। ধর্ম্ম বেত্তা, নীতি বেত্তা, পিতা মাতা বা অন্য উপদেশ দাতা, সকলেই বলিয়া থাকেন, সতীত্ব স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম; সতীত্ব রক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য; সতীত্ব রক্ষা করিলে সুখসম্পদ হয়। এ সকল কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু কেবল শুষ্ক উপদেশে অন্তরস্পর্শ করে না। এক ডেসিডিমোনার চরিত্রে সতীত্বের সাপক্ষে ইংলণ্ডে যাহা করিয়াছে, সহস্র উপদেষ্টা একত্র হইয়া কস্মিনকালে তাহা পারিতেন না। অতএব যাত্রা কি নাটকের নায়ক নায়িকা দ্বারা যে নীতি কি ধর্ম্মশিক্ষা হয় না, এমত নহে।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকদিগের শিক্ষা কেবল পুরাণ ব্যবসায়ী কথক আর যাত্রাকরের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাণ ব্যবসায়িরা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছেন। এক্ষণে যাত্রাওয়ালারা দেশের শিক্ষক দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যে যাত্রার আলোচনা আমরা করিলাম, সে যাত্রা যেখানে সমাদৃত, তথাকার শিক্ষা যত উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা এক প্রকার অনুভূত হইতে পারে।

পল্লীগ্রাম অনুসন্ধান করিলে এই যাত্রার ফলভোগী অনেককে পাওয়া যাইতে পারে। মালিনী মাসি দৌত্যক্রিয়ার অধ্যাপিকা; তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে দেশ ব্যাপিতেছে। ছোট খাটো সুন্দরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিদ্যার বংশবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ জানা নাই; কিন্তু বোধ হয়, নিতান্ত অল্প না হইতে পারে। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হয়?

"এখন উপায় আম্বি, কর তারে আনিতে।
"কামানলে জেলে ছলে, ভুলে আছে মনেতে॥
"কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে,
"বারি বিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে॥

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ গীত পিতা পুত্র লইয়া, মাতা কন্যা লইয়া শুনেন; লজ্জা করেন না। সেই পুত্র কন্যা জ্ঞানবান হইলে পিতা মাতাকে কিরূপ ভাবিবেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দু সমাজের হৃদয় মধ্যে ইহার নানা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেননা হিন্দু সমাজের পূর্ব্বকালীন গতি অনেকদূর সাংখ্য প্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে২ প্রবেশ করিয়াছে, এমন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন, ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্ত্তমান হিন্দু চরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্য সাধারণতা

এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক, জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে২, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্য দর্শন মনে পড়ে; যখন পূজার পূর্ব্বে চীনা বাজারে, বড় বাজারে ভিড় ঠেলিয়া যাইতে পারি না, তখন সাংখ্যকারকে গালি দিই। যাঁহাকে পূজার সময়ে বস্ত্রাদি কিনিতে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া দিতে হইয়াছিল, তিনি যখন ঋণ পরিশোধ করেন, তখন মনে২ "কপিলের বাপ নির্ব্বংশ হউক," বলিলে অন্যায় কথা হইবে না!

অদ্যাপি শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, সুশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। সেই গীতা মিশ্র পদার্থ। তৎপ্রণেতা যিনিই হউন, "বহুশাস্ত্র গুরূপাসনেপি সারাদানাং ষট্‌ পদবৎ।" * সাংখ্য প্রবচনের এই বাক্যানুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যেখান হইতেই তিনি সঙ্কলন করুন, সাংখ্য হইতে যাহা লইয়াছেন, তাহা জাজ্জ্বল্যমান। সাংখ্য দর্শন না হইলে ভগবদগীতা হইত না।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এখন ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া, সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে, এই

* ৪র্থ অধ্যায়, ১৩ সূত্র।

ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি এই সাংখ্য দর্শনে। বেদ অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ ধর্ম্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্ত্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে "বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং সাংখ্য দর্শন" ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্য দর্শনে। নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিণাম মাত্র। বেদের অবজ্ঞা, সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।*

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা তৎপরবর্ত্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্য মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে যীশু খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে২ কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শন শাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই: প্লেতো বা আরিস্ততল, বেকন বা দেকার্ত, অধিকতর শুভ ফলের বীজবপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফল বাহুল্যে কপিলের সৃষ্টি ভূতলে অদ্বিতীয়। সেই সৃষ্টির সকল পরিণাম যে শুভ নহে, সে দোষ কপিলের নয়। যে ভূমিতে তাহার বীজ পড়িয়াছে, অনেক দোষ সেই ভূমিরই। জর্ম্মান ভূমিতে কপিল দর্শন কাণ্ট দর্শনাপেক্ষা অধিক ফলোপধায়ক হইতে পারিত সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষে কাণ্ট দর্শনে কি মন্দ ফল না জন্মিত?

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্ দেশীয় ব্যক্তি, কোন্ কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই"

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি প্রণীত যোগ শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন কোন সাংখ্য গ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই কপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থ মধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্য প্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস, ভোজবাৰ্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল, অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া অতি সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতক গুলিন বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্য সৃষ্টিকৰ্ত্তা জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টি মধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে পায়?

আবার কতক গুলিন লোক আছেন; তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারা বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকৰ্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্য বুদ্ধির বিচাৰ্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘন পৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর সেই সকল নিয়ম এমত করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক সেবন

পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদক সেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছু জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গাস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহান অনিষ্টকারী কার্ব্বনিক-আসিড প্রধান বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন্ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেক গুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ২ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্য বুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও যে দুঃখ পাইব না, এমতও দেখি না। এক জন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজ শাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার, গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে, যে স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেই দুঃখ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে মালথসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ

নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন২ স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে]।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্য দর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী, (৬ অধ্যায় ৭ সূত্র) এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (ঐ; ৮) দুঃখ হইতে যত ক্লেশ, সুখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না। (ঐ, ৬) অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখ মোচন। এই জন্য সাংখ্য প্রবচনের প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যালোচনা সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি নাই; কেননা আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কাল ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয়ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্ব্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে, আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না। (১ অধ্যায় ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্‌তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনঃজ্বালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখ নিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মজন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং সেখানেও জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়; ৫২,৫৩ সূত্র) আত্মা, বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না, কেননা যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে। (উ ৫৪)

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখ নিবৃত্তি। অপবর্গই বা কি? "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।" (তৃতীয় অধ্যায় ৬৫ সূত্র,) সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। "অপবর্গ" ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত, বা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত, এমত মনে করিবেন না। বিবেচকে দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্য গ্রন্থ খানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন। বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাজয়, ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। বানরদিগের কীর্ত্তি সম্যকরূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে ততদূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আমরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দ্দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

রামায়ণে অনেক নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা ইহাতে উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার যুবতী ভার্য্যা ছিল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, নির্ব্বোধ বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠপুত্রও ততোধিক মূর্খ; আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। তা, একাই যাউক, তাহা নহে; আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা," এটা সামান্য কথা; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে যাহা ঘটিবার, ঘটিল। স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য বশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে২ কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে, এতটা

ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও, ঘরে থাকিত; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্যের সংসর্গ সুসাধ্য হইয়াছিল, এ জন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

লক্ষ্মণ আর একটি গণ্ড মূর্খ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা লক্ষ্মণকে কর্ম্মক্ষম বোধ হয়। মনে করিলে সে এক জন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু২ বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল বুদ্ধিহীনতার ফল।

আর একটি গণ্ড মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ মূর্খ লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে আমার বন্দনীয় পূর্ব্বপুরুষ তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিলেন, কিন্তু মূর্খের মূর্খতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে এক দিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বুদ্ধিহীনতাবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে, সীতা খাইতে না পাইয়া, রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া, রাগ করিয়া, মাটীতে পুতিয়া ফেলিল। বুদ্ধি না থাকিলে এই রূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীক মধ্যে এই গ্রন্থ খানি পাওয়া গিয়াছিল; ইহা কাহারও প্রণীত নহে।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কীর্ত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকিরামায়ণ কীর্ত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কীর্ত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কীর্ত্তিবাস বাল্মীকিরামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি।

কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, "রামায়ণ" শব্দটি "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব" কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কীর্ত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া ছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থ খানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিরস ঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্তৃক সীতা হরণ, এ সকল আদিরস ঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরগণকর্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়। লক্ষ্মণ ভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধাকাণ্ড।" গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধাকাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যাকাণ্ড" লিখিয়াছেন। ইহা কি সামান্য মূর্খতা? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থ খানি সাধারণের পরিহার্য্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে এই কদর্য্য গ্রন্থ খানি পড়া ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য; কেননা আমি ত বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ।

মহামর্কট।

পুনশ্চ। আমার প্রণীত রামায়ণ আমার ভদ্রাসন বৃক্ষের নিম্নশাখায় পাওয়া যায়। মূল্য এক এক ছড়া সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা।

---

(১) ক

(প্রয়োগ।)

সুদূর পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্ত, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী, নদ ধার,
দেখ কি আনন্দে বসেছে যেয়ে—
বীণা যন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ;
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী তুমি—বীণার অধম—
তুমিও বাজিতে কর রে উদ্যম;
বাঁশরী যেমন রাখাল অধরে,
বাজ রে নীরব ভারত ভিতরে—
বাজ রে আনন্দলহরী স্বরে।

(বিরাম) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,
রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে,
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান আগে,
সুস্বরলহরী ছড়ায় রাগে;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তাদের না যায় দেখা—
প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুরবে।

(২)

(প্রয়োগ।)

কবিরঙ্গভূমি এই না সে দেশ,
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
সঙ্গীত যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়;

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে উক্তি; গাহক কর্তৃক উচ্চারিত।

(খ) গাহক সন্নিষ্ট দুই কিম্বা তিন জন কর্তৃক উচ্চারিত।

(গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন কর্তৃক উচ্চারিত; শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে।

যেখানে সরসী কমলে নলিনী,
যামিনী কণ্ঠেতে যথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎ চাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট বাহিয়া বয় ?

(শাখা।)

তবে মিছে ভয়, ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পূরিয়া আশয়—
যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শত দল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন বনে।

(বিরাম)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার,
ভারতে শারদা নাহিক আর !
অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন্ ;
নাহি সে বসন্ত, সুরভি ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম-বনে।

(৩)

(প্রয়োগ।)

শ্বেত শতদল তেমনি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি করে ;
কারুকার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী কুসুম, পারিজাত দলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা।)

ঘের চারি ধার মাধবী লতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তুরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবী লতায় কর রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(বিরাম।)

রচিল আসন অমরগণে,
আইল কন্দর্প ষড়্ ঋতু সনে ;
আপনি সুমন্দ মলয় বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস ভূধর-শৃঙ্গ,
আইলা মহেশ দেখিতে রঙ্গ ;
শ্রীপতি আইলা কমলা সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে,
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ধায়,—
সচী সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪)

(প্র)

শোভিল সুন্দর কুসুম-আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;
যথা পূর্ব্ব দিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্মমূর্ত্তি-কালে—দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্মুখ সেই রূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশে।

(শাখা।)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হতে জ্যোতি ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ্র বরণা,
নারী উপজিল, হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্য বেদ করে ঘোষণা।

(শাখা।)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণাধ্বনি সহ প্রবাহ বহিল—
হায়! সুখ-তরি কতই ভাসিল,
ভারতে যবে সে তরঙ্গ ছিল।

(বিরাম।)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে,
মুনিমতভেদ ঘুচিবে যবে;
শুনে বেদগান বাণীর সুরে,
হবে জয়ধ্বনি আকাশ পূরে;—
নামে রে যখন গগন পথে,
মলিন তপন—কে রোধে রথে?
আকাশের তারা খসিলে, হায়,
পুনঃ কি উঠে সে আকাশে ধায়!
উজানে কখনো ছুটে কি জল,
ফিরে কি যৌবন করিলে বল?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল!

(বিরাম।)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায়?
হারান মাণিক্ পাওয়া ত যায়;
হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
গ্রহণের ছায়া ক দিন রবে?
এ জগত মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয়;
দেখো না, দেখো না, দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে;
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত তীমিরে,—
আর কি উহারে পাবি না ফিরে।

(৫)

(প্রয়োগ।)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে,
পঞ্চমুখে বেদ করিলা গান;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল
দিলা শ্বেত ভুজে—দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত প্রাণ।

(৬)

(প্রয়োগ।)

ক্রমে যত দিন বহিতে লাগিল,
শারদা পূজিতে মানব আইল,
কবি নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুর হৃদয় মানবগণে;
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগত বিখ্যাত বাল্মীকি কবি—
দিলেন শারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল মনে

(শাখা।)

হেরিয়া সে ছবি আরো কত জন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর য়ুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-রাশি।

(বিরাম।)

বাজায়ে আনন্দে সমর তূরী,
যাও রে দুজন অবনীপুরি ;
শুনায়ে মধুর অমর ভাষ,
ঘুচাও মানব মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে, করো না ভয়।
ছুঁইও না কেবল কৃতান্তধাম—
যোহানা মিল্টন্, ডানটি নাম,
আসিবে দুজন অমুর পরে,
এ পুরী খুলিয়া দেখাবে নরে ;
দেখাবে ইহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
আতঙ্কে হেরিবে ভুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ।)

পরে অদ্‌ভুত মানব দুজন
আইল পূজিতে শারদাচরণ—
পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।

ডাকিলা শারদা আনন্দে দুজনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটী দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে যতেক রস।

(শাখা।)

যাদুকর বেশে, চমকি ভুবন,
নিজ নিজ দেশে ফিরিল দুজন ;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া মনঃ হরে,
এক জন বসি আভনের ধারে
সুধা ঢেলে দেয় অমর নরে।

(বিরাম।)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুল-মালিকা গাঁথিলি কেন ?
আর কি আছে রে সুরভি ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল গান ?
আর কি এখন সুগন্ধ ময়,
গৌড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়,
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
শুখায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কাননে কেন এ ধন,
রাখিলি ভুলাতে কাহার মন ?

স্বাস্থ্য কৌমুদী। অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য বিষয়ক নূতনবিধ গ্রন্থ। প্রথম ভাগ। ডাক্তার শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ঢাকা গিরীশ যন্ত্র।

আমরা এই গ্রন্থ খানি দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের মুদ্রাযন্ত্র সকল যে অজস্র অপাঠ্য অসার কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা উদ্গীরণ করিতেছে, তন্মধ্যে এক খানি সারবৎ গ্রন্থ দেখিয়া আমাদিগের চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল। কাব্য নাটকের আমরা অবমাননা করি না, এবং আধুনিক বিষয়ী বাহ্যসুখাভিলাষী ইংরাজদিগের ন্যায় বলি না যে, সকলে মিলিয়া, কেবল যাহাতে দৈহিক সুখের বৃদ্ধি, সেই বিদ্যার অনুশীলন কর—কাব্য—নাটক স্পর্শ করিও না। যত দিন মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, উভয়েরই সমুচিত পর্য্যালোচনা ভিন্ন মনুষ্য উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না। পরন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্যের উপকারিতা বা প্রয়োজন লঘু নহে। কিন্তু যে সকল অভিনব কাব্য নাটকাদি দিন২ বাঙ্গালায় প্রচার হইতেছে—তাহা অপেক্ষা বঙ্গভূমে কাব্য নাটকের একবারে লোপ হয়, সেও ভাল। তৎপরিবর্ত্তে এ সকল চর্চ্চার একাধিপত্য পরমাহ্লাদের বিষয়। এই জন্য বলিতেছি, একখানি ক্ষুদ্র শারীরবিধান গ্রন্থ দেখিয়াও আমাদিগের চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল।

ভারতচন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যাহাতে আমাদিগের স্বদেশস্থ লোকে, আপামর সাধারণে, সংক্ষিপ্ত শারীরবিধান জ্ঞাত হইতে পারে,—প্রত্যহ, দণ্ডে২ যে সকল নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালিরা ক্ষীণ, অল্পায়ুঃ, অসুস্থ, এবং নিস্তেজ হয়, সেই সকল নিয়ম যাহাতে সকলে জ্ঞাত

হইয়া তাহার লঙ্ঘনে বিরত হইতে পারে—যাহাতে বাঙ্গালির সুখ বৃদ্ধি, পরমায়ুঃ বৃদ্ধি, কল্যাণ বৃদ্ধি হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তদ্রূপ উদ্দেশ্যে শত২ উত্তম গ্রন্থ ইউরোপে সচরাচর প্রচারিত হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন মহৎ সুফল ফলিতেছে। কিন্তু এ দেশে এগুলি অতি দুর্লভ। মেডিকেল কালেজের শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়ই বাঙ্গালীর মধ্যে এ শাস্ত্রের অধিকারী; কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, অথবা আপন মাতৃভাষায় স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অক্ষম, সুতরাং এদিগে বড় চেষ্টা নাই। নব্য ডাক্তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কেহ২ এপথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র বাবুকে এপথের আর এক জন পথিক দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি।

তাঁহার গ্রন্থ খানি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন মাত্র। ইহার অধিক এক্ষণে প্রত্যাশা করা যায় না। সবিস্তারে এসকল বিষয় বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই। তবে ভারত বাবুর সঙ্কলনে, বোধ হয়, সংক্ষেপের আতিশয্য দোষ ঘটিয়াছে। শারীরতত্ত্ব ভাগের অনেক অংশই এত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা শারীরতত্ত্ব অনভিজ্ঞ পাঠক বড় কিছু বুঝিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ। অনেক গুলিন নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের উপযুক্ত বিবৃতিও দেখা যায় না। যথা—পচন এবং সমীকরণ (Digestion and Assimilation) ক্রিয়ার পর্য্যায় ক্রমে বোধগম্য বিবরণ কোথাও দৃষ্ট হইল না। রক্ত সঞ্চালন (Circulation) সম্বন্ধেও ঐ রূপ। স্নায়ু মণ্ডলীর বর্ণনায় স্নায়ু গ্রন্থির (Ganglia) কোন উল্লেখ নাই। পচন, সমীকরণ, সঞ্চালনের যে কিছু উল্লেখ আছে, তাহা অন্য বিষয়ের আনুষঙ্গিক ক্ষণিক উল্লেখ মাত্র। যদি কোথাও এসকলের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, তবে গ্রন্থকার আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন—সে আমাদিগের দেখিবার দোষ। যদি না থাকে, তবে তদ্ব্যতীত শারীরতত্ত্ব পরিচ্ছেদটি, একটা কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণযাত্রার মত হইয়াছে।

গ্রন্থ খানি সাধারণের বোধগম্য হইবার আর দুইটি বিঘ্ন ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ভাষা। শারীরতত্ত্ব লিখিতে ভারত বাবুকে তদুপযোগিনী ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে; এ কঠিন ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রশংসা! কিন্তু সাধারণ পাঠক সহজে সেই ভাষাটিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। ইহা গ্রন্থকারের দোষ নহে।

দ্বিতীয় বিঘ্ন, চিত্রের অভাব। শারীরতত্ত্ব শিখিতে গেলে, জীবদেহচ্ছেদ ভিন্ন সুশিক্ষা হয় না। তদভাবে, উত্তম চিত্রে অনেক বুঝা যায়। কিন্তু এদেশে তদুপযোগী চিত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহাতেও গ্রন্থকারকে দোষ দিতে পারি না।

গ্রন্থের দুই একটি অভাবের উল্লেখ করিলাম বলিয়া অপ্রশংসা করিতেছি না। দেশ, কাল এবং পাঠকদিগের অবস্থা বিবেচনা করিলে, বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে এরূপ কার্য্যে যতদূর সফলতা লাভ করা যাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহা লাভ করিয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট প্রশংসা। তিনি পরিশ্রমে ক্রটি করেন নাই—শারীরতত্ত্বে সুপণ্ডিত, এবং সুলেখক। কিন্তু একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে সকল কথা আজিও অনুমান মাত্র—প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় না—তাহা অত নিশ্চিত করিয়া না লিখিলে ভাল হইত।

উদাহরণ;—

"মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণ পদার্থে মনের সংস্কার সঞ্চিত ও সেই সংস্কারের মর্ম্ম গৃহীত হয়, এবং স্নায়ু সূত্র দ্বারা উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত বা ঐ সকল স্থান হইতে চালিত হয়। ধূসর বর্ণ পদার্থের পরিমাণ বিশেষে বুদ্ধির তারতম্য হয়।"

পুনশ্চ;—

"কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হানি হইলে আত্মার কিছু মাত্র অবনতি হয় না। যেহেতু আত্মার বিনাশ নাই। ইহলোকে আমরা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, আত্মা পরলোকে সেই সকল সুখ দুঃখরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে।"

একি বিজ্ঞান? না ধর্ম্মোপদেশ? যিনি ধর্ম্মোপদেশকে বিজ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত করেন, তাঁহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগত অল্পতা আছে, বিবেচনা করিতে হয়। এই দোষেই ভারতবর্ষের গৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

দুই একটি দোষে সমগ্র গ্রন্থের অবমাননা করা যায় না। ভারতচন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানি প্রশংসনীয়। বৃদ্ধ, যুবা, এবং স্ত্রীলোক, সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। সকল ঘরেই ইহার এক এক খণ্ড থাকা আবশ্যক। বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে ইহা পঠিত হইলে ভাল হয়, কিন্তু পড়াইবে কে?

ললিত কবিতাবলী। কাব্যমালার রচয়িতৃ প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এগ্রন্থ খানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িতৃ প্রণীত বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না। এ কবিতা গুলি ভাল। কাব্যমালা যে

ঘোরতর দোষে দূষিত, এগ্রন্থে সে দোষ নাই; কদাচিৎ বিন্দুপাত হইয়াছে মাত্র। কবিতা গুলিও মধুর। সংস্কৃত ছন্দোবন্দে সকল কবিতা গুলিই লিখিত। উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা কত কঠিন, তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে ছুরূহ ব্যাপারে যে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা ক্ষমতার মন্দ পরিচয় নহে। অথচ কবিতা মধুর এবং সরস হইয়াছে। তবে পুরাতন কথাই অনেক।

দেখা যাইতেছে যে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, ছুই আছে। তবে কেন তিনি কাব্যমালা লিখিয়াছেন?

কাব্যমঞ্জরী। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত। কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

এই কবিতা গুলির মধ্যে অনেক গুলি উত্তম। স্থানে২ কবিত্বের পরিচয় আছে। গ্রন্থকার যে এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি, অনেক স্থানে তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়।

এই কবি কিছু রূপক প্রিয়। অনেক গুলি কবিতাই এই অলঙ্কার বিশিষ্ট। এইরূপ কাব্য, এপর্য্যন্ত কখন অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণিত হয় নাই, হইতে পারেও না। কাব্যমঞ্জরী মধ্যস্থ সেরূপ কাব্য গুলিনও অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া গণা যাইতে পারে না। তথাপি সে গুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য হয়। "কবিতার জন্য" ইত্যাভিধেয় কাব্যখানি আমাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।

কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতি-গর্ভ। আদিরসের সংস্রব মাত্র নাই। এ সকল বিষয়ে কাব্যমঞ্জরী কাব্যমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাব্যমালা কে লিখিয়াছে? কবিদিগের হৃদয়ে কি, গ্রহগণের মত, এক পিঠ আঁধার এক পিঠ আলো।

আর্য্য প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পাতুরিয়া ঘাটাস্থিত সাহিত্য যন্ত্র। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পত্র খানির বাহ্যদৃশ্য উত্তম, ভাল কাগজে পরিষ্কাররূপে ছাপা হইয়াছে। বিষয় গুলিও মন্দ নহে; চিত্তাকর্ষক বটে, এবং যত্নসংগৃহীত, কিন্তু রচনা প্রাঞ্জল বা প্রণালীবদ্ধ নহে। কাগজ খানির উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন কেবল প্রকৃত ঘটনা ও বিচারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন।

অবলা বিলাপ। শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রণীত। শ্রীযুক্ত হৃদয় শঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাঙ্গালী কুলকামিনীরা যখন গ্রন্থ রচনা করেন, তখনই তাঁহারা পাঠকের নিকট একটু দয়ার পাত্র হইয়া বসেন। রচনা কর্ত্রী মনে ভাবেন, "আমি যে স্ত্রীলোক হইয়া যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছি, ইহাই বঙ্গবাসী পুরুষগণের ভাগ্য ; আবার তাহার উপর লিখিলাম—আর কি রক্ষা আছে।" পাঠকেরা বলেন, "ভাল মোর ধন !—ঢের হয়েছে।" সুতরাং গ্রন্থ কর্ত্রীগণ ভাল না লিখিয়াও সুখ্যাতির পাত্রী হয়েন। আমরা সেরূপ সুখ্যাতি করিতে বড় অনিচ্ছুক। আমরা বলি যে, বাঙ্গালির মেয়ে যে লেখা পড়া শেখেন, ভালই ; কিন্তু ভাল রচনা করিতে না পারিলে, তাহাদিগের রচনা করিয়া সাধারণের সমীপবর্ত্তিনী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি তাঁহারা আমাদের শিক্ষাদাত্রী হইতে স্পর্দ্ধা করেন, তবে স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব ; স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না। যে স্ত্রীলোক অন্নদা সুন্দরীর ন্যায়, কবিতা রচনা করিতে না পারেন, তিনি যেন লেখেন না।

অন্নদা সুন্দরীকে স্ত্রীলোক বলিয়া কাহারও দয়া বা ক্ষমা করিতে হইবে না। তিনি যদি পুরুষ হইতেন, তথাপি তাঁহার কবিতা শ্রদ্ধার বিষয় হইত। বাবু হৃদয় শঙ্কর রায় বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, যে, "বঙ্গ-কামিনী বিরচিত যে কয়েকখানি পদ্যগ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছে, বোধ হয়, সে সকল অপেক্ষা এইখানি কখন ন্যূন নহে।" সে সকল অপেক্ষা ন্যূন নহে, বলিলে প্রশংসা হইল না। আমরা বলি, ইহা কোন খানির অপেক্ষা ন্যূন নহে।

হৃদয়শঙ্কর বাবুর বিজ্ঞাপনে জানা যায়, গ্রন্থকর্ত্রী নারীজন্মে নিতান্ত মন্দভাগিনী। পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা, সহোদরা, সকলকেই একে একে শমনহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তাঁহার শোকানল "অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন নির্ব্বাপিত অথবা লঘূকৃত করিবার মানসে এই পদ্য গুলি অবসর ক্রমে ক্রমশঃ রচনা করিয়াছেন।" গ্রন্থকর্ত্রীর মন্দভাগ্যের কথায় আমাদিগের যে কষ্ট হইয়াছিল, শেষ কথাটিতে তাহার কিঞ্চিৎ লাঘব হইল—আমরা সুখী হইলাম। দুর্ব্বিষহ শোক সন্তাপ অবশ্য এত দূর মন্দ-তেজঃ হইয়া আসিয়াছে যে, এক্ষণে তাহা পদ্যে ব্যক্ত হয়, এবং নির্ব্বাপিতও হয়। এরূপ নিয়ম না থাকিলে সংসারের যন্ত্রণা কে সহিতে পারিত ?

গ্রন্থকর্ত্রীকে একটি পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি সাধারণ পাঠকের নিকট সহৃদয়তার প্রত্যাশায় কবিতা গুলিন প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক, গ্রন্থ প্রণেতার দুঃখে কখন কাতর হয় না। তাহাদিগের নিকট সহৃদয়তার কামনা অরণ্যে রোদন মাত্র। মনের দুঃখ মনে মনে রাখিলেই স্ত্রীলোকের যোগ্য কাজ হয়।

পরিত্যক্ত পল্লী। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। দামোদরের বন্যায় গ্রাম নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য কবি নদকে কিছু ভৎর্সনা করিয়াছেন; আমরা ভরসা করি, নদ আর এমন দুষ্কর্ম্ম করিবেন না। কিন্তু আমরা কবিকে জিজ্ঞাসা করি, একের অপরাধে পরের দণ্ড কেন? দামোদর নদ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া, আমরা ২৫ পাত নীরস কবিতা পড়িয়া মরি কেন?

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। শ্রীঈশানচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কবিতা গুলিন অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা নাই করি, তাহা যে সুপাঠ্য ও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

ভর্ত্তৃহরি কাব্য। শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত।

ভর্ত্তৃহরির বিষয়ে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ভর্ত্তৃহরি নামে রাজা এক অনন্ত যৌবনপ্রদ ফল প্রাপ্ত হয়েন। আপনি তাহা ভক্ষণ না করিয়া প্রাণাধিকা মহিষীকে দেন। আবার মহিষীর প্রাণাধিক আর এক জন। তিনি ঐ ফল সেই উপপতিকে দিলেন। উপপতির প্রাণাধিকা এক কুরূপা বারাঙ্গনা। সে সেই বারাঙ্গনাকে দিল। বারাঙ্গনা এ ফল ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র কাহাকেও না দেখিয়া উহা রাজাকেই দিল। রাজা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বলদেব বাবু এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য নহে। তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থান বাছিয়া লইয়া চিত্রিত করিয়া তিনি কাব্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তিন সর্গে চারিটি মাত্র চিত্র। প্রথম রূপবতী মহিষী, দ্বিতীয় অসতী মানময়ী, তৃতীয় সদাশয়া বারাঙ্গনা, চতুর্থ বিবাগী বনবাসী রাজা। এই চারিটি চিত্রই চিত্রনিপুণের হস্তলিখিত। যেমন চিত্রকর বর্ণবৈচিত্র্য সাধন দ্বারা চিত্রের উজ্জ্বলতা সাধন করে, কবি তাহাও

করিয়াছেন। রূপবতী অঙ্গনার সঙ্গে, কুৎসিতা বারাঙ্গনার বৈষম্য, অসাধ্বী রাজমহিষীর সঙ্গে, সদাশয়া বারাঙ্গনার বৈষম্য; অবন্তী নগরীর উজ্জ্বল শ্রীর সহিত, বিজন বৈন্ধ্যারণের বৈষম্য; সিংহাসনারূঢ় সম্রাট ভর্ত্তৃহরির সঙ্গে বানপ্রস্থ ভর্ত্তৃহরির বৈষম্য। এই বৈষম্য গুণে চিত্র গুলিন বিশেষ মনোহর হইয়াছে। নচেৎ বলদেব বাবু যে রূপ উজ্জ্বল বর্ণের বাহুল্য করেন, তাহাতে রঙ্গ জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

এই কাব্য গ্রন্থ খানি, আদ্যোপান্ত অপূর্ব্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব্ব কবিগণ, দুই একটী সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃতচ্ছন্দ বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি "ললিত কবিতাবলী" প্রণেতা, এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতচ্ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মালিনী, উপজাতি প্রভৃতিতে বাঙ্গালা কবিতা যেমন স্থানে২ মধুর এবং ওজোগুণ বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনেক স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে। "ভর্ত্তৃহরি কাব্য" সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকে সচরাচর বুঝিতে পারেন কি না, তাহা সন্দেহ। যত্ন করিয়া পুনঃ২ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু কষ্ট করিয়া যে কবিতার অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ পাঠক পড়িতে অনিচ্ছুক। ভর্ত্তৃহরি কাব্য মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে, যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক তাহা সংস্কৃতই মনে করিবেন; কেবল দুই একটা অনুস্বারের অভাব বোধ করিবেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি মালিনী, এবং কয়েকটি বংশস্থবিলের কবিতা ভর্ত্তৃহরি কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে আমাদিগের কথিত দোষ গুণ সকলই প্রমাণীকৃত হইবে।

মালিনী

ফুলসম সুকুমারী, দীর্ঘকেশা, কৃষাঙ্গী,
অচপলতড়িতাভা সুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব বয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা,
যুবকনয়নলোভা "কামিনী কামশোভা।"

বিকচজলজতুল্য স্মের উৎফুল্ল আস্য ;
ভ্রমরকচয় তাহে ভৃঙ্গশোভা প্রকাশে।
স্খলিত চিকুরবন্ধ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠদেশে,
পতিত বিমল তল্পে নিন্দিয়া মেঘমালা।
সুতনু অনতি বক্রাভ্রূলতা দীর্ঘ রেখা ;
প্রণয়সলিলপূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাব্জনেত্র ;
জিনি মধুকরপালী পক্ষরাজী বিশালা ;
নয়নতট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জলাভা।

বংশস্থবিল।

তথায় ভীমাসিত-বর্ম্ম-ভূষিত,
প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে,
সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ
কৃপাণপাণি প্রহরি-ব্রজে ভ্রমে।
মহী ধরাকার শরীর পীবর,
প্রমৃষ্ট ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ দ্যুতি,
অজস্র আস্ফালিত কর্ণ মণ্ডল,
প্রকাণ্ড দন্ত ক্ষমবপ্রভেদনে।
ইতস্ততশ্চালিত শুণ্ড ভীষণ,
প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃংহিত ধ্বনি,*
বিরাজিছে তোরণপার্শ্ব শোভিয়া
প্রভিন্ন যূথপ্রতি বন্ধ শৃঙ্খলে।
সমীপবর্ত্তী পট মণ্ডপে স্থিত,
প্রযত্নতঃ রক্ষকবর্গ সেবিত,
বনায়ু দেশী কত শুক্ল ঘোটকে
গভীর হেষায় খনে ক্ষুরে ক্ষিতি।

জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। রাজশাহী, বোয়ালিয়া। রাজশাহী প্রেস।

এই পত্র খানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তির অভাব জন্মিবে।

---

* একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হস্তির বৃংহিত ধ্বনি "বজ্রোপম" হইল কি প্রকারে? যাঁহারা শুনেন নাই, তাঁহারা জানেন না যে হস্তির বৃংহিত একটি মাধুর্য্য গুণ বিশিষ্ট।

মন্দ কাগজে মন্দ ছাপা, দেখিয়া অশ্রদ্ধা হইবে ; কিন্তু যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে। যদি অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যার তুল্য হয় তবে ইহা যে বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, লেখকেরা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল, এবং লিপিপটু। ভরসা করি, পত্র খানি স্থায়ী হইবে। অধ্যক্ষকে আমরা অনুরোধ করি যে, পত্র খানি কলিকাতায় ছাপাইবেন। সুন্দরীকে জীর্ণ মলিন বসনাবৃতা দেখিলে যেরূপ কষ্ট হয়, জ্ঞানাঙ্কুর দেখিয়া আমাদের সেই রূপ কষ্ট হইয়াছে।

ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন? কাণ্ট দর্শন বাঙ্গালায় লেখা নিতান্ত কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা বলি, যে আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জন্য লিখিতেছি। যদি বাঙ্গালায় কাণ্ট দর্শন বুঝাইয়া লিখিতে পারি, লিখিব, বাঙ্গালায় বুঝাইয়া লিখিতে না পারি, লিখিব না। এরূপ প্রবন্ধ যে ইংরাজিতে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন আমরা বলি না। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দেওয়া, এখন দুদিন থাক। যাহাদের রুক্ষ কেশ, তাহাদের জন্য আগে তৈলের কুলান করিয়া উঠা যাউক।

বীরাঙ্গনা উপাখ্যান। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভবানীপুর।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকটি কাব্যেতিহাস কীর্ত্তিত, এবং কয়েকটি আধুনিক স্ত্রীলোকের চরিত্র সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

সঙ্গীত রত্নাকর। শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। বহু যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থকারের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্তের প্রকটিত রাগাধ্যায় বিষয়ক অংশ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে গ্রন্থকারের নিজ অনুসন্ধান দ্বারা নানা প্রবন্ধে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক ৫ পরিচ্ছেদে বিভক্ত, এবং শেষ ভাগে একটি উত্তম পরিশিষ্ট বিশিষ্ট হইয়া, উপযুক্ত পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্থানে অর্পিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে সঙ্গীত সম্পর্কীয় কিঞ্চিৎ ইতিহাস, ভূমিকাস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভাগের শৃঙ্খলা, সারবত্তা এবং বিচার পদ্ধতির কিছু

আধিক্য থাকিলে আমরা অধিকতর আপ্যায়িত হইতাম। বোধ হয়, গ্রন্থকর্ত্তা যেন সময়ে২ যাহা "নোট" করিয়াছেন, তাহা এক স্থলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং জনশ্রুতি সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের কথা বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কি মূল হইতে তাহা উদ্ধৃত, তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা এক্ষণে পৌরাণিক কাল অতিক্রম করিয়া ঐতিহাসিক কালে উপস্থিত হইয়াছি, গীতের ইতিহাস প্রার্থনা করি; কেবল গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের এক মিলনের পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু নানা দেশের পদ্ধতির সহিত ঐক্য না করিলে. দোষ গুণ বিচার হয় না। "আমরা বড় লোক" বলিয়া মনকে বেগবিহীন করিলে, উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইবেক। গ্রন্থকার কহেন যে, ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদেরা এদেশীয় গীত প্রণালী উত্তম রূপে অবগত হইলে, তাহা উত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারাই নিন্দা করে। গরিমা বশত ইউরোপীয়েরা অনেক স্থলে যাহা না বুঝেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন; ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ইউরোপীয় দোষ, আমাদের জানিয়া শুনিয়া, গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার কহেন, ইউরোপীয় সঙ্গীতে কেবল অহং এবং অহং খাম্বাজ রাগিণীদ্বয় মাত্র আছে, এ সম্বাদ তিনি কোথায় পাইয়াছেন? যাঁহার বিচার করিতে হয়, তাঁহার উভয় পক্ষের দোষাদোষ দেখিতে হইবেক। গ্রন্থকার আরও কহেন যে, মুসলমানেরা আমাদের সঙ্গীত নিকৃষ্ট করিয়াছে, "পূর্ব্বতন স্বাধীন ভারতবর্ষে সঙ্গীত শাস্ত্র ক্রমে যেরূপ পরিণত হইয়া আসিতেছিল, সেইরূপ আর দুই সহস্র বৎসর থাকিলে এখানে সঙ্গীতের উন্নতির আর অবধি থাকিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যখন এই দেশ বিদেশীয় জেতাদিগের শাসনাধীন হইয়া স্বাধীনতাচ্যুত হইতে লাগিল, সেই অবধি সঙ্গীতের চর্চ্চা ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল," এই প্রকার বিচারে আমরা সম্মতি দান করিতে পারি না। হীনবীর্য্য হইলেই এক জাতি অপর জাতির দ্বারা পরাজিত হয় এবং জেতাদিগের উন্নত স্বভাব অনুক্রমে পরিজিতদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সংসার নির্ব্বাহার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে, এবং এই নিয়ম দ্বারা অনিষ্টের কোন মতে সম্ভাবনা হইতে পারে না। মুসলমান কর্ত্তৃক সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং ইউরোপীয়

বিজ্ঞান দ্বারা ভারত সঙ্গীতের ক্রমে উন্নতি লাভ হইবেক। গ্রন্থকার আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, খেয়াল এবং টপ্‌পা মুসলমান গায়ক হইতে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশীয় প্রণালীক্রমে স্বরাধ্যায় উত্তম বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্বর সাধন তাম্বুরার সহিত না হইয়া পিয়ানার সহিত হইলে ভাল হয়। উপস্থিত প্রণালীতে স্বরের বিকৃতি হয়, স্বর স্বভাবে থাকাই কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইলেই সুশ্রাব্য হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রাগাধ্যায় বর্ণিত ও লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় বহু যত্নে সঙ্কলিত এবং ইহাতে নানা রাগ রাগিণী লিখিত হইয়া সাধারণের মূল্যের ও উপকারের সামগ্রী হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সঙ্গীতের নানা শাখার আদর্শ না হইয়া কেবল এক সামান্য শাখার রূপ বাচক হইয়াছে। "রত্নাকরের" রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি সেতারের গথের রূপানুযায়ী ধ্রুবপদ খেয়াল টপ্‌পা ইত্যাদির উদাহরণ ইহাতে নাই। ভারত সঙ্গীতে ধ্রুবপদ খেয়াল টপ্‌পা ইত্যাদিই পরম রমণীয়, এবং বিমল সুখকর। বীণা এবং সেতারের গথ সকল অতি উৎকৃষ্ট রূপে বাদিত হইলেও, কেবল ভগ্নাঙ্গ বিশিষ্ট বলিতে হইবে। ইহার দ্বারা ভারতসঙ্গীতের উপযুক্ত চিত্র লক্ষিত হয় না। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সুর লেখার পদ্ধতিতে যথাবিধি চিহ্ন সকল নির্দ্ধারিত হওয়া সত্বেও, ডাএ, রে, ডিরি২ শব্দ সমূহ একাধারে লিখিত হওয়াতে, অনাবশ্যক এবং ভ্রমজনক হইয়াছে। ভৈরব রাগের একটি সুন্দর মূর্ত্তি গ্রন্থে চিত্রিত আছে, কিন্তু ডিরি ডিরি বিশিষ্ট গথের দ্বারা অদ্ভুত স্বর কল্পনা উপযুক্ত মতে উপলব্ধি হয় কি না, পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কয়েকটি সুচিত্রিত যন্ত্রের আদর্শ সহিত যন্ত্রাধ্যায়ের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত বলিয়াই গণনা করিতে হইবেক। ইহাতে সকল যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই, এবং যন্ত্র সম্বন্ধীয় উৎপত্তি, উন্নতি এবং প্রকাশের উপযুক্ত ইতিহাসও নাই। মৃদঙ্গ হইতে মাদল কি মাদল হইতে মৃদঙ্গ হইয়াছে, ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক। গ্রন্থকার কহেন, "বিয়ালা" সারঙ্গী হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। এই সঙ্কল্পের আকর কি? ভাল, "আমরা যেন বড় লোকই" হইলাম, এবং সারঙ্গী হইতে বিয়ালাই যেন হইয়াছে, কিন্তু উভয় যন্ত্রের মধুরতা ও শক্তি বিবেচনা

করিলেই, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় যন্ত্রাধ্যায়ের তারতম্য উপলব্ধি হইবেক।

এই পরিচ্ছেদে তানাধ্যায়ের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অল্পায়তনে ইহা এক প্রকার সম্পূর্ণ এবং উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে নত্যাধ্যায় অতি সামান্য রূপে লিখিত হইয়াছে। নত্যাধ্যায় অতি রমণীয় সামগ্রী। ইহার ইতিহাসের, এবং প্রচলিত এবং প্রাচীন প্রণালীর, এবং সম্প্রদায় সকলের বিস্তারিত বিবরণ সাধারণের পরম উপকারসাধক হইবেক। ভরসা করি, সত্বর এই অধ্যায়ের উচিত সমালোচনা হইবেক।

রত্নাকরের শেষে যে পরিশিষ্টটি লিখিত হইয়াছে, তাহা পরম উপকারের হইবেক সন্দেহ নাই, কেবল রাগমালার মধ্যস্থিত কোন২ রাগ রাগিণী প্রচনদ্রূপ এবং কোন কোন রাগ রাগিণী লুপ্ত হইয়াছে, কোন২ রাগ রাগিণী দেশী, এবং কোন২টি বিদেশী, অথবা মিশ্রিত, ইহার পৃথক২ শ্রেণী থাকিলে আরও উপকারের হইত।

হরিবংশ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া হোগলকুড়িয়া সাহিত্যসংগ্রহভবন হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বেদব্যাসকৃত মহাভারত অন্তর্গত খিল হরিবংশ পর্ব্ব অতি পবিত্র গ্রন্থ। হিন্দুগণ সাদরে হরিবংশ অধ্যয়ন ও পৌরাণিকগণের সমীপ হইতে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি এই অভিনব বাঙ্গালা হরিবংশ দ্বাদশ খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া, কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম, অনুবাদ মূলানুযায়ী ও বিশদ হইয়াছে। ইহা আর চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

প্রথম বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা

উপন্যাস

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে২ দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্ম্মভীতি,এবং লোক লজ্জা, প্রণয় বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর-চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্ত সংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী। এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ, অপাত্রন্যাস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায় স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে, এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিক দংশন স্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন, কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাস্যবৃত্তি স্বীকার করার আর একটী কারণ ছিল। হীরা পূর্ব্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূতা করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে; কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থ সম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপনার নিষ্ফল প্রণয় যন্ত্রণা, সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশপরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয়-সঞ্চার হইল। হীরা হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গল চিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাতদৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হরিদাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল, যে হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এবং তিরস্কৃত এবং অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্ত স্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখন তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্র প্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভু-পত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখন২ কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাঙ্ময়ী হীরার নিকট তাল ফাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিত লোচনে দেওয়ানজীকে কহিল,

"তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমার সেই ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন, নগেন্দ্র বিদেশে যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুর-সন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে; উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতা-পল্লবরন্ধ্র মধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেত প্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছজলের উপর নাচিতেছে। উদ্যান পুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। পুষ্পগন্ধে সুরভি বায়ু যেমন উন্মাদকর, প্রকৃতিস্থ কোন সামগ্রীই তদ্রূপ নহে। এমত সময়ে হীরা অকস্মাৎ লতা মণ্ডপ মধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে, আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন? যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা কহিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আপনার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে এ অবস্থায় কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে ঈর্ষ্যানল জ্বালিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল,—

"তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীত ভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতা মণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল, এবং তখন তাহার কষ্টসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুর মধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিগে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে কালো২ গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক "শ্বশুরা" "শালা" প্রভৃতি প্রিয় সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য একদিন তাঁহার প্রসাদি ব্রাণ্ডি খাইয়া পরদিবস

আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজি বাবুকে তেল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরকল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি আর দত্ত বাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছেল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া২ কে পথ চলে? এক জন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারির বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র২ কেশ গুলি কতক২ শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে২ চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতেই আবার পথে রাত্র হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেননা তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ সব সমান।

রাত্র অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে—সেই বৃক্ষ শিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু২ বৃষ্টি পড়িতেছে। এক২ বার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভালো। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মাগো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দ সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্য কণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন২ বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথ পার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মানুষ? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্ত জন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রচার করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্য দেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটীকে, দুই হস্তদ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে; তথাপি শিশু সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গমপথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখন শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণ কুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞা স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীর মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌চি। শীঘ্র দোর খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে২ স্ত্রীলোকটীকে গৃহ মধ্যে মাটীর উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময় বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমিলিত। নিঃশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশ মত, তাহার আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্কবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু২ কোরে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া, অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটীকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষুরুন্মীলন করিল। দেখিয়া, হরমণি জিজ্ঞাসা করিল,—

"মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধা স্ত্রী কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেকদূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

হর। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আশাপথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পর দিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহাঁর কাশ রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাংঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটা রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপীশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন,

"ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের আবশ্যক নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।"

সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিতেছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন ?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানিনা—কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন "যতবার মরিবার কথা হইল, ততবার তোমার চোখে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথা বার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্র ঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না ? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময় কেন করি ? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল, মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে এক বার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায় ? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সম্বাদ দিলে এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সম্বাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না,

জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি তত দিন বাঁচিব কি ?”

ব্র। কতদূর সে ?

সূ। হরিপুর জেলা।

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন। এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন।—

“আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে, তাহাও আমি জানি না। কেবল এই মাত্র জানি, যে শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে শঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাটীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সম্বাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইহাঁকে মাতৃ সম্বোধন করি। পুত্র স্বরূপ তাঁহার অনুমতি ক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান মাধবচন্দ্র গোস্বামির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। ইতি।

আশীর্ব্বাদ শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।”

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার নামে শিরোনামা দিব।”

সূর্য্যমুখী বলিলেন, “হরমণি আসিলে বলিব।”

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্র খানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে, যুক্ত করে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর ! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাই না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামির মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পঁহুছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যখন যেখানে পঁহুছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেই খানে আমার নামের পত্র গুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশী পঁহুছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান সেই সম্বাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্‌স মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সম্বাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া, কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর ! মুহূর্ত্ত জন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পঁহুছিল ;—মুহূর্ত্ত জন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল। কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরি বারাণসি, কোন্ সুখীজন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্ত লোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা ; আকাশে সহস্র২ নক্ষত্র জ্বলিতেছে —গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিগে চাও, সেই দিগে আকাশে নক্ষত্র !—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে,

বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণী হৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র২ আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এই রূপ আলোকরাজি শোভিত অনন্তশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুদিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পরে পঁহুছিয়াছে —এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে২ বড় হাসি হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে২ ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি, মনে২ আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই না; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কাম সিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতীর দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন উর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতব বাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধি ভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধিলোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপুরা লইলেন। এবং সুরাপান সমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলক-কণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্য পরিহাস সংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখন বা এরূপ প্রকৃত প্রণয়ীর অনুরূপ, স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কার বচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জ্জিত-বাগবুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গসুখ। হীরা ত কখন এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গ পরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষচিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদ কবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথম বসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমর ঝঙ্কারবৎ গুণ২ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্ত্তি প্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্র চিত্তে, সুরারাগ রঞ্জিত কমল নেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া, প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্ত্তি বশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চস্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপ মণ্ডপে বসিয়া, পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষ বশীভূত হইয়া, চিরপাপ রূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযত করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না

বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয় বেধকারী অনুরাগ কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তিহেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্ত সংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সূর্য্যমুখীর সম্বাদ

বর্ষাকাল গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইয়াছে। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে২ ধূমাকার হয়। এমতকালে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরে রাস্তার উপরে একখানা পালকি আসিল। পল্লীগ্রামে পালকি দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পালকির ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল —কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক হইয়া পালকি দেখিতে লাগিল। বউ গুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ্ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল২ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাসারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাতায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পালকি দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বর লোকে অমনি কমিটীতে বসিয়া গেল। পালকির ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পালকির ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেননা তাঁহার পেণ্টালুন পরা, টুপি মাতায় ছিল। কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া, নগেন্দ্র শিব-প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, এক জন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্র নাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, এক জন বাবু আসিয়াছে দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সম্বাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ, তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এ জন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন এখান হতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগে। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। কেহ ২ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পালাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণ রায় কহিলেন, "না; কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িত হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ী রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাশরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে ২ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কি—?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময় হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল!"

নগেন্দ্র নাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহ-প্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে? সে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করুক। কেন, বিধাতঃ! এ সংসার সুখের কর নাই? তুমি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে সুখের সংসার সৃজিতে পারিতে। সংসারে এত দুঃখ কেন?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

এত দিনে সব ফুরাইল

"এত দিনে সব ফুরাইল।" সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পালকিতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে ২ বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল, সুখ? তা ত যেদিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যত দিন মানুষের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না; আশা ফুরাইলেই সব ফুরাইল।

নগেন্দ্রের আজ আশা ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয় আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীদারী, ভদ্রাসন বাড়ী, এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগীনেয় সতীশচন্দ্রকে দান পত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখা পড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছু মাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয় আশয়ের আয় ব্যয়ের কাগজপত্র সকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমূখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া এক বার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কার গুলিন লইয়া আসিবেন। সে গুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেই গুলি দেখিতে ২ মরিবেন। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ পর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকা-দ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথ পার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থ মাত্রই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংসা। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত

হইয়া হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজ সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসার স্রোতঃ তেমনি অপ্রতিহত! জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকা সমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে২ মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়া অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়-শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার্ ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে, ধন সম্পদ মান, রূপ যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গ সুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে, যে আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে। আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে, সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার্ এমন ছিল? সংসারে

সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতে আশা, পরলোকে পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?”

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী, পথ হাঁটিয়া২, পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ২ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেই খানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, ইহ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহ ত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধবের আর কোন সংশ্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমিও সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে২ অনাথিনী স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজ ব্যয়ার্থ রাখিলাম, সে অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ, আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?” তখন চক্ষে হস্তাবরণ করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমত সময়—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্ত বাহিত কানবাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া, নীরবে এক খানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন, মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন, এবং পত্র পাইয়া মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সন্ধান পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন! ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না—"সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন"—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। এখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও

বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না ; মনে২ করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেই খানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধুলিধূসরা, নীরবে রোদন পরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্ত প্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন, কে সে বালকরোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা২ শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা২ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেননা গত কল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগে। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রী। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমাকে পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে

প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সম্বাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সম্বাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কাল গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগে। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন ?

শ্রীশ। সে সকল কাল বলিব।

নগে। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশ বৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা, এবং চিকিৎসা ও প্রায়ারোগ্যলাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন, সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে২ নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে ? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি ?"

শ্রী। আজি আর সে সকল কথায় কাজ কি ? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া মহাপরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন ;

বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত, তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প২ করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিগে আসিয়াছিলেন।"

নগে। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

নগে। তিনি ত একটী পয়সাও লইয়াও বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রী। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল !!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেননা নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া আছেন; চারি দিগ হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারিদিগে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে, তাঁহার সিংহাসন চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারি পার্শ্বে শত২ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনা বিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখি! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরব হইয়া বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল!"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন। এক দিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।

নগে। সে ব্রাহ্মণের নাম কি, ও বাটী কোথায় ?

নগেন্দ্র মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোনরূপে তাহার সন্ধান করিয়া প্রত্যুপকার করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?"

শ্রী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলকট্রেনে গিয়াছিলেন ; এ পর্য্যন্ত হাটিয়া ক্লেশ পান নাই।

ন। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল ?

শ্রীশ। না ; সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কতদিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন ? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠ লগ্ন হইয়া, তাঁহার কাঁদে মাতা রাখিয়া, রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী আসিয়া এপর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকের রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে, আব মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্যে অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এককড়া কানা কড়ি। কেননা দেবেন্দ্রের প্রেম, বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন২ কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে একদিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, একদিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ক চুত ফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্ম্ম পীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, শেষ সাক্ষাৎ দিবসে, হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়া-

ছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম ; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাতায় লইয়া গৃহে যাও।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক ঘূর্ণন স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুত হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণ সংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজ বিষ, সর্পবিষাদি নানাপ্রকার সদ্য প্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে ; সদ্য প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার ?"

চণ্ডাল শিয়ালের গল্প বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে ; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিষে ধরিবে।"

হীরা কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্ট দেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া

বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চণ্ডালকে দিল। চণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।"

চণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া, মনে২ কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নইলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া পরে মরিতে হয়, মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

হীরার আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে২ গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে মুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড়বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি২ যাইতেছিল, পশ্চাৎ২ বালকের পাল, এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে২ করতালি দিতে২, এবং নাচিতে২ চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপবিশিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের

বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল—এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবানদিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়ন কালে কোন বালক বলিল ;—

রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পলাবে ?

কেহ বলিল ;—

রাম সিং পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখলে দৌড়মারে পুকুরের পাড়ে।

কেহ বলিল ;—

লালচাঁদ সিং
নাচে তিড়িং মিড়িং
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।

বালকেরা দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্২ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া, বুড়ী কহিল ;—

"হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা ?"

ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার"। বুড়ী কহিল, "আর বাবা, চোকে দেখতে পাইনে—বয়স হইল পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোনই হয়—আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটি বেটা ছিল তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও"—বলিয়া বুড়ী—হাঁউ—মাউ—খাঁউ করিয়া উচৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর ?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবন চরিত আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং অনেক কাঁদা কাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল—"এখন তুই চাহিস কি ? তোর কি হইয়াছে ?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবন চরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার, ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবন চরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেননা তাহাতে আত্ম পরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতে কখন মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখন কখন একা হাসে—একা কাঁদে, কখন বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখন চীৎকার করে। কখন মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধি চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার নাতিনীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বৈকি। উহাকে খুব গরমে রাখিস, আর এই কাষ্টর-ওয়েলটুকু লইয়া যা—কাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।"

বুড়ী কাষ্টর-ওয়েলের সিসি হাতে, লাঠি ঠক২ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁগা? কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল- "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। ত তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হতে পারে। আচ্ছা, হীরের আয়ি, তোর নাতিনীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরের আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়স দোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাছুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনেছি, তাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সমুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর্! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম কর্‌তে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে২ পায়রার বাসা, কড়িতে২ চড়াই। বাগানে শুকনা পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিসপত্র সব ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে, ছুঁছা বিছা বাতুড় চামচিকে অন্ধকারে২ দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখী গুলাকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও২ উচ্ছিষ্টাবশেষ পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁস গুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূর গুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরু গুলার হাড় উঠিয়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুক্কুর গুলার স্ফূর্ত্তি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পালাইয়া গিয়াছে। ঘোড়া গুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড়কুটা; শুকনা পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখন পায়, কখন পায় না। সহিষেরা প্রায় আস্তাবলমুখা হয় না; উপপত্নীর গৃহেই থাকে। অট্টালিকার কোথা আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথায় খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেণ্টের উপর বসুধারা, বুককেশের উপর কুমীরকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়াইয়ের বাসার খড়কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মী ছাড়া হয়।

যে উত্থানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখন একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহ মধ্যে তমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজনে খাইত পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক ছুড়২ করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানকে যে পত্রগুলিন লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না—সেই গুলিন পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুখাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্র গুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক, সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভাল বাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয় খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা কুন্দের নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্র দিন ভাবে, রাত্র দিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভাল বাসুন—তাকে ভাল বাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল। কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখনও মরি না কেন?" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সম্বাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু২ মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে তবে মরিব। আর তার সুখের কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাত নাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজিষ্টি হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুর গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দান পত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন, ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রী ছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসা বাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন—নগেন্দ্র আসিতেছেন, সম্বাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সম্বাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে২ হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতিন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা

বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতিনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে"— তোমার সতিন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তাহলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম২ কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন্—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে— কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাস্‌ব না?" এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বট পত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজ মজূর, ফরাশ, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সে খানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা বাদুড় চামচিকে মহলে বড় কিচিমিচি পড়িয়া গেল; পায়রা গুলা "বকম২" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ই গুলা পলাইতে ব্যাকুল—যেখানে সাসী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া, ঠোঁঠে কাঁচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে২ দিকে২ দিগ্‌বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে, পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব

দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যাপ্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে, পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির—এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কক্ষটী প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা পল্লব-ফল পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র২ বিহঙ্গম সকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। এক পাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হাস্তিদন্তরচিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্রবস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয় খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতি নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরাজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। এক খানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বত-শিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চারণ করিতেছেন। লতা গৃহদ্বারে নন্দী, বাম প্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কানন-শব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যান ভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে২ বসন্তের উদয়। অগ্রে, বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত।

মস্তক নমিত হওয়াতে, অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে ; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে ; দূরে হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্ত প্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছে। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন ; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্য মার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা, নিম্নে, পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান চতুস্পার্শ্বে নানা বর্ণের মেঘ,—নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে, আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গ সকল হীরক রাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে—"সৌধকিরীটিণী লঙ্কা"—তাহার প্রাসাদাবলির স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে, শ্যাম শোভাময়ী "তমাল তালবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবীসেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদিগের পতাকা শ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন; অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে; সুভদ্রা আপন সারথ্য নৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিতেছেন, কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি২ হাসিতেছেন ; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলকা সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদ বিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর এক খানি চিত্র, সাগরিকা বেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমাল তলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন ; লতা পুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর এক খানি চিত্রে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না—

যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া, সিংহশাবক তুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধ যাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটীতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ; তাহার পাশে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলা যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদ খণ্ডবৎ, নানালঙ্কার ভূষিত, প্রৌঢ় বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে, নানা রত্নাদি সহিত সুবর্ণ রাশি স্তূপকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী; উন্নতদেহ, পুষ্টকান্তি, নানাভরণ ভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু২ ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ, তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামীপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষণ্মাত্র অধর প্রান্তে হাসি হাসিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন, শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিগে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো

করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত২ পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে সোনা রূপার তুলা ?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষ মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প২ বৃষ্টি হইতেছিল। এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে২ বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে২ মুক্ত ছিল, সেই খানে২ বজ্রতুল্য শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল ঝন্২ শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটী দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া, কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন!

নগেন্দ্র ভূয়ো২ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয়চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্র পুত্তলী সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমশয্যা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে তুইটি ছোট২ বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি২ হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে

অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোক লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া"। নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণ মানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামিকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া, দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবিরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী এক স্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

"১৯১০ সম্বৎসরে।
ইষ্ট দেবতা স্বামির স্থাপনা জন্য এই মন্দির তাঁহার দাসী
সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ২ লোপ হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া২ পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে২ দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাসত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিগে কবাট তাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকার তুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝা বাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিগে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্ত দ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত, এবং হস্ত-

পদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি, সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্যা হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্য প্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃ সঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল তুই তিন বিন্দু উষ্ণবারি নগেন্দ্রের কপোল দেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে, ধীরে২ রুদ্ধ নিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্বদিগে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ হইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে২ দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমত আলো নাই যে মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক২ উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে, অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন,

"তুমি দেবতাই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপাল দোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তীরবৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। কক্ষপার্শ্বে উদ্যান মধ্যে বৃক্ষে২ পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন্ আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্র সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত?" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ার মুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদু২ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবন সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন

করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তকন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

যথা সময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে, তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহ দাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত ; তাহার একটি মরিয়া রহিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে রুগ্ন সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। গ্রামের গোমস্তার নিকট হরমণির কিছু টাকা গচ্ছিত ছিল। হরমণির মৃত্যু যথার্থ হইলে টাকা সে নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সে সেই কথা যত্ন করিয়া প্রচার করিল। বলিল 'আমি চিনিয়াছি, হরিমণিই বটে।'

সেই প্রকার সুরতহাল করাইয়া দিল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন, যে তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পঁহুছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব দিন এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কালি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পঁহুছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম তখনও খিড়কী দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে, সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা! দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভাল বাসনা। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবেক

আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে ? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন, "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব ?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে ; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে ; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখ ভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধস্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি

হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য মতাবলম্বিরা বলিতে পারেন, "মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল কে? যে ভোগ করিল, সেই আত্মা।" এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেই রূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। উহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এদেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন।

এই মত পরিশুদ্ধ বলিয়া আমরা গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমরা সে মতাবলম্বী নহি। মস্তিষ্ক ভিন্ন, আর কাহারও অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই —প্রমাণাভাবে আত্মার কল্পনা করিতে বলি না। বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত সাংখ্য দর্শনে, এই আপত্তিও অবিবেচিত ছিল না। সাংখ্যদর্শনে মনোবৃত্তি সকল আত্মা হইতে ভিন্ন। মন, বুদ্ধি, "মহৎ" এ সকল আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিদগণের মতের ন্যায় প্রাকৃতিক পদার্থ (Matter) বলিয়া সাংখ্যে গণা হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ এ সকল হইতে ভিন্ন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতি ঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গ বিশিষ্ট নহে। (১ অধ্যায় ১৫ সূত্র) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জক ভাবোপি দেশব্যবধানাৎশ্রুঘ্নস্থ পাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই, কেননা তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশ ব্যবধান বিশিষ্ট। যেমন এক জন পাটলীপুত্র নগরে থাকে, আর এক জন শ্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে, দেশ ব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেই

রূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখ নিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ স্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ; (৬, ৭০)

সাংখ্যের মত এই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তবে, ইহা বক্তব্য যে, যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যদি আত্মাই সুখ দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্য দর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই "যদি" গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিববাদী এখনই বলিবেন,

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ? শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখ দুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ দুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহ নাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব মানিতে হয়, মানিব, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শন শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহ ধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরা মরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্য দর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই শক্তি," (Knowledge is Power) হিন্দু সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই মুক্তি।" দুই জাতি, দুইটি পৃথগ্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহই নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তির অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দ্যেশ পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা এক মাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তি সকল অতি প্রবল, অস্থির, অশাসনীয়, কখন মহা মঙ্গলকর, কখন মহা অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানিরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্র সকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্য-জাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপণিষৎ, আরণ্যক, এবং সূত্রগ্রন্থ সকল কেবল ক্রিয়া কলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। ইহার ফল মহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা

হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেক-শূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার প্রথম বলিলেন, কর্ম্ম, অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান, পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানেই মুক্তি। কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। জ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত হইতে লাগিল। অন্যান্য দর্শনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শাক্য সিংহের পথ পরিষ্কার হইল।

বঙ্গদর্শনে, প্রয়াসসঙ্কলিত বিচিত্র সূত্রগ্রথিত যে দুশ্ছেদ্য সংশয় জালে কালিদাস আবৃত হইয়াছেন, তাহার কিয়দংশমাত্র উত্তোলন করিয়া কবির মুখ নিরীক্ষণে প্রয়াস পাইয়াছি।

দক্ষিণাবর নাথকৃত রঘুবংশের প্রথম সর্গের টীকা আমি দেখিয়াছি। তিনি উহাতে রামায়ণ, মনু, পরাশর, ভগবদ্গীতা, দণ্ডী, অমরকোষ, ধরণি, শাশ্বত, হলায়ুধ, সংসারাবর্ত্ত, কামন্দক, মাঘ, ভট্টি প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং টীকার শেষভাগে লিখিয়াছেন ;—

"টীকাম্ অবক্রাং রঘুবংশকাব্যে
শ্রীনাথকো যাং কৃতবান্ বিমৃশ্য।
তস্যাম্ অগাচ্ চারুরয়ং সমগ্রঃ
সর্গঃ প্রসিদ্ধঃ প্রথমঃ পৃথিব্যাং ॥
রূপাদি সন্দেহতমো বিহন্তুং
কাব্যার্ণবং চাদ্ভুত মুত্তরীতুং।
একৈব কার্য্যদ্বয়সন্বিধাত্রী
টীকা বুধানাং তরণীযতাং মে ॥"

কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, ইতি "শ্রীমন্মহোপাধ্যায় **কোলাচল মল্লিনাথ** সূরিবিরচিতায়াং রঘুবংশ টীকায়াং বশিষ্ঠাশ্রমাভিগমনো নাম প্রথমসর্গঃ ॥ ১ ॥"

অজ্ঞ লেখকেরা প্রায়ই এইরূপ ভ্রমে পতিত হন। আচার্য্য গোল্ড্ষ্টুকার লিখিয়াছেন যে, ইষ্টইণ্ডিয়া হাউস গ্রন্থালয়ে তিনি কুমারিল্ল ভাষ্য সমেত মানব কল্পসূত্র প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থের উপরি ভাগে "ঋগ্বেদ কুমারেলভাষ্য সং" লেখা থাকায় উহার অস্তিত্ব বহুকাল অপ্রকাশিত ছিল। "জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি" ইত্যাদি ধ্রুবাত্মক একটী সুন্দর ভবানীস্তোত্র

আছে। কাশ্মীর ও কাশীদেশস্থ হস্তাক্ষরগ্রন্থে উহা শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু সম্প্রতি একটী গ্রন্থ পাইয়াছি, যাহাতে স্তোত্র রচয়িতা আপনাকে শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

মল্লিনাথ স্বীয় টীকায় মাধব বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ১৪০০ শ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব মল্লিনাথ তদপেক্ষা প্রাচীনতর নহেন।

লাসেন মতে কালিদাস ২ শ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র গুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কালিদাস ৩২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, স্বীকার করিলে এ নির্ণয় তাদৃশ অসঙ্গত নহে। কিন্তু "কবিবন্ধু," "কাব্যপ্রিয়" প্রভৃতি উপাধি মাত্র অবলম্বন করিয়া, এক জন নির্দ্দিষ্ট কবি তাঁহার সভায় ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বেণ্টলি যে বিক্রমাদিত্যকে ভোজের পরকালবর্ত্তী করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। ভোজপ্রবন্ধের মধ্যেই একাধিকবার বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে। অতএব "শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত," এ সিদ্ধান্তও অমূলক। উক্ত প্রবন্ধে ভট্টিকাব্যের উল্লেখ আছে, যথা,—"ভট্টির্নষ্টোভার-বীয়োঽপিনষ্টঃ" ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রীর মতে ভোজপ্রবন্ধ ১২০ শ্রীষ্টাব্দে * রচিত। তাহা হইলে বল্লালকে ভবিষ্যজ্ঞ ও অতএব অপ্রামাণিক বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে ভবভূতি ৭০৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু তাহার ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ!

শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলন কর্ত্তৃগণের মতে সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের বিবরণ উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধেয় বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। গল্প মাত্রের ঐতিহাসিক বিষয়ে অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা বিচক্ষণ বটে, কিন্তু সেই রীতি অনুসারে কথাসরিৎসাগরের অপ্রামাণ্যতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কথাসরিৎসাগরের প্রমাণানুসারে কাত্যায়নকে পাণিনির সমকালবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের প্রতি আচার্য্যের প্রত্যুত্তর কি বিস্মৃত হইয়াছেন?

---

* মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গদর্শনের কালিদাস বিষয়ক প্রস্তাবে ১২০০ পরিবর্ত্তে ১২০ শ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এটী সংশোধন করিয়া লইলেই কোন ভ্রম থাকিবে না। কালিদাস সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন ঐ প্রবন্ধটি পুনঃমুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে ভ্রমটি সংশোধিত হইয়াছে। বং দং সং।

মহাত্মা কোলব্রূক লিখিয়াছেন যে, কিম্বদন্তী আছে, শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এরূপ দীর্ঘকালের কিম্বদন্তী যে একবারে ভ্রমশূন্য হইবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বর্ত্তমান বৎসর হইতে গণনা করিলে খ্রীঃ পূঃ ৫২৮ লব্ধ হইল। অতএব শ্রীদেব কৃত বিক্রমচরিত মতে তাহার ৪৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৮ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন। এ নির্ণয় কি অত্যন্ত অসঙ্গত ?

জ্যোতির্ব্বিদাভরণের ২০ নং শ্লোকে যে "কিয়দ্‌ক্রুতিকর্ম্মবাদঃ" আছে, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মতে উৎকল দেশপ্রচলিত স্মৃতিচন্দ্রিকাভিধ বেদোক্ত কর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ।

ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না, এ কথা আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। যমককাব্য ব্যতীত নীতিসার নামক ২১ শ্লোকাত্মক কাব্য আছে। কালিদাস কুমারসম্ভবের প্রথমসর্গের তৃতীয় শ্লোকে হিমালয়ের হিমের বিষয় লিখিয়াছেন যে, "একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।" এই উপমা লক্ষ্য করিয়া ঘটকর্পর নীতিসারে কহিয়াছেন, "একোহিদোষোগুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন, দারিদ্র্য দোষোগুণরাশিনাশি।" যমককাব্যের শেষেতেও "তস্মৈ বহেরমুদকং ঘটকর্পরেণ" বলিয়া শ্লেষতঃ আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নবরত্নশ্লোকোল্লিখিত অন্য কতিপয় ব্যক্তিরও গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে। ধন্বন্তরিকৃত আয়ুর্ব্বেদ, অমরসিংহরচিত অমরকোষ, বেতালভট্ট প্রণীত নীতিপ্রদীপ, বরাহমিহিরকৃত লঘুজাতকাদি জ্যোতিঃশাস্ত্র, বররুচি প্রণীত প্রাকৃত প্রকাশ ও নীতিরত্ন, এ বিষয়ে প্রমাণ। অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অন্যান্য কাব্য ধ্বংসিত হয়। ক্ষপণকের নাম দেখিয়া অনুমান হয় যে, তিনিও বৌদ্ধ।

কিন্তু সম্প্রতি দুইটী হস্ত লিখিত যমক কাব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; একটী মূল মাত্র, দ্বিতীয়টী সটীক। উভয়েতেই উহা কালিদাস রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত।
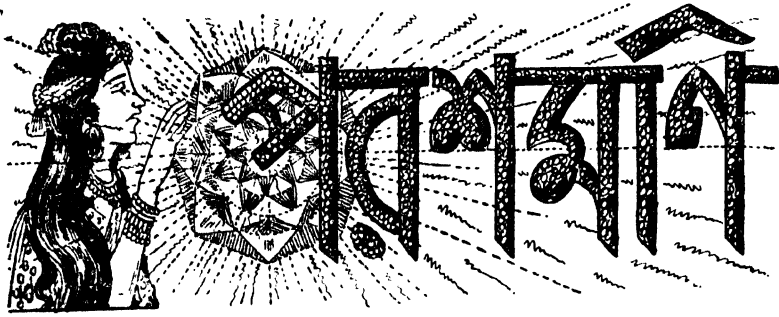
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,

বিধাতা নির্ম্মিত চারু মানব নয়ন।

পরশ মণির সনে, লৌহঅঙ্গ পরশনে,

সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন—

এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,

বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।

কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,

ইহারি পরশগুণে মানব বদন

দেবতুল্য রূপ ধরে, আছে ধরা আলো করে,

মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,

কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,

কোথা বা নক্ষত্র শোভা গগনে ফুটিত!

কে রাখিত চিত্রকরে চাঁদের মালতী ধরে,

তরঙ্গ মেঘের অঙ্গ করিয়া রঞ্জিত ?

কে আনিত ধরাতল বিমল গঙ্গার জল—

ভারতভূষণ করি ছড়ায়ে রাখিত ?

কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,

মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী ঢাকিত ?

ইন্দ্রধনু-আলো তুলে, সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,

কে বল শিখির পুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিত ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল,　　হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী অঙ্গে,　　নয়ন মণির সঙ্গে,
না হয় মানবচক্ষে আনন্দদায়িনী !—
নদীজলে মীন খেলে,　　বিটপীতে পাতা হেলে,
চড়াতে বালুকা ফুটে, ঘাসেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়,　　পিপিলী শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী,
তাতেও আনন্দ হয়,—　　অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ লতা, তমিস্রা রজনী ।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশ বলে　　সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে ;
শিখিয়া প্রেমের বেদ,　　ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয় আহ্নিক করে সুখের সাগরে ।
ধন্য এই ধরাতল,　　প্রেম-মালিনীর জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি,　　যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনোসুখে পৃথিবী উপরে ।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি,　　পায়রে মানবে বিধি,
গেল চলে চিরদিন অই-আশা ধরে !

৫

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল,　　ফুটায় ইহার মূল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন !
জননীবদনইন্দু,　　জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শতশশি রশ্মিমাখা,　　চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,

সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

আমরা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্রমশঃ নব২ প্রবন্ধ প্রাচীন পুরাবৃত্তপ্রিয় পাঠকবর্গের করকমলে উপহার প্রদান করিতেছি। এ সকল অনুসন্ধান ভ্রমবিহীন হইবেক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। তবে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর, প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ করিব, তাহাতেও যদি ঐতিহাসিক কোন ভ্রম থাকে, তবে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। গতবারে কালিদাসকে আধুনিক স্থির করায় কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ন নহি। ঐতিহাসিক সত্য গোপন রাখা কোন মতেই উচিত নহে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ—"

নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত একখানি পুস্তকে * নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লার্ড বায়রণ, থ্যাকারী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণের ভূতযোনিবিরচিত প্রস্তাব কলাপ প্রকাশিত হইয়াছে; আমাদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে বোধ হইতেছে, বররুচির ভূতযোনি এখানি রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এই আধুনিক আদিরস ঘটিত গল্প "নবরত্নের" রত্ন বিশেষ বররুচিকৃত কখনই হইতে পারে না। ইহার রচনাচাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাব সম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত "অশ্লীল কবিতা" দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গদেশীয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রতীয়মান হইল। ইহাতে ভারতচন্দ্র

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্। মহাকবি বররুচি বিরচিতম। সংস্কৃত ব্যাখ্যায়ানুগতম্ কলিকাতা রাজধান্যাম্। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিতম্॥

* Strange Visitors.

কৃত বিদ্যাসুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে "চোরপঞ্চাশৎ" আছে, তাহা চোর কবি বিরচিত। বররুচি দুই ব্যক্তি। কাত্যায়ন বররুচি ও বররুচি। ভট্ট মোক্ষমূলর এই দুই বররুচিকে এক ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ইষ্টিণ্ডিয়া হাউসের" পুস্তকালয় স্থিত আত্মানন্দকৃত ঋক্‌বেদ ভাষ্যে, "সর্ব্বানুক্রমণি" মধ্যে "অত্র শৌনকাদি মতসংগৃহীতুর্বররুচেরনুক্রমণিকা" এই পঁক্তি পাঠে ভ্রম হইয়াছে। "সর্ব্বানুক্রমণি" কাত্যায়ন বররুচিকৃত, তৎকৃত মাধ্যান্দিন প্রাতিশাখ্যও প্রসিদ্ধ। ইনি পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা এবং বৈদিক কল্পসূত্র প্রণেতা। "কথাসরিৎসাগরে" লিখিত আছে, পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের অনুচর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্য লোকে কাত্যায়ন বা বররুচি * নামে কৌশাম্বী নগরীতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতধর হইবে এবং বর্ষ হইতে ইহার সমস্ত বিদ্যালাভ হইবে; বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং সমুদায় বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্য ইহার নাম বররুচি হইবে" ‡ যথা মুল সংস্কৃত গ্রন্থে ;—

এক শ্রুতধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি ॥
নাম্না বররুচি লোকে তত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্বরং ভবেত্‌কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগু পারমত্‌ ॥

তিনি অতি শৈশবাবস্থায় নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া সেই নাটকখানি তাঁহার মাতার সমীপে অবিকল কণ্ঠস্থ বলিয়াছিলেন, এবং তখন তিনি তাদৃশ শ্রুতধর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ব্যাড়ির নিকট একবার প্রাতিশাখ্য শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ না দেখিয়াই তাহা সমুদায় আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবের কৃপায় পাণিনি অবশেষে জয় লাভ করিলেন। কাত্যায়ন, পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়নান্তর তাহার বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। এই "কথাসরিৎসাগরের" মতানুসারে তিনি নন্দের মন্ত্রীর কার্য্যও করিয়াছিলেন।

* ততঃ স মর্ত্যবপুষা পুষ্পদন্তঃ পরিভ্রমত্‌। নাম্না বররুচি কিঞ্চকাত্যায়ন ইতিশ্রুতঃ॥ হেমচন্দ্র কোষে কাত্যায়ন এবং বররুচি এক নাম স্থির হইয়াছে।

‡ বৃহৎ কথার বাঙ্গালা অনুবাদ পৃঃ ১২, প্রথম ভাগ।

সুতরাং তিনি তিন শত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ২ “বৃহৎ কথার” রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, * কিন্তু মিথ্যা গল্পের পুস্তকের এত মান্য করিতে হইলে “আরব্যোপন্যাসও” প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ পাণিনি মুনি কখনই কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী ছিলেন না। এ জন্য “বৃহৎ কথার” প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতেছে। আচার্য্য গোলড্‌ষ্টুকরের মতে তিনি পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৪০ ও ১২০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বররুচি, সদ্‌গুরু শিষ্যের মতে “কর্ম্ম প্রদীপ” প্রণেতা। উহা আদ্যোপান্ত অনুষ্টুপচ্ছন্দে রচিত। এক্ষণে বিক্রমের বররুচির পরিচয় সন্ধান করা আবশ্যক। আমরা শকারি বিক্রমাদিত্য, সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য, এবং উজ্জয়িনীর অধীশ্বর নবরত্ন সভা সংস্থাপক বিক্রমাদিত্য, এই তিন জন বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য পাইয়াছি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নৃপতিদ্বয় শক প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য; তৃতীয় বিক্রমাদিত্য “রাজতরঙ্গিণীর” মতে যদিও শকদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত নহেন। পুরাকালে শক জাতিরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিত, এ জন্য হিন্দু ভূপালবর্গ সর্ব্বদা সসজ্জিত থাকিতেন। কাজেই আমাদিগের তৃতীয় বিক্রম, যিনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত, তিনিও তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কার্য্য করিয়া তিনি স্বীয় অব্দ প্রচলিত করেন নাই। আমরা এই সকল কারণে প্রথমোক্ত দুই বিক্রমাদিত্যকে “কালিদাসের” বিবরণে শক প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়াছি। “জ্যোতির্বিদাভরণ” নামক কালজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বররুচি সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের সভার “নবরত্নের” অন্তর্ব্বর্ত্তী, কিন্তু যখন উহা একজন জাল কালিদাস কৃত, এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সকল অনৈক্য প্রমাণ হইতেছে, তখন উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য বোধ করা অন্যায়। “ভোজ প্রবন্ধে” লিখিত আছে, “অথ ধারানগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্। বররুচি সুবন্ধুবাণ ময়ূর রামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিঙ্গ কর্পূর বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।”

সেই ভোজ মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীসাহসাঙ্ক নামে খ্যাত, যথা রাজ শেখর;—

* শ্রীরামায়ণ ভারত বৃহৎ কথানাং কবীন্নমস্কুমঃ।
ত্রিস্রোতা ইবসরসা সরস্বতী স্ফুরতিযেভিন্না॥

ভাসো রামিল সৌমিলৌ বররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবি মেঘো ভারবি কালিদাস তরলাঃ স্কন্ধঃ সুবন্ধুশ্চয়ঃ।

এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুবন্ধু তাঁহার ভাগিনেয় (*)। ইঁহাদিগের উভয়ের নাম এবং কালিদাসের নাম বল্লাল মিশ্র এবং রাজ শেখর লিপিবদ্ধ করিয়া ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্কের পার্ষদ স্থির করিয়াছেন। ভোজ বা শ্রীসাহসাঙ্ক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবর সেনের সমসাময়িক, উজ্জয়িনীর শ্রীমন্ বিক্রমাদিত্য বা হর্ষ বিক্রমাদিত্যও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে। সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, ও তাঁহার রাজ্ঞী লোকান্তরগত হইলে বাসবদত্তা রচনা করেন (†) এবং বাসবদত্তার প্রারম্ভে বিক্রমাদিত্য মানবলীলা সম্বরণ করাতে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন ; যথা—

সারসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তিচরনোতিনোকঙ্কঃ
সরসীবকীর্ত্তি শেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

এই সকল প্রমাণে বোধ হইতেছে, হর্ষ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু, কালিদাস, এবং বররুচি বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহবান্ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বররুচি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি ভোজ রাজের পৌরোহিত্য করিতেন এবং তাঁহার এক মাত্র আশ্রয়পাদপ ভোজের মৃত্যুর পর তৎকৃত "ভোজ চম্পূ" সম্পূর্ণ করেন। বররুচি প্রণীত "প্রাকৃত প্রকাশ" এক খানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ। তাঁহার কৃত "লিঙ্গ বিশেষ বিধিকোষ" অতি প্রসিদ্ধ। মেদিনীকার এবং হলায়ুধ তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নামে "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

---

* ইতি শ্রীবররুচি ভাগিনেয় সুবন্ধু বিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

† কবিরয়ং বিক্রমাদিত্য সভ্যঃ। তস্মিন্ রাজ্ঞী লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্ নিবন্ধং কৃতবান। নারসিংহ বিদ্যা।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিজো বলিয়াছেন যে, উন্নতিই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুজাতি সভ্য বলিয়া গণ্য নহে। এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করাতে কোন ফল নাই। কারণ, গিজোর সঙ্কল্প এই যে, স্বভাবতঃ লোকে যে সকল জাতিকে সভ্য বলিয়া গণনা করে, সেই সকল জাতির প্রকৃতিই সভ্যতার লক্ষণ। ইউরোপীয়েরা সকলেই কেবল আপনাদিগকে সভ্য এবং অন্যান্য জাতিকে অসভ্য জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক কালে হিন্দুরাও অহিন্দু মাত্রকে অসভ্য ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মতে সভ্যতার লক্ষণ বিভিন্ন হইবেক, ইহাতে বিচিত্র কি ? ফলতঃ সভ্যতা পদার্থের যদি কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে, তবে সভ্যতা শব্দে সকল ভাষাতেই ঐ সমস্ত লক্ষণ বুঝান উচিত বটে। কিন্তু উহার মধ্যে কোন২ অঙ্গ সভ্যতার লক্ষণ নহে বলিয়া জাতিবিশেষ তাহা পরিত্যাগ করিলে, সভ্যতা পদার্থটী কখন অঙ্গহীন হইবেক না ; কেবল উক্ত জাতির ব্যবহৃত ভাষানুসারে সভ্যতা শব্দের বিভিন্ন অর্থ সম্পাদিত হইবেক। অতএব ইউরোপীয়দিগের মতে হিন্দুরা সভ্যপদের বাচ্য নহেন, এ কথা বলিলে হিন্দুদিগের অবমাননা না হইয়া ইউরোপীয় ভাষা সমগ্রে সভ্য শব্দের অর্থ বিভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্তও হইতে পারে। ইহাতে স্বজাতির গৌরব করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে ; কারণ পক্ষান্তরে ম্লেচ্ছ শব্দের নিন্দাও এই হেতুতে অপনীত হইবেক। কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিলে ইউরোপীয় মাত্রেই অসভ্যপ্রধান বলিয়া অতিশয় বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু জাপান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত যে কোন বিবেচক ব্যক্তি ইহাকে অবলোকন করিবেন, তিনি তাঁহাকে ভক্তিই না করুন, তাঁহার সহিষ্ণুতা গুণের ভূয়সী প্রশংসা অবশ্যই

করিবেন। ইহার নিগূঢ় এই যে, কাহাকে দোষ এবং কাহাকে গুণ বলে, তদ্বিষয়ে সকলের ঐকমত্য নাই। সদগুণের সংস্কার হওয়াই সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ। যাহারা সভ্যসমাজে থাকিয়াও সদ্‌গুণ অভ্যাস করিতে পারে নাই, তাহারা কুলাঙ্গার এবং কদাচ সভ্য পদবীর যোগ্য নহে। আবার সকল পাত্রে সমস্ত গুণ কখনই যুগপৎ পাওয়া যায় না—অতএব সকলে তুল্যরূপ সভ্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। পৃথিবীস্থ নানা জাতির আচরণ অবলোকনপূর্ব্বক প্রত্যেক জাতির সদ্‌গুণ সমূহ একত্রিত করিয়া সভ্যতার লক্ষণ স্থির করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে প্রকাশ হইবেক যে, সদ্‌গুণ অভ্যাসই সভ্যতার লক্ষণসমূহের সাধারণ প্রকৃতি।

সভ্যতা যে অভ্যাসগত গুণ, ঐক্য ধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গালির সহিত ইউরোপীয় জাতিগণের তুলনা করিলে তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐক্য সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অবশ্যই গণ্য। আমরা সকলেই ঐক্যকে ভাল বলি; ঐক্য লাভ করিতে লোককে পরামর্শ দিই—কিন্তু কার্য্যে এক হইবার সময়ে আমাদিগের পৈতৃক অযোগ্যতা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচজন সামান্য ইংরাজ নানা বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও প্রয়োজন স্থলে অনায়াসে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহায়তা করিবে; কিন্তু দুই জন ভদ্র বাঙ্গালি পরমবন্ধু হইলেও দশ দিন কাল উভয়-নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম যথাযোগ্যরূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন না। অসভ্য জাতিগণ সরদারের আদেশানুসারে কর্ম্ম করে। এবং সর্ব্বত্রই নির্ব্বোধ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐরূপে কার্য্য করিয়া থাকে; এতাদৃশ লোকের ঐক্যসাধনের মূলীভূত হেতু এই যে, ইহাদিগের মন নানা বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় না, সুতরাং সময় বিশেষের জাগরূক বাসনা একমাত্র বলিয়া সকলে তাহারই অনুগামী হয়। কিন্তু ইহারা কিছু কাল পরেই আবার মতিচ্ছন্ন হইয়া পরিশেষে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

যাঁহারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বেচ্ছাচার দমন করিয়া সকলে একমতে কার্য্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ঐক্য ধর্ম্মধারী। ইচ্ছা করিলেই স্বেচ্ছাচার বৃত্তি দমন করা যায় না। ইচ্ছা সকল সময়ে তুল্য প্রকার বল ধারণ করে না; অতএব ভিন্ন২ ব্যক্তির মনে একই ইচ্ছা একই সময়ে প্রবলা হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। তবে কোন কারণবশতঃ কোন জাতির বহুকাল পর্য্যন্ত অগত্যা ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে, তাহারা ক্রমশঃ এই গুণ

অভ্যাস করিয়া লয়। আর যে সমাজে লোকে সর্ব্বদা এক বাক্যে কার্য্য করে, তাহাদিগের সংসর্গে থাকিলে ঐ গুণ সহজেই অভ্যস্ত হইয়া যায়—এবং পুরুষানুক্রমে এইরূপ অভ্যাস হইলে ঐক্যের প্রয়োজন স্থলে লোকে সামান্য বিরোধ বিস্মরণ করিয়া শত্রুর সঙ্গেও এক বাক্যে কার্য্য করিতে পারে।

ঐক্যের দুই লক্ষণ। উদ্দেশ্যের একতা এবং কার্য্যকারকদিগের পরস্পরের সহায়তা। লক্ষণদ্বয় সর্ব্বতোভাবে পৃথক। প্রথমটী থাকিলেই যে দ্বিতীয়টী সহজে উপস্থিত হয়, এমত নহে। এক উদ্দেশ্য অনেক লোকের থাকে, কিন্তু তৎসাধনার্থ পরস্পরের সাহায্য করিতে সকলেই ইচ্ছুক বা সক্ষম হয় না। ঐক্য রক্ষার জন্য দলের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসুক হওয়া আবশ্যক, যেন তিনি ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইবেক না। গুরুতর কার্য্য এক ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর বলিয়াই ঐক্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; তাহাতে যদি কার্য্যকারকেরা স্ব২ ক্ষমতার অংশ মাত্র নিযুক্ত করেন, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন উপকার দর্শে না। কার্য্য নির্ব্বাহ করাই ঐক্যের উদ্দেশ্য, তৎপরিবর্ত্তে শ্রম লাঘবকে উদ্দেশ্য জ্ঞান করিলে কার্য্যের ক্ষতি অবশ্যই হইবেক। কারণ লোক বৃদ্ধিতে স্বভাবতঃ অনেক দৌর্ব্বল্যের হেতু উপস্থিত হয়। মনুষ্যের মন নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যদি দুই ব্যক্তিকে এক বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ পরিশ্রম আবশ্যক হয়, তবে তিন জনের স্থলে তাহার তিন গুণ এবং চারি জনের স্থলে ছয় গুণ পরিশ্রম প্রয়োজন হইবেক। অতএব বহুসংখ্যক ব্যক্তির মনে একটী উদ্দেশ্য জাগরূক রাখিবার জন্য যে অতিরিক্ত প্রয়াস আবশ্যক, তজ্জনিত ক্ষয় পূরণার্থ তাবৎ লোককে উদ্দিষ্ট কর্ম্ম নির্ব্বাহ সময়ে একাকী নিযুক্ত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। প্রয়োজনাতিরিক্ত লোককে ঐক্যে রাখিতে অনেক বৃথা শ্রম ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কর্ম্মহানি করে। যাঁহারা এক বাক্যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজনীয় কি না, তাহা অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। যদি উদ্দেশ্যটী এতাদৃশ মহৎ হয় যে, লোক যত অধিক হইবেক, ততই সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা হইবেক, তবে উদ্দেশ্যের পূর্ণাবস্থা অসংখ্য লোকেরও অসাধ্য বলিতে হইবেক ; সুতরাং এক ব্যক্তিরও পূর্ণ আয়াসের কিঞ্চিৎমাত্র ব্যতিক্রম হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তদনুযায়ী ব্যাঘাত হয়।

এই সামান্য কথা এতাদৃশ বাহুল্য ভাবে লিখিবার হেতু এই, আমাদিগের মধ্যে অনেকে, প্রত্যেকের আয়াস অল্প হইবেক, মনে করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন এবং পরিণামে বিফলপ্রয়াস হয়েন। এরূপ কার্য্য কুসংস্কার-মূলক। বহুলোকের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিতে হয়, এবং লোকবল থাকিলে এক একটী বিশেষ কার্য্যের ভার পর্য্যায়-ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে প্রদান করা কর্ত্তব্য ; তথাপি এক জনের কার্য্য দুই জনের হস্তে প্রদান করা উচিত নহে। কার্য্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি প্রণালীতে বিভাগ করিলে কার্য্যটী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবেক, কোন্২ বিষয়ে সহকারিগণ অধ্যক্ষের আদেশ অবলম্বন এবং কোন্২ স্থলে তাঁহারা স্ব২ অভিলাষ অনুসরণ করিলে তাবতের বলসমষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা করাই অধ্যক্ষের কার্য্য। নতুবা কেবল কর্ত্তৃত্ব বাসনার বশীভূত হইয়া অন্যের প্রতি নানাবিধ আদেশ করিলে কেহ অধ্যক্ষ হয় না। বাঙ্গালিরা সকলেই কর্ত্তৃত্বপ্রিয়। পরের গোলামি করিতেছি, তথাপি সুযোগ পাইলেই হীনতর গোলামের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা আমাদিগের এক প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম। পাঁচ জন একত্রে সমবেত হইলে সকলেই পরামর্শ দিতে তৎপর। তাহাতে তত দোষ নাই ; কিন্তু কেহই যে কৌশল বিনা জানিয়া শুনিয়া, পরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং আপন বিবেচনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তদন্যথা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা আমাদিগের আন্তরিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ।

পূর্ব্বকালে আমাদিগের সমাজ মধ্যে রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তদনন্তর জাতি, কৌলীন্য, সম্পর্কের শ্রেষ্ঠতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠতানুসারে লোক সমূহের মধ্যে কর্তৃত্ব এবং অধীনতা সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইত। তখন ব্রাহ্মণেরা নিরবচ্ছিন্ন সমাজের মঙ্গল কামনা করিতেন, তদর্থে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং অধীন জাতিগণ কুদৃষ্টান্ত দেখিতে না পায়, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা স্বচরিত্রের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিতেন। রাজা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণের অপরামর্শে কোন কার্য্য করিতেন না, সুতরাং ব্রাহ্মণেরা যে মত করিতেন, তাহাতে কেহই অসম্মত বা অবাধ্য হইতেন না। নিরন্তর পরকাল ভয় সকলের মনোমধ্যে জাগরূক থাকাতে সকলেই একাগ্রচিত্তে ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞা পালন করিতেন ; কাজেই ঐক্য সাধনের উভয় উপকরণই বর্ত্তমান ছিল। এবং ব্রাহ্মণেরাও

সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষ বিধর্ম্মীদিগের হস্তগত হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা পদচ্যুত হইয়া পরে ধর্ম্মচ্যুতও হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা আপনাদিগের উপজীবিকার জন্য কেবল ভদ্র ব্যক্তিগণের দয়াধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া-ছিলেন। হিন্দু ক্রিয়া কলাপ মাত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবার বিধান দেখিয়া যাঁহারা শাস্ত্র প্রণেতাগণকে অর্থলোলুপ মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। আজিকে ইনকমটাক্স এবং পণ্য দ্রব্যের মাসুল রূপ টাক্স লইয়া যে বিসম্বাদ চলিতেছে, ব্রাহ্মণেরা বহুকাল পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিয়া এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্মযাজক প্রতিপালনার্থ রাজাকে কর সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা হইতে বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবেক না। লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুণ্যাভিলাষে ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে দান করিবে এবং তদ্দারা দাতাগণের দানশীলতা এবং পারলৌকিক মঙ্গলকামনাও বদ্ধমূল হইবেক।

তখন রাজার সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইতেন এবং সামান্য লোক-দিগকে ভিক্ষা দানের নিমিত্ত পীড়ন করিতে হইত না। কিন্তু রাজভাণ্ডার বিধর্ম্মীর হস্তগত হইলে ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। আহার না চলিলে প্রত্যহ বেদ পাঠ কে করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মচ্যুত হইলে হিন্দু সমাজের শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া গেল। বাহুবল, এবং পরিণামে অর্থবলই সর্ব্বত্র মান্য হইয়া উঠিল। লোকে রাজার অনাচার দেখিয়া হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাহীন হইল এবং শ্রদ্ধার পাত্র অভাবে স্বেচ্ছাচারী হইল। বাঙ্গালিদিগের আবার বাহুবলও নাই, সুতরাং এখানে অনৈক্যের সমস্ত কারণ একত্রিত হইল। পূর্ব্বে ধর্ম্মরক্ষাই এতদ্দেশীয় লোকের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রাজকার্য্যে কেহ কখন হস্তক্ষেপ করিত না; যে রাজা উপস্থিত হইতেন, ব্রাহ্মণ আদেশানুসারে তাঁহাকেই কর দিত। দলবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরাই তাহার মন্ত্রী হইতেন। বিধর্ম্মী রাজারা বাহ্যতঃ কেবল কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাল সহকারে হিন্দুদিগের পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণের অভাব হইল। অনুরুদ্ধ না হইলে হিন্দুরা প্রায় কখনই কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না—সুতরাং ব্রাহ্মণের স্থলে নূতন কর্ত্তা সংস্থাপন করিতে পারিলেন না, এবং তাহার প্রকরণও কেহ জানিতেন না। ধর্ম্মলোপ হওয়াতে হিন্দুদিগের এক মাত্র উচ্চাভিলায—ধর্ম্মরক্ষা—তাহাও নিস্তেজ হইল; সুতরাং দুর্ব্বলের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে বাঙ্গালিরা কেবল শরীর রক্ষা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের

প্রতি বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন—ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত এবং ঐ মহৎ কার্য্যের ভার দুর্ব্বল, মূর্খ, ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণ-সহায়বিহীন জমিদারগণের হস্তে পতিত হইল। অতএব ঐক্য অভ্যাসের সুযোগ কোথায় ?

বরং যুদ্ধ ব্যবসায়িরা নিতান্ত বেতনভোগী হইলেও এই মহৎগুণ কথঞ্চিৎ অভ্যাস করিতে পারে। সম্মুখে শত্রু—কেবল আমাকে নহে, সমস্ত সৈনিক দল বিনাশের জন্যই উহারা ব্যগ্র। পলায়নের সম্ভাবনা নাই। নিষ্কোসিত অসি হস্তে পার্শ্ববর্ত্তি সিপাহীকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত। এরূপ সময়ে তরবারি উত্তোলন করিবার জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না। কিন্তু এই সঙ্গে২ কতকগুলি মহৎ গুণ অভ্যাস হইয়া যায়! যাঁহারা যুদ্ধকালে প্রাধান্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের মনে সাহস, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন এবং পরোপকারবাসনা প্রদীপ্ত হয়। যাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হয়েন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা অভ্যাস করেন, এবং এতদুভয় শ্রেণীর মধ্যে হৃদ্যতা, সাহায্য করিবার ক্ষমতা এবং সাহায্য প্রাপ্তির আশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। সৈনিক পুরুষদিগের প্রধান ধর্ম্ম কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞা পালন। যুদ্ধকালে ইহার চালনার দ্বারা একদিগে কর্ত্তৃত্ব, অন্যদিকে অধীনত্ব করণ বিষয়ে সকলেই উৎকর্ষ লাভ করেন।

যে স্থলে যোদ্ধগণ বেতনলালসার পরিবর্ত্তে স্বদেশ রক্ষা বা তদনুরূপ অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত যুদ্ধে রত হয়েন, সেখানে পরাজিত হইলেও তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা থাকে না। ইঁহারা পদে২ আত্মসংযম এবং পরোপকার ধর্ম্ম অভ্যাস করেন। রাজ্য রক্ষার্থই ঐক্যের প্রয়োজন। কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক সমূহকে একত্র করিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারেন।

যুদ্ধের দ্বারা এরূপ অসাধারণ ফললাভ হয় যে, যাহারা যোদ্ধাগণের সহিত একত্রে আলাপ, একত্রে ভোজন, একত্র ভ্রমণ করে, তাহাদিগের মনেও ঐ সকল ধর্ম্মের সংস্কার হইয়া উঠে।

ইংরাজদিগের ঐক্য দেখিয়া আমরা আপনা আপনি কতই না ধিক্কার করিয়া থাকি! কিন্তু ঐক্য সাধনের এক মহৎ উপায় ভক্তি; তাহা আমাদিগের প্রায় নাই বলিলেই হয়। ব্যক্তি বিশেষকে দেখিয়া একবারও এমন মনে হয় না যে ইনি আমার অতীব মান্য; ইঁহার আদেশ মতে আমার

পুত্রের মস্তকে করাত দেওয়াও কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও দোষ নাই। পুনরায় ব্রাহ্মণ সৃষ্টি না হইলে তাঁহারা আর পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইবেন না—অতএব তাঁহাদিগের সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা। এক্ষণে সর্ব্বত্র বিবেক শক্তি প্রকাশ এবং সদ্‌গুণ অভ্যাস ভিন্ন আমাদিগের উপায়ান্তর নাই। কাল্পনিক আচরণ পরিত্যাগ করিলে, আমরা ক্রমশঃ পরস্পরের বিশ্বাসপাত্র হইতে পারিব। কোন উদ্দেশ্য সকলের মনে জাগরূক হইতেছে না বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা নাই; কারণ অবস্থার সাদৃশ্য না ঘটিলে উদ্দেশ্যের একতা হয় না। কিন্তু পরস্পরের সাহায্যার্থ কর্ত্তৃত্ব, অধীনত্ব এবং সমকক্ষের প্রতি বিশ্বাস, এই তিনটী গুণ অভ্যাস করা আবশ্যক। কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে অধীনের সুবিধা চেষ্টা, এবং অধীনত্ব করিতে গেলে কর্ত্তার নিকট বিনয়, এতদুভয়ের প্রয়োজন। সামাজিক বিনয়ে আমাদিগের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু আমাদিগের অন্তঃকরণ নিতান্ত বিনয়-বিহীন এবং আত্মম্ভরী হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধার পাত্র নাই বলিয়া কাহাকেই কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষেক করিব না—ইহাতে আমাদিগের বিনয়াভাব এবং কর্ত্তৃপদাকাঙ্ক্ষিদিগের অযোগ্যতা, উভয় দোষই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্ব২ কর্ত্তব্য সাধনে অযত্ন এবং পরের প্রত্যাশা করা আমাদিগের আন্তরিক দৌর্ব্বল্যের প্রমাণমাত্র।

এতাবতা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমরা প্রাচীন কালে যে প্রণালীতে ঐক্য সাধন করিতাম, এক্ষণে তাহা পুনরুত্থাপন করিবার সম্ভাবনা নাই। কর্ত্তাবিহীন হইলে যে সমস্ত গুণ এবং উপায়ের দ্বারা ঐক্য লাভ করা যায়, তাহার অনেক গুলিতে আমাদিগের নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আর ঐক্য অভ্যাসের এক প্রধান উপায় যুদ্ধ ব্যবসা।

অতঃপর পরামর্শ এই যে, দলবদ্ধ হইবার জন্য পদে২ এরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা উচিত যে, প্রত্যেকে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে পারে এবং তাহা প্রতিপালন করা সকলের পক্ষে সুসাধ্য হয়।

পদ্যময়। প্রথম ভাগ। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এন্‌স্‌ যন্ত্র।

এখানি বালকের পাঠোপযোগী পদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বালক শিক্ষা, কবিত্ব নহে। ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

পদ্যমালা। উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা, দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

এই পদ্যগ্রন্থখানি খুলিয়াই আমরা গ্রন্থারম্ভে পড়িলাম,

ওহে নরগণ।
একভাবে ধর্ম্ম প্রতি রাখ সবে মন!
সত্য সনাতন শিব, সুন্দর বরণ।
কেমন কৌশলে সৃষ্টি করেন ভুবন॥

তার পরে ২৫ পৃষ্ঠা খুলিলাম। পড়িলাম,

উদিত জনম ভূমি হৃদয়ে যখন।
তখনি আমার হয় বিচলিত মন॥
জান না জনমভূমি স্বর্গ গরীয়সী!
কি সুখের স্থান যথা স্বজন প্রেয়সী।

ইত্যাদি।

আবার এক স্থানে খুলিলাম—৩৮ পৃষ্ঠা,

মন্দ মন্দ সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ
দেখিয়া আমার মন,
স্নিগ্ধ অতিশয়।
স্বভাবের শোভা হেরি,
শোক দূরে রয়॥

ইত্যাদি ।

অন্যান্য অনেক স্থান পড়িয়া দেখিলাম—সকলই ঐরূপ ।

আমরা গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, এই রূপ কথা, তিনি কত লক্ষ বার পড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিতে পারেন ? যাহা লক্ষ২ বার লিখিত, পঠিত, কথিত, শ্রুত, চর্ব্বিত, উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহা আবার উদ্গীর্ণ করিয়া লাভ কি ? লাভ দূরে যাউক, সুখ কি ?

কবিতাকুসুম। প্রথমভাগ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে।

আমরা উপেন্দ্র বাবুকে যাহা বলিলাম, তিনকড়ি বাবুকেও তাহাই বলি। এইখানি কবিতা কুসুমের প্রথমভাগ। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ না করিলেও হয়।

সদ্ভাবকুসুম। শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা। প্রাচীন ভারতযন্ত্র।

এই কবিতা গুলিন নিতান্ত অপাঠ্য নহে। স্থানে২ মধুর। কিন্তু কবিতার অমৃত বাঙ্গালা দেশে আজকাল ছড়াছড়ি যাইতেছে। এরূপ মাধুর্য্যও ভাল লাগে না। এ গ্রন্থেও বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু নাই।

প্রথম চরিতাষ্টক। শ্রীকালীময় ঘটক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হুগলী বুধোদয় যন্ত্র।

দেখিলাম, এখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

প্রথম বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সরলা এবং সর্পী

যখন শয়নাগারে, সুখসাগরে ভাসিতে২ নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে। মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম। আরো ভাবিল যে, এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়ন কালে, যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদ মধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষীপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকারমধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প২ হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে২ সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীর ভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন,—

"কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত ?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম, আর একবার আসিব। তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল! আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা, প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সম্বাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপরুষ ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্যা সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা—সুতরাং হীরার

এই নূতন প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত, বিশ্বাসভাজিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাজিনী মনে করে নাই!

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকরাণি, কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সম্বর্দ্ধিত বেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া, আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্ত্তা বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসম্বরণীয় হইল।

হীরা মনে২ বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা! এতে কি কাঁদ্‌তে হয়? কত লোকের কত বড়২ দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ!"

"বড়২ দুঃখ" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিন তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা," এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কানে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেক বার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও এক জনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—

কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে লুকালেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কানে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কানে২ বলিতে-ছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে। এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?"

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামির অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমাকে ভাল বাসিত না। আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভাল বাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শত গুণে নিগুর্ণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভাল বাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি এক বার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল; পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু এক দিন আমাদের উভয়েরই দুর্ব্বুদ্ধি হইল।" এই রূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তদ্দারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবা মাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, কহিল, "তার পর?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পূরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটী হীরা মুনিব বাড়ীর প্রসাদ পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানেই রাখিত।

হীরা সেই বাক্‌সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্‌স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষ লোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনঃ বশতঃ বাক্‌স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময়, অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের পুরী-মধ্যে, মঙ্গলজনক শংখ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শংখ ধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর, গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক, এবং বালিকা সকলে মিলিয়া, কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহা কলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুগন্ধি তৈল নিসিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে, এবং করতালী দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া২ কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন, ও হুলুধ্বনি দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন২ এ দিক ও দিক চাহিয়া, এক২ বার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিতা হইল। হীরা মণ্ডল মধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বলা হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুমসুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে, কেহ বা আদ্র´ গাত্রম্রক্ষণীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে।

সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিছু লজ্জিতা, একটু২ সাপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহমুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কেগা ?"

কথা কৌশল্যার কানে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না নেকি ? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা, এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাশ সমাপ্ত হইলে, এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, সূর্য্যমুখী কমলের কানে২ বলিলেন, "চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিক্লিষ্ট বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতি ব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবা মাত্রেই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন ?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে ?"

সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সে কি ?

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজঃ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এতদিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "একি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামির কথায় উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামির সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপরে ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামির সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি মুখ দেখিতে২ যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এই রূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্ত্যকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে২ স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি, বালিকা অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে, মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্ট নিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ, পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্কে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধি দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া, ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামির পদযুগল মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুইজনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে২ চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া, স্বামিচরণ মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীনযৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দ-কুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সম্বরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি, তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক! আমি যেন এই রূপে স্বামির চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামির হস্ত ধারণ করিয়া, স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধ সংকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্য হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। একবার মাত্র, বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্য সেবায় বিরতি না হওয়ায়, রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারিদিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্ন শয্যায় উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র

জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "এক জন পাগলী আপনাকে দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে এক জন অতিদীন ভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতিদীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প, এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবন্ধ, ধূলি ধূসরিত —কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল। এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকটে আসিয়া এরূপ তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না ? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল, যে হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— "তোমার এমন দশা কে করিল ?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। কিন্তু সম্বতা হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর —আমার এমন দশা কে করিল ? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমার খোষামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া, আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপরে পা রাখিল) গায়িয়াছিলে—

'স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।' "

এই রূপ কত কথা মনে করিয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাতি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম— একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে

আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম— আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম। তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না দেখিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে২ ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

'স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।"

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্পপূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, "পদপল্লবমুদারং" "পদপল্লবমুদারং"।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছিল যে, স্ত্রীলোকে গায়িতেছে,—

"স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা **বিষবৃক্ষ** সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে **অমৃত** ফলিবে।

সমাপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাকৃতিক নিয়ম

আমরা জমীদারের দোষ দিই, বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দু রাজার রাজ্যকালে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়ন করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্ত্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি ততদূর বর্ত্তে; বঙ্গদেশে তৎ সমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটী খণ্ড মাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবীমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব

আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা, সমান।

জ্ঞান বৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্ল কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বক্ল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, এবং এই বঙ্গদর্শনে অন্য লেখক কর্তৃক সে কথার প্রতিবাদ হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজ মধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্ম ভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণ পোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না, কেননা যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্ম ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণ পোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশ বিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা।

যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবিদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই ; আমরা এতদংশ বক্লের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি ; কৌতূহল-বিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্ল এই বলেন, যে তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজলের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন। অতএব শীত প্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশু হনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্ব কালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটী সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে২ নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না ;—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজ মধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কার স্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যোপজীবীর। প্রথম ভাগ "মজুরির বেতন", দ্বিতীয়ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা।" * আমরা, "বেতন" ও "মুনাফা," এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যোপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার" মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন", পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশে পচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন," পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবির উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা", তাহার

* "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণ পোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে২ আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমপোজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি২ সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে২ ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়ে দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক,—তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, আস্ট্রেলিয়া, এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকা নির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহ প্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে, এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহ প্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটী আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবন ধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহ প্রবৃত্তি দমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজা-বৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবী-দিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন

হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যোপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতি শাস্ত্রের মূল।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবিদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেননা যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যোপজীবিদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত, মনুষ্য হৃদয়ের দুইটী বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটী মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টী স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটী বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎ, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদা নূতন২ সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে।

অতএব সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজা-বৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্ট-কারক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে, তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীর মধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যক হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ব্বকালীন তাদৃক অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্তসিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেক গুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দু ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন, যে ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্ম যাজকগণকর্ত্তৃক ঐহিক সুখে অনাদর তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র-বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন যুনানী সাহিত্য, যুনানী দর্শনের পুনরুদয়

হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষা নিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে২ সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল ; আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্যা নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।

৩। শ্রমোপজীবিদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী ; তাহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্য ব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাব বৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিকদিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না ? ছিল বৈকি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বর ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্য বাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা, রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিৎ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই, যে সাধারণ প্রজা

সতেজঃ, এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই, আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেই খানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারত কীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্য-নাটকাদি চিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয়পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে, ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিনবর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপরবর্ণের মানসিক শক্তি হানি হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতা পূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপরবর্ণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্ম-পীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক, সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থা জাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের

অন্ত নাই। এদিগে রাজশাসন প্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে; সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেননা ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে২ যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দু সমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি স্ফুর্ত্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটী প্রাকৃতিক কারণ ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবিদের চিরদুর্দ্দশা। প্রথম ভূমির উর্ব্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বায়ু্াদির তাপাধিক্য। এই দুই কারণে অতি পূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম প্রথম শ্রমোপজীবিদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দ্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক শ্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমিদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্ব্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য, যে যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্ব্বরতা বা অন্য বাহ্যপ্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না।
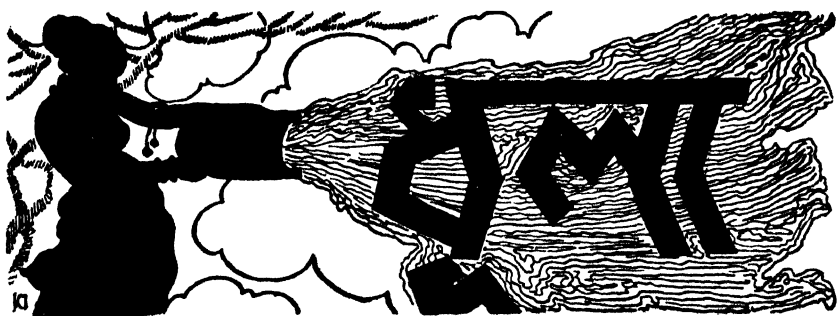
আমাদিগের দেশে অন্য যে বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, কেবল এক বিষয়ের অভাব নাই—বড়২ বিষয়ে ক্ষুদ্র২ প্রবন্ধ। আমাদের দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব আছে; কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতি, এ সকলের অভাব নাই; চাঁদনীর চকে জুতা কিনিলে বিনা মূল্যে অনায়াসে শিখিতে পারা যায়। জুতা বাঁধা কাগজ পড়িলেই হইল। স্কুলের ছেলে বিস্তর; উমেদারও অনেক; সকলের চাকরি জুটে না; কাগজ কলম ধার চাহিলে পাওয়া যায়, কেননা কেহ পরিশোধের প্রত্যাশা করে না; মুদ্রাযন্ত্র অতি সুলভ। লিখিতে হইলে ছোট বিষয়ে লেখা অযুক্তি—সুতরাং অন্ন বস্ত্রের যাদৃশ অভাব—বড়২ বিষয়ে প্রবন্ধের তাদৃশ অভাব নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিবেচনা হইয়াছিল যে দর্শন বিজ্ঞানাদির কথা যাহাই হউক, কাব্য সমালোচনা কিছু কঠিন; কেননা দর্শনাদি শিখিলে তদ্বিষয়ে লেখা যায়, কিন্তু কাব্যের সমালোচনা কেবল শিক্ষার বশীভূত নহে। কিন্তু আমাদিগের দেশের সৌভাগ্য যে, তাহারই কিছু ছড়াছড়ি অধিক। মা সরস্বতীর অনুগ্রহ!

দেখিয়া শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিব না। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞান, সুতরাং গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় অক্ষম। কোন সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি প্রস্তাব লিখিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অনুসন্ধান কালে আমাদের সম্মুখে একজন "ঝাড়ুদার" সম্মার্জ্জনী হস্তে, রাজপথ পরিষ্কার করিতেছিল, বড় ধূলা উড়াইতেছিল। দেখিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, যাহার তত্ত্ব করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি—আমরা ধূলা সম্বন্ধেই লিখিব। ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই।

ভাবিলাম যে, ধূলা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা লিখিতে পারিব, যথা; প্রথমতঃ, ধূলায় জল ঢালিলে কাদা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ধূলা চক্ষে গেলে কর্ কর্ করে; তৃতীয়তঃ, ধূলা দাঁতে গেলে কিচ্ কিচ্ করে; চতুর্থতঃ, রেইলে বড় ধূলা লাগে ইত্যাদি নানাবিধ নূতন এবং বিস্ময়জনক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিব, ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সকল স্থানে রাস্তা ঘাটে ভাল জল দেওয়া হয় না বলিয়া মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিদিগকে কিঞ্চিৎ সুসভ্য গালিগালাজ করিব, এমতও ইচ্ছা ছিল। মনে করিয়াছিলাম, কাব্যালঙ্কারেও ধূলার প্রয়োজন দেখাইতে পারিব, যথা, "ধূলায় ধূষর অঙ্গ," "ধূলায় মিশাবে দেহ" ইত্যাদি। বস্তুতঃ আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে পাঠক মহাশয়ের "চক্ষে ধূলা" দিব। পারি ত, আপনারাও কিছু "ধূলা বাকস পাতা" উপার্জ্জন করিব।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের স্মরণ হইল যে, আচার্য্য টিণ্ডলও ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এবং তাহা পাঠ করিয়া ধূলা সামান্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অতি গুরুতর এবং দুর্জ্ঞেয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আচার্য্য স্বয়ং একজন ইউরোপের মান্য বিজ্ঞানবিৎ মহামহোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন অবধি পরিশ্রম করিয়া ধূলাতত্ত্বের কিয়দংশ জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং সামান্য বিষয় বলিয়া ধূলার উপর যে আদর হইয়াছিল, তাহার লাঘব হইল। আমাদিগের কপালক্রমে ধূলাও সামান্য বিষয় নহে।

বোধ হয়, এতক্ষণে পাঠকের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে যে, ধূলার ন্যায় সামান্য পদার্থ সম্বন্ধে আচার্য্য কি এমন নূতন কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিব। বিশেষ, আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেব কৃত সিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়া মধ্যে কোন রন্ধ্র নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই যে, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ,

তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যক নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটি করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য, কেননা তাহার কণা সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিকচিক করিতেছে। যদি এত যত্ন পরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়া মধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্র মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ, কেননা বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলি কণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট ; এজন্য তাহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি ; জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি ; এবং রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আরো অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য সাধ্যাতীত। যে জল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরক খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাণু পূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতিপূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্ত্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়া বীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরের মধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেরই গাত্র মধ্যে কীট সমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীর বাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতা শক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীর মধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়া বীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণা রূপী পীড়া বীজের জন্য। ক্ষত মুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না, যে অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র মুখে ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বোলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়া ক্ষত মুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ সকল মরিয়া যায়। ক্ষত মুখে পরিষ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেননা তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, এই গ্রন্থখানি সবিস্তারে সমালোচিত করিব। অবকাশাভাবে এ পর্য্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারি নাই। পাঠকেরা ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

এ দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, সন ১৮৬৮ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ড হইতে সহোদরকে পত্র লিখিতেন। তিন বৎসরে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ইংরাজি গ্রন্থাদি হইতে ইংলণ্ডের বিষয় অনেক অবগত হইয়াছি, এবং এখানেও অনেক ইংরাজ দেখিতে পাই। তথাপি, অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা হস্তির আকার অনুভূত করিয়াছিল, ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান। ইংরাজি গ্রন্থ বা পত্রাদি ইংরাজের প্রণীত। ইংরাজের চক্ষে যেমন দেখায়, তাহাতে ইংলণ্ড সেইরূপ চিত্রিত। আমাদিগের চক্ষে ইংলণ্ড কিরূপ দেখাইবে, তাহার কিছুই সে সকলে পাওয়া যায় না। মসূর তাইন একজন কৃতবিদ্য ফরাশী। তিনি ফরাশীর চক্ষে ইংলণ্ড দেখিয়া, তদ্দেশবিবরণ একখানি গ্রন্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তৎপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইংরাজের চিত্রিত ইংলণ্ড হইতে মসূর তাইনের চিত্রিত ইংলণ্ড অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। ইংরাজ ও ফরাশীতে বিশেষ সাদৃশ্য;

Three years in Europe, being Extracts from Letters sent from Europe. Calcutta, I. C. Bose & Co. 1872.

আমাদিগের চক্ষে দেখিতে গেলে উভয়ে এক দেশবাসী, একজাতি, এক ধর্ম্মাক্রান্ত; উভয়ের এক প্রকার শিক্ষা, এক প্রকার আচার ব্যবহার, একপ্রকার স্বভাব। যদি ফরাশির লিখিত চিত্রে ইংলণ্ড এই রূপ নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তবে বাঙ্গালীর বর্ণনায় আরও কত তারতম্য ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বাঙ্গালির হস্তলিখিত একখানি ইংলণ্ডের চিত্র দেখিবার আমাদের বড় বাসনা ছিল। এই লেখক বাঙ্গালি জাতির সেই বাসনা পূরাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, লেখক ইউরোপ একটু অনুকূল চক্ষে দেখিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকের চক্ষে যে ইউরোপ অতি আশ্চর্য্য দেশ বোধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে দেশের জন কয়েক লোকমাত্র সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া পাঁচ সহস্র মাইল দূরে আসিয়া প্রত্যহ নূতন২ বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের স্বদেশ যে আমাদের নিকটে বিশেষ প্রশংসনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব যাঁহার স্বভাব দ্বেষবিশিষ্ট নহে, তিনিই ইংলণ্ডকে অনুকূল চক্ষে দেখিবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি বিদেশে গেলে বিদেশের সকল বিষয় ভাল লাগে না। ইউরোপে কিং আমাদিগের ভাল লাগে না, সেইটুকু শুনিবার জন্য আমাদিগের বিশেষ কৌতূহল আছে। এ গ্রন্থে সে আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না।

সেইটুকু আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না। আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদিগের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। একথা সত্য কি না, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে২ আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই—তাহা কে ভাল বাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালি জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আমাদিগের দেশ-বাৎসল্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্ব্বদা ইচ্ছা করে যে, সভ্যতম জাতির অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে পাই না। যাহা শুনি, তাহা সত্যপ্রিয় সুবিবেচকের কথা নহে। যাহা শুনি,

তাহা শুদ্ধ স্বদেশপিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যাদম্ভপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা—তাহাতে বিশ্বাস হয় না—বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। যদি এই লেখকের ন্যায় সুশিক্ষিত, সুবিবেচক, বহুদেশদর্শী ব্যক্তির নিকট সে কর্ণানন্দদায়িনী কথা শুনিতে পাইতাম—তবে সুখ হইত। তাহা যে শুনিলাম না, সে লেখকের দোষ নহে—আমাদের কপালের দোষ। লেখক স্বদেশবিদ্বেষী বা ইংরাজপ্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশ-বৎসল, স্বদেশবাৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশ বিষয়ে যে সকল কবিতা গুলিন লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জন্মভূমি সম্বন্ধে আমরা যে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" বলিবার অধিকারী নই, আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায়, আমরা এ আক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। লেখক যদি আমাদিগের মনের ভাব বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনিও আমাদিগের সঙ্গে রোদন করিবেন। যদি কেহ সত্য-প্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন।

আমরা গ্রন্থ সমালোচনা ত্যাগ করিয়া একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়াছি, কিন্তু কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নহে। আমরা যে ভাব ব্যক্ত করিলাম, এই গ্রন্থের আলোচনায় সেই ভাবই বাঙ্গালির মনে উদয় হইতে পারে। যদি সাধারণ বাঙ্গালির মনে ইহা হইতে সেই ভাব উদিত হয়, তবে এ গ্রন্থ সার্থক। তাহা হইলে ইহার মূল্য নাই।

এই গ্রন্থের প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। কেননা, ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রণীত হয় নাই। সুতরাং রচনা-চাতুর্য্য, বা বিষয় ঘটিত পারিপাট্য ইহার উদ্দেশ্য নহে। ভ্রাতার সঙ্গে সরল কথোপকথনের স্বরূপ ইহা লিখিত হইয়াছিল। অতএব সমালোচক

যে সকল দোষ গুণের সন্ধান করেন, ইহাতে তাহার সন্ধান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সন্ধান করিলেও দোষ ভাগ পাওয়া কঠিন হইবে, গুণ অনেক পাওয়া যাইবে। ভাষা সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। ভাবও সরল, এবং আড়ম্বরশূন্য। লেখকের হৃদয়ও যে সরল এবং আড়ম্বরশূন্য, এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। লেখক সর্ব্বত্রেই গুণগ্রাহী, উৎসাহশীল এবং সুপ্রসন্ন। তাঁহার রুচিও সুন্দর, বুদ্ধি মার্জ্জিত, এবং বিচারক্ষমতা অনিন্দনীয়। বিশেষ, তাঁহার একটি গুণ দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। চিত্রে বা খোদিত প্রস্তরে যে রস, বাঙ্গালীরা প্রায়ই তাহা অনুভূত করিতে পারেন না। বালকে বা চাসায় "সং" দেখিয়া যে রূপ সুখ বোধ করে, সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরাও চিত্রাদি দেখিয়া সেইরূপ সুখ বোধ করেন। এই গ্রন্থের লেখক সে শ্রেণীর বাঙ্গালি নহেন। তিনি চিত্রাদির যে সকল সমালোচনা পত্র মধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ রসানুভাবকতা এবং সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। ইউরোপে পর্য্যটন করিলে, ভুবনে অতুল্য চিত্রাদি দর্শনে, এবং তত্তদ্বিষয়ের বিচক্ষণ বিচারকদিগের সহবাসে যে বুদ্ধি মার্জ্জিতা, এবং রসগ্রাহিণী শক্তি স্ফুরিতা হইবে, ইহা সঙ্গত। কিন্তু এ লেখকের রসগ্রাহিণী শক্তি স্বভাবজাতাও বটে। তিনি ইউরোপে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মাল্টা নগরে "Charity"র গঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিয়াছেন ;—

"It is impossible for me to describe in adequate terms the meekness and tender pathos that dwells in the placid and unclouded face of the mother as she gazes with a loving and affectionate look on the sweet heaven of her infant's face. I stood there I know not how long, but this I know I could have stood there for hours together, and not have wished to go away." p.11-12.

পুস্তকের মধ্যে মধ্যে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। সে সকল গ্রন্থকারের লিপিশক্তির পরিচয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিলাম—

"From Iona we went to the small uninhabited island of Staffa containing several wonderful caves, of which Fingal's cave is the most magnificent. This cave with its splendid arch 70 feet high, supporting an intablature of 30 feet additional,—its dark basaltic pillars, its arching roof above, and the sea ever and anon rushing and roaring below, is a most wonderful sight

indeed. The sea being calm we went in a boat to the inner end of the cave. The walls consist of countless gigantic columns sometimes square, often pentagonical or hexagonical, and of a dark purple color which adds to the solemnity of the aspect of the place. The roof itself consists of overhanging pillars ; and every time that the wave comes in with a roaring sound, the roof, the caverns, and the thousand pillars return the sound increased tenfold, and the whole effect is grand." p.48.

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা অন্যান্যাংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুসন্ধায়ী—যেখানে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সুন্দর ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তিনি কালিদনীয় খালের মধ্যে, তখনকার অবস্থায় অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন ; তিনি লিখিয়াছেন ;—

"On both sides of us were continuous chains of mountains, and it being very bad weather, dark clouds hanging over our heads served as a gloomy canopy extending from the ridges on our right to those on our left. As far as the eye could reach, before or behind, there was nothing but this gloomy vista, —the dark clouds above, dark waters below, and high mountains on both sides of us. The scene was grand indeed, and I can assure you, I would not have changed that gloomy scene of highland grandeur for the neatest and prettiest spot in the earth, nor ever for the sunniest sky, the dark rolling clouds which added to the gloom and sublimity of the scene." p. 50.

লেখক মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালি হইয়া যিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখন তাঁহার প্রশংসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। সুতরাং তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করুন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা যাদৃশ মনোরঞ্জক এবং উপকারী, ইংরাজি অভিজ্ঞদিগের নিকট তাদৃশ নহে। যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারা ইউরোপের বিষয় কিছু কিছু জানেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা

ইউরোপের বিষয় কিছুই জানেন না। বিলাত কি—মরুভূমি কি জলাশয়, ভূত প্রেত কি রাক্ষসের বাস, তাহার কিছুই জানেন না। অন্ততঃ গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি যে, বঙ্গসুন্দরীদিগের পাঠার্থে ইহা বাঙ্গালায় প্রচার করুন। তজ্জন্য যে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা কষ্টকর হইবে না ; কষ্টকর হইলেও তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালিদিগের মেয়ের এমন শক্তি হইয়াছে যে, এরূপ গ্রন্থ পড়িয়া মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ প্রায় নাই যে, তাঁহাদের শয়নগৃহের পশ্চাতে কি আছে, তাহা জ্ঞাত করায়। সুতরাং অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালিতে মোট বয়, বাঙ্গালিতে ভূমি চসে ; কেননা সাহেব কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধরিবে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া, এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য? অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা এক জন আছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক তত্ত্ব, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আর একটি পৃথক তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টি ক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।"

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" পুরুষ মানেন, এরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এইরূপ কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেননা কারণ শ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সে বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল, এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১,৭৪)

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চতন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূলভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, এক আকাশ স্থূলভূত। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান, "অহঙ্কার।" মহৎ মন।

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এজন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে। ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিৎ, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে "আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি ? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে। (Cogito ergo Sum) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে। সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে সৃষ্টি ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র। যথা বিষ্ণুপুরাণে ;—

আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবীতথা।
শব্দাদিভিগু´ণৈব্র্হ্মণ্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ ॥
শান্তা ঘোরাশ্চ মুধাশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতঃ।
নানাবীর্য্যাঃপৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহাতিং বিনা ॥
নশক্নুবন্প্রজাস্রষ্টুমসমাগম্যকৃৎস্নশঃ।
সমেত্যান্ যোন্যসংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়ঃ ॥
এক সংঘাতলক্ষশ্চ সম্প্রাপৈক্যং অশেষতঃ।
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ ॥
মহাদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে।
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধস্তু জলবুদ্বুদবৎসমং ॥
ভূতেভ্যোণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহত্তদুদকেশয়ং।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্ত বিষ্ণোসংস্থানমুত্তমম্ ॥

তত্রাব্যক্তস্বরূপোসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥
মেরুতুল্যমভূত্তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ॥
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেভবদ্বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ॥
বারিবহ্ন্যানিলাকাশৈস্ততোভূতাদিনাবহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা॥
অব্যক্তেণাবৃতোব্রহ্মংস্তৈঃসর্ব্বৈ সহিতোমহান্।
এভিরাবরনৈরণ্ডং সপ্তভিপ্রাকৃতৈর্বৃতম্॥
নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।
জুষন্ রজোগুণস্তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ॥
ব্রহ্মভূত্বাস্যজগতোবিসৃষ্টৌসম্প্রবর্ত্ততে॥

পুনশ্চ লিঙ্গপুরাণে :—

মহদাদি বিশেষান্তাহ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি চ।
জলবুদ্বুদবত্তস্মাদবতীর্ণঃ পিতামহঃ॥
স এবভগবাণ্রুদ্রো বিষ্ণুর্বিশ্বগতঃ প্রভুঃ।
তস্মিন্নণ্ডেত্বিমে লোকা অণ্ডর্বিশ্বমিদং জগৎ॥
অণ্ডংদশাগুণানৈব নভসাবাহ্যতো বৃতং।
আকাশশ্চাবৃতস্তদ্বদহঙ্কারেণ শব্দজঃ॥
মহতাশব্দ হেতুর্বৈপ্রধানেনাবৃতঃ স্বয়ম্॥

পুনশ্চ ভাগবত পুরাণে ;—

দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেন পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ॥
রজঃ প্রধানান্মহত স্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ।
জাতঃ সসর্জ্জভূতাদি বিষাদিদিনি পঞ্চাশঃ॥

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

এতান্যসংহাত্যযদা মহদাদিনি সপ্তবৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরূপবিশৎ॥
ততস্তেনানুবিদেভ্যো যুক্তেভ্যোণ্ডম চেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌবিরাট্॥

এ সকলের আলোচনায় দুইটী কথা অনুভূত হয় ;—

১ম। বেদে কোথাও সাংখ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় নাই। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, শত পথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টি কথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টি কথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ মনু, রামায়ণের পরেও অন্ততঃ বিষ্ণু ভাগবত এবং লিঙ্গ পুরাণের পূর্ব্বে সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ নূতন, কোন্ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিৎ করা ভার। কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে তাহা সাংখ্যানুকারী।

২য়। সাংখ্য প্রবচনে বিষ্ণু, হরি রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর, আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রা-কুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চষমা-অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেস প্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা-পারদর্শী, মাতৃভাষা-বিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধি সম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটু;—চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপার নির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার সহিষ্ণু; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষের রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট "বাবু" অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক, কেবল বাবু জন্ম-নির্ব্বাহাভিলাষী কতক গুলিন মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গো জন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাকু" এবং "চুরট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন, এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইহাঁদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন আগুন" এবং "মনাগুন" রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাঁদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকে ইহাঁরা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন, "বায়ু সেবন"। চন্দ্র ইহাঁদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্ল পক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইহাঁদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমার-দিগকে ইহাঁরা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সংগীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন,

তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজা সিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলাপটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুল-ভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁরাও অনন্ত শয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টর, ষ্টেশ্যন মাষ্টর, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টর অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেশ্যন মাষ্টর অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলা প্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা; এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ, পৃষ্ঠে শত গুণ, এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, এবং বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদ পত্র, এবং তীর্থ "নেশ্যানাল থিয়েটর," তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টীয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে শুধু জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যা গৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নান কালে তৈলে ঘৃণা, আহার কালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল

গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনেং বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনি পুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন্।

১

এক দিন—প্রিয়তমে! আছে কি স্মরণ?
নহে বহু দিন গত, এই জনমের মত,
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ রতন,
এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন।

২

কার্য্যস্থান হতে অতি ক্লান্ত কলেবরে,
প্রায় অবসন্ন প্রাণে, দীর্ঘ দিবা অবসানে,
আসিয়াছি, শ্রমে ভারি, বিসন্ন অন্তরে,
অস্ত যায় দিনমণি অমল অম্বরে।

হায়! ওই অস্তাচল-বিলম্বী ভাস্কর,
কত বাঙ্গালির মুখ, মূর্ত্তিমান চির দুখ,
দেখে সদা মসিজীবী হতভাগা নর,
সারা দিন খেটে যবে ফিরে আসে ঘর।

৪

তেমনি বিকল অঙ্গে, এক দিন হায়!
কর্ম্ম ক্ষেত্র পরিহরি, মসি যুদ্ধ শেষ করি,
আসিয়াছি,—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায়,
বঙ্গ কর্ম্মচারী বিনে কে জানে ধরায়?

৫

নাহি প্রবেশিতে পর্ণ কুটীরের দ্বার,
"আজি এত দেরি কেন,　　　　মলিন বদন হেন,
বল নাথ ?"　শুনিলাম, দেখিলাম আর
প্রেমের প্রতিমা খানি সম্মুখে আমার।

৬

সুশীতল সুবাসিত বাসন্ত অনিল,
সুকোমল পরশনে,　　　　পরিমল বিতরণে,
সরস মধুরে যথা জাগায় কোকিল,
সঙ্গীতে মোহিত করি কানন অখিল।

৭

তথা বীণা-বিনিন্দিত সুমধুর স্বর,
ছুঁইল অজ্ঞাতসারে,　　　　হৃদয়ের প্রেমতারে,
শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্র বাজিল সত্বর,
নাচিতে লাগিল রক্ত ধমনী ভিতর।

৮

ঘুরিল নয়নে ধরা, ঘুরিল গগন,
দুই বাহু প্রসারিয়া,　　　　যুড়াতে তাপিত হিয়া,
হৃদয়ে হৃদয়-নিধি করিনু স্থাপন,
কাঙ্গাল পাইল যেন কুবেরের ধন।

৯

জগত-মোহিনী হাসি ভাসিল বদনে,
অধর অমৃতাধার,　　　　বর্ষিল পীযূষাসার,
মৃত-সঞ্জিবনী-সুধা পশিল মরমে,
ঝরিল শীতল ধারা দাব দগ্ধ বনে।

১০

বঙ্গ কুল-নারী ফুল্ল সলজ্জ কমলে,
যদি এই সুধাসার,　　　　না থাকিত অনিবার,
নিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য অনলে,
বাঙ্গালির সুখ কোথা থাকিত ভূতলে ?

১১

ফুটে বঙ্গ অন্তঃপুরে যে কম কামিনী,
তার কি তুলনা হয়, উদ্যান কুসুমচয়,
প্রত্যেক বাতাস যারে করে কলঙ্কিনী,
দুঃখী বঙ্গবাসিদের রমণীই মণি।

১২

তুমুল ঝটিকা শেষে কুলে আগমন,
শান্তি সমরের শেষ, শ্রম শেষে নিদ্রাবেশ,
নহে তত প্রীতিকর, দিনান্তে যেমন,
দুঃখী বঙ্গবাসিদের প্রিয়া সংমিলন।

১৩

সেই দিন—সেই সুখ—আবার আবার,
পড়িতেছে মনে প্রিয়ে, তোমারে হৃদয়ে নিয়ে,
বলেছিনু পড়ে মনে ?—"প্রেয়সি আমার—
আমার মতন সুখী কেহ নাহি আর।"

১৪

পশিল কি সেই কথা বিধাতার কানে,
সেই সুখ সমাচার, নিদারুণ বিধাতার,
না পারিল সহিতে কি পাষাণ পরাণে ?
তাহে কি হে এত দুঃখ সহি প্রাণে প্রাণে ?

১৫

সেই দিন—এই দিন—কি বলিব আর ?
নহে বহু দিন গত, পটে চিত্রার্পিত মত,
দেখিতেছি সেই রূপ—এ রূপ তোমার ;—
সেই প্রেমমূর্ত্তি,—এই ভুজঙ্গ আকার।

১৬

সেই দিন, প্রিয়তমে ! থাকিবে স্মরণ,
জীবন হইবে গত, কিন্তু জনমের মত,
পেয়েছিনু এক দিন যে সুখ রতন,
ধরাতলে আর নাহি পাইব তেমন। শ্রী নঃ
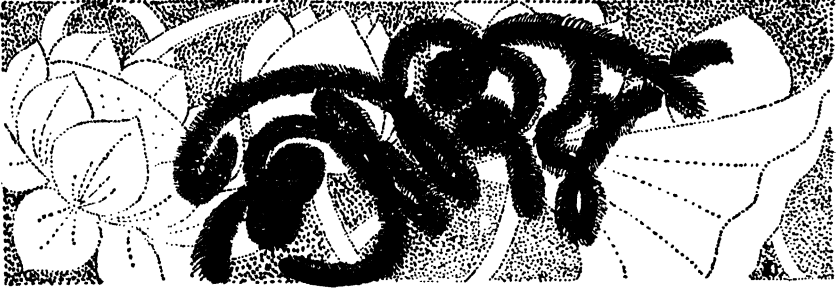
ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ নামা দুইজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। অধ্যাপক উইলসন সাহেব ইঁহাদিগের উভয়কে এক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানে তাঁহার সম্পুর্ণ ভ্রম হইয়াছে। তাহা, পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত প্রস্তাবে দুইজন শ্রীহর্ষের পৃথক২ জীবন চরিত পাঠে, উত্তমরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে বঙ্গদেশে আদিস্থর নামা ন্যায়পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী গৃধ্র পতিত হওয়াতে, রাজা ভাবিবিঘ্ন আশঙ্কায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে আজ্ঞা করিলেন; তচ্ছ্রবণে বুধগণ সকলেই গৃধ্রের মাংস দ্বারা হোম করিতে কহিলেন। রাজা গৃধ্র ধৃত করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই নীরব হইলেন। কিন্তু সভাস্থিত জনৈক ভূস্থর কহিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; তথায় এতাদৃশ রাজ-ভবনে গৃধ্রপতিত হওয়াতে, রাজা ভট্ট নারায়ণাদি দ্বারা মন্ত্র বলে গৃধ্র ধৃত করতঃ তাহার মাংসে যজ্ঞাদি করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গাধিপ আদিস্থর এই কথা শুনিয়া কিয়দ্দিবস মধ্যেই কান্যকুব্জ হইতে ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামা বেদপারগ পঞ্চবিপ্রকে সস্ত্রীক স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ৯৯৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত একটী ভবনে বাস করিতে অনুমতি করিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট নারায়ণ ও শ্রীহর্ষ সৎকবি।

শ্রীহর্ষ দেব শ্রীহীর ঔরসে এবং মামল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের ন্যায় আপন পরিচয় গোপন করেন

নাই। নৈষধ চরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষে তিনি গর্ব্বোক্তি সহকারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা প্রথম সর্গের শেষ শ্লোক :—

শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কারহীরঃসুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয় চয়ংমামল্ল দেবীচয়ং
তচ্চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তন ফলে শৃঙ্গার ভঙ্গ্যামহা-
কাব্যে চারুনি নৈষধীয় চরিতে সর্গোঽয় মাদির্গতঃ।

অর্থাৎ "কবিরাজ রাজির মুকুটালঙ্কার হীর স্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্ল দেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণি মন্ত্র চিন্তাফল স্বরূপ অথচ শৃঙ্গার রস প্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত হইল।"*

পুনর্ব্বার গ্রন্থের শেষে কান্য কুব্জাধিপতির সমীপ হইতে শ্রীহর্ষ, তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লিখিয়াছেন যথা "তাম্বুলদ্বয় মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্য কুব্জেশ্বরাদ্।" পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" মধ্যে আমরা এই মাত্র কবি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকর্ত্তা বেদান্তাচার্য্য এবং বল্লাল মিশ্র উভয়েই শ্রীহর্ষকে ভোজ দেবের পারিষদ স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বোধ হইতেছে ; এবং শ্রীহর্ষ স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ঐক্য হইতেছে না।

সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "প্রবন্ধ কোষ" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীর পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দ্রচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্ত চন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজ শেখর জয়ন্ত চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্ত চন্দ্র, পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইঁহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলার সাহেব কহেন, এই জয়ন্ত চন্দ্র কাষ্ট্রকূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্য কুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের

---

* শ্রীজগচ্চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক অনুবাদিত নৈষধ চরিত। ৪৭ পৃষ্ঠা।

বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেননা, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।

শ্রীহর্ষ এক জন অসাধারণ কবি। তাঁহার নৈষধ চরিত দ্বাবিংশ সর্গে সম্পূর্ণ, বৃহৎ গ্রন্থ। তাহার স্থানে২ কবি বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সরস্বতী কর্ত্তৃক পঞ্চনল বর্ণনে বাক্যালঙ্কারের এক শেষ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শেষ সর্গে "নলস্য সন্ধ্যা বর্ণনং" "তমো বর্ণনং" "চন্দ্র বর্ণনং" প্রভৃতি বর্ণনগুলি অতীব মনোহর। এই সকল দৃষ্টে শ্রীহর্ষ এক জন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, বিবেচনা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত। এতদ্বিধায় আমরা বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণের ন্যায় "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ" বা "নৈষধে পদলালিত্যং" বলিতে পারিলাম না। তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার "নৈষধ" "কাব্য প্রকাশ" রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেন। এ রূপ কিংবদন্তী আছে যে শ্রীহর্ষ তাঁহার মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া কাব্য লিখিতেন এবং একটী শ্লোক রচনা করিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিতেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহার মাতুল ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে এক খানি কাব্য বহুকাল মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ; এজন্য তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধিজনিত সন্দিগ্ধ চিত্ত যাহাতে আর না থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ মাস কলাই ভোজন করিতে দিতেন, ইহাতে শ্রীহর্ষের বুদ্ধি ক্রমে স্থূল হইয়া উঠিল এবং কাব্যগুলির রচনা সংশোধন আবশ্যক হইল না। শ্রীহর্ষ তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস হওয়ায় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "অশেষ শেমুষী মোষ মাস মশ্নামি কেবলং" অর্থাৎ সকল বুদ্ধি বিনাশক মাস কলাই মাত্র খাইতেছি। মাস কলাই খাইয়া যে বুদ্ধি নাশ হয়, ইহা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন এবং তাহা হইলে নিত্য মাস কলাই ভোজী রাঢ় দেশীয় অধ্যাপকগণ ঘোর মূর্খ হইতেন।

শ্রীহর্ষ কবি এবং দার্শনিক। একাধারে এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গোতমীয় ন্যায় শাস্ত্রের খণ্ডন গ্রন্থ। এখানি অতি কঠিন। বঙ্গদেশীয় অতি অল্প ব্যক্তি ইহার অধ্যাপনা করেন। শ্রীহর্ষ "নৈষধ" এবং "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" ব্যতীত "স্থৈর্য্য বিবরণ," "গৌড়ার্বিসাকুল প্রশস্তি," "অর্ণব বর্ণন," "ছন্দ প্রশস্তি", "বিজয় প্রশস্তি",

"শিব শক্তি সিদ্ধি বা শিবভক্তি সিদ্ধি" এবং "নবশাহ সঙ্ক চরিত" রচন করিয়াছেন। এ গুলি অত্যন্ত বিরল প্রচার।

শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশীয় চট্টোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয় কিছু মাত্র জ্ঞাত নহেন।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ দেব "রত্নাবলী নাটিকা" প্রণেতা। কেহ২ বলেন, ধাবক, শ্রীহর্ষ দেবের নিকট অর্থ লইয়া তাঁহার নামে "রত্নাবলী" প্রতিষ্ঠিত করেন, যথা:—

শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্য প্রকাশ শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্না-বলীং নাটাকাং তন্নামা কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্। ইতি প্রকাশাদর্শে মহেশ্বরঃ। ধাবক কবিঃ। সহি শ্রীহর্ষ নাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্। শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞো নাম্না রত্নাবলী নাটিকা কৃত্বা নাগেশ ভট্টঃ। ধাবকাখ্য কবির্ব্বহুধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্। প্রকাশ প্রভায়াং বৈদ্যনাথঃ তথা "ধাবকনামা কবিঃ স্বকৃতাং রত্নাবলীং নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষ নাম্নো নৃপাৎ বহুধনং প্রাপেতি পুরান বটত্তম্" ইতি প্রকাশ তিলকে জয়রাম।

এ সকল গুরুতর প্রমাণ সত্বেও আমরা "রত্নাবলী" ধাবক কৃত বলিতে অপারক হইতেছি; কেননা ধাবক মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; যথা কালিদাসের "মালবিকাগ্নি মিত্রের" প্রস্তাবনায়—

—প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রমস্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

ধাবক একজন আলঙ্কারিক। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। সাহিত্যসার প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সাহিত্যসারে লিখিত আছে, ধাবক মন্ত্র বলে কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াও অতি দরিদ্র ছিলেন; তৎপরে এক শত সর্গে "নৈষধীয়" রচনা করিয়া রাজা শ্রীহর্ষের সমীপ হইতে পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদিগের একমাত্র মুক্তিদায়িনী "রাজতরঙ্গিণীর" মতে শ্রীহর্ষ নানা দেশ ভাষাজ্ঞ ও সৎকবি যথা ৮ তরঙ্গে—

সোংশেষ দেশ ভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসুসৎকবিঃ।
কৎস্ন বিদ্যানিধিঃ প্রাপখ্যাতিং দেশান্তরে ষ্বপি।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের নাম "রাজতরঙ্গিণী" মধ্যে নাই। তথাপি তিনি যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়।

বাণ ভট্টকে কেহ কেহ "রত্নাবলী" রচক বলেন। তাহার এই মাত্র কারণ তৎকৃত "হর্ষচরিতের" প্রারম্ভে এবং "রত্নাবলীর" সূত্রধর মুখে "দ্বীপাদন্যস্মাদপি" এই এক রূপ শ্লোকারম্ভ দেখিয়াই সংশয় হইয়াছে। ইহাতে বাণভট্টকে রত্নাবলী প্রণেতা বলা কতদূর সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যশাসন করেন; কিন্তু এই কাল নিরূপণ আমাদিগের যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে না, কেননা মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অলঙ্কার গ্রন্থদ্বয় ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং তাহা হইলে শ্রীহর্ষের দৃশ্য কাব্যদ্বয় উইলসন সাহেবের আনুমানিক কালে রচিত হয় নাই।

শ্রীহর্ষ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ" এবং "শ্রীহর্ষোদেবে না পূর্ব্ববস্তু রচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী।"

তথা শ্রীহর্ষদেবেনা পূর্ব্ববস্তু রচনালঙ্কৃতং বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী প্রবিবন্ধং নাগানন্দং নাম নাটকং।

এ কথা যথার্থ—

"নাগানন্দ দৃশ্য কাব্য অতিচমৎকার।
কাব্য-প্রিয়গলে বহু মূল্য রত্ন হার॥
"রত্নাবলী"—(যার কিবা সুচারু গ্রন্থন!)
কোথা রয় তার কাছে হীরক রতন॥

রত্নাবলীর নান্দীমুখে গ্রন্থকার হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরে নাগানন্দ রচনা করেন। তাহাতে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীরামদাস সেন।

বঙ্গদর্শনের অসংখ্য সমালোচকের মধ্যে কোন এক জন (বাচনিক কি সম্বাদ পত্রে, তাহা আমাদিগের স্মরণ হয় না) আমাদিগের উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সাময়িক পত্রে দেশবিশ্রুত ব্যক্তিদের জীবন চরিত লিখিত হয়। সেই উপদেশ বাক্য অদ্য আমাদিগের স্মরণ হইয়াছে। আমরা অদ্য উপদেষ্টার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কোন "দেশবিশ্রুত" মহাত্মাদিগের চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই মহাত্মারা কে, তাহা প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিলে বুঝা যাইবে। বঙ্গীয় সমালোচকদিগের কথায় যে আমাদের অচলা ভক্তি, এই প্রস্তাব তাহার প্রমাণ স্বরূপ।

বানরদিগকে কেবল উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। ডারুইন সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্য বানর বংশ সম্ভূত। এ কথায় যিনি হাস্য করিবেন, তিনি ডারুইন সাহেবের গ্রন্থ পড়েন নাই, বা বুঝিতে পারেন নাই, বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সম্যক অধিকারী নহেন। সেই আশ্চর্য্য গ্রন্থের সম্যক আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অল্প সংশয় থাকে।

অতএব পূর্ব্বকালিক বানরেরা মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ, এবং বর্ত্তমান বানরেরা আমাদের কুটুম্ব। ভরসা করি, ভবিষ্যতে ক্রিয়া কাণ্ডে তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ হইবে। আমরা নিশ্চিৎ বলিতে পারি, অনেক মনুষ্য কুটুম্ব অপেক্ষা তাঁহারা সুসভ্য। সুন্দরী পাঠকারিণীদিগকে স্মরণ করিয়া দিই যে, ইহাদিগের সহিত তাঁহাদের ভাই সম্বন্ধ—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভুল না হয়।

রহস্য ত্যাগ করিয়া আমরা পাঠকদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, যিনি সক্ষম, তিনি ডারুইনের বিস্ময়কর গ্রন্থ যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে পাঠ করিবেন। যাঁহারা সক্ষম নহেন, তাঁহাদিগকে আমরা অবকাশ ক্রমে

তদ্বিষয়িণী সমালোচনা উপহার প্রদান করিব, ইচ্ছা আছে। এক্ষণে আমরা তাহার স্থূল মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহার আনুষঙ্গিক কথা হইতে বানরদিগের স্বভাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রসঙ্গ সঙ্কলিত করিলাম।

মনুষ্যদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার দুই একটি কোন২ পশুরও হইয়া থাকে—যথা বসন্ত। কিন্তু অনেকগুলিন মানুষিক পীড়াই অন্য পশুর হয় না। সে রূপ পীড়া কতক২ কেবল বানরদিগেরই হইয়া থাকে। রেঙ্গর দেখিয়াছেন যে, আমেরিকা নিবাসী এক জাতীয় বানরের (*Cebus Azaræ.*) "সরদি" হয়। মনুষ্যের মত, তাহার পৌনঃপুন্যে যক্ষ্মাদি হইয়া থাকে। মৃগী, অন্ত্রপ্রদাহ, ও চক্ষে ছানিও উহাদের রোগ। 'দুধে দাঁত' পড়িবার সময়ে ঐ জাতীয় অনেক বানরশাবক জ্বররোগে মরিয়া যায়। মনুষ্য ব্যবহার্য্য ঔষধে তাহারা আরোগ্য লাভ করে।

অনেক জাতীয় বানর, চা কাফি এবং মদ্য ভাল বাসে। ডারুইন সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, বানরেরা তামাকু সেবন করিয়া সুখ বোধ করে। ইহা পড়িয়া আমাদিগের বড় দুঃখ হইয়াছে। না জানি, এই তামাকুপ্রিয় বাবুরা হুঁকা কলিকা তামাকু এবং টিকার অভাবে বনমধ্যে কতই কষ্ট পান! যাঁহারা দানশৌণ্ড, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, বৎসর২ কিছু২ হুঁকা, কলিকা, টিকা ও তামাকু বনমধ্যে প্রেরণ করিবেন। অধিক বেতন দিলে খানসামাও নিযুক্ত হইতে পারে। সে যাহা হউক, এই বানরেরা যে অনেক বি, এ, এম, এ প্রভৃতি পাণ্ডিত্যাভিমানী মনুষ্য অপেক্ষা বিজ্ঞ, এবং সুসভ্য, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।

ব্রেহ্ম বলেন যে, পূর্ব্ব দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসীরা "বিয়ার" নামক সুরার লোভ দেখাইয়া বন্য বানরদিগকে ধৃত করে। পাত্রে করিয়া "বিয়ার" বাহিরে রাখিলে, বন্য বাবুরা আসিয়া তাহা পান করিয়া উন্মত্ত হয়েন। এ টুকু তাঁহাদের সাহেবি মেজাজ বলিতে হইবে—বাঙ্গালি মেজাজ হইলে, ব্রাণ্ডি ভাল বাসিতেন। ব্রেহ্ম স্বয়ং এই রূপ মদ্যোন্মত্ত বানরদিগের "নেসা" দেখিয়াছেন—এবং তদবস্থায় তাহাদিগকে ধরিয়া অবরুদ্ধও রাখিয়াছেন। নেসায় যে রূপ তাহারা রঙ্গ ভঙ্গ করে, ব্রেহ্ম তাহার অতি রহস্যজনক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদ্যপানের পরদিন প্রাতে এই মদ্যপদিগেরও "খোঁওয়ারি" যন্ত্রণা হইয়াছিল। তখন তাহারা বিমর্ষ ভাবে রহিল, সহজে রুষ্ট হইতে লাগিল, দুই হস্তে পীড়িত শিরঃ ধরিয়া অত্যন্ত দুঃখব্যঞ্জক ভাব

ধারণ করিয়া রহিল, পুনশ্চ মদ্য প্রদত্ত হইলে তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিল; কিন্তু লেবুর রস ইচ্ছা পূর্ব্বক খাইতে লাগিল। আমেরিক এক জাতীয় এক বানর একবার মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, পরে তাহাকে মদ্য প্রদান করিলে সে আর স্পর্শ করিত না। মনুষ্য পশু অপেক্ষা এই বানর পশুকে বিজ্ঞ বলিতে হইবে। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে এইরূপ দুই চারিটি বিজ্ঞ বানর থাকিলে টেম্পরেন্স সোসাইটির বিশেষ উপকার দর্শিত।

এই সকল পাঠ করিয়া অনেকের শান্তিপুরের বিখ্যাত অহিফেণপ্রিয় বানরের কথা মনে পড়িবে। সে গল্প অলীক কি না, তাহা আমরা জানি না—কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বটে। বানরে চরস গাঁজা কখন খাইয়াছে কি না, তাহা জানা নাই, কিন্তু সুন্দরবনে আবকারির দোকান করিলে কি রূপ দাঁড়ায়, বলা যায় না।

বানরের "ইয়ারকি" সম্বন্ধ এইরূপ। তাহাদিগের স্নেহ ও বলের কয়েকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইতেছে।

রেঙ্গর কোন বানরকে শাবকের অঙ্গ হইতে সযত্নে মাছি তাড়াইতে দেখিয়াছেন। ডুবসেল্ দেখিয়াছেন যে, Hylobates, জাতীয় কোন বানর নদীর জলে সন্তানের মুখ ধৌত করিয়া দিতেছে। ব্রেহ্ম উত্তর আফ্রিকায় দেখিয়াছেন যে, কয়েকটি বানরী অপত্য শোকে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কে 'মনুষ্যত্ব' লইয়া গর্ব্ব করিবে? কে বা আর বানর বলিলে গালি মনে করিবে?

বানরেরা মন্বাদি স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহারা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মাতৃপিতৃহীন বানর শিশু অন্য বানর বানরী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এক সদাশয়া বানরীর চরিত্র বিশেষ কৌতুকাবহ। সে কেবল অন্য জাতীয় বানর শিশু পালন করিত, এমত নহে; কুকুর এবং বিড়ালের শাবক চুরি করিয়া আনিয়া লালন পালন করিত এবং পৃষ্ঠে বহন করিয়া বেড়াইত। এইরূপে দত্তক গৃহীত একটি মার্জ্জার শিশু দৈবাৎ এই স্নেহময়ীকে আঁচড়াইয়াছিল। স্নেহময়ী তাহাতে বিস্মিতা হইয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইলেন। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে মার্জ্জার শাবকের নখ আছে। সে এই রূপ কৃতঘ্নতায় আর দূষিত না হইতে পারে, এই আশয়ে তাহার নখ গুলি দংশন করিয়া ছিন্ন করিয়া দিল। মনুষ্যের পৌষ্যপুত্রের দৌরাত্ম্য নিবারণের এ রূপ কোন উপায় হয় না?

C. Chacma এক জাতীয় বানর। Drill অন্য জাতীয় বানর; কিন্তু Chacmaর নিকট কুটুম্ব। Rhesus আর এক জাতীয় বানর। লণ্ডনের পশুনিবাসোদ্যানে একটি প্রাচীন Chacma নিবাস করিতেন। নিকটে একটি যুবা Rhesus ছিল। বৃদ্ধ তাহাকে পৌষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেখানে দুটি Drill আনীত হইলে প্রাচীন দেখিলেন যে কুটুম্বের ছেলে আসিয়াছে; অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ Rhesusকে ত্যাগ করিয়া Drill দুইটিকে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ যে ক্ষুণ্নমনা হইবেন, বিচিত্র কি? যুবরাজের নানা প্রকার ক্ষোভ প্রকাশক কার্য্য ডারুইন স্বয়ং দেখিয়াছেন। যুবরাজ Drill দুইটিকে নানা প্রকার পীড়া দিতেন; তাহাতে বৃদ্ধ দশরথ ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

বানরেরা ক্ষেপাইলে ক্ষেপে। লণ্ডনের পশু নিবাসোদ্যানে একটি বানর ছিল, তাহাকে কিছু পড়িয়া শুনাইলে সে বড় রাগ করিত। পত্র বা গ্রন্থ পাঠে তাহাকে ক্ষেপিতে ডারুইন স্বয়ং দেখিয়াছেন। একবার এমন রাগিয়াছিল যে, আপনার চরণ দংশন করিয়া রক্তপাত করিল। ইহাতে বানরটিকে দোষ দেওয়া অন্যায়। গ্রন্থ বিশেষ পাঠ করিলে, অনেক মহাশয়ই এইরূপ রাগ করিয়া থাকেন। মেঘনাদ বধ পড়িয়া অনেক অধ্যাপককে এইরূপ বানর করা যায়।

বানরেরা যুদ্ধপটু। একদা ড্যুক অব কোবর্গ-গথা অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আবিসিনিয়া প্রদেশে মেন্সা নামক পার্ব্বত্য পথ আরোহণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে বানরেরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিল। ব্রেঙ্গর সঙ্গে ছিলেন। তখন নর বানরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সাহেবেরা বন্দুক চালাইলেন, বানরেরা শিলা খণ্ড বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমে বানরেরাই জয়ী হইয়াছিল। শেষে কি হইল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। লঙ্কায় রাঘবী সেনার কীর্ত্তি নিতান্ত অমূলক না হইবে।

পারগোয়ে নিবাসী Cebus Azaræ নামক বানরেরা ছয় প্রকার শব্দ ব্যবহার করে, ভিন্ন২ শব্দের ভিন্ন ভাব, তাহা বানর জাতির বোধগম্য। অতএব উহা এক প্রকার বানরী ভাষা।

পাঠকদিগের বিরক্তির আশঙ্কায় আমরা আর অধিক লিখিলাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, বানর বলিলে গালি হয় কেন? বানরদিগের যদি ভাষা থাকে, তবে তাহারা পরস্পরকে মনুষ্য বলিয়া গালি দেয়, সন্দেহ নাই।

১

প্রথম দশা দিনে, বেরি বেরি রোওল,
শেজে পাড়ি কাঁদে ভূমি লুটি।
দ্বিতীয় দশা দিনে, আঁখি মেলি হেরল,
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গিল উঠি॥

২

তৃতীয় দশা দিনে, মৃদু মৃদু হাসিল,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ।
চউঠ দশা দিনে, সিনান করি আওল,
হাঁড়ি পাড়ি খাওল পান্তা ভাত॥

৩

পঞ্চম দশা দিনে, বাঁন্ধি চারু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের।
ষষ্ঠম দশা দিনে, পিঠা পুলি বানাওল,
কাঁদিতে২ তার গিলিল তিন সের॥

৪

সপ্তম দশা দিনে, সজিনা খাড়া রাঁধিল,
বলে প্রাণ বঁধু কোথা গেলে।
যে খাড়া রেঁধেছি ভাই, তুমি বঁধু কাছে নাই,
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে॥

৫

অষ্টম দশা দিনে,　　বিরহ বিষাদিনী
মন দুঃখে কিনিল ইলিস।
তিতিয়া নয়ন জলে,　　ভাজায় ঝোলে অম্বলে,
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ॥

৬

নবম দশা দিনে,　　পেট ফেঁপে ঢাক হলো,
আইল কানাই কবিরাজ।
সই বলে কর্ম্মভোগ,　　এ ঘোর বিরহ রোগ,
কবিরাজে নাহি ইথে কাজ॥

৭

দশম দশা দিনে,　　বিরহিণী মরে মরে,
আই ঢাই বিছানায় পড়ি।
কাতরে কহিছে সতী,　　কোথা পাব প্রাণপতি,
কোথা পাব পাচকের বড়ি॥

৮

বিরহীর দশ দশা,　　পন্ পন্ করে মশা,
মাছি উড়ে, ছেলে কাঁদে কোলে।
চাকরাণীর চীৎকার,　　সই সাঙ্গতির টিট্‌কার,
খেদে কবি ছন্দোবন্ধ ভোলে॥

ঐতিহাসিক নবন্যাস। অঙ্গখণ্ড। মাধবমোহিনী। শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অগ্রে ধনাঢ্য লোকের এক২ জন করিয়া কথক (গল্পবক্তা) থাকিত, প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম ভেদে পল্লীস্থ ও গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব২ দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ ধনাঢ্য লোকের বৈঠকখানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গরস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া উপজীবিকার শ্রম দূর করিত। এক্ষণে সে চাল আর নাই, এক্ষণে স্ব২ প্রধান 'আপনি আর কপণি' কিন্তু উপজীবিকার্থে সেই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া শ্রম দূরার্থ ইচ্ছা সেই প্রকারে বলবতী, কিন্তু উপায় অভাব, সেই অভাব পূরণার্থ 'নবন্যাসাদির উৎপত্তি'।"

বোধ হয়, এই কথার পর গ্রন্থের কোন পরিচয় দিতে হইবে না। যদি এমত শ্রেণীর কোন পাঠক থাকেন যে, এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাঠ করুন। কিন্তু আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এরূপ নীচাশয় লেককদিগের সংখ্যা দিন দিন অল্প হউক। এরূপ লেখকদিগের দ্বারা সাধারণের কোন মঙ্গল সিদ্ধ হয় না বরং অমঙ্গল জন্মে।

এই শ্রেণীর লেখক ও পাঠক উভয়কেই আমাদিগের একটি একটি কথা বলিবার আছে। লেখকদিগকে বক্তব্য এই যে, যতই যত্ন করুন না কেন, তাঁহারা কখন ভাঁড় ও কথকদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। কেননা ভাঁড়েরা মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, স্বরবিকৃতি প্রভৃতির দ্বারা যে প্রকার লোকের

মনোহরণ করিত, ঘ্যান২ করিয়া এ প্রকারের উপন্যাস পাঠ করিয়া কাহারও সে রূপ চিত্তরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এইরূপ উদ্দেশ্য করিয়া যাঁহারা উপন্যাস লেখেন, তাঁহাদিগের স্থান কথক ও ভাঁড়ের নিম্ন পদবীতে।

ঐ শ্রেণীর পাঠকদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, যে অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা এরূপ গ্রন্থপাঠ করিবেন, সে অভাব তাস খেলা প্রভৃতির দ্বারা তদপেক্ষা উত্তমরূপে পূর্ণ হইতে পারে। একখানি গ্রন্থ এক টাকা বার আনার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না, এক জোড়া তাস চারি আনায় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি একবার পড়িলে আর ভাল লাগে না; কিন্তু এক জোড়া তাসে প্রত্যহ খেলা যায়, নিত্যই সমান আমোদ পাওয়া যায়। বিশেষ, তাস খেলায় কোন অনিষ্ট নাই, ভাঁড়ামি বা ভাঁড়ামির স্থলাভিষিক্ত উপন্যাসে অনিষ্ট আছে।

বলা বাহুল্য যে, যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য এরূপ, তাহা আমরা আদর করিয়া পড়িতে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধেও সমুদায় গ্রন্থখানি পড়িতে পারিলাম না—ইহা নিতান্ত অপাঠ্য বোধ হইল। এমত হইতে পারে যে, সমুদায় গ্রন্থখানি পড়িলে তাহার কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যাইত। যদি এ গ্রন্থের এমত কোন গুণ থাকে, তবে গ্রন্থকার আমাদিগের এই ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন —আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক এ ক্রটি করি নাই। ইহা আমরা বলিতে পারি যে যতদূর পড়িয়াছি, তত দূর মধ্যে গ্রন্থে বিশেষ গুণ কিছুই দেখিতে পাই নাই। দোষ যাহা দেখিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলে "ঐতিহাসিক নবন্যাসের" আকারের আর একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। দুই একটি উদাহরণেই যথেষ্ট হইবে।

১ম। গ্রন্থের নাম "ঐতিহাসিক।" লেখকের "ঐতিহাসিক" জ্ঞানের পরিচয় এইমাত্র দিলে যথেষ্ট হইবে যে, যৎকালে মগধে হিন্দু রাজা, তৎকালের একজন লোকে জয়দেব হইতে "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" আওড়াইতেছে।—২৭ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি দেখ।

২য়। অসভ্যতা। পূর্ব্বগামী লেখকদিগকে "বাঁদর, হনূমান, জাম্বুবান্" বলিয়া, গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। (ভূমিকার শেষভাগ দেখ) ভদ্রলোকে স্মরণ করিবেন যে, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ব্বাগামী উপন্যাস লেখক।

৩য়। শ্রেণী বিশেষের লোকের অসভ্যতা মার্জ্জনীয়। কিন্তু অশ্লীলতা মার্জ্জনীয় নহে। (৮ পৃষ্ঠার ১৭।১৮ পংক্তি দেখ।) ভদ্রলোক এবং স্ত্রীলোকের পাঠ্য এই বঙ্গদর্শনে উহার সবিশেষ নির্ব্বাচন অসম্ভব।

৪র্থ। সদসৎজ্ঞান মাত্রেরই অভাব। উদাহরণ স্বরূপ নায়ক নায়িকার অবিবাহিতাবস্থার একদিনের ব্যবহার উদ্ধৃত করিলাম—

"মাধবলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া, * * * মনোদুঃখে মস্তক নত করিয়া শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন * এমন সময়ে কে একজন স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল। চমকাইয়া দেখিলেন, মোহিনী সজল নয়নে তাঁহার হস্ত ধরিয়া মুখাবলোকন করিতেছেন। * * * * মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিণত করাইয়া স্বস্কন্ধে রাখিলেন। কপোল স্পর্শে, যে প্রকার জ্বলিত ক্ষত তৈল দানে শীতল হয়, মাধবের দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল, বাহুপ্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, 'মোহিনী' ইত্যাদি। * * * এমন সময়ে সুমতী (নায়কের যুবতী ভগিনী) শীঘ্র আসিয়া কহিল, 'দাদা, ও দিগে কে আশ্চে,' মাধব প্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বক্ষ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।" (২১—২২ পৃষ্ঠা)

আমরা শুনিয়াছি যে, যেখানে রাধাশ্যাম, সেখানে বৃন্দাদূতীর অভাব নাই। কিন্তু শ্যামচাঁদের ভগিনীই যে বৃন্দাদূতী, এইটি নূতন।

৫ম। দেশীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গে গ্রন্থকারের বড় বিবাদ। তাঁহার নায়ক ঐ যুবতী ভগিনীর ললাট চুম্বন করিয়া থাকেন। ভগিনীও "দাদার হস্ত ধারণ" করেন। (২১ পৃষ্ঠা ১১।১২ পংক্তি) মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বকার হিন্দু ভদ্রলোকে বাবু পদে বাচ্য হইয়াছেন। রাজপুত্রের নাম "মাধব বাবু।" সর্ব্বাপেক্ষা "রাজা বাবু" সম্বোধনটি আমাদিগের মিষ্ট লাগিয়াছে।

৬ষ্ঠ। আমরা লেখকের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার একটি গুণ আছে—ভাষা অতি সরল। যাঁহারা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ এবং পদ ত্যাগ করিয়া সচরাচর পরিশুদ্ধ কথোপকথনের ভাষা অবলম্বন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা ভালই করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইতর লোকের ভাষা অবলম্বনীয় নহে। এ গ্রন্থে যে২ স্থানে ভাষার অশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার অনেকই বোধ হয়, মুদ্রাকরের দোষ। বাঙ্গালাগ্রন্থের

মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিশুদ্ধরূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট। আমরা অনেক যত্ন করিয়া দেখিয়াছি, তাহা ঘটনীয় নহে। তজ্জন্য আমরা সর্ব্বদাই পাঠকদিগের নিকট লজ্জিত। সকল গ্রন্থেই এইরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু এ দোষে এই গ্রন্থ বিশেষ দুষ্ট। ৯ পৃষ্ঠা হইতে আমরা অসম্পূর্ণ চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"পাণ্ডাজী কয়েক বার পরাস্থ হইয়া মনে২ তাঁহার উপর অত্যান্ত আক্রোশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু ভয় বশতঃ কথা বাহ্যিক বলিতে সক্ষম হইতেন না; লুকাইয়া লোকের নিকট নৈয়াইক বলিয়া গ্লানী করিতেন।"

চারিটি ছত্রে চারিটি ভুল—যথা পরাস্থ, অত্যান্ত, নৈয়াইক, গ্লানী। এই গুলি মুদ্রাকরের দোষ বিবেচনা করিতে পারি, কিন্তু "পাণ্ডাজী পরাস্থ হইয়া ——আক্রোশ জন্মিয়াছিল," "বাহ্যিক বলিতে" ইত্যাদি দোষ মুদ্রাকরের নহে। যে ভ্রমটি একবার ঘটে, তাহাই মুদ্রাকরের, কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে দেখিলাম, কথাবার্ত্তার স্থানে "কথাবাত্রা" আবার ২২ পৃষ্ঠার ২৩ ছত্রে "কথাবাত্রা" ইহাতে কি বিবেচনা হয়? এই গ্রন্থে "বালাপোষাবৃত" পুরুষের কথা পড়িলাম। এইরূপ দোষ অসংখ্য।

এক্ষণে অনেকে মাতৃভাষার বিশেষ আলোচনা না করিয়াও গ্রন্থাদি প্রণয়নে প্রবৃত্ত, এবং তাঁহাদিগের গ্রন্থ অনেক সময়ে ভাল হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিতে আমরা অনিচ্ছুক; কিন্তু যে সকল দোষ আমরা দেখাইলাম, তাহা কাহারও ঘটে না।

৭ম। গ্রন্থকারের প্রণীত চিত্রগুলি সম্বন্ধে কি বলিব? এ গ্রন্থে রাজপুত্র নাগরীগণের জলের কলস ভাঙ্গিতেন, (১৩ পৃঃ) তাঁহার বিমাতার সঙ্গে বিবাদ হইলে দুধ পাইতেন না, পেঁড়া পাইতেন না, জল খাবার পাইতেন না। রাজকুমারী দোকানে দাঁড়াইয়া খেলানার দর করেন। ১৯ পৃষ্ঠায় রাজা এবং রাজপুত্রের যে কথোপকথন হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই আমাদিগের মনোহরণ করিয়াছে। রাজা বলিতেছেন, "আমি আমার রাজ্য কুকুরকে দিয়া যাইব, তথাচ তোমাকে দিব না।" তাঁহার পুত্র উত্তরে বিমাতা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "অমন স্ত্রীকে হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলুন, পাণ্ডার মস্তক মুণ্ডন করিয়া উল্টা গাদায় চড়াইয়া দেশান্তর করিয়া দিন।" "ঐতিহাসিক নবন্যাসের" ঐতিহাসিক ভাগ পিতামহীদিগের নিকট প্রাপ্ত।

৮ম। গ্রন্থকার প্রতি পরিচ্ছেদে, এক২টি গীত উদ্ধৃত করিয়া বসাইয়াছেন। তাহা দাসু রায়, গোপালে উড়িয়া প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহা লেখকের রুচি এবং শিক্ষার পরিচয়।

এরূপ তালিকা করিতে গেলে শেষ হইবে না। আমরা যাহা বলিলাম, তাহা গ্রন্থের অত্যল্পাংশ সম্বন্ধে। গ্রন্থের বিশেষ কোন গুণ দেখিলে এসকল দোষ সামান্য বলিয়া গণনা করিতাম।

জ্ঞান কুসুম। প্রথমভাগ। শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

পাঠ্য পুস্তক, স্মরণ শক্তি, যৌবন, স্বভাব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি প্রস্তাব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিই।

"পুস্তক পাঠ জ্ঞান বৃদ্ধির এক প্রধান উপায়।" ১ পৃষ্ঠা

"যিনি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন না, তিনি জ্ঞান হইতে এক প্রকার বঞ্চিত।" ২ পৃষ্ঠা

"জ্ঞান সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্মরণ এক প্রধান সাধন। এই সাধন না থাকিলে আমরা কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতাম না।" ৩ পৃষ্ঠা

"আমরা স্বভাবের হস্ত হইতে স্মরণ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি সকলকে সমান স্মরণ দান করেন নাই।" ৪ পৃষ্ঠা

এইরূপ ৫, ৬, ৭, ৮ যথাক্রমে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিয়া আমরা কেবল ঐরূপ নূতন এবং দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বই পাইলাম। গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ উদ্দেশে এই গ্রন্থ খানি প্রচারিত হইয়াছে ?

শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস। বর্গীর হাঙ্গামা হইতে লার্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত। কলিকাতা ভারত যন্ত্র।

১১১ পৃষ্ঠায় পড়িলাম, "প্রিন্স অব আলফ্রেড" এখানে আসিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া "উপাধি" দান করেন। তিনি আয় করটি উঠাইয়া দিয়া যান নাই বলিয়া তাঁহার সমাদরার্থে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা অপব্যয় হইয়াছে। যে গ্রন্থে এরূপ পাণ্ডিত্য, তাহা শিশুদিগের বা কাহারও পাঠ্য নহে।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা এ গ্রন্থে আরও গুরুতর দোষ আছে। ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "এমন কোন গ্রন্থকারই নাই, যিনি স্বর্ণময়ীর পারিতোষিক

প্রাপ্ত হন নাই।” ক্ষেত্রনাথ বাবু কে, তাঁহার কি অভিপ্রায়, তাহা আমরা কিছুই জানি না; বোধ করি, তিনি ভদ্রলোক এবং অসাবধানতাবশতঃই এমত লিখিয়াছেন; কিন্তু যদি তিনি ইহা না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, যে কথাটি মিথ্যা লেখা হইল, এবং অর্থলোলুপ ভিক্ষুকের তোষামোদের মত শুনাইবে, তবে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। লেখক মাত্র সম্বন্ধে এইরূপ অপবাদ প্রচার করিতে তাঁহার লজ্জা হইল না? আমরা জানি, মহারাণী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত দানপরায়ণা এবং অনেক ভিক্ষুক গ্রন্থ লইয়া তাঁহার দ্বারস্থ, মহারাণীও অকাতরে তাহাদিগকে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশের লেখক মাত্রেই যে তাঁহার পারিতোষিক ভোক্তা নহেন, তাহা বলা বাহুল্য। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এখন অনেক গ্রন্থকার আছেন, যে তাঁহারা অন্যকে ভিক্ষা দেন, অন্যের নিকট ভিক্ষার্থী নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের নাম এমন দেশব্যাপ্ত, যে এস্থানে নাম করিবার আবশ্যক নাই। এই লেখক, বোধ হয়, স্বশ্রেণীর লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও চেনেন না। তিনি যাঁহাদিগের কথা বলিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন, সেই শ্রেণীর লোক গ্রন্থকর্ত্তা নামের অধিকারী বলিয়াই বঙ্গদেশে ভদ্রলোকে সচরাচর গ্রন্থ প্রণয়নে বিমুখ। বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখা কাজে কাজেই আজিও অনেকের কাছে ইতর বৃত্তি বলিয়া গণ্য। এই লেখকের উক্তি বিচারাগারে এবং অন্য প্রকারে দণ্ডনীয়।

যে সকল গ্রন্থকার ভিক্ষার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহাদিগকে ইহা বলিয়া দিবার আবশ্যক হইল যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট প্রাপ্তি কামনায় পরনিন্দাঘটিত তোষামোদের প্রয়োজন নাই। বিনা তোষামোদেও তিনি দান করিয়া থাকেন।

সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রীউমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এখানি কাব্য। ইহাতে প্রশংসার কিছুই পাইলাম না। অনেক স্থানেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। মধ্যে২ অনুপ্রাসের ঘটা। তজ্জন্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গান্ধারী বিলাপ কাব্য। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। কুরুক্ষেত্র সমরে রাজা দুর্যোধন হত হইলে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গান্ধারীর বিলাপ এই কাব্যে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, ঐ সম্বাদ পাইলে গান্ধারী যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

পুত্রের জন্য মাতার বিলাপ ৪০ পৃষ্ঠা লিখিলে কখনই ভাল হয় না। স্থানে২ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। অনেক স্থান ভাল নহে। ছন্দোবন্ধ ভাল।

প্রমীলাবিলাস। গুপ্তপল্লী নিবাসী শ্রীমহিমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেস।

এখানিও কাব্য। কাব্য খানি কোন অংশে ভাল নহে। লেখকের কবিত্ব এবং তাঁহার ভাবের নবীনত্বের পরিচয় স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"হেরিয়া বেণীর শোভা, জগজন মনোলোভা,
বিবরে লুকায় ফণী হইয়া অধীর।
বদন না তোলে আর, মাথা কুটি বার বার,
করিয়াছে চক্রসম আপনার শির॥
কামের ধনুক জিনি, ভুরু ধরে বিলাসিনী,
বসন্ত বেদিকা সম ললাট রুচির।
হেরিয়া চিকুর চয়, কাদম্বিনী পেয়ে ভয়,
বাতাসে উড়িয়া শেষে হইলা অস্থির॥"

নলদময়ন্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা, স্কুলবুক প্রেস।

অশুভক্ষণে মহাভারতকার নলদময়ন্তীর উপাখ্যান সেই মহাভারত মধ্যে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসের জ্বালায় মুদ্রাযন্ত্র দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। যাঁহার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে, তিনিই নলদময়ন্তীর কথা লেখেন। এক্ষণে জলের কল, মিউনিসিপল বিল, রোড সেস প্রভৃতি অনেক লিখিবার বিষয় হইয়াছে—ভরসা করি, আর কোন কাব্যকার নলদময়ন্তীকে লইয়া টানাটানি করিবেন না।

বর্ত্তমান গ্রন্থের একটি গুণ আছে,—গ্রন্থ পরিচায়ক বিজ্ঞাপনটি ক্ষুদ্র। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"বহুদিন পর্য্যন্ত আমার একখানি কাব্য রচনা করিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু অনবকাশ বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি সজ্জনগণের সন্তোষ সাধনার্থ ও তরুণবয়স্কদিগের সসম্মদ উপদেশ লাভার্থ প্রণয়ন করতঃ বিদ্বানগণের পরিতোষ প্রতীক্ষায় সিদ্ধকাম হইতে পারিলাম কি না, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু থাকিলাম।"

এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা আছে।

১। বহুকাল হইতে কিশোরী বাবুর কাব্য রচনার অভিলাষ ছিল। সকল অভিলাষই কি পূর্ণ করিতে হয়? যিনি বহুকালের অভিলাষ নিবারণ করিতে পারেন, তিনি আত্মজয়ী। আমরা কিশোরীলাল বাবুকে পরামর্শ দিই, তিনি ভবিষ্যতে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন না। তাহাতে যে দোষ, নলদময়ন্তী কাব্যই তাহার প্রমাণ।

২। তাঁহার উদ্দেশ্য দুইটি দেখা যাইতেছে, "সজ্জনগণের সন্তোষ সাধন," এবং "তরুণবয়স্কদিগের সসম্মদ উপদেশ লাভ।" প্রথম উদ্দেশ্যটি বুঝিতে পারিয়াছি—গ্রন্থকার সজ্জনগণের সন্তোষ সাধন করিতে চাহেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি বুঝিতে পারি নাই—তিনি কি "তরুণবয়স্কদিগের সসম্মদ উপদেশ লাভ" করাইতে চাহেন? যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারি না। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান হইতে "সসম্মদ উপদেশ" লাভ করিতে পারে, এমন ছেলে প্রায় আমরা দেখি নাই।

৩। তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু নহেন। অন্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। "বিদ্বান্গণের পরিতোষ প্রতীক্ষায় সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন কি না" তাহাই জিজ্ঞাসা করেন। "প্রতীক্ষায় সিদ্ধকাম" কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না, সুতরাং আমরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। তবে, এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাহাতে "সজ্জনগণের সন্তোষ" হইবে, তাহাতেই "তরুণবয়স্কদিগের সসম্মদ উপদেশ লাভ হইবে," আবার তাহাতেই "বিদ্বান্গণের পরিতোষ" হইবে, ওরূপ আকাঙ্ক্ষা করা বড় দুরাশার কাজ। বিশেষ, বিদ্বান্গণের পরিতোষ কিছুতেই হয় না। সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাঁহাদের পরিতোষ জন্মে না। নিউটন বলিয়াছিলেন যে, আমি বালকবৎ সমুদ্র তীরে কেবল ঢেলা কুড়াইতেছি মাত্র।

যিনি সাত ছত্র পদ্য লিখিতে অক্ষম, তিনি নলদময়ন্তী কাব্য না লিখিলে ভাল হইত। শ্রীহর্ষ ইহা লিখিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে "সজ্জনগণের সন্তোষ সাধন" হইবে না—কেননা, অনর্থক কিশোরী বাবুর সময় নষ্ট হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইবেন। বিদ্বানগণের পরিতোষ লাভ হইবে না, কেননা তাঁহারা ইহা পড়িবেন না। তবে "তরুণ বয়স্কদিগের" কিছু উপদেশ লাভ হইতে পারে বটে, "ভরসা করি", তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ বহু কালের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। ৮

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবের মধ্যে কেবল মনুষ্যই উন্নতিশীল। পুরাকালে যেরূপ কৌশলে পক্ষীগণ নীড় নির্ম্মাণ করিত, মধুমক্ষিকানিকর মধুচক্র রচনা করিত, ঊর্ণনাভ লূতাতন্তু জাল বিস্তার করিত, এক্ষণেও তদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু কালে কালে মানব জাতির অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গিরি গহ্বর বা তরুশাখা যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষনিচয়ের আশ্রয় ছিল, তাহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিতেছে। বনের ফল বা অপক্ক মাংস যাহাদিগের আহার ছিল, যাহারা উলঙ্গ থাকিতে লজ্জা বোধ করিত না, যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ পদে পদে প্রাকৃতিক কার্য্য পরম্পরায় ভয়ঙ্কর দৈব শক্তির লক্ষণ দেখিয়া ভীত হইত, তাহাদিগের বংশজাত সভ্যজাতিগণের কৃষি সমুৎপন্ন পরিপক্ক ভক্ষ্য দ্রব্যের পারিপাট্য, সুবিচিত্র বেশ ভূষার আড়ম্বর, নৈসর্গিক নিয়ম জ্ঞান জনিত পার্থিব প্রভুত্ব নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, ভাষাই এই অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির মূলীভূত। ভাষার প্রভাবেই অর্জ্জিত জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। ভাষার প্রভাবেই উত্তর কালবর্ত্তী জনগণ পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া নূতন সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুতরাং ভাষার প্রভাবেই পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্যের ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং অবস্থার উন্নতি হয়।

ভাষা শক্তিগুণে মানব জাতির ঈদৃশ মহত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত ভাষা শক্তিকেই নরকুলের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাষা না থাকিলে মনুষ্যে পশুতে কি বিভেদ থাকিত? উপস্থিত পদার্থ পুঞ্জেই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত তত্ত্ব নিচয় হৃদয়ঙ্গম হইত

না। সমীপস্থ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করাই জীবনের উদ্দেশ্য হইত। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নত ভাব সকল মনে স্থান পাইত না। কবির রসময়ী কবিতা লহরী, দার্শনিকের পরমার্থ বিষয়ক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, ইতিহাসের উদ্দীপক দৃষ্টান্তমালা, বিজ্ঞানের অকাট্য উপপত্তি, ধর্ম্মের গম্ভীর উপদেশ, প্রণয়ের অনন্ত আশা প্রকাশ, এই সকল মনুষ্য গৌরব সূচক সভ্যতা-চিহ্ন কোথায় থাকিত?

এই মানব-মহিমা-প্রসূতি ভাষার কি রূপে উৎপত্তি হইল, আমরা এই প্রস্তাবে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। কি বাঙ্গালা, কি হিন্দি, কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি, কি আরবি, কি পারসি, কোন ভাষা যখন ছিল না, মনুষ্যগণ কি রূপে আদৌ ভাষা শিক্ষা করিল, আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করিব। নরজাতির স্বভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহার সাহায্যে অতীতকালের গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া ভাষার প্রথম সঞ্চার বর্ণনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

মনোভাব-ব্যঞ্জক পরিস্ফুট বর্ণময় শব্দ মালার নাম ভাষা। এই লক্ষণের দ্বারা প্রথমতঃ, অভিপ্রায় প্রকাশক অঙ্গ ভঙ্গিগুলি বাদ যাইতেছে। যে কথা কহিতে পারে না, যাহার শব্দের অকুলান আছে, বা যে দেশ বিশেষের ভাষা না জানিয়া কার্য্যোপলক্ষে তথায় উপস্থিত হয়, দেহ সঞ্চালনই তাহার প্রধান সম্বল। মূক, শিশু, অসভ্য বা ভাষানভিজ্ঞ পর্য্যটক, হাত পা মুখ প্রভৃতি নাড়িয়া কোন রূপে আপনার মনের বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এবম্বিধ শারীরিক ক্রিয়া সমুদায় ভাষাপদ বাচ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগের লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের পরিস্ফুট বর্ণাত্মক ভাষা অপর জীবগণের অস্ফুট শব্দ সমূহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হইতেছে। অধিকাংশ জন্তুই যে শব্দ বিশেষ দ্বারা স্বজাতির মধ্যে সুখ দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের শব্দগুলি পরিস্ফুট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা যায় না: সেগুলি অপরিস্ফুট স্বর মাত্র। সত্য বটে, কোন কোন পাখিতে মানব ভাষার অনুকরণ করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের স্বাভাবিক ভাষা প্রায় অধিকাংশ অস্ফুট, অথবা একটী বাঁধা সুর মাত্র।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়ত্ববাদ *, ২য় সম্মতিবাদ, ৩য় অনুকৃতি বাদ। আমরা যথাক্রমে এই তিনটীর পর্য্যালোচনা করিব।

অপৌরুষেয়ত্ববাদীরা বলেন যে, ভাষা মনুষ্য-নির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাঁহাদিগের মতে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশার্থে প্রথমসৃষ্ট নরকুল-পিতা সুন্দর ভাষা-জ্ঞান-ভূষণে দেবাদিদেব জগৎপতি কর্তৃক বিভূষিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভূত কালের অন্ধকারময় গর্ভে জ্যোতির্ম্ময় সত্যযুগ নিরীক্ষণ করেন এবং যাঁহারা কালসহকারে মানব-জাতির বিদ্যা ও নীতি বিষয়ে অধোগতি সন্দর্শন করেন, তাঁহারা এই মতের প্রধান প্রতিপোষক। তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে জগৎকারণ যাহাকে ভূমণ্ডলের আধিপত্য প্রদানার্থে সৃজন করিলেন, সেই নবসৃষ্ট আদিপুরুষের কোন অভাব ছিল। শব্দানুকরণ-শক্তি-বিশিষ্ট অথচ ভাষা-বিবর্জ্জিত, বিজ্ঞানশূন্য, নীতি-শূন্য, ধর্ম্মশূন্য অসভ্য চূড়ামণিকে আদি পিতা বলিতে তাঁহাদিগের লজ্জা হয়; এজন্য সর্ব্বগুণবিশিষ্ট মনোহর মূর্ত্তি কল্পনা করেন। কিন্তু এরূপ কবির চিত্রে প্রত্যয় স্থাপন না করিয়া, যথার্থতত্ত্ব নিরূপণার্থে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। দেখ, ইতিহাস পাঠে কি জানা যায়। মনুষ্যের ক্রমাগত অবনতি নহে, উত্তরোত্তর উন্নতি। "জ্ঞান ও নীতি" বিষয়ক প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কালক্রমে নরজাতির জ্ঞান ও নীতির বৃদ্ধি হইতেছে। সত্য বটে, কোন নির্দ্দিষ্ট-দেশ-বাসীদিগের প্রভাবের উদয়াস্ত আছে; যেমন তাহাদিগের এক সময়ে উন্নতি হইতেছে, তেমনই অপর সময়ে অবনতি হইতেছে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সমগ্র মানবজাতি ক্রমেই উন্নত হইতেছে, অবনত হইতেছে না। জোয়ার আরম্ভ হইলে যেমন অল্প ক্ষণের মধ্যে জল বৃদ্ধি বুঝা যায় না, বরং ভাটাই হইতেছে সন্দেহ থাকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সলিলের উচ্চতা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; তেমনই অল্প কালের মধ্যে মনুষ্য জাতির উন্নতি নয়নগোচর না হইয়া অবনতি প্রতীয়মান হইলেও অধিক সময় ব্যবধানে দেখিলে উন্নতি অনুভূত

---

* আমাদিগের দেশে যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ২ ভাবেন, বেদ মনুষ্য বিরচিত নহে, ঈশ্বর প্রণীত; কেহ২ বিবেচনা করেন যে বেদ নিত্য, কাহারও রচিত নহে। শেষোক্ত মতে ভাষার নিত্যতা কল্পিত হইতেছে; কিন্তু এমতটী এরূপ অসঙ্গত, যে ইহার বিষয়ে কিছু লেখা আবশ্যক বোধ হইল না।

হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষাও উন্নত হইতেছে। সভ্যতা জনিত নূতন ভাব প্রকাশার্থে নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়া ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে, অথবা পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া ভাষার ভাব প্রকাশিকা শক্তি বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ভাষা ঈশ্বরপ্রদত্ত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পদার্থ, সর্ব্ব গুণ বিশিষ্ট আদিমানবের অনুপার্জ্জিত সম্পত্তি, এমতটী ঐতিহাসিক-প্রমাণ-বিরুদ্ধ। ইহার আরও অনেক দোষ আছে। আমাদিগের কি না ঈশ্বর-প্রদত্ত? কিন্তু ঈশ্বর শক্তি ও উপকরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন। তিনি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন না; প্রস্তর, মৃর্ত্তিকা, চূর্ণক প্রভৃতি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। সেই রূপ হয়ত তিনি আমাদিগকে শব্দানুকরণ ও শব্দ সন্নিবেশ শক্তি দিয়া থাকিবেন। তদ্দারাই যদি আমরা ভাষা প্রস্তুত করিতে পারি (পারি যে ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া যাইবে), তবে ভাষা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর-প্রদত্ত, কেন ভাবিব? এইরূপ বৃথা কল্পনা দ্বারা অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করা হয়, এই মাত্র। যাহা কিছু লোকে বুঝিতে পারে না, তাহাতেই ঈশ্বরকে আনিয়া ফেলে। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অগ্নিতে পূর্ব্বে ঈশ্বরের হস্ত দৃষ্ট হইত; কিন্তু বিজ্ঞান তাহাদিগকে প্রকৃতির নিয়মের অধীন করিয়াছে। যদি মানব বংশের আদি পুরুষ হাত, পা, নাক, কান, চোক, প্রভৃতির ন্যায় ভাষাও পাইতেন, তাহা হইলে আর একটী বিপদ্ ঘটিত। যে ভাষা সম্পূর্ণ, তাহাতে প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক ভাবের এক একটী নাম চাই। যখন আদি পিতার প্রথম জ্ঞান হইল, সকল পদার্থ একবারে তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল, বিশ্বাস করা যায় না; যদি না হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামগুলি কিরূপে তাঁহার স্মরণে রহিল, এবং স্থল বিশেষে তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রয়োগ করিতেই বা শিখিলেন? ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া এক একবার সমুদায় বস্তুর নাম না বলিয়া দিলে, তাঁহার শব্দপ্রয়োগ-জ্ঞান জন্মিবার আর কোন উপায় এই মতানুসারে উদ্ভাবিত হয় না।

সম্মতিবাদ পক্ষাবলম্বীদিগের মতে কতকগুলি লোকে পূর্ব্বকালে একত্রিত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে এই এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। কিন্তু ভাষার সত্ত্বাভাবে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কি রূপে তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জানিল? এমতটী সুতরাং ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে খাটে না। অনেক লোকে কেন একটী বস্তু বুঝাইতে

একই শব্দ প্রয়োগ করে, ইহাই এমতের প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায়? ইতিহাসে ত নাই। সঙ্কল্প বা সম্মতি ভাষা পরিবর্ত্তনে অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছে। প্রতিযোগী শব্দ ও ভাষারদ্বন্দ্ব আমাদিগের সম্মুখেই চলিতেছে; এই মারাত্মক বিরোধে সম্মতি বা সন্ধি কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাহা স্বভাবতঃ মিষ্ট, যাহা বহুজন-পরিগৃহীত, যাহা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, যাহা বল, ঐশ্বর্য্য বা ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যতার উপযোগী, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া জয় লাভ করে।

এক্ষণে আমরা অনুকৃতি বাদ প্রকটনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই মতে কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক চিত্তাবেগ বশতঃ আমাদিগের মুখ হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শব্দ বা স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত প্লেটোর গ্রন্থে এই মতের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইদানীন্তন কালীন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ফরাসীদেশীয় রিনান * এবং ইংলণ্ড নিবাসী ফ্যারার † এই মত সমর্থন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই মতের মূল কেবল দুইটী কথা; প্রথম মনুষ্যের শব্দানুকরণ শক্তি আছে, দ্বিতীয় বিস্ময় হর্ষ প্রভৃতি চিত্তাবেগ-বশতঃ মনুষ্যের মুখ দিয়া স্বভাবতঃ শব্দবিশেষ বিনির্গত হয়। এই দুইটীই যে সত্য, প্রতিদিনই জানিতে পারা যাইতেছে। অনুকরণশক্তি-প্রভাবেই আমরা ভাষা শিক্ষা করিতে পারিতেছি; অনুকরণশক্তি থাকাতেই বিড়ালের শব্দ শিখিবার পূর্ব্বে অনেক বালকে মার্জ্জারকে "ম্যাও ম্যাও" বলে। দুঃখ, ঘৃণা, চমক, আহ্লাদাদির আতিশয্য হইলে যে আপনাআপনিই আস্যহইতে শব্দ নিঃসৃত হয়, ইহাও কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আবেগ-বাচক শব্দের যেরূপ সাদৃশ্য বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় দৃষ্ট হয়, তাহাও বোধ হয় এই স্বাভাবিক বেগের ফল।

অনুকৃতি বাদ মতে সুতরাং এই মাত্র অনুমিত হইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল শক্তি থাকাতে মানব জাতির ভাষা রক্ষা হইতেছে, সেই সকল শক্তি প্রভাবেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে যে শক্তি থাকাতে শিশুগণ মনুষ্যোচ্চারিত শব্দের অনুকরণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, এবং সময়ে সময়ে কথার অকুলান বশতঃ নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে, সেই শক্তি থাকাতেই

* Renan.

† Farrar.

আদিম পিতৃগণ পক্ষীগণের সঙ্গীত, অপর জীবের রব, জলের কল কল, পত্রের মর্ম্মর প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ করিয়া ভাষার মূল পত্তন করেন।

কখন এই অনুকৃতি শক্তি মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রথম বিকাশ পায়, আমরা অনুসন্ধান করিতে যাইব না। মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরিণামবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, নরকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ ভাষা বিহীন পশুবৎ জীব হউন বা না হউন, তাহা আমাদিগের নির্ণয় করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান মানব প্রকৃতি সুলভ শব্দানুকরণ শক্তি যাহার ছিল না, সে এ প্রবন্ধে মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে যদি অনুকৃতিবাদই সত্য, তবে কেন সংস্কৃত বা ইংরাজি প্রভৃতি উন্নত ভাষাতে অনুকরণোৎপন্ন-লক্ষণ-যুক্ত শব্দ অধিক পরিমাণে দেখা যায় না? কেন আমরা ম্যাও ম্যাও না বলিয়া বিড়াল বা ক্যাট বলি, খ্যাও২ না বলিয়া সারমেয় বা ডগ্ বলি, ইত্যাদি? দ্বিতীয়তঃ, কেনই বা বিবিধ ভাষার বহু বিস্তীর্ণ শব্দ মালা স্বাভাবিক শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইয়া গুটিকতক ধাতু হইতে সমুৎপন্ন দৃষ্ট হয়? নিম্নে এবিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, ইহা মনে রাখা উচিত যে সংস্কৃত ও ইংরাজিতে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহাদিগকে স্পষ্টই অনুকরণোৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কাক ও ইংরাজি ক্রো, সংস্কৃত কোকিল এবং ইংরাজি কু কু, সংস্কৃত কুক্কুট ও ইংরাজি কক্, এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচ্য যে সংস্কৃত বা ইংরাজির ন্যায় সুন্দর-ভাব-প্রকাশক ভাষা পাইয়াও মনুষ্যের মন অদ্যাপি অনুকৃতির পক্ষপাতী আছে। যখন আলঙ্কারিকেরা বলেন যে যদ্রূপ ভাব, তদ্রূপ শব্দ বিন্যাস করিবে, যখন উৎকৃষ্ট কবিগণ তদনুযায়ী কার্য্য করিতেও বিশেষ প্রয়াস পান, তখন বলিতে হইবে যে আমাদিগের অন্তঃকরণে একটী নিগূঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভাষার উদ্দেশ্য তখনই সর্ব্বাপেক্ষা সফল হয়, যখন বর্ণিত পদার্থের সহিত ব্যবহৃত পদের শব্দগত সাদৃশ্য থাকে। তৃতীয়তঃ, ইহাও দ্রষ্টব্য যে যদি কোন কথা বাস্তবিক অনুকৃতিজাত হয়, তাহা নির্ণয় করাও বড় কঠিন কাজ, কারণ, অনুকরণোৎপন্ন হইলেও দেশভেদে নামগত অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য ঘটে। দেখ, সংস্কৃত কল কল ও ইংরাজি মর্ম্‌র, সংস্কৃত স্বন্ স্বন্ ও ইংরাজি হিসিং, একই স্বাভাবিক শব্দের অনুকৃতি; কিন্তু তাহাদিগের রূপ

কত ভিন্ন। প্রাকৃতিক শব্দ ও তৎপ্রকাশক কথার পরস্পর সম্বন্ধ অতি দূরবর্ত্তী ও কল্পনামূলক। যখন একটী পাখি ডাকিতেছে, অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট যে তাহার স্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্ণে ভিন্ন প্রকার লাগে। লোকের ইন্দ্রিয়বোধের তারতম্য আছে। উপস্থিত মনের গতিতে বহির্জগৎকে নূতন ভাব প্রদান করে। যে বিহঙ্গম রব এক সময়ে মধুর সঙ্গীত বোধ হইবে, অন্য সময়ে তাহাই আবার শোকসিক্ত হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি জ্ঞান হইবে। যে শব্দে ভাবুক ঐশ্বরিক গাম্ভীর্য্য দেখিবেন, সে শব্দ হয় ত বিরহী মদনোদ্দীপক ভাবিবেন। রঙ্গিল কাচের ন্যায় আমাদিগের মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে স্ববর্ণে আচ্ছাদিত করে; সুতরাং একই শব্দ যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিয়া অনুকরণ করিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। চতুর্থতঃ, অনুকৃতি-মূলক শব্দ যখন প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা সম্ভবতঃ একটী বিশেষ পদার্থের নাম মাত্র ছিল; পরে তৎসদৃশ অপরাপর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া ইহা জাতিনামরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যে সাদৃশ্য লইয়া ঈদৃশ অর্থবিস্তার ঘটে, তাহা শব্দগত না হইয়া আকারগত বা অন্য কোন কল্পিত লক্ষণগত হইতে পারে। এইরূপে কাল ক্রমে উহার প্রাকৃতিক শব্দমূলক অর্থ লুপ্ত হইবে, এবং উহা উক্ত জাতিগুণবাচক ধাতু বলিয়া গণ্য হইবে, আশ্চর্য্য নহে। কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষ নাম সাধারণ নাম হইয়া পড়ে, সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান যাইতে পারে। দেখ, তৈল শব্দের প্রকৃত অর্থ তিল নামক একটী বিশেষ পদার্থের নির্য্যাস; কিন্তু রূপগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা সরিষা, বাদাম প্রভৃতির নির্য্যাসকে সরিষার তৈল, বাদামের তৈল ইত্যাদি বলিয়া তৈল শব্দকে জাতিনাম করিয়া লইয়াছি। সুতরাং এক্ষণে তৈল শব্দের অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বালকেরা কিরূপে শব্দ প্রয়োগ করিতে শিখে, তাহা দেখিলেও অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। মনে কর, একটী শিশু ঘোড়া ও কুকুর বাটীতে দেখে ও তাহাদের নাম শিখিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে সে বিড়াল বা ছাগল দেখিলে তাহাকে কুকুর বলিবে, এবং গোরু কি উট দেখিলে ঘোড়া বলিবে। যদি একজাতীয় জীবের রব শুনিয়া তদনুসারে তাহার নামকরণ হয়, এবং বিভিন্ন-রব-বিশিষ্ট অপর জন্তুর প্রতি আকৃতি, গতি বা অন্য কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া সেই নাম বিস্তার করা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক রবানুগত অর্থ যে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

অগোস্ত কোমত্ বলিয়াছেন যে, সকল বিষয়েই জ্ঞানের তিনটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে দৈবশক্তির আশ্রয় লই ; পরে এমন কোন কারণ নির্দ্দেশ করি, যাহার সত্তার প্রমাণ নাই ; পরিশেষে পরিজ্ঞাত তত্ত্বগত নিয়ম অবলম্বন করি। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তিনটী মতের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে কোম্তের বাক্যের পোষকতা হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে ভাষা দিয়াছেন, ঐতিহাসিক-প্রমাণ-শূন্য বর্ত্তমান ব্যবহার-বিরুদ্ধ লৌকিক সম্মতি হইতে ভাষা জন্মিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের যে শব্দানুকরণশক্তি দৃষ্ট হইতেছে, সেই শক্তি প্রভাবেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনটী মত জ্ঞানোন্নতি সংক্রান্ত তিনটী অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।
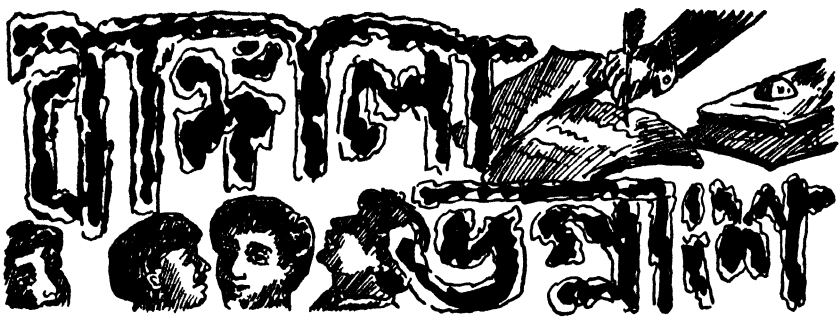
গণিত শাস্ত্রবেত্তারা সংখ্যা মাত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করেন। বাঙ্গালাতে তাহার বিশেষ কোন নাম নাই, তবে অভিনব অঙ্ক পুস্তক প্রণেতাগণ এক শ্রেণীর প্রতি "অবচ্ছিন্ন" এবং অন্যের প্রতি "অনবচ্ছিন্ন" নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ নাম যাহাই হউক, শ্রেণীদ্বয়ের লক্ষণ এই যে, ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি যখন কোন পদার্থ বিশেষের সংখ্যা বলিয়া প্রকাশিত হয়, যেমন ৫ টাকা, ৭ পয়সা, ১২টা কলম, তখন উহা অবচ্ছিন্ন সংখ্যা নামে একটী পৃথক শ্রেণী রূপে গণ্য হয়, এবং যখন কোন পদার্থ বুঝায় না—নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাই ব্যক্ত করে, যেমন পাঁচ আর সাতে বারো, তখন সেই সংখ্যাগুলি অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়।

অবচ্ছিন্ন সংখ্যার মধ্যে কতক গুলির বিশেষ ২ ভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা, দণ্ড, পল, বিপল; মণ, সের, পোয়া, ছটাক, কাঁচ্চা; টাকা, আনা, পয়সা, পাই ইত্যাদি। যে সকল সংখ্যার দ্বারা এগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার নাম মিশ্র রাশি।

তদ্রূপ অনবচ্ছিন্ন রাশির ভাগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ইংরাজিতে সামান্য ও দাশমিক ভগ্নাংশ নামক সঙ্কেত প্রচলিত আছে। প্রয়োজন মতে এই সঙ্কেত মিশ্ররাশি প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিশ্ররাশি ভিন্ন অন্য স্থলে অবচ্ছিন্ন সংখ্যার অংশ প্রকাশের তাদৃশ আবশ্যকতা উপস্থিত হয় না, যেমন আধ খানা কেদেরা। কিন্তু ইচ্ছা করিলে এরূপ স্থলেও উল্লিখিত সঙ্কেত নিযুক্ত করিতে পারা যায়।

বাঙ্গালাতে অনবচ্ছিন্ন রাশি ভাগের সঙ্কেত কি ?

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিশ্ররাশি প্রকাশ করিবার জন্য বাঙ্গালাতে দুই প্রণালি অবলম্বিত হয়। তন্মধ্যে একটিতে পণ, চৌক, গণ্ডা নামক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, এক মণ বারো সের সাত ছটাক লিখিতে হইলে ১।১২।৶০ এইরূপ অঙ্ক পাত করিতে হয়, আর ৩ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন অথবা ৭ দণ্ড ১২ পল ৩ বিপল লিখিতে হইলে ক্রমান্বয়ে "৩।৫।৭" দিন এবং "৭।১২।৩ বিপল" লিখিতে হয়। এরূপ অঙ্ক লিখিবার ইংরাজী প্রণালী এই, যথা, "১ ম—১২ সে ৭ ছ," "৩ ব—৫ মা—৭ দিন" এবং "৭ দ—১২ প—৩ বি।"

লেখকের অনুমান এই যে, বাঙ্গালাতে মিশ্র রাশি প্রকাশ করিবার জন্য স্থান বিশেষে যে পণ-চৌক আদি চিহ্ন প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা কোন বিশেষ পদার্থের সংখ্যা প্রকাশ করে না, কেবল অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা, একের ভগ্নাংশ প্রকাশ করে। অতএব পণ, চৌক লিখিবার ধারা সমূহকে বাঙ্গালা ভগ্নাংশের সঙ্কেত বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালাতে অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা বিভাগের নিমিত্ত প্রধানতঃ দুটী পর্য্যায় (table) প্রচলিত আছে এবং তদুভয় পরস্পরের অনুরূপ। যথা—

(১)	এক কাহন বা পূর্ণসংখ্যা একের	চতুর্থাংশ	এক চৌক।	ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন	।০
	এক চৌকের	ঐ	এক পণ	চিহ্ন	৶
	এক পণের	২০ ভাগের ১ ভাগ	এক গণ্ডা	চিহ্ন চৌক	‹১
(২)	এক গণ্ডার	চতুর্থাংশ	এক কড়া	চিহ্ন চৌক	।০
	এক কড়ার	ঐ	এক কাক	চিহ্ন পণ	৶০
	এক কাকের	২০ ভাগের ১ভাগ	এক তিল	চিহ্ন গণ্ডা	‹১

অতএব ভগ্নাংশের বিষয় বিচার করিতে গেলে কড়া, কাক, তিল, এবং চৌক পণ গণ্ডার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, স্বীকার করিতে হইবেক। গণ্ডার বাম পার্শ্বস্থ এবং কাহনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চিহ্নকে ইলেক বলে; স্বয়ং ইহার দ্বারা কোন সংখ্যা প্রকাশ হয় না, কেবল পার্শ্বস্থিত অঙ্কের নাম ব্যক্ত হয়।

নিম্নোদ্ধৃত মিশ্ররাশির পর্য্যায় গুলি দৃষ্ট করিলে প্রকাশ হইবেক যে, তাহা লিখিবার জন্য ঠিক উল্লিখিত নিয়মানুসারেই পণ চৌক গণ্ডা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১)	১ টাকার (১্)	চতুর্থাংশ	১ সিকি	চিহ্ন ১ চৌক	।॰
	১ সিকির	ঐ	১ আনা	চিহ্ন ১ পণ	৴॰
	১ আনার	ঐ অর্থাৎ ২॰ ভাগের ৫ ভাগ	১ পয়সা	চিহ্ন ৫ গণ্ডা	৻৫
(২)	১ মনের (১৴॰)	চতুর্থাংশ	১॰ সের	ঐ ১ চৌক	।॰
	১ সেরের (৴১)	ঐ	১ পোয়া	ঐ ঐ	৴।॰
	১ পোয়ার	ঐ	১ ছটাক	ঐ ১ পণ	৴॰
	১ ছটাকের	ঐ অর্থাৎ ২॰ ভাগের ৫ ভাগ	১ কাচ্চা	ঐ ৫ গণ্ডা	৻৫
(৩)	১ কাহন (১)	শস্তের চতুর্থাংশ	৪ শলি বা বিশ	ঐ ১ চৌক	।॰
	৪ বিশের	ঐ	১ শলি বা বিশ	ঐ ১ পণ	৴॰
অথবা	১ কাহনের ১৬ ভাগের ১ ভাগ				
	১ বিশের ২॰ ভাগের ১ ভাগ		১ পালি	ঐ ১ গণ্ডা	৻১

[পালির বিভাগেও আবার যথা ক্রমে চৌক পণ গণ্ডা নিযুক্ত হয়]

(৪)	১ বিঘার (১৴॰)	চতুর্থাংশ	৫ কাঠা	চিহ্ন ১ চৌক	।॰
	১ কাঠার (৴১)	ঐ	১ পোয়া	ঐ ১ ঐ	৴।॰
	১ পোয়ার	ঐ	১ ছটাক	ঐ ১ পণ	৴॰

মন সংখ্যার দক্ষিণ এবং সের পোয়া সংখ্যার বাম পার্শ্বস্থিত চিহ্নটী পণের অনুরূপ, কিন্তু কার্য্যে ইলেকের সদৃশ, এই জন্য উহার দ্বারা পণ-চৌক-সংঘটিত ভগ্নাংশের নিয়ম অতিক্রান্ত হয় নাই। বিঘা এবং কাঠার সংখ্যাতেও এই প্রকার, পণের অনুরূপ ইলেক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৪ সংখ্যক পর্য্যায়ানুসারে দীর্ঘ এবং দীর্ঘ প্রস্থ কালি উভয় প্রকার মাপ ও তাহার অঙ্ক পাত করিতে হয়। ভূমির কালি করণ বিষয়ে ইংরাজি প্রণালীতে যাঁহাদিগের গাঢ় সংস্কার হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে উপরিলিখিত পর্য্যায় অনুসারে হিসাব করিতে গোলযোগ হইয়া থাকে। যদি বাঙ্গালাতে দীর্ঘ মাপের বিঘা কাঠা পোয়া ছটাক এবং দীর্ঘ প্রস্থ কালি মাপের বিঘা কাঠা ইত্যাদির প্রতি একই নাম না হইয়া বিভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে

অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু প্রচলিত প্রণালি অনুসারে এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। দীর্ঘ মাপই হউক বা দীর্ঘ প্রস্থ কালিই হউক, ১ বিঘার বিংশতি ভাগের এক ভাগের নাম ১ কাঠা। এই জন্য কালি ১ কাঠা শব্দে, দীর্ঘ ২০ কাঠা এবং প্রস্থ ১ কাঠা বা তৎতুল্য পরিমিত ভূমি বুঝিতে হয়। সুতরাং যে ভূমি খণ্ড দীর্ঘ প্রস্থ উভয় দিকে কেবল ১ কাঠা মাত্র, তাহার কালি, এক কাঠার ২০ ভাগের ১ ভাগ হইবেক। কিন্তু উপরিলিখিত পর্য্যায়ে কাঠার চতুর্থাংশ পোয়া এবং ষোড়শ অংশ ছটাক মাত্র পাওয়া যায়। অতএব দীর্ঘ প্রস্থ ১ কাঠা ভূমির মাপ প্রকাশ করিবার উপায় কি? শুভঙ্কর কহেন,

"কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ,
দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় যান।"

অথবা "বিশ গণ্ডা কাঠার প্রমাণ।"

এই বচনানুসারে দুই প্রকার হিসাব হইয়া থাকে।

কাঠায় কাঠায় গুণ করিয়া যে গুণ ফল হয়, তাহাকে গণ্ডা কহে। কিন্তু পণের বিংশ ভাগ গণ্ডার সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

১ম প্রকার হিসাব। সামান্যতঃ কাঠায় কাঠায় গুণ করণান্তর গুণফল ৫ গণ্ডা কি তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা হইলে প্রত্যেক ৫ গণ্ডাকে এক কাঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১ পোয়া গণ্য করিয়া, লিখিবার সময়ে পোয়ার অঙ্কপাত করিতে হয় এবং ৫এর ন্যূন সংখ্যা ত্যাগ করিতে হয়। যথা চারি কাঠা প্রস্থ এবং ছয় কাঠা দীর্ঘ ভূমির কালি করিতে হইলে চারি ছয়ে ২৪ গণ্ডার মধ্যে ৪ গণ্ডা ত্যাগ করিয়া ২০ গণ্ডার স্থলে /১ এক কাঠা কালি গণনা করিতে হয়। আবার দীর্ঘ প্রস্থ পাঁচ কাঠা ও চারি কাঠা হইলেও সেই /১ এক কাঠা কালি হয়।

২য় প্রকার। এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম হিসাব করিতে হইলে গণ্ডা প্রতি, ৪কড়া গণনা করিয়া উপরিলিখিত ৫ গণ্ডার চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রত্যেক ৫ কড়ার স্থলে /০ এক ছটাকের অঙ্ক পাত করিতে হয় এবং তদনন্তর কড়া প্রতি, ৪ তিল ধরিয়া ছটাকের অঙ্কের পরে শতিকার অঙ্কের দ্বারা সেই তিল লিখিতে হয়। যথা, দীর্ঘ প্রস্থ ছয় কাঠা ও চারি কাঠা হইলে /১৶৪ এক কাঠা তিন ছটাক চারিতিল কালি হইবেক।

এস্থলে পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন যে এই তিল, /১ কাঠার ৩২০ ভাগের ১ ভাগ; সুতরাং ৮০ তিলে যে ১ কড়া হয় সে তিলের সহিত এই

তিলের কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্য আমরা অনুমান করি যে উল্লিখিত শুভঙ্কর বচনে "দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় যান" এই পাঠই প্রাচীন। এবং এ স্থলে "গণ্ডা" শব্দ বচনোক্ত ধূল শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। আর এই পাঠ ধরিলে ধূল বা গণ্ডা পরিত্যাগ করণ বিষয়ে যে প্রথার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। ইদানীন্তন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি সহকারে সূক্ষ্মতর গণনা আবশ্যক হওয়াতে "বিশ গণ্ডা কাঠার প্রমাণ" এই পাঠান্তর ও তাহার আনুষঙ্গিক কড়া তিলের নিয়ম প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে, তথাচ অনবচ্ছিন্ন রাশির তিলের সহিত কাঠার তিলের ঐক্য রক্ষা হয় নাই।

যাহা হউক এতদ্দ্বারা এই প্রকাশ হইতেছে যে কাঠার ভগ্নাংশ গণ্ডা, কড়া, তিলই হউক বা পোয়া ছটাকই হউক, উভয় প্রকার রাশি লিখিবার জন্য কেবল পণ চৌকেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। এবং কাঠা কালির অন্তর্গত কড়া গণ্ডার কোন পৃথক চিহ্ন নাই। উপরিলিখিত পর্য্যায় সমূহ ভিন্ন অন্য কোন মিশ্র রাশিতে পণ চৌক প্রয়োগ হয় না। কেবল ভূমি সম্পত্তির স্বত্ব বিভাগের নিমিত্ত মুদ্রা প্রকাশ করিবার পর্য্যায় ও চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে চৌক পণ গণ্ডা সর্ব্বত্র এক নিয়মে পর পর ৪, ৪, ২০ ভাগ প্রকাশ করে, সুতরাং উক্ত নামের চিহ্নগুলি অনবচ্ছিন্ন রাশির ভগ্নাংশ জ্ঞাপক বলিয়া গণ্য।

উল্লিখিত পর্য্যায়গুলি ব্যতীত মুদ্রা ভাগ বিষয়ে আর কতিপয় নিয়ম প্রচলিত আছে। তৎসমুদায় কড়ার ভাগ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা মতে এক কাহন বা ১এর ভাগ বিশেষকে কড়া কহে, এইজন্য ঐ ভাগগুলি কাহনের অংশ রূপেই প্রকাশ করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত ফর্দ্দ দেখিলে পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালাতে কি কি প্রকার এবং কতদূর সূক্ষ্ম ভাগ হইতে পারে। ফর্দ্দের লিখিত বিভাগ গুলির মধ্যে কেবল পণ চৌক এবং ক্রান্তির পৃথক মূর্ত্তি আছে।

এক কাহনের সমান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অঙ্কের ফর্দ্দ—

৪ চৌক $= ২^{২}$	৫,১২০ কাক $= ২^{১০} \times ৫$
১৬ পণ $= ২^{৪}$	৬,৪০০ তাল $= ২^{৮} \times ৫^{২}$
৩২০ গণ্ডা $= ২^{৬} \times ৫$	৮,৯৬০ দ্বীপ $= ২^{৮} \times ৫ \times ৭$
১,২৮০ কড়া $= ২^{৮} \times ৫$	১১,৫২০ দন্তী $= ২^{৮} \times ৩^{২} \times ৫$
৩,৮৪০ ক্রান্তি $= ২^{৮} \times ৫ \times ৩$	১৪,০৮০ রুদ্র $= ২^{৮} \times ৫ \times ১১$

১৫,৩৬০ বট $= ২^{১০} \times ৩ \times ৫$	১,০২,৪০০ তিল $= ২^{১২} \times ৫^{২}$
১৬,৬৪০ থিশ $= ২^{৮} \times ৫ \times ১৩$	৫,৩৭,৬০০ রেণু $= ২^{১০} \times ৫^{২} \times ৩ \times ৭$
১৭,৯২০ ভুবন $= ২^{৯} \times ৫ \times ৭$	১৬,৩৮,৪০০ ঘুণ $= ২^{১৬} \times ৫^{২}$
৩৪,৫৬০ যব $= ২^{৮} \times ৩^{৩} \times ৫$	৩,২৭,৬৮,০০০ বিন্দু $= ২^{১৮} \times ৫^{৩}$

এই ফর্দ্দের দক্ষিণ ভাগের অঙ্ক গুলির দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইবেক যে বাম ভাগের অঙ্ক সমূহ কি কি সংখ্যার গুণফল।

শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কৃত পাটীগণিত অবলম্বন পূর্ব্বক এই ফর্দ্দের রেণু, ঘুণ এবং বিন্দুর সংখ্যা লেখা গেল, কিন্তু তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।*

যাহা হউক ফর্দ্দটীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনেক গুলি কথা হৃদয়ঙ্গম হইবেক। বাঙ্গালা ভগ্নাংশ লিখিবার প্রণালীমতে কোন সংখ্যার বা মুদ্রার ৩,২৭,৬৮০০০, তিন কোটি ২৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ভাগের ভাগ প্রকাশ করা যায়, তদূর্দ্ধ যায় না। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রভাগ সহসা প্রয়োজন হইতে দেখা যায় না, তথাচ তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই বলিয়া প্রণালীকে অবশ্যই নিন্দা করিতে হইবেক। এই প্রণালীর ভগ্নাংশের আরো কতিপয় দোষ আছে। তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

* পাটীগণিত মতে ১ কড়ার তুল্য সংখ্যা ৩ ক্রান্তি, ৪ কাক, ৫ তাল, ৯ দন্তী, ২৭ যব, ৮০ তিল, ৪২০ রেণু, ১২৮০ ঘুণ এবং ২৫৬০০ বিন্দু। অনেক গুরু মহাশয় বলিয়াছেন যে ১ কড়ার সমান, ৩ ক্রান্তি, ৪ কাক, ৭ দ্বীপ, ৯ দন্তী, ১১ রুদ্র, ১২ বট, ১৩ থিশ, ১৪ ভুবন বা দামড়ি, ২৭ যব, ৮০ তিল, ৩২০ রেণু, ১২৮০ ধূল, ১০০০০০ ঘুন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলেন, ৪২০ও নহে ৩২০ও নহে ; ৩৬০ রেণুতে কড়া হয়। ইনি বট থিশের কথা জানেন না এবং পাটীগণিতের তাল ও বিন্দুর কথা শেষোক্ত দুই জনের কেহই শুনেন নাই। ফলতঃ নিম্নলিখিত শুভঙ্কর বচনোক্ত বিভাগ ব্যতীত অন্য ভাগগুলি এক প্রকার অপ্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য।

"কাক চতুর্থে (?) বটেক জানি,
তিন ক্রান্তে বট বাখানি,
নব দন্তী করিয়া সার,
সাতাশ যবে বট বিচার,
আশি তিলে বটং কর,
লেখার গুরু শুভঙ্কর,"

২। ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ এই ছয়টী সংখ্যা ঘটিত কতকগুলি সংখ্যার দ্বারা অন্ততঃ ৩২৭৬৮০০০ দিয়া বাঙ্গালা প্রণালিতে ১ বা ১ কাহনকে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু উহার ন্যূন অনেক সংখ্যা দিয়াও ভাগ করা যায় না। যথা—

১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা শ্রেণীর মধ্যে ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ইত্যাদি কতকগুলি এরূপ সংখ্যা আছে যে, তাহা ১ ভিন্ন অন্য সংখ্যার দ্বারা তুল্যভাগে বিভক্ত হইতে পারে না। এ গুলিকে ইংরাজীতে Prime number অর্থাৎ অবিভাজ্য সংখ্যা কহে; ইহার মধ্যে কেবল প্রথম ছয়টী অঙ্ক ঘটিত সংখ্যা ভিন্ন অন্য কোন সংখ্যার দ্বারা বাঙ্গালা ভগ্নাংশ প্রণালীমতে অপর সংখ্যার বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে না। যথা ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ইত্যাদি। আর এই রূপ অবিভাজ্য সংখ্যার সহিত অন্য কোন সংখ্যা গুণ করিলে যে গুণ ফল হয়, তাহা দিয়াও কোন সংখ্যাকে বিভাগ করা বাঙ্গালা সঙ্কেতের অসাধ্য।

এই দোষে কোন সম্পত্তির ১৭, ১৯, কি ২৩ কি তদনুরূপ অন্য কোন অবিভাজ্য সংখ্যার ভাগ বাঙ্গালা প্রণালীমতে ব্যক্ত করা অসম্ভাবিত। এবং বৎসরের পরিমাণ ৩৬০ দিনের পরিবর্ত্তে ৩৬৫ দিন অথবা মাসের পরিমাণ ৩০ দিনের পরিবর্ত্তে ২৯ বা ৩১ দিন ধরিলে দৈনিক বেতন বা সুদের হিসাব হয় না।

৩। পুনশ্চ, অবিভাজ্য নহে এরূপ অনেক সংখ্যা দিয়াও ১ কাহনকে বিভাগ করা যায় না। যথা—৩^{৪}, অর্থাৎ ৮১, ৫^{৪} অর্থাৎ ৬২৫, ৭^{২} অর্থাৎ ৪৯, ১১^{২} অর্থাৎ ১২১, ১৩^{২} অর্থাৎ ১৬৯, ২^{১৯} অর্থাৎ ৫২৪২৮৮ ইত্যাদি।

৪। ৩, ৭, ১১, ১৩, ২৫ বা এতাদৃশ কতকগুলি সংখ্যার দ্বারা কোন সংখ্যা বিভাগ করা বাঙ্গালা প্রণালীমতে সুসাধ্য হইলেও তন্নিমিত্ত অনেক অঙ্কপাত করিতে হয় এবং সমধিক শ্রম ও সময় আবশ্যক করে।

৫। ইতি পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে ভূমি সম্পত্তির অংশ প্রকাশ জন্য মুদ্রা বিষয়ক বিভাগ গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময়ে এইরূপ কথা পাওয়া যায়—যথা "অমুক সম্পত্তির, যোল আনার ৵৫৷৷১২ দুই আনা পাঁচ গণ্ডা দুইকড়া বারো ভুবনকে যোলআনা গণ্য করিয়া, তাহার ৵৪ তিন আনা চারি গণ্ডার ।/৬৷৷ = পাঁচআনা ছয়গণ্ডা দুইকড়া দুই ক্রান্তি রকম হিস্যা।" কিন্তু ইহা পাঠ করিলে কেহই বলিতে পারিবেন না

যে এতদ্দারা মূল সম্পত্তির সপ্তম অংশকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের তৃতীয়াংশ বুঝিতে হইবেক। অপর প্রাগুক্ত ।/৬॥=অংশ যে মূল সম্পত্তির ১০৫ ভাগের ১ ভাগ, তাহাও বাঙ্গালা প্রণালীতে সহজে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজি সামান্য ভগ্নাংশ প্রণালীমতে ইহার প্রক্রিয়া যৎপরোনাস্তি সহজ।

৬। পণ-চৌক সংঘটিত ভগ্নাংশ প্রণালীর এক সুবিধা এই যে, মূর্ত্তিভেদ থাকাতে ইহাতে অঙ্কপাতের গোলযোগ হইতে পারে না—এবং সেই কারণে যোগ বিয়োগ (তেরিজ জমা খরচ) প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সমস্ত অঙ্কগুলি, কড়া, কাক, তিল অথবা ক্রান্তি, দন্তি, যব অথবা দ্বীপ, ভুবন, রেণু এইরূপ এক একটী পর্য্যায়ের অন্তর্গত না হইলে হিসাব করা যায় না। যাঁহারা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ৵ কাক, ৭ দন্তী, এবং ১২ ভুবন, এই তিনটী সামান্য অঙ্ক একত্র ঠিক দিতে চেষ্টা করিবেন। ইহার যোগফল দুই কড়া এবং এক কড়ার একশত ছাব্বিশ ভাগের সতের ভাগ। কিন্তু বাঙ্গালা প্রণালীতে তাহা কোনমতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৭। সচরাচর এক পয়সা প্রকাশ করিবার জন্য এক বুড়ি অর্থাৎ ৫ গণ্ডা লিখিতে হয়, ইহাতে যে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ প্রস্তাব হইয়াছে, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট, প্রচলিত পয়সা উঠাইয়া দিয়া যদি ১৲ টাকার সমান ১০০ সেণ্ট মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাহা হইলে ১ সেণ্ট লিখিবার জন্য ৩৶৪ তিনগণ্ডা তিন কাক চারিতিল এইরূপ অঙ্কপাত করিতে হইবেক এবং ২ হইতে ৯৯ সেণ্ট পর্য্যন্ত পদেপদে ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া উক্ত অঙ্কের গুণফল লিখিতে হইবেক। এইরূপ গুণ করিতে এবং তদনন্তর তাহার যোগ বিয়োগ করিতে কত আয়াস আবশ্যক, তাহা কিয়ৎকাল চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

অনন্তর এই অবস্থার প্রতিকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই প্রবন্ধ এতদূর পাঠ করিয়াছেন, ভরসা করি যে তাঁহারা ভগ্নাংশ লিখিবার ইংরাজি প্রণালী না জানিলেও বুঝিতে পারিবেন যে কড়া কাক ক্রান্তি আদির অনুরূপ যত প্রকার বিভাগের পর্য্যায় সংস্থাপিত হউক, তাহাতে কখনই হিসাবের সম্পূর্ণ সুবিধা হইবেক না। অতএব এরূপ কোন প্রণালী অবলম্বন

করা কর্ত্তব্য যে তদ্দারা যে কোন ভাগ ইচ্ছা সহজে ব্যক্ত করা যায়। আমরা মনে করি যে ইংরাজি প্রণালী অবলম্বন করাই বিধেয়। যাঁহারা ঐ প্রণালী অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এতদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবেন না। কিন্তু লেখকের বাসনা এই যে শুভঙ্করী বিদ্যা ব্যবসায়ীগণও এই কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।

ইংরাজি দাশমিক বা সামান্য ভগ্নাংশ লিখিতে শতিকার অঙ্ক ভিন্ন অন্য কোন চিহ্ন প্রয়োগ করিতে হয় না। এই জন্য তাহা পণ চৌকের পার্শ্বে লেখা কর্ত্তব্য নহে।* লিখিলে ৵½ বা ইহার অনুরূপ অঙ্ক হইবে কিন্তু তাহাতে ½ অঙ্কটি পণের অংশ কি গণ্ডার অংশ ইহা প্রকাশ করিবার জন্য পরিশেষে অক্ষরের দ্বারা লিখিতে হইবেক। অনন্তর আর একটী অঙ্কে ৵ পণ ½ গণ্ডা লিখিলে এক সারির অঙ্ক অন্য সারির সহিত পরিগণিত হইতে পারে। এবং প্রত্যেক সারিতে কতকগুলি বাঙ্গালা ও কতকগুলি ইংরাজি প্রণালীর ভগ্নাংশ থাকিলে, শেষোক্ত অর্থাৎ সামান্য ভগ্নাংশের অঙ্ক গুলির যোগ বিয়োগ ক্রিয়া পুনঃ২ করিতে হইবেক। তাহাতে কেবল উভয় প্রণালীর অসুবিধা গুলিই একত্রিত হইবেক। ফলতঃ ভগ্নাংশ লিখিবার একাধিক প্রণালী একত্রিত করা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। ইহার তুলনার স্থল দেখাইবার জন্য আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে কারণে ইংরাজিতে সামান্য ও দাশমিক ভগ্নাংশ একত্র প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ এবং যে কারণে বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত ইংরাজী অক্ষর অথবা ইংরাজী অক্ষরের পার্শ্বে া, ি বা বাঙ্গালাভাষার অন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য, সেই কারণে পণ চৌকের সহিত সামান্য বা দাশমিক ভগ্নাংশ সংযুক্ত করাও অনুচিত।

তবে কি আনা পোয়া ছটাক প্রভৃতি রাশি গুলি ভাষা হইতে দূরীকৃত করিতে হইবেক? তাহা নহে। কেবল এই মাত্র আবশ্যক যে বৎসর মাস দিন বা দণ্ড পল বিপল ইত্যাদি সংখ্যা গুলি যে ধারা মতে লিখিতে হয়, অন্যান্য মিশ্ররাশি গুলি লিখিবার জন্যেও পণ চৌক কড়া কাক আদি চিহ্নের

---

* কোন২ বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক প্রণেতা এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। যথা—"৩৷৵২দ৺ক" "৩৷২দ৺ক" ইত্যাদি প্রসন্ন বাবুর পাটিগণিতের পরিশিষ্ট ১৪ পৃ। ১৫শ সংস্করণ। "১০৸৵১৮৷⅙" "২৬৷৴৪৷৷⅙" ইত্যাদি সারদাপ্রসাদ সরকার কৃত গণিতাঙ্ক ১ম সংস্করণ পরিশিষ্ট ২৭ পৃষ্ঠা।

পরিবর্ত্তে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবেক। ভূমি সম্পত্তির অংশ প্রকাশ করিবার জন্য কোন বিশেষ মিশ্ররাশির পর্য্যায় অবলম্বন না করিয়া সামান্য ভগ্নাংশ ব্যবহার করিতে হইবেক।

আমাদিগের ভাষা এই কেবল উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতেছেন, এখনও পদবিন্যাস বা অক্ষর সংক্রান্ত প্রথা এতদূর বদ্ধমূল হয় নাই যে তাহার অবস্থান্তর করা অসম্ভব। প্রাচীন গ্রীক রোমীয়েরা সভ্য প্রধান বলিয়া গণ্য, কিন্তু তাঁহাদিগের অঙ্ক লিখিবার প্রণালী এত জঘন্য ছিল যে তদ্দ্বারা সামান্য প্রক্রিয়া গুলি সহজে নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না। কথিত আছে যে এই কারণে হেরোডোটস নামক ইতিহাস বেত্তার সংখ্যা বিষয়ে এত প্রমাদ ঘটিয়াছে যে তাঁহার অপর সমস্ত কথা সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও সংখ্যা বিষয়ে তিনি কদাচ বিশ্বাস্য নহেন। বড় দুঃখের কথা যে, যে দেশের শতিকার সংখ্যা প্রণালী ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে, সেখানে ভগ্নাংশ প্রকাশ করিবার জন্য পণ চৌক আদি চিহ্ন গুলি অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই।

এখনও পাটীগণিতের নিয়মাবলী কেহ বিষয় কর্ম্মে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন নাই, অতএব এই সময়ে গণিত শাস্ত্র বিষয় এই সংশোধন সুসম্পন্ন করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। পাটীগণিত লেখকগণ যদি পণ চৌক সংঘটিত ভগ্নাংশ পৃথক প্রদর্শন করেন এবং উহার দোষ সমগ্র দেখাইয়া ব্যবহার নিষেধ করেন, তবে বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপক মহাশয়েরা তাহা দূরীকৃত করিতে না পারুন, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন। আর আদালতের অধ্যক্ষ অর্থাৎ উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণিস্থ জজ কালেক্টর মহাশয়েরা যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করিয়া সেরেস্তার পুস্তকাদিতে পণ চৌকের পরিবর্ত্তে ইংরাজি প্রণালীতে মিশ্ররাশি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন, তবে অচিরাৎ উহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে এবং সেই সঙ্গে২ দাশমিক ও সামান্য ভগ্নাংশ প্রয়োগের সুযোগ হওয়াও অসম্ভাবিত নহে।
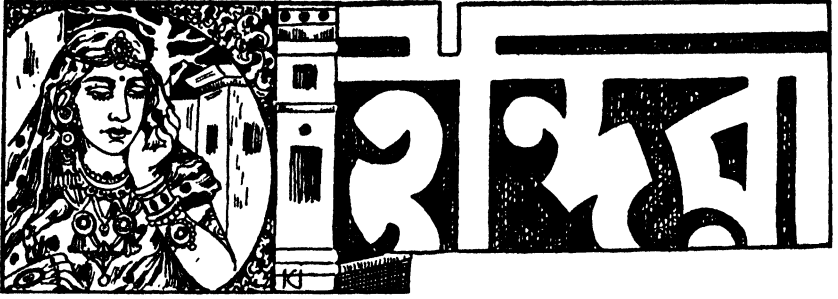
উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র, বিবাহের কিছু দিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না। বলিলেন, "বিহাইকে বলিও, যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন —এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?" শুনিয়া আমার স্বামির মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থ উপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন— কিন্তু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সম্বাদ লইলেন না। যে সময়ে আমার ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে তিনি বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের (কমিসেরিয়েট্ বটে ত?) কর্ম্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে

উপেন্দ্র (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জ্জনা করিবেন ; হাল আইনে তাঁহাকে আমার "উপেন্দ্র" বলিয়া ডাকাই সম্ভব)—উপেন্দ্র বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পালকী বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড় মানুষ বটে। পাল্কী খানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁশে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারিজন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কির সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড় মানুষ। হাসিয়া বলিলেন, "মা, ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র তোমাকে লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

তাই আমি শ্বশুর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুর বাড়ী মনোহর-পুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর ; উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ। সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌছিতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বট গাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে একা লোক জন আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এইজন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান, এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এই খানে পঁহুছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল, যে আমরা কিছু জল টল না খাইলে আর যাইতে পারি না। দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, এ স্থান ভাল নয়। বাহকেরা

উত্তর করিল, আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি? আমার সঙ্গের লোক জন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে লোক জন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বট বৃক্ষ তলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিশাল দীঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীবৎ উচ্চ, অথচ সুকোমল শ্যামল তৃণাবরণ শোভিত "পাহাড়"; —পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে— জলের উপরে জলচর পক্ষীগণ ক্রীড়া করিতেছে—মৃদু পবনের মৃদু২ তরঙ্গ হিল্লোলে স্ফাটিক ভঙ্গ হইতেছে—ক্ষুদ্রোর্ম্মি প্রতিঘাতে কদাচিৎ জলজ পুষ্প পত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে—তাহাদের অঙ্গ চালনে তাড়িত হইয়া শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দেখিলাম যে বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এক কালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক—এক জন শ্বশুর বাড়ীর, এক জন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ নিকটে নাই— স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা যইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিগের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, যে এক জন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতে২ আর এক জন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল! দেখিতে দেখিতে আর এক জন, আবার এক জন! এই রূপ চারিজন প্রায় এককালীনই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই—পাল্কি স্কন্ধে করিয়া উঠাইল। উঠাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়াইল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যু হস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে! পাল্কির উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোকে অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহু সংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কি লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোক সংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যে রূপ দ্রুত বেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কি হইতে নামিলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এক জন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, এক জন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কি ধরিল, তখন এক জন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এই রূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কি নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহারা এক খানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহু মূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া, পাল্কি ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্ন মাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়! সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাত্রে, আমাকে বন্য পশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহনীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণ ভাবে বলিল, "বাছা! অমন রাঙ্গা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরত হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

এক জন যুবা দস্যু কহিল, "আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।" সে আর যাহা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দ্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই লাঠির বাড়ি এই খানে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সয়?" তাহারা চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তার পর সেই খানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশ-পত্রাবচ্ছেদে বালারুণ কিরণ ভূমে পতিত হইয়াছে। আমি গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামানুসন্ধানে গেলাম। কিছুদূর গিয়া এক খানি গ্রাম পাইলাম। আমার পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম; আমার শ্বশুরালয় যে গ্রামে, তাহারও সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা বনে ছিলাম ভাল। একে লজ্জায় মুখ ফুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, যদি কই, তবে সকলেই আমাকে যুবতী দেখিয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ করিতে থাকে। কেহ ব্যঙ্গ করে—কেহ অপমানসূচক কথা বলে। আমি মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই খানে মরি, সেও ভাল; তবু আর পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। স্ত্রীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তাহারাও আমাকে জন্তু মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেননা তাহারাও বিস্মিতের মত চাহিয়া

রহিল। কেবল এক জন প্রাচীনা বলিল, “মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা? তুমি আমার ঘরে আইস।” তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইস। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। এক জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর?” সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?” যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সে গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, “তুমি পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উল্‌টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে দুই দিনের পথ।”

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কোথায় যাইবে?” সে বলিল, “আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।” আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ২ চলিলাম।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে?” আমি কহিলাম, “আমি এখানে কাহাকেও চিনিনা। একটা গাছ তলায় শয়ন করিয়া থাকিব।”

পথিক কহিল, “তুমি কি জাতি?”

আমি কহিলাম, “আমি কায়স্থ।”

সে কহিল, “আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।”

ছাই রূপ! রূপ, রূপ, শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে আমার অত্যন্ত গাত্র বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে; বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গাত্রের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্র সন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য আমার খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সম্বাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে আমার জানা শুনা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথিনী আপন পিত্রালয়ে পঁহুছিতে পারে।" কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পর দিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পর দিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পঁহুছিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া-ছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলিকাতার কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা ?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর এক খানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনি এক খানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। এক জন ভদ্র লোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্র বিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে ?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। রাম রাম দত্ত নামে আমার এক জন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্য তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে 'মহাশয় আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়ী রাঁধিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন ?' আমি বলিয়াছি, 'চেষ্টা দেখিব।' তুমি এ কার্য্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমত শক্তি নাই যে তোমায় আবার খরচ পত্র করিয়া কাশী লইয়া যাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে ? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।"

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রি দিন "রূপ! রূপ!" শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্র আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রাম রাম বাবুর বয়স কত ?"

উ। "তিনি আমার মত প্রাচীন।"

"তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান কি না ?"

উ। "দুইটি।"

"অন্য পুরুষ তাঁহার বাড়ীতে কে থাকে ?"

উ। "তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।"

আমি সম্মত হইলাম। পর দিন কৃষ্ণদাস বাবু আমাকে রাম রাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার বাড়ী পাচিকা হইয়া রহিলাম। শেষে কপালে এই ছিল! রাঁধিয়া খাইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিলাম, যে আমার বেতনের টাকা গুলি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই পিত্রালয়ে যাইতে পারিব। কিন্তু মহেশপুর কোথায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন সুযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন জেলা, কোন দিগে যাইতে হয়, আমি কুলবধূ, এ সকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এই রূপে এক বৎসর রাম রাম বাবুর বাড়ীতে কাটিল। তাহার পর এক দিন অকস্মাৎ এ অন্ধকার পথে প্রদীপের আলো পড়িল, মনে হইল। শ্রাবণের রাত্রে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল।

এই সময়ে রাম রাম দত্ত আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমার মহাজন, আমি খাদক,—আজিকার পাক শাক যেন পরিপাটি হয়। নহিলে বড় প্রমাদ হইবে।"

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলাম। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রামরাম বাবু আহারে বসিলেন।

আমি অগ্রে অন্নব্যঞ্জন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহারা আসিলেন। তাহার পর মাংস দিতে গেলাম। আমি অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু ঘোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না। ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশবৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; তাঁহাকে দেখিয়াই রমণী মনোহর বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি, আমি মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর

একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন, যে অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একটু মাত্র মৃদু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু সুখী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু সুখী হইয়া আসিলাম না। আমার নারী জন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতা মণ্ডলী আমার উপর ভ্রূভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "পাপিষ্ঠে, এ যে অনুরাগ।" আমি স্বীকার করিতেছি, এ অনুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামী সন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতৃপ্ত ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

আমি স্বীকার করিতেছি যে এ কথা বলিয়া আমি দোষ শূন্য হইতে পারিতেছি না। সকারণে হউক, আর নিষ্কারণেই হউক, পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া, আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাঁকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাঁকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমত সময়ে রাম রাম বাবু, আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম, ইনি সেই কটাক্ষটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রাম রাম দত্তকে

বলিলেন, "রাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন, যে পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রাম রাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ উনি রাঁধেন ভাল।"

আমি মনে২ বলিলাম "তোমার মাথা আর মুণ্ড রাঁধি।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে আপনার বাড়ীতে দুই এক খানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি।" বস্তুতঃ দুই এক খানা ব্যঞ্জন আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রাম রাম বলিলেন, "তা হবে ; ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একেবারে আমারে মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথা গা ?"

আমার প্রথম সমস্যা ; কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এ রূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, "আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এখন আর একটা বলিয়া দেখি।" এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম,

"আমাদের বাড়ী কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালা দীঘি ?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংস পাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রাম রাম দত্ত বলিলেন,

"উপেন্দ্র বাবু, আহার করুন না।" ঐটি শুনিবার আমার বাকি ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া এক বার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রাম রাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল?" আমি মাংসের পাত্র খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন হইতে এই ইতিবৃত্ত মধ্যে এক শত বার আমার স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে। এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দেও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব? এক শত বার "স্বামী স্বামী" করিয়া কান জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামিকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব? না, "প্রাণ নাথ" "প্রাণ কান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণ পতি," এবং "প্রাণাধিকের" ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্ব্বপ্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে২ ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (সে একটু সহর ঘেঁসা মেয়ে) স্বামিকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু সুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামিকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনে২ স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

এই ভাবিয়া আমি এমত স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজন স্থান হইতে বহির্ব্বাটীতে গমন কালে যে এদিক ওদিক চাহিতে২ যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনে২ বলিলাম যে, যদি ইনি এদিক ওদিক চাহিতে২ না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই। আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করিও—আমি

মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রে২ রাম রাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিগে কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়ন পথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা বিলক্ষণ জানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক,—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিস্তার স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। যাঁহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় "প্রাণনাথ" আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

হারাণী নামে রাম রাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি! দিদি ঠাকুরুন! তোমার এ রোগ আছে, তাহা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ—আমার এ উপকার করবি কি না, বল্।"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব। কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতি শিক্ষা এই রূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। চারি দণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি, যদি অপরাহ্ণে চলিয়া যান—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া

পাঠাইলেন যে, এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন। কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ, কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া থাকিবেন।" হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি।" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃতা হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে২ তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—এ জন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে' চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোন লক্ষণও দেখান নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে২ নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে২ সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে২ কলিকাতায় আসিতেন। রাম রাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্নে তিনি হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া, রাম রামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রাম রাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজ পত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে এক বার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতে যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গভীর রাত্রে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিঃশব্দে রাম রাম দত্তের বৈঠকখানায় গেলাম। তথায় আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়াছিলেন।

যৌবন প্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামী সম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হৃদয় মধ্যে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাঁদিলে কেন ? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন ?"

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্ম্ম পীড়া হইল, তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল। মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন,—যদি মনে করেন যে, ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রী হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য লোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহাঁর বিশ্বাস জন্মাইব ? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্যান্য কথার পরে তিনি বলিলেন, "কালাদীঘি তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

আমি নেকী সাজিয়া বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব।" এই ছলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ?"

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ ?

আমি বলিলাম, "আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

উত্তর। "না।"

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা যেমন বড় লোক, এটি তেমনি বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পরে আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমত বোধ হয় না। তাঁহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলেও, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও আমাকে গ্রহণ করিবেন না ! আমার এবারকার নারী জন্ম বৃথায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন ?"

তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয় ! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রে আমি স্বামি-শয্যায় বসিয়া তাঁহার আনন্দিত মোহন মূর্ত্তি দেখিতে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখন সে চিন্তিতভাব আমার দূর হইল। ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে তিনি আমার হাস্য কটাক্ষের বশীভূত হইয়াছেন। মনে২ করিলাম, যদি গণ্ডারের খড়্গ প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্তীর শুণ্ড প্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রের নখ ব্যবহারে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আয়ুধ দিয়াছেন, উভয়ের মঙ্গলার্থে তাহার প্রয়োগ

করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, “আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি,” হাসিতে২ আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতে২ কবরী মোচন পূর্ব্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে ?) আবার বাঁধিতে বসিলাম “আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে। আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সম্বাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।”

বোধ হয়, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আমি তখন হাসিতে২ বলিলাম, “তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ,” এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন; আসিয়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, “তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না।”

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত যোড় করিয়া ডাকিলেন, “আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।” আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বসিলাম না—বলিলাম, “প্রাণাধিক! আমি কোন ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বুঝিও। কিন্তু কি করিব ? ধর্ম্মই আমাদিগের এক মাত্র প্রধান উপায় —এক দিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আমি চলিলাম।”

তিনি বলিলেন, “আমি শপথ করিয়াছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে। এক দিনের জন্য কেন ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই।” এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম। তখন আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে করিতে না পারিয়া তিনি দুই হস্তে আমার দুই চরণ ধরিয়া পথ রোধ করিলেন।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্পদূর, সেই রাত্রেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি হাসিতে২ বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে। যদি কালও এমনই ভাল বাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন। অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আপনার করে তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "প্রাণনাথ, হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।" তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোন উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জ্বালিতে না জানিতাম, তবে গত রাত্রে এত আগুন জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে ফুৎকার দিলাম—কি প্রকারে স্বামীর হৃদয় দগ্ধ করিলাম, লজ্জায় তাহার কিছুই বলিতে পারি নাই। যদি আমার কোন পাঠিকা নর হত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবেই তিনিই বুঝিবেন। যদি কোন পাঠক কখন এই রূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন। বলিতে কি, স্ত্রীলোকই পৃথিবীর কণ্টক। আমাদের জাতি হইতে

পৃথিবীর যত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে তত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে এই নরঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অষ্টাহ আমি সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। হাসি, চাহনী, অঙ্গভঙ্গী,—সে সকল ত ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। আমি প্রথম দিনে আদর করিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অনুরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাঁহার ঘরকরনার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—স্বহস্তে পাক করিতাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—এক দিন একটু কাঁদিলাম; কেন কাঁদিলাম, তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অথচ একটু২ বুঝিতে দিলাম যে অষ্টাহ পরে পাছে বিচ্ছেদ হয়—পাছে তাঁহার অনুরাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। এক দিন, তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপাচরণ শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না—আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তিনি যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি অষ্টাহ পরে আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও আমি যাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অনুরাগানলে অপরিমিত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অথচ আমার ইঙ্গিতমাত্রে স্থির হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, "আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না।" ফলে আমি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার উন্মাদ গ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

পরীক্ষার শেষ দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিলাম। বলিলাম, "প্রাণাধিক! আমি তোমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করি নাই। তোমাকে বৃথা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পরীক্ষা মিথ্যা ভ্রম মাত্র। মানুষের মন স্থির নয়। তুমি আট দিন আমাকে ভাল বাসিলে—কিন্তু আট মাস পরে তোমার এ ভাল বাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমায় ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যদি সেই ভাবনা হয়, তবে আমি তোমাকে এখনই যাবজ্জীবনের উপায় করিয়া দিতেছি। পূর্ব্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার যাবজ্জীবনের সংস্থান করিয়া দিব।"

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, "ছি! তুমি যদি ত্যাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তুমি ত্যাগ করিলে জীবন রক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এ জন্মে আমায় ত্যাগ করিবে না। আজ শেষ পরীক্ষার দিন।"

তিনি বলিলেন, "কি করিব, বল। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম "আমি স্ত্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।" পরে অন্য কথা পাড়িলাম। কথায়২ একটা মিথ্যা গল্প করিলাম। তাহাতে কোন ব্যক্তি আপন উপপত্নীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে কোথায় গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার কাছ ছাড়া হইলেন। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরাহ্নে আবার গেলেন। এবার এক খানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ইহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ী হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আমি কখন ত্যাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।"

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রু জল পড়িল – তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন। আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, "আজি হইতে আমি তোমার চিরকালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাহার পরেই মনে২ বলিলাম, "এই বার সোণার চাঁদ, আর কোথা যাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?" যে অভিপ্রায়ে, আমার এত জাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন "ইন্দিরা"—মাতা নাম রাখিয়াছিলেন "কুমুদিনী।" শ্বশুর বাড়ীতে ইন্দিরা নামই জানিত, কিন্তু পিত্রালয়ে অনেকেই আমাকে কুমুদিনী বলিত। রাম রাম দত্তের বাড়ীতে আমি কুমুদিনী নাম ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইহাঁর কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখা পড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতায় সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। আমি এ পর্য্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব। ছলে কৌশলে স্বামির নিকট হইতে মহেশপুরের সম্বাদ সকল জানিয়াছিলাম—সকলে কুশলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

আমি স্বামীকে বলিলাম, "আমি একবার কালাদীঘি যাইয়া পিতা-মাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।"

স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কি প্রকারে থাকিবেন? কিন্তু এদিগে আমার আজ্ঞাকারী, "না" বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কালাদীঘি যাইতে আসিতে এখান হইতে পনের দিন পথ; এতদিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালাদীঘি গিয়া কোথায় থাকিবে?"

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কালাদীঘিতে কতদিন থাকিবে ?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচদিনের বেশী থাকিব না।"

তিনি বলিলেন, "সেই পাঁচদিন আমি বাড়ীতে থাকিব। পাঁচদিনের পর তোমাকে কালাদীঘি হইতে লইয়া আসিব।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে শিবিকারোহণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হতভাগ্য দীঘি পার করিয়া গ্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ ফিরিলে, আমি বাহকদিগকে বলিলাম, "আমি আগে মহেশপুর যাইব—তাহার পর কালাদীঘি আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

তাহারা আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এস্থানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পরে বলিব।"

পর দিন পিতা আমার শ্বশুর বাড়ী লোক পাঠাইলেন। পত্র বাহককে বলিয়া দিলেন, "জামাতা যদি বাড়ী না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।"

আমি মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরমাত্মীয়, আর

সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।” তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, “আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এত দিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।”

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কাদিগের বলিলাম, “তোমরা উহাঁদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উহাঁকে গ্রহণ করাইব।”

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, “আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।” শেষে মাতার রোদন এবং আমার সমবয়স্কাদিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর অন্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল না - সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্য মনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে২ বলিলেন,

“হাঁ দেখ্, কামিনী, তুই আরও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?”

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, “আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।”

আমার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “এ কি এ?”

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বলিলাম, “চতুর চূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?”

তিনি অবাক্ হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন্ রঙ্গ কুমুদিনী? তুমি এখানে কোথা হইতে?"

আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবর গণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রাম রাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্ম বিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়া ছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে তোমার স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিনেই পরিচয় দিতাম।" দান পত্র খানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।" সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এই খানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয়, আমায় গ্রহণ কর; না অভিরুচি হয়, আমি তোমার উঠান ঝাঁট দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দান পত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দান পত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড২ করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া—আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে, চল।"

সমাপ্ত

গত বৎসর শীতকালে বঙ্গদেশের প্রজা গণনা হইয়াছিল। এ বৎসর ঐ কার্য্যের বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হইয়াছে। গণনায় যে২ কথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন২ কথা পাঠককে জানাইতেছি।

প্রথম। এদেশে কত লোক? বঙ্গীয় লোকসংখ্যার এই প্রথম প্রকৃত গণনা। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে যে প্রদেশ, তাহাতে ৬৬,৮৫,৬৮৫৬ জন লোক বসতি করে। প্রায় সাতকোটি।

দ্বিতীয়। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী কত? বঙ্গীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধানে ৫টি পৃথক২ দেশ আছে, যথা, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আশাম, এবং ছোট নাগপুর। *বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, আসামী, এবং বন্যজাতি, এই পাঁচটি দেশে যথাক্রমে বাস করে। অতএব বাঙ্গালীর সংখ্যা সাত কোটি নহে। এই কয় প্রদেশের লোক সংখ্যা পৃথক২ লিখিত হইল।

বাঙ্গালা	...	...	৩৬,৭৬৯,৭৩৫
বেহার	...	...	১৯,৭৩৬,১০১
উড়িষ্যা	...	...	৪,৩১৭,৯৯৯
ছোট নাগপুর	...	...	৩,৮২৫,৫৭১
আসাম	...	...	২,২০৭,৪৫৩

উপরে যে বাঙ্গালার ৩৬, ৭৬৯, ৭৩৫ জন লোক লেখা হইল, তাহাও সকল বাঙ্গালী নহে। উহার মধ্যে কয়েকটি জেলা গণিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর বাস নহে। যথা, দারজ্জিলিং, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি। এবং

---

* আমরা এই পাঁচটি প্রদেশের সমবায়কে "বঙ্গদেশ" এবং বাঙ্গালার বাসস্থানকে "বাঙ্গালা" বা "নিজ বাঙ্গালা" বলিতে থাকিব।

তদ্ভিন্ন ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিও বাঙ্গালায় বাস করে। বাঙ্গালী ভিন্ন যে সকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করে, তাহার সংখ্যা ৪৬৫, ৬৮৪। অবশিষ্ট সকলই বাঙ্গালী। তদ্ভিন্ন সাঁওতাল পূর্ণিয়া গোয়ালপাড়া ও মানভূমের অনেকাংশে বাঙ্গালির বাস এবং পশ্চিমে কোথাও২ অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী আছে। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ তিন কোটি সাত লক্ষ কি আট লক্ষ বাঙ্গালী ভারতবর্ষে আছে।

তৃতীয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তুলনায় কি সিদ্ধান্ত হয়?

গতবর্ষে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেরও লোক সংখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু সে সকল প্রদেশের বিজ্ঞাপনী এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই। বিবর্লী সাহেব অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে, তাহার ফল নিম্নলিখিত মত হইয়াছে,—

উত্তর পশ্চিম	...	...	৩,১৩,৯৬,৪৫০
বোম্বাই	...	...	১,৩৯,৮৩,৯৯৮
মান্দ্রাজ	...	...	৩,১১,৭৩,৫৭৭
মহীশূর কুর্গ	...	...	৫২,২০,৬৬৩

তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের লোক-সংখ্যায় এবার কিরূপ হইয়াছে, তাহা জানা যায় না, কিন্তু পূর্ব্ব গণনার ফল নিম্নলিখিত মত জানা আছে।—

অযোধ্যা	...	...	১,১২,২০,২৩২
পঞ্জাব	...	...	১,৭৫,৯৩,৯৪৬
মধ্যভারতবর্ষ	...	...	৯১,০৪,৫১১
বেরাড়	...	...	২২,৩১,৫৬৫
ব্রিটেনীয় ব্রহ্ম	...	...	২৩,৩০,৪৫৩

এই সকল সংখ্যাগুলিন একত্র করিলে ১২, ৪২, ৫৫, ৩৯৫ হয়। এবং ইহার সহিত বাঙ্গালার লোকসংখ্যা সংযোগ করিলে ১৮, ১১, ১২, ২৫৪। সমগ্র ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এই। দেখা যাইতেছে যে ইহার মধ্যে একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে, ইহার তৃতীয়াংশের একাংশ। বঙ্গদেশ লইয়া গবর্ণর জেনেরলের অধীন দশটি খণ্ডরাজ্য। এক এক খণ্ড রাজ্য এক একজন গবর্ণর বা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, বা চীফ্ কমিশনর শাসন করেন। অন্যান্য নয় জন যত লোক শাসন করেন, একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহার সমষ্টির অর্দ্ধেক শাসন করেন। মান্দ্রাজে একজন

গবর্ণর কৌন্সিল সহিত নিযুক্ত, এবং উত্তর পশ্চিমে, এক জন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত, কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের উভয়ের দ্বিগুণ লোকের উপর কর্ত্তা। পঞ্জাবে একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, তাঁহার চারিগুণ লোক শাসিত করেন। বোম্বাইতে এক জন গবর্ণর এবং তাঁহার কৌন্সিল আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের ৫ গুণ। এক পাটনা কমিশনরের অধীন যে প্রদেশ, তাহাই লোকসংখ্যায় বোম্বাই গবর্ণরের শাসিত রাজ্যের তুল্য। অযোধ্যার এবং মধ্য ভারতবর্ষের চীফ কমিশনরদিগের শাসিত রাজ্য তদপেক্ষায় ন্যূন। মহীশূরের কমিশনরের শাসিত রাজ্য, ত্রিহুৎ জেলার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র। ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনর যে রাজ্য শাসিত করেন, তাহার লোক-সংখ্যা ত্রিহুৎ জেলার লোকের প্রায় অর্দ্ধেক, মেদিনীপুরের অপেক্ষায় কম, এবং সারণ এবং চব্বিশ পরগণার প্রায় সমতুল্য। অতএব অন্যত্র যেখানে একটি গবর্ণর, বঙ্গদেশের সেখানে একটী কমিশনরে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে। অন্যত্র যে খানে একটি চীফ কমিশনরের আবশ্যক, বঙ্গদেশে সেখানে একটি মাজিষ্ট্রেট কালেকটরের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।

চতুর্থ। কোথায় কোথায় ঘন বসতি? যে পাঁচটি দেশ বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন, তাহার মধ্যে বর্গমাইল প্রতি বাঙ্গালায়, ৩৮৯ জন, বেহারে ৪৬৫ জন, উড়িষ্যায় ১৮১ জন, ছোট নাগপুরে ৮৭ জন, এবং আসামে ৫১ জন। অতএব বেহারে সর্ব্বাপেক্ষা ঘন বসতি। আসামে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

বঙ্গদেশে যে কয়েকটি প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে চারিটি স্থানে অত্যন্ত ঘন বসতি দেখা যায়। যথা ;—

প্রথম, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাবড়া, এই তিন জেলা লইয়া যে প্রদেশ।

দ্বিতীয়, ঢাকা, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলা লইয়া যে প্রদেশ।

তৃতীয়, রঙ্গপুর।

চতুর্থ, পাটনা, ত্রিহুৎ এবং সারণ লইয়া যে প্রদেশ।

এই কয় জেলায় বর্গ মাইল প্রতি ৬০০ জন লোকের অধিক।

ইহার মধ্যে লোকের সংখ্যা অধিক সর্ব্বাপেক্ষা ত্রিহুতে, তৎপরে মেদিনীপুরে। কিন্তু এই দুই জেলায় যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘন বসতি এমত নহে; এই দুই জেলা অতি বৃহৎ, কিন্তু বর্গ মাইল প্রতি লোকসংখ্যার পড়তা

করিলে হুগলী হাবড়া সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক লোক। তথায় বর্গ মাইল প্রতি ১০৪৫ জন লোক। তৎপরে ২৪ পরগণায় ৭৯৩ জন। তারপর সারণে ৭৭৮, পাটনায় ৭৪২। এই কয় জেলায় সাত শতের উপর। অবশিষ্ট কয় জেলা, অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, রঙ্গপুর এবং ত্রিহুতে বর্গ মাইল প্রতি ছয় শতের উপর।

তৎপরে বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর, মুরশীদাবাদ, রাজসাহি এবং ত্রিপুরা। এই কয় জেলায় লোক মাইল প্রতি পাঁচ শতের উপর।

তৎপরে মেদিনীপুর, বগুড়া, কুচবেহার, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোওয়াখালি, গয়া, চাম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং কটক। এই কয় জেলায় লোক বর্গ মাইল প্রতি চারি শতের উপর।

দেখা যাইতেছে, সকল জেলার মধ্যে হুগলী জেলাই জনাকীর্ণ। কিন্তু জেলা ছাড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ ধরিতে গেলে কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে। কলিকাতার ঔপনিবেশিকভাগ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্গদেশের মধ্যে যে কয়েক স্থান অতিশয় জনাকীর্ণ, নিম্নে দেখান যাইতেছে।—

থানা বা নগর	জেলা	বর্গ মাইল প্রতি লোকসংখ্যা
কলিকাতা		৫৫৯৫০
* পাটনা নগর	পাটনা	১৭,৬৫৬
* কলিকাতা উপনিবেশ	২৪ পরগণা	১১,২৫৬
* হাবড়া	হাবড়া	৮১৪৯
* শ্রীরামপুর	হুগলী	৬৪১১
আঁড়িয়াদহ	২৪ পরগণা	৩৯৪৪
* দানাপুর	পাটনা	২৯১৯
* দিনাজপুর	দিনাজপুর	২৬০৪
* নবাবগঞ্জ (বারাকপুর)	২৪ পরগণা	১৬২৫
* শাহানগর (শহর মুরশিদাবাদ)	মুরশিদাবাদ	১৫৬২
* দমাদমা	২৪ পরগণা	১৪৪৪
ডুমুজুড়	হাবড়া	১৪১৭
হাসনাবাদ	২৪ পরগণা	১৪১৪

থানা বা নগর	জেলা	বর্গ মাইল প্রতি লোকসংখ্যা
* টালিগঞ্জ সোনারপুর	২৪ পরগণা	১৩৩৯
চণ্ডীতলা	হুগলী	১৩২৬
দাসপুর	মেদিনীপুর	১৩১৩
বৈদ্যবাটী	হুগলী	১২৭৪
* মানুল্লাবাজার	মুরশিদাবাদ	১২৬৮
শ্রীনগর	ঢাকা	১১৫০
ঘাটাল	হুগলী	১১২৯
আচিপুর	২৪ পরগণা	১১২২
* সুজাগঞ্জ (বহরমপুর)	মুরশিদাবাদ	১১০৮
আমতা	হুগলী	১০৯৩
রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গিপুর)	মুরশিদাবাদ	১০৯১
* হুগলী	হুগলী	১০৮৯
জগৎবল্লভপুর	হাবড়া	১০৭০
ঝালকাটি	বাখরগঞ্জ	১০৬৫
পুঁটিয়া	রাজশাহী	১০২২
ডেবরা	মেদিনীপুর	১০১৬
* তমলুক	ঐ	১০০৪

বঙ্গদেশের মধ্যে যে কয়েক স্থান সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ, তাহা উপরে দেখান গেল। এ সকল স্থানেই বর্গ মাইল প্রতি সহস্রাধিক লোক। উহার মধ্যে যে কয়েক স্থানে * চিহ্ন দেওয়া গেল, তাহা নগর বা উপনগর, বা নগর বা উপনগরবিশিষ্ট প্রদেশ। গ্রাম্য প্রদেশের মধ্যে বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা আঁড়িয়াদহের থানায় বর্গ মাইল প্রতি লোক অধিক। তৎপরে ডুমজুর, ও সুন্দরবন মধ্যগত হাসনাবাদ (টাকি অঞ্চল)। যে কয়েক স্থানে বর্গ মাইল প্রতি সহস্রাধিক লোক, তাহা সকলই হুগলী, ২৪ পরগণা, হাবড়া, পাটনা, মুরশিদাবাদ, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ এবং রাজশাহীর অন্তর্গত। কিন্তু শেষোক্ত চারিটি জেলায় কেবল এক২ থানায় এ রূপ লোকাধিক্য।

. ঢাকা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি প্রাচীন বহু জনাকীর্ণ নগর এই তালিকার অন্তর্গত নহে। তাহার কারণ এই সকল স্থান যে২

থানার অন্তর্গত, সেই সকল থানার মধ্যে অনেক সামান্য গ্রাম আছে, গড় পড়তা অধিক হয় নাই।

পঞ্চম। বিলাতের সঙ্গে তুলনায় কি জানা যায়?

দেখা যায় যে এ বিষয়ে বঙ্গদেশের সঙ্গে ও বিলাতের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যও আছে। তারতম্য আছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতির মোট বিস্তার ১২১,১১৫ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৩,১৮,১৭,১০৮। বঙ্গদেশের পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ এবং লোকসংখ্যাও দ্বিগুণ। ব্রিটেনে বর্গ মাইল প্রতি ২৬৩ জন লোক, বঙ্গদেশে বর্গ মাইল প্রতি তদপেক্ষা ছয় জন বেশী অর্থাৎ ২৬৯ জন লোক। নিজ ইংলণ্ডে বর্গ মাইল প্রতি ৪২২ জন লোক, বেহারে তদপেক্ষা ৪৩ জন বেশী অর্থাৎ ৪৬৫ জন, এবং বাঙ্গালায় তদপেক্ষা ৩৩ মাত্র কম, অর্থাৎ ৩৮৯ জন। হুগলী প্রভৃতি যে ২৭ জেলার উল্লেখ পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা একত্র করিলে পরিমাণে গ্রেটব্রিটেনের তুল্য হইবে। কিন্তু লোক সংখ্যায় তাহার গড় বর্গ মাইল প্রতি ৪২২ জনের অনেক অধিক। অতএব ঐ সকল প্রদেশ ইংলণ্ড অপেক্ষাও জনাকীর্ণ। ইউরোপে যে রাজ্যে গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক বাস করে, সে রাজ্য বহু জনাকীর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। জর্ম্মাণি ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে দুইটি অতি প্রাচীন এবং সর্ব্বাংশে প্রধান ও সুসভ্য রাজ্য। কিন্তু তথায় বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক নাই।

অতএব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহার পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত জনাকীর্ণ প্রদেশ। এরূপ লোকের আতিশয্য মঙ্গলের কারণ নহে—অমঙ্গলের কারণ।

ষষ্ঠ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে এই রূপ লোক বাহুল্য পূর্ব্বাবধি আছে, না ইদানীন্তন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে?

ইহার সদুত্তর দিবার কোন উপায় নাই। পূর্ব্বে কখন লোক সংখ্যা করা হয় নাই। ইংরাজেরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে কিছু পরে অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার লোক সংখ্যা এক কোটি। পরে এমত বিবেচনা হয় যে এ অনুমান অযথার্থ—লোক আরও অধিক হইবে। সর উইলিয়ম জোন্স তৎপরে অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশে বারাণসী বিভাগ সমেত ২,৪০,০০,০০০ লোক আছে। ১৮০২ শালে কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশে তিন কোটি লোক আছে। ১৮১২০ শালে

বিখ্যাত "পঞ্চম বিজ্ঞাপনীতে" এ দেশের লোক সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

১৮০৭ শালে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন নামা একজন বিচক্ষণ ইংরাজ বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হয়েন। সাত বৎসর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম করেন। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্যা নির্ণীত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার নির্ণয়ানুসারে উক্ত অংশে তৎকালে ১,৬৪,৪৩,২২০ জন লোক ছিল। বর্ত্তমান গণনায় তৎপ্রদেশে ১,৪৯,২৬,৩৩৭ জন লোক পাওয়া গিয়াছে। অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমরা নিতান্ত দুঃখিত নহি।

সর্ব্বত্রই যে লোক সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, বুকাননের নির্ণয়ে এমত সিদ্ধান্ত হয় না ; কোথাও হ্রাস—যথা মালদহ, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া। কোথাও বৃদ্ধি—যথা মুঙ্গের, রঙ্গপুর, সাঁওতাল পরগণা।

সপ্তম। বঙ্গদেশে কত হিন্দু, কত মুসলমান ? তাহার সংখ্যা বিজ্ঞাপনীর পরিশিষ্টের ১বি চিহ্নিত নক্সায় নিজ বাঙ্গালা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংখ্যা পাওয়া যায়—

হিন্দু ··· ··· ১,৮১,০০,৪৩৮

মুসলমান ··· ১,৭৬,০৯,১৩৫

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান। মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ মাত্র অধিক হিন্দু আছে। তবে হিন্দুদিগের প্রাধান্য এই যে, মুসলমানেরা প্রায় কৃষক, এবং সামান্য শ্রেণীর লোক। ভদ্রলোক অধিকাংশই হিন্দু, কিন্তু তাই বলিয়া এই বঙ্গদেশকে কেবল হিন্দুর দেশ বলা যায় না। যেমন ইহা হিন্দুর দেশ, সেই রূপই ইহা মুসলমানের দেশ।

মোটের উপর নিজ বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান তুল্য বলিয়া সকল জেলায় যে সেই রূপ, এমত বলা যায় না। নিম্নলিখিত কয় জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিক, যথা—

যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোওয়াখালি, (সুধারাম) ত্রিপুরা।

এই কয়েকটিকে মুসলমান জেলা বলিলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। নদীয়া ভিন্ন এই সকল জেলাই পূর্ব্ববঙ্গান্তর্গত। অতএব পূর্ব্ববঙ্গ যথার্থ মুসলমানের দেশ বটে।

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বগুড়া জেলাতেই মুসলমানের আধিক্য। তথায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান। তৎপরে রাজশাহী; তথায় শতকরা ৭৭ জন মুসলমান। তারপর সুধারামে ৭৫ জন, চট্টগ্রামে ৭০ জন, পাবনায় প্রায় তাহাই; বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরায় প্রায় ৬৫ জন, এবং রঙ্গপুরে ৬০ জন। অবশিষ্ট যশোহর, নদীয়া, দিনাজপুর, ঢাকা এবং ফরিদপুরে ষাটের কম, এবং পঞ্চাশের অধিক।

নিম্নলিখিত কয়টি জেলায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক, সুতরাং ঐ কয়েকটিকে হিন্দুর দেশ বলা যায়। যথা—

বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, মুরশীদাবাদ, মালদহ, দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, কাছাড়।

শ্রীহট্টে হিন্দু মুসলমান প্রায় তুল্য। এই কয় জেলার মধ্যে বাঁকুড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুর আধিক্য। তথায় শত করা ২॥ জন মাত্র মুসলমান। মেদিনীপুর দ্বিতীয়—তথায় মুসলমান শতকরা ৬ জন। তার পরে দারজিলিঙ্গে ৬॥, বীরভূমে ১৬, বর্দ্ধমানে ১৭, হুগলী হাবড়ায় ২০, কাছাড়ে ৩৬, ২৪ পরগণায় ৪০; মুরশিদাবাদ, মালদহ, এবং জলপাইগুড়িতে চল্লিশের অধিক, পঞ্চাশের কম।

কলিকাতায় শতকরা প্রায় ত্রিশ জন মুসলমান, ৬৫ জন হিন্দু, ৫জন অপর ধর্ম্মাক্রান্ত।

পাঠক দেখিবেন যে যে জেলায় প্রাচীন মুসলমান রাজধানী ছিল, সেই২ জেলায় যে অধিক মুসলমান এমত নহে। তাহা হইলে ঢাকা, মুরশীদাবাদ, মালদহে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুসলমান হইত। বিবর্লি সাহেব কোন২ জেলায় মুসলমানের আধিক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু বড় সফল হইতে পারেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বগুড়া এবং রাজশাহীতে অধিক মুসলমান কেন, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

পূর্ব্বকালে ইতরজাতীয় হিন্দুগণ পীড়নেই হউক বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করাতেই যে বঙ্গদেশে মুসলমানের ভাগ অধিক হইয়াছে,

এ কথা বিবর্লি সাহেব সবিস্তারে সমর্থিত করিয়াছেন। সে আয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে।

নিজ বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যত্র মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। বেহারে ১,৬৫,২৬,৮৫০ জন হিন্দু, ২৬,৩৬,০৩৫ মুসলমান মাত্র। উড়িষ্যায় ৩৭,৮৭,৭২৭ জন হিন্দু, ৭৪,৪৭২ জন মাত্র মুসলমান। ছোট নাগপুর ও আসামেও মুসলমানের সংখ্যা অতি সামান্য। এই কয় প্রদেশের কোন জেলাতেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের আধিক্য নাই।

বঙ্গদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন কয় প্রদেশে মোট ২৫,৬৬৪,৭৭৫ মুসলমান আছে। অর্থাৎ মোট লোক সংখ্যার তৃতীয়াংশের পূরা একাংশ নহে। হিন্দু ৪২,৬৭৪,৩৬১।

অষ্টম। মুসলমানের ভাগ বাড়িতেছে কি না? বিবর্লি সাহেব বলেন, বাড়িতেছে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কালে এ দেশে হিন্দু নাম লুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। বিবর্লি সাহেবের এ সিদ্ধান্তে আমাদের বিশ্বাস হয় না, তিনি যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। প্রধানতঃ তিনি বুকানন প্রভৃতির কথার উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কোথায় কত ভাগ হিন্দু, কত ভাগ মুসলমান, সে বিষয়ে বুকানন প্রভৃতির কথা অনুমান মূলক মাত্র। দ্বিতীয় কারণ এই একটি বলেন যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বালক বালিকার ভাগ অধিক, এ জন্য মুসলমানের ভাগ অধিক জন্মিতেছে। মুসলমানের মধ্যে বালকের ভাগ অধিক বটে, কিন্তু সে কি অধিক সন্তান জন্মিতেছে বলিয়া, না মুসলমানের মধ্যে অকালমৃত্যু অধিক বলিয়া? এ কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

নবম। হিন্দুর মধ্যে কোন্ জাতির সংখ্যা অধিক?

সর্ব্বাপেক্ষা কৈবর্ত্ত দাস অধিক। তথায় যে কয়েকটি জাতি সংখ্যার দশ লক্ষের অধিক, তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল—

কৈবর্ত্ত দাস	...	...	২০,৬৪,৩৯৪
চণ্ডাল	...	...	১৬,২০,৫৪৫
কায়স্থ	...	...	১১,৬০,৪৭৮
ব্রাহ্মণ	...	...	১১,০০,১০৫

আর সকল জাতি দশ লক্ষের কম। বেহারে সর্ব্বাপেক্ষা গোয়ালা অধিক। তথায় তিনটি জাতি মাত্র সংখ্যায় দশ লক্ষের অধিক। যথা—

গোয়ালা	...	...	২৩,০৭,৪০৬
ব্রাহ্মণ	...	...	১০,১৩,৬৭৬
বভন (ইতর ব্রাহ্মণ বিশেষ)	...	...	১০,০১,৩৬৯

উড়িষ্যায় কোন জাতিই সংখ্যায় দশ লক্ষ নহে। তথায় চাষা নামক কৃষি-ব্যবসায়ী জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশে প্রায় এক হাজার ভিন্ন২ জাতি বাস করে।

দশম। এতদ্দেশে স্ত্রীলোক অধিক, না পুরুষ অধিক ?

কথিত আছে যে, পৃথিবীতে স্ত্রীলোক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পুরুষ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু জীবিতে স্ত্রী পুরুষ তুল্য সংখ্যক। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, কেহ২ বলেন। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ইউরোপীয় নানাদেশের প্রজা গণনায় শেষোক্ত কথাটি এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। বিলাতের (United Kingdom) লোক সংখ্যা গণনায় পুরুষাপেক্ষা ৯,২৫,৭৬৪ জন স্ত্রীলোক অধিক পাওয়া গিয়াছে। বিলাতের অনেক পুরুষ বিদেশে থাকে, তাহা বাদেও প্রায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা সাত লক্ষ বেশী। সুইডেন্, নরওয়ে, এবং হলাণ্ডের লোক সংখ্যা গণনায় শত করা ৪।৫ জন স্ত্রী লোক বেশী হইয়াছে। জর্ম্মাণিতেও প্রায় চারি জন (৩˙৭) স্ত্রীলোকে শত করা বেশী, অর্থাৎ যেখানে ১০০ জন পুরুষ, সেখানে ১০৩˙৭ জন স্ত্রীলোক। রুসিয়ায় ১০০ পুরুষের স্থানে ১০২˙৫ জন স্ত্রী, পোলণ্ডে ১০৬˙৮ জন এবং ফিনলণ্ডে ১০৫˙৪ জন। অতএব ইউরোপের গতিক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বত্র পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক।

কিন্তু ভারতবর্ষে দৃষ্টিপাত করিলে এ সিদ্ধান্ত উন্মূলিত হইয়া যায়। তথায় পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশে লোকের সংখ্যা করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে একশত জন পুরুষ প্রতি

উত্তর পশ্চিমে	৮৬˙৫ জন	স্ত্রীলোক
অযোধ্যায়	৯৩ "	"
পঞ্জাবে	৮১˙৮ "	"
মধ্যভারতে	৯৫˙৩ "	"
বেরাড়ে	৯৫˙৫ "	"

অতএব ভারতবর্ষে সচরাচর স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

বঙ্গদেশে কোন২ পার্ব্বত্য প্রদেশে (নাগা, গারো, এবং বন্য ত্রিপুরায় স্ত্রী পুরুষ পৃথক করিয়া গণনা হয় নাই। তদ্ভিন্ন ৬,৬৬,৭২,৬৭৯ জন লোকের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ পৃথক করিয়া গণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩,৩৩,৯৮,৬০৫ জন পুরুষ, এবং ৩,৩২,৭৪,০৭৪ জন স্ত্রীলোক।

তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গ প্রদেশের প্রভেদ এই যে, এখানে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার অল্প তারতম্য। এক শত জন পুরুষের প্রতি ৯৯.৬ জন স্ত্রীলোক। নিজ বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও কিছু কম। ১০০ জন পুরুষের প্রতি ৯৮.৯ জন স্ত্রীলোক।

একটা কৌতুকের কথা মনে পড়িল। এক জন স্ত্রী এক জন পুরুষে বিবাহ হইলে, বঙ্গদেশে সকল পুরুষের বিবাহ ঘটে না। নিজ বাঙ্গালার নিতান্তপক্ষে শতকরা এক জন পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। বিশেষ কতকগুলি স্ত্রীলোক আজন্ম বেশ্যা, কখন বিবাহ করে না, এমত স্থলে এ দেশে পুরুষের বহু বিবাহ প্রথার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ অবস্থা সঙ্গত বোধ হয়। এক জন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করিতে না পারিলে স্ত্রীলোকে কুলায় না।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোক সংখ্যায় অল্প নহে। কোথাও স্ত্রীলোক বেশী, কোথাও পুরুষ বেশী। কলিকাতায় স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ পুরুষ। নিম্নলিখিত কয়েকটি জেলায় স্ত্রীলোক বেশী।—

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, মুঙ্গের, কটক, বালেশ্বর, খাসিয়া পাহাড়। ইহার মধ্যে চট্টগ্রাম এবং মুরশিদাবাদে সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভাগ অধিক।

এই কয় জেলায় পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা না চলিলে, কতক স্ত্রীলোককে অন্য জেলায় গিয়া বিবাহ করিয়া আসিতে হয়। তাহা বাঞ্ছনীয়, কি বহু-বিবাহ বাঞ্ছনীয়, তাহা দেশ হিতৈষী মহাশয়েরা মীমাংসা করিবেন। শাস্ত্রে কি বলে?

ত্রিহুত, এবং সাঁওতাল পরগণায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঠিক সমান।

অবশিষ্ট কয় জেলায় পুরুষের সংখ্যা অধিক।

এ সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ তত্ত্ব এই যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প ; কেবল উত্তর ভারতবর্ষের অন্যত্র সেরূপ নহে। বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম সংখ্যক। মুসলমানের স্ত্রীলোক মোটের উপর এই, কিন্তু জেলায় জে ায় বৈষম্য দেখা যায়।

একাদশ। কোন্ বয়সের ে াক কত? সকল বয়সের লোক পৃথক২ করিয়া গণা হয় নাই। দ্বাদশ ব রের অনধিক বয়স্ক, এবং দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রীপুরুষ এই দুই শ্রে তে বিভক্ত হইয়াছে। বালক বা বালিকা বলিলে এ প্রবন্ধে বার বৎসরের অনধিক বয়স্ক বুঝাইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত বলিলে বার বৎসরের অধিক বয়স্ক বুঝাইবে। বয়সের বিষয়ে এই কয়েকটি কথা পাওয়া যাইতেছে।

১। বঙ্গদেশে যেমন মোট স্ত্রীলোক এবং পুরুষ প্রায় তুল্য, বালক বালিকা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। বিস্ময়কর কথা এই যে, বালিকা অপেক্ষা বালক অধিক ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক। যে পরিমাণে বালকের আধিক্য, প্রায় সেই পরিমাণেই স্ত্রীলোকের আধিক্য। যথা একশত জনের মধ্যে

বালক	...	...	১৮.৮
বালিকা	...	...	১৫.৭
মোট অল্প বয়স্ক			৩৪.৫
বয়ঃপ্রাপ্ত পুং	...	...	৩১.৩
ঐ স্ত্রী	...	...	৩৪.২
মোট বয়ঃপ্রাপ্ত			৬৫.৫

২। এইটি কেবল মোটের উপর বর্ত্তে এমত নহে। সকল জেলাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত বালক অধিক, বালিকা কম ; সকল জেলাতেই বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক অধিক, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অল্প। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রথমতঃ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্র সন্তান অধিক জন্মে, দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক পুরুষ মরে। অধিক পুরুষ জন্মে, বা অধিক পুরুষ মরে, ইহার কি কোন কারণ আছে?

৩। ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে বালক বালিকাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডে বালক বালিকার সংখ্যা

অধিক, কিন্তু তথায় এক শত লোকের মধ্যে ২৯'৪৪ জন মাত্র বালক বা বালিকা। কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে,

বঙ্গদেশে	...	...	৩৪'৫ জন
পঞ্জাবে	...	...	৩৫'৪২ ঐ
উত্তর পশ্চিমে	...	...	৩৫'৫৮ ঐ
অযোধ্যায়	...	...	৩৬
বেরাড়ে (১৩ বৎসর পর্য্যন্ত)			৩৫'৭
মধ্য ভারতে (১৪ ঐ)		...	৩৯'৯

ইহার কারণ কি? ভারতবর্ষ ইউরোপ অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, তথায় অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না, অল্প বয়সেই মরিয়া যায়, সেই জন্য কি এমত ঘটে? কিন্তু তাহা হইলে অস্বাস্থ্যকর বর্দ্ধমান এবং রাজধানী বিভাগে বালক বালিকার সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যত্রাপেক্ষা অল্প কেন? এই দুই বিভাগে বালক বালিকা শতকরা ৩০'৯ এবং ৩০'৮ মাত্র। ইংলণ্ড হইতে কিছু অধিক মাত্র। জ্বর পীড়িত হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় ২৯'২ ও ২৯'৪ জন,. অর্থাৎ ইংলণ্ড অপেক্ষাও অল্প। ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যাহারা সংক্রামক জ্বরে পীড়িত হয়, তাহাদের অপত্যোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়।

বঙ্গদেশে নিজ বাঙ্গালা ও বেহার অপেক্ষা বন্য ও পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে বালক-বালিকার আরও প্রাবল্য।

সাঁওতাল পরগণায়, ছোট নাগপুরে, ও আসামেই তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যত্রও দেশী লোক অপেক্ষা বন্যজাতির মধ্যে সন্তানের আধিক্য। বিবর্লি সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে দেশী জাতির অপেক্ষা বন্যজাতির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি অধিক এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

৫। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বালক বালিকার সংখ্যা অধিক। বিবর্লি সাহেব বলেন যে, বাঙ্গালায় মুসলমানেরা পূর্ব্বে নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল—পরে যবন হইয়াছে। নীচজাতীয় হিন্দুরা পূর্ব্বে বন্যজাতীয় ছিল। এই জন্য বাঙ্গালায় মুসলমানেরা বন্য জাতিরস্বভাবানুযায়ী অধিক সন্তানোৎ-পাদক। তাহা হইলে নীচজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও সন্তানের আধিক্য হইত। বাস্তবিক তাহা হয় কি না, জানা যায় না।

অন্যত্র বাঙ্গালায় সন্তানাধিক্যের তিনি আর একটি কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিবাহ করিতে হয়, এবং সন্তানোৎপাদন পরম ধর্ম্ম। তবে হিন্দুর মধ্যেই সন্তানাধিক্য হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে বিবাহের আধিক্য, এবং বাল্য বিবাহ সন্তানাধিক্যের কারণ হইতে পারে।

৬। এদেশে বালক বালিকার এতাদৃশ বাহুল্যে দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি অবশ্য সত্য বোধ হয়। হয়, ইউরোপ অপেক্ষা এদেশে অকাল মৃত্যু অধিক, নয় এদেশে অধিক সন্তান জন্মে। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি সত্য বোধ হয়। কিন্তু বাল্য বিবাহকে বিবর্লি সাহেব যে অকাল মৃত্যুর কারণ বলিয়াছেন, এ কথা অমূলক।

৭। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে বালিকা অপেক্ষা অধিক বালক জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এই তারতম্য অল্প, তদপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে বালকের আধিক্য এবং হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে আরও অধিক।

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় প্রজা সম্বন্ধে আরও অনেকগুলিন জ্ঞাতব্য কথা সঙ্কলন করিতে পারিলাম না।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্র।

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা একটি আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখক-দিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে "আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবী মধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোক পীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালি গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না। অপ্রশংসা দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন ; দুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালির স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্র লোকের ভাষা এবং ভদ্র লোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল— যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন

অন্ত গালি জানে না, সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখন২ দেখিয়াছি যে মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ত্রুটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন। কখন২ দেখিয়াছি, রাগান্ধ লেখকেরা সমালোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্ব্বিত চর্ব্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া "নূতন" বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, যে সত্য সত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নূতন বলিয়াছি। যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চারি হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে তাঁহার কথা গুলিন অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন২ দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে২ স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষ্যা বশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতক গুলিন ভাল মানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদিগের বড় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখক সমাজকে জানাই যে আমরা বিশ্বনিন্দুক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, এবং বাঙ্গালা ভাষার দুভার্গ্য ক্রমে সে রূপ গ্রন্থ অতি বিরল। অদ্য দুই খানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজি আমাদিগের এত আহ্লাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থ খানি প্রথমেই সমালোচনীয়।

হিন্দু ধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্র মাসে জাতীয় সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত হইতে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচার কালে কার্য্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ। সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না, কেননা তাহা করিতে গেলে হিন্দু ধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল।

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি এক জন হিন্দুবংশজাত লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা একজন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে বোধ করি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা বলিতেছি, এ কথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু এ কথা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, বা অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, তদ্বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা, বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দু ধর্ম্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দু ধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।

রাজনারায়ণ বাবু নিজ প্রশংসিত ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দু শাস্ত্রে আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দু ধর্ম্মের একাংশ মাত্র—অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু যেমন হিন্দু ধর্ম্মের অংশ বিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্ম্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল

কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলা যায় না। উপধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা কোন কালে একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, সন্দেহ। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয়, রাজনারায়ণ বাবু এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না। স্বমত সংস্থাপনে সকলেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবর্ত্তে হিন্দু কথাটি ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার; যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের পরিশোধন ভাল। কেননা তাহাতে বহু লোকের ইষ্ট সাধন হয়। আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায় ভুক্ত নহি; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এ কথা বলিলাম না; হিন্দু জাতির আনুকূল্যেই এ কথা বলিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনা প্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতি সুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের প্রীতি প্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এ রূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে এ কথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই, তাহাতে আমাদের সুখ।

"আমার এই রূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন,—Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible looks ; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day heaven.

আমিও সেই রূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃ প্রাণ ;
গাও ভারতের যশো গান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা।

হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।

হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥"

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে২ মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসির হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!

কিঞ্চিৎ জলযোগ। প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র।

একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুই খানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষ রূপে বর্জ্জিত, **একেই কি বলে সভ্যতা** এবং **সধবার একাদশী**। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এ রূপ প্রহসন দুর্লভ। "**কিঞ্চিৎ জলযোগ**" ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি। ইহাও এক খানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এপ্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গে যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। কে ব্যঙ্গের যোগ্য, তাহার মীমাংসার স্থান এ নহে; সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব।

কার্য্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য্য হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য্য সফল হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্ত্তার অভিপ্রায় ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলি। যদি অসদভি-প্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুষ্ক্রিয়া। যদি অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ, বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভৎর্সনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত,

তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থা বিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেই খানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য পৃথক২ নাম আছে। একটিকে Error বলে আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ায় অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অধর্ম্ম বলি, এবং ভ্রান্তির উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Folly-ও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐরূপ অসঙ্গত কার্য্য বা ভাবের উপর লক্ষিত। সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।

পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনের কোন২ স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক, একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্য্য ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।